সোনার বাংলা

সপ্তর্ষি

সপ্তর্ষি, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩।

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারি ১৯৬৫

প্রকাশক ঃ
ভোলানাথ দাস
সপ্তর্ষি
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ
কনক কুমার বসুঠাকুর
সুমুদ্রণী
৪/৫৬-এ, বিজয়গড়,
কলিকাতা-৭০০০৩২

"অবশেষে কর্মস্থলে এসে পৌঁছনো গেল। নতুন পরিবেশে ভালই লাগছে প্রথমটা। কাল মাত্র এসেছি, ঘরদোর কিছুই গোছানো হয়ে ওঠেনি। আর ঘর বলতে তো দরমার বেড়া ঘেরা দুটি খুপরি। শালকাঠের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা দরমার দেওয়াল, উপরে পুরু করে বিছানো উলুখড়। জানলা-দরজা সব ঝাঁপের, কঞ্চির ঠেকনা দিয়ে বায়ু গমনাগমনের একটা প্রচেষ্টা মাত্র। একখানি ঘরে আমার সংসার, অর্থাৎ আহার নিদ্রা, লেখবার টেবিল পাতা—অপর ঘরখানা আমার অফিস। সেখানেও টেবিল ও খানকয়েক চেয়ার। বারান্দায় পাতা আছে একটি টুল, ঘণ্টা টিপলে টুল থেকে উঠে আসে ঝিমন্ত পিয়ন—খিদমৎ করতে। খাট-টেবিল-বেঞ্চি কোনটাই বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়নি , মহাবীর কর্ণের সহজাত কবচ কুণ্ডলের মতোই এরা এ গৃহের আঙ্গিক। এদের শ্রীচরণ হচ্ছে বংশদণ্ড, মাটির মেঝেতে হাত দেড়েক প্রোথিত। এসবের জন্যে সরকারি খাতায় কোন খরচের অঙ্ক পড়েনি—আমার আগমন সংবাদে ঠিকাদার প্রভু স্বযং দাঁড়িয়ে থেকে এগুলি বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বানিয়ে রেখেছেন।

"কোথায় ছিলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনের ধারে একটি কলেজের শান্ত সুবোধ ছাত্রটি—আর কোথায় হয়ে গেলাম কলমের এক খোঁচায় একটা সাব-ডিভিসনাল অফিসের ইন্‌চার্জ। অবশ্য চাকরিটাই গালভারি—এস ডি ও অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের অফিস বললে যে ছবিটা সচরাচর মনের মধ্যে জেগে ওঠা স্বাভাবিক, আমার এই দরমার কুঠরির ছবিটা তার কাছে নেহাৎই কার্টুন পিকচার। তবু বনগ্রামের শিরা সম্রাট তো হওয়া গেল। যতদিন না বদলি হচ্ছি এই উলুখড়ের রাজপ্রাসাদেই শেয়ালরাজাকে রাজত্ব করে যেতে হবে। ভাগ্যে ভগবান গৃহের সঙ্গে গৃহিণী দেননি। এ বাড়িতে এসে রানীগিরি করবার মত ইচ্ছে কোন বঙ্গললনার হতে পারে না। রেখা মিত্তিরের মতো মেয়ের কথা এ পরিবেশে না ভাবাই ভাল। তবু স্বীকার করা উচিৎ যে, সিংজী ঠিকাদার এগুলি করে রেখেছিলেন বলেই তাঁর নির্মিত টেবিলে বসে তাঁর বাড়ির এ প্রশস্তি লিখবার সুযোগ মিলছে। সুতরাং হে সিংজী ঠিকাদার, তুমি শতায়ু হও।

"কাল যখন এসে নামলাম—এগুলি দেখিয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে সিংজী নিবেদন করলেন—হুজুরের অফিস ফার্নিচার যতদিন না এসে পড়ে ততদিন যাতে কোনক্রমে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, তাই এই দীন আয়োজন তিনি করে রেখেছেন। খড়ের চালের নিচ দিয়ে একটা দরমার সিলিংও করে দেবেন এবম্বিধ প্রতিশ্রুতি দিলেন একটা তাড়াতাড়িতে নাকি ওটা হয়ে ওঠেনি

"আমি বিব্রত বোধ করি। কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে সবে এই চাকরি পেয়েছি। প্রথমেই এভাবে ঠিকাদার কর্তৃক অনুগৃহীত হওয়া উচিত হবে কিনা মালুম হচ্ছিল না। ঠিকাদার প্রভু তাক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চাইলেন। রনৎজেন সাহেবের যন্ত্রটির সঙ্গে ওঁর অক্ষিতারকার কোনও সাদৃশ্য আছে কিনা জানিনা , বললেন, 'হুজুরকে এহী লিয়ে বলেছিলম কলকত্তায়—একেবারে ক্যাম্পের বীচে অফিস না বানিয়ে রেল-টিসনে বনাইতে। উখানে উমদা কোয়াটার ভি মিলে যেত। চার মীল রাস্তা, ও তো হুজুর সুরোসাম সাইকেলে মারতে পারতেন - হমার জীব ভি ছিল।"

"সত্য কথা। রামশরণ সিংজীর প্রবল আপত্তি ছিল ক্যাম্পের ভিতর অফিস করাতে। এখানে থাকার ইচ্ছা আমারও ছিল না। কথা বলার লোক নেই। নানান অসুবিধা। এর চেয়ে স্টেশনে থাকলে অনেক সুবিধা হত আমার। বলেও ছিলাম কথাটা চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে। তিনি কানেই তোলেননি। হেসে

বলেছিলেন, 'পরামর্শটা কার? রামশরণের নাকি?'

"কি জানি কি ভেবে তাড়াতাড়ি বলেছিলাম, 'না, আমিই ভাবছিলাম।'

"চীফ ইঞ্জিনিয়ার পাইপটা কামড়ে ধরে পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা পার হয়ে এসে আমার কাঁধটা ধরে বললেন, 'ইয়ংম্যান, কলকাতাই যদি ছাড়তে পারলে, তখন ও স্টেশন আর ক্যাম্পে তফাৎটা কী? বরং ক্যাম্পে সুপারিন্টেন্ডেট আছে, ডাক্তার আছেন, রিলিফ ডিপার্টমেন্টের আর পাঁচজন ভদ্রলোক আছেন। এ্যাসোসিয়েশন ওখানেও একটা গড়ে উঠবে। আর তা ছাড়া—"

"আবার কি ভেবে নীরবে পায়চারি করতে লাগলেন। এটি আমাদের সি.ই.র একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি পায়চারি করতে করতে কথা শোনেন, কথা বলেন, ডিক্টেশন দেন—এমন কি লাঞ্চ-আওয়ার্সে তাঁকে পায়চারি করতে করতে খেতেও দেখেছি। ঘুমন্ত অবস্থায় সি. ই.-কে দেখিনি। অনুমান করি নিদ্রিত অবস্থায় অন্তত তাঁর পদচারণা অব্যাহত থাকে না।

"তা ছাড়া আই উইস্ য়ু শুড ডাইভ হেডলং ইনটু দি এ্যাফেয়ার্স। ক্যাম্পে না থাকলে তা সম্ভব নয়।"

"হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে চাইলেন। ওষ্ঠে নয়, চোখ দুটিতে তাঁর চাপা হাসি। ওঁর এই নিগূঢ় হাসি, এই 'এ্যাফেয়ার্স' শব্দটির বিশেষ বাচন-ভঙ্গিতে কিসের যেন একটা আভাস ছিল।

"সিংজীকে বললাম, 'না না সিলিং-এর কোন দরকার হবে না। টিনের ঘর হলেও না হয় গরম হত ; খড়ের ঘরে আবার সিলিং কি হবে? এমনিতেই এসব করতে আপনি কত বাজে খরচ করেছেন—'

"বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলাম। কারণ ছিল।

"ছাত্রজীবন থেকেই শুনে এসেছি কন্ট্রাকটরেরা চিরকালই দেখে থাকে ইঞ্জিনিয়ারদের সুখসুবিধা। এতে নাকি দূষণীয় কিছু নেই। এ সম্বন্ধে ছাত্রজীবনে বহু মুখরোচক গল্প শুনেছি, ডাউনিং হোস্টেলে প্রণবের কাছে। তার বাবা ছিলেন একজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু জিনিসটা আমার প্রত্যক্ষ সত্য ছিল না। তাই হঠাৎ মনে হল—এই যে আমার ব্যক্তিগত প্রযোজনে চেয়ার-টেবিল-খাট প্রভৃতি বানিয়ে রেখেছে ঠিকাদার, চালটা নতুন খড় দিয়ে ছেড়ে রেখেছে, এ সবই কি মৌফৎসে? যদি না হয়? যদি সিংজী আশা করে থাকে যে আমি এসে ওর যা খরচ হয়েছে সেটা নগদ মিটিয়ে দেব? এটাই তো স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন প্রবাসবাসের পর প্রতিবেশি বন্ধু যদি আপনাকে চিঠি লেখেন—'ওহে আমি হপ্তাদুয়েক পরে ফিরছি, তুমি গলুমিস্ত্রিকে ডেকে ঘরটা এককোট চুনকাম করিয়ে রেখ—চাবি পাঠালাম।' এবং সেই কাজ করাতে গিয়ে যদি গলুমিস্ত্রিকে দু'বস্তা কলিচুন আপনাকে নগদ মূল্যে কিনে দিতে হয়—তাহলে আপনি কী আশা করবেন? দীর্ঘদিন প্রবাসবাসের পর বন্ধু যেদিন পাড়ায় ফিরে আসবেন, সেদিন অব্যবস্থার মধ্যে আপনি তাঁকে আপনার বাড়িতে দুটো খেতে বলবেন—আর তার জবাবে বন্ধু বললেন—'না না সেকি, এমনিতেই কলিচুন কেনা বাবদ আপনি কত বাজে খরচ করে ফেলেছেন।'

"সিংজী বললেন, 'এখানে গরম হুজুর বহুত কড়া আছে। সিলিং না হোলে আপনার বড় কষ্টো হোবে। ঔর চিড়িয়াতে খড় কুঠা ছড়িয়ে নোংরা করবে হুজুর।"

"আমি ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছি। যেটুকু খরচ সিংজীর হয়ে গেছে তার আর চারা নেই। কিন্তু আমার উপস্থিতিতে আর কিছু হতে দেব না। তাতে যত অসুবিধাই হোক। বললাম, 'আরে না না, আমরা ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, এই অল্প বয়সে এত আয়েসী হলে আমার চলবে কেন?'

'একটু হেসে জিনিসটাকে সরল করবার চেষ্টা করি।'

'টাকায় টাকা আনার মতো হাসিতে হাসি আনে, রসিকতায় আনে রসিকতা। সিংজী আমার হাসি দেখে নিজেও একটু হাসলেন। কী একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে, পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য রুমাল নিয়ে ঘর্মসিক্ত টাকটি মুছে ফেলে আবার পাগড়িখানা

শিরোধার্য করলেন। বুঝলাম এ সময়টুকুর প্রয়োজন ছিল জবাবটাকে মানিয়ে নিতে।

'হুজুর ইঞ্জিনিয়ার—লেকিন হামরা ছাঁ-পোষা মানুষ। হুজুর নওজোয়ান আছেন, লেকিন হামার টাকটাতো দেখলেন স্যার! বুড্ডার প্রতি এ কিরপাটুকু আপনাকে কোরতে হোবে।'

"এ আবার কি জাতীয় রসিকতা? ব্যাপারটা ঘুলিয়ে গেল। এ ঘরে থাকবো আমি ; কচিৎ ঠিকাদারের উপস্থিতিটা অবশ্য অনস্বীকার্য। কিন্তু সে দু'দণ্ডও কি উনি এটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না? বেশ বাগিয়ে একটা জবাব দিতে যাব—তার পূর্বেই রামশরণ বললেন—

'হামাদের ওয়ার্ক-শেডে সব ঘরে হামি সিলিং বানিয়ে দিলম। এখন আপনি যদি হুজুরের ঘরে সিলিং না-মঞ্জুর করেন তবে আমাদের সব ঘরের সিলিং তো খুলিয়ে নিতে হোবে—না কি বোলেন উপারসিয়ার বাবু?'

"ওভারশিয়ার সেনগুপ্ত একখানা কাঠের পুতুলের মত নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। আমাদের এত কথার অর্থগ্রহণ যে তার হয়েছে মুখ দেখে তাও বোঝা যায় না। আমরা যেন এতাবৎকাল পুস্তু অথবা ফার্সীতে আলাপচারি করছিলাম। এবার বললে, 'দরমা-ম্যাট সিলিং সিডিউল আইটেম। হাজারখানেক সিলিং বানানোই আছে সাইটে। ওর একটা লাগিয়ে দেওয়া যায়। কাজ শেষ হবার আগে খুলে নিয়ে অন্য ঘরে ফিট করলেই চলবে।'

'ব্যস্ খুব বোলেন স্যার! ফয়সলা তো করে দিলেন উপারসিয়ার বাবু! আপনাদের উপারসিয়ারবাবুর ব্রেন খুব সাফা। একদিন হয়েছিল কি—

'এবার আমি চলি স্যার। আমার বাসের টাইম হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি যান। কাল সকালে কথা হবে।'

'ওভারসিয়ার সুরেন সেনগুপ্ত নমস্কার করে চলে যান। উনি এই রিলিফ ক্যাম্পে থাকেন না। স্টেশনের ধারে একটা বাসা ভাড়া করেছেন। এখানে আমার দুজন ওভারসিয়ার। অপর জন ক্যাজুয়াল লীভে আছে। অসুস্থ। তার নাম জীবেন কর।

"সর্গজনে এসে দাঁড়ালো সিংজীর শেভ্রলে ট্রাকখানা। ওরই গর্ভে আমার বাক্স-বিছানা। সংসার-যাপনের যাবতীয় সরঞ্জাম। স্টেশন থেকে আমি ওর জীপেই চলে এসেছি। মালপত্র নামিয়ে, লগেজ ভ্যান থেকে সাইকেল ছাড়িয়ে সিংজীর লোক আর আমার অর্ডালি পিয়ন রতন পরে ট্রাকে আসবে, এই ব্যবস্থা করেই আমি আগে চলে এসেছিলাম—সিংজীর জীপে! সিংজীও এসেছিলেন সেনগুপ্তের সঙ্গে আমাকে রিসিভ করতে।"

মনে পড়ছে ঋতব্রতের অসহায় স্বীকারোক্তিটা এই প্রসঙ্গে। ও বলেছিল, "প্রথম চাকরি-জীবনের কথা মনে হলেও হাসি আসে ভাই। স্টেশনে নেমে যখন দেখলাম আমাকে নিয়ে যাবার জন্য একখানা ট্রাক আর একখানা জীপ নিয়ে ঠিকাদার অপেক্ষা করছে, তখন বড় বিব্রত বোধ করেছিলাম। তখন মনে হয়েছিল আগমন সংবাদটা টেলিগ্রাম করে না জানালেই ভালো হত। এখন ওর জীপ প্রত্যাখ্যান করে অন্য কোনও যান ভাড়া করাটা অত্যন্ত বিসদৃশ দেখাবে। অথচ এক স্টেশন লোকের সম্মুখে ঠিকাদারের গাড়িতে ওঠাটাও ঠিক হল কিনা মালুম হচ্ছে না! এক্ষেত্রে সরকারি ইঞ্জিনিয়াররা কি করে থাকেন? এটাতো কলেজে শেখায়নি! মনে হল ল্যাটিশ-গার্ডার, প্লেট-গার্ডারের নোট মুখস্থ না করে যদি এইসব সহবৎ শিখে রাখতাম কোনও সরকারি ঘাঘু ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে, তো কাজ হত।"

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"শেষ পর্যন্ত কী করলে?"

"এক্সপিরিয়েন্সড় লোকের পরামর্শ গ্রহণ করলাম। রতনের দিকে চাইতেই সে বললে, 'আপনি জীপে চলে যান স্যার, আমি মালপত্র নিয়ে ট্রাকে আসছি।' অর্থাৎ আমার জীপারোহণ স্যাংশনড় এবং অ্যাপ্রুভড়! রতন আজ বিশ বছর অর্ডারলির্গিগিরি করছে। আমার টেম্পোরারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কিন্তু

বতন পার্মানেন্ট সার্ভিসের লোক। এক ডজন গেজেটেড অফিসার চরিয়েছে সে। এসব ক্ষেত্রে ঠিকাদাবের জীপে আরোহন যদি নিয়ম-বিরুদ্ধ হত, তবে সে কিছুতেই তা রেকমেণ্ড করতো না।"

যাক্, ডায়েরিতে ফিরে আসি আবার।

"ট্রাক থেকে মালপত্র নামিয়ে একে একে ঘরে সাজিয়ে রাখছে রতন। সিংজীর লোক একটা লণ্ঠন জ্বেলে রেখে গেল। আর একজন একটা ঝকঝকে মগ, আর এক বালতি জল রেখে গেল বারান্দায়। সিংজী বললেন, 'হুজুর এবার মুখ হাঁত ধুয়ে লিন---হামি দেখি আপনার খাবারের কী ইন্তাজাম করেছে হতভাগারা।'

"আমি বাধা দিয়ে বলি, 'না না, খাবার আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আজ রাত্রে আর কিছু লাগবে না। রতন, আমার টিফিন কেরিয়ারটা?'

'রতন এসে মাথা চুলকে বলে, 'টিফিন-কেরিয়ারের খাবার সব পচে উঠেছে, স্যর। যাবে না? যা গরম গেছে সারাদিন।'

'হতভাগার যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকে! ওর সামনে এ কথাটা বলার কী দরকার! না হয় একটু পরেই দোকান থেকে কিছু কিনে আনতো।'

"আপনি মুখ হাঁত ধুয়ে লিন স্যর, হামি দেখছে!"

বাধা দিয়ে আমি বলি,—'না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। দোকান তো কাছেই আছে।'

'দুকান কাছে না থাকলেও দূরে থেকে এনে লিতে পারতেন আপনি। সে কোথা নয় ; লেকিন রামশরণ সিং থাকতে সে হোবে না হুজুর। ইখানকার দুকান বড় নোংরা স্যর। খেলেই বিমার হোবে।'

'আমি তবু ইতস্তত করি।'

হঠাৎ হাত দুটি জোড় করে সিংজী নিবেদন করেন, 'দুকানদারকে আপনি যে আট দশ আনা পৈসা দিতেন, ওটা হামাকে বকশিশ দিবেন হুজুর। হামি লিয়ে লিব। লেকিন দুকানের খাবার আপনাকে খেতে দিব না।'

কথা বলতে জানে বটে রামশবণ!

একটা বড় ডিশেব উপর খাবার নিয়ে এবং অপর একটি ডিশে সেটা ঢাকা দিয়ে একজন ভৃত্য জাতীয় লোকের প্রবেশ এবং টেবিলের উপরে সন্তর্পণে স্থাপন। রামশরণ অতি সযত্নে ঢাকাটা খুলতে খুলতে বললেন, 'ইখানে কুছুভি মিলে না স্যার। আপনার আজ খাওয়াই হোবে না।'

যে ভঙ্গিতে যাদুকর টুপির ঢাকা খুলে দেখায় রুমালের বদলে খরগোস, ঠিক তেমনি ভঙ্গিতেই ঢাকনাটা খুলে ফেলে রামশরণ দেখালেন 'ক্যাম্প বাজারে কুছুভি মিলে না।'

"ছাড়ানো ফল ও মিষ্টান্নে পাত্রটি পূর্ণ! আম ও লিচু এ সময়ে কিছু দুর্লভ নয়—কিন্তু ছাড়ানো বেদানা, কমলা লেবু, আপেল? বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি এ জায়গায় ও জিনিস বাজারে মেলে না নিশ্চয়ই। তারপর ওগুলো কী? প্যাস্ট্রী না কেক্? নিঃসংশয়ে এগুলি কলকাতা থেকে এসেছে সিংজীর সঙ্গেই। অথচ চতুর সিংজীর ভাবখানা যেন তাঁর অধস্তন হতভাগা কর্মচারীরা কী করছে না করছে সে খবরও রাখেন না।

'খাদ্যদ্রব্য প্রসঙ্গে আমাকে আর কোনও কথা তিনি বলতে দেবেন না বলেই হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ও হো! একঠো ভুল হইয়ে গেছে। এ রামাওতার, দো দশটো কাঁটি ঔর সুতলি তো লাও। সাবকো মচ্ছরদানি তো খটানে পড়েগি।'

"তারপর সলজ্জ হেসে বললেন, 'আর দরমার দেওয়ালে কাঁটিই ফিন লাগবে কৈসে? এহী লিয়ে আপনাকে বলছিলামৈ স্যর, টিসানের কাছে কোয়াটার লিন। ইখানে আপনার হরবখৎ তক্‌লিফ্ হোবে।'

"আমি হেসে বলি, 'এখানেই বেশ কেটে যাবে। পাকাবাড়ি নিয়ে কী করব আমি? একা মানুষ জরু

গরু নিয়ে তো আর আসিনি?'

"এক গাল হাসলেন রামশরণ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হামি শুনিয়েছে কি আপনি রচিলর আছেন। আচ্ছা, আপনি ঘবড়াইবেন না—সব ব্যবস্থা হইয়ে যারে।'

"লোকটা বলে কী! থাকবার ঘর দিয়েছে, আসবাব গাড়ি দিয়েছে, মুখ ধোবার জল, রাত্রের আহার্য, মায় মশারী খাটাবার দড়িও দিয়েছে! এবার কি রাত্রের শয্যাসঙ্গিনী—অর্থাৎ জরুর ব্যবস্থাও করতে বসবে না কি? এটাও কি ঠিকাদারদের করণীয় তালিকাভুক্ত?

"বললাম, 'ব্যবস্থা আবার কী করবেন আপনি? ঘটকালি করবেন নাকি? এখানেই পাকাপাকি ঘর বানাতে হবে বোধ হয় বাকি জীবনের জন্যে?'

"যেন অত্যন্ত উঁচুদরের একটা রসিকতা করেছি আমি। হো হো করে হাসলেন প্রাণ খুলে। তারপর বললেন, 'আপনাদের তামাম জিন্দিগি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হোবে। একঘরে তো হোবে না স্যর, আপনাদের কারবার। কতো ঘর বনাইবেন? সব জাগহতেই আপনাদের ঘর বনাতে হোবে। আপনাদের রবীন্দরনাথজি না বলিয়েছেন 'সব ঠাঁই হমার ঘর আছে হামি সুদূরের পিয়াসী আছি।'"

"সর্বনাশ! এ যে দেখি একেবারে গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া! মায় রবীন্দরনাথজিকে পর্যন্ত পেড়ে ফেলেছে! এতটা মাখো-মাখো হবার ইচ্ছা ছিল না আমার আদৌ! তাই মাররার-তনয়ের সঙ্গে রবীন্দ্র কাব্য আলোচনা ঐখানে স্থগিত রেখেই আমি মুখ ধুতে বেরিয়ে গেলাম।"

যার ডায়েরি থেকে উদ্ধৃতিটি তুলছিলাম, সেই ঋতব্রত বোস আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের কেমন একটা ধারণা ছিল, পরিণত বয়সে সে দশের একজন হয়ে উঠবে। ধারণাটা মাস্টারমশাই মহলেও ছিল। হয় উঁচুদরের কবি, লেখক, রাজনীতিক অথবা অমনি কিছু। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েই তার সঙ্গে সাময়িক ছাড়াছাড়ি হয়েছিল , ও নিয়েছিল সায়েন্স। ছাত্র-জীবন সমাপ্ত করে সে কিন্তু দশ জনের দশম জন হল না, হল মামুলি চাকরিজীবি। তার চাকরি-জীবনের প্রথম অধ্যায়টায় দূর থেকে চিঠিপত্রে যোগাসূত্রটা বজায় রেখেছিল সে। পরে কলকাতায় বদলি হয়ে এলে প্রথম চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতাটা সবিস্তারে বলেছিল আমায়। বেশ একটা উপন্যাসের উপকরণের সন্ধান পেয়েছিলাম যেন সে অভিজ্ঞতায়। তাকে জানালাম সে কথা। বললাম, ওর কাহিনীটা লিপিবদ্ধ করতে চাই। ও যতটা উৎসাহিত হল, তার চেয়ে অনেক বেশি উচ্ছ্বসিত হলেন ম্যাডাম বোস অর্থাৎ মিসেস বসু।

এ কাহিনীর অধিকাংশ রসদই সংগ্রহ করেছি ঋতব্রতের ডায়েরি থেকে। কিন্তু সেইটাই একমাত্র উপাদান নয়। ওদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে সান্ধ্য চায়ের টেবিলে আলাপচারিতে শুনেছি অনেক বিক্ষিপ্ত ঘটনা—যা নাকি স্থান পায়নি ওর ডায়েরিতে। কিছু জেনেছি ম্যাডামের কাছ থেকে, যা নাকি নিজ মুখে বলেনি ঋতব্রত। কখনও সংগ্রহ করেছি ওর অর্ডালি পিয়ন রতনের কাছ থেকে কোনও সংবাদ, কখনও বা ওর দাদা অথবা বৌদির কাছে।

বাংলা বিহারের সীমারেখার কাছাকাছি ঋতব্রতের এই কর্মস্থলটি। যুদ্ধকালে এখানে গড়ে উঠেছিল একটি সেনানিবাস। শান্তশিষ্ট পরিবেশে একদিন জেগে উঠেছিল কোলাহল—এল গাড়ি গাড়ি ইঁট, কাঠ, সিমেন্ট, বালি। তার চেয়েও বেশি এল বাঁশ, দরমা, শালের খুঁটি আর খড়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এল বিভিন্ন কারিগর। পাঞ্জাবী ছুতোর, সিন্ধি ঠিকাদার, ওড়িয়া প্লাম্বার এবং মদ্রদেশীয় কুলি। সারি সারি তৈরি হয়ে গেল মিলিটারি ব্যারাক। আশপাশের গাঁয়ের মেয়েরা তালদিঘি থেকে জল নেওয়া বন্ধ করল। গাঁয়ের লোকে ঊনো মাল দুনো দামে বেচে গেল মিলিটারিদের কাছে। গ্রাম্য বালখিল্য বাহিনী কুড়িয়ে নিয়ে গেল খালি টিন, বোতল, সিগ্রেটের কৌটা কখনও বা দু'এক টুকরো অভুক্ত বিস্কুট—চিজ্। রাতারাতি তৈরী হয়ে গেল পিচের রাস্তা, ইলেকট্রিক লাইন, এমন কি কংক্রিটের

একটা ল্যান্ডিং স্ট্রিপ পর্যন্ত। দিনরাত মিলিটারি কনভয় ছোটাছুটি করত। গ্রামবাসী বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখতো দৈত্যপুরীর আজব কাণ্ডকারখানা। যেদিন প্রথম ওখানে এরোপ্লেন নামলো সেদিন ছিল হাটবার। হাট ভেঙে লোক ছুটলো হাওয়াই জাহাজ দেখতে। কাঁটাতারের ওপার থেকে তারা বড় বড় চোখ করে দেখলো বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক বিস্ময়! তারপর ক্রমে সেটা এতই গা-সওয়া হয়ে গেল, যে প্লেনগুলো নিচু দিয়ে যাবার সময়ও ঘাড় উঁচু করে ফিরে দেখতো না কেউ।

রাতারাতি গড়ে ওঠা এই ময়দানবের নগরী একদিন আবার জনশূন্য হয়ে গেল। থামল কালযুদ্ধ। কালের রথচক্র ঘুরল আর এক পাক। দলে দলে মিলিটারিরা চলে গেল। কর্মচঞ্চল হঠাৎ-গড়ে-ওঠা অত বড় শহর হয়ে গেল স্তব্ধ। পড়ে থাকল পিছনে ভাঙা টিন, মরচে ধরা লোহার টুকরো, ঘর-বাড়ি, ওয়াটার টাওয়ারের জলের ট্যাঙ্ক ; আর পড়ে থাকলো হয়তো আশপাশের গ্রামের কৃষক-বধূদের মনে কিসের যেন একটা বিভীষিকার স্মৃতি। দু-একটা নেপালী দারোয়ান শুধু পড়ে ছিল রাস্তার ধারের ঘরখানায়। সরকারি পাহারা। ওদের যেটা কন্‌ট্রোল বিল্ডিং ছিল, সেটা পরিণত হল প্রোকিয়োরমেন্ট ডিপার্টমেণ্টের চালের গুদামে। বাকি ঘরগুলো হল রিক্ত, পরিত্যক্ত। কালবৈশাখী ঝড়ে উড়ে গেল খড়ের চাল ; বর্ষায় দেওয়াল গেল ধ্বসে। কেউ খেয়াল করল না। জানলার গরাদ একটি দুটি করে অপহৃত হল। কেউ বারণ কবতে এলো না। ক্রমে জানলা দরজা। শেষে গ্রামবাসী সাহস করে এগিয়ে এলো শাবল হাতে ;—দেওয়াল ভেঙে ইঁটগুলোও নিয়ে যাবে ওরা। এভাবে চললে আর দশ বছরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত মিলিটারি ক্যাম্প।

কিন্তু তা ঘটল না।

আবার ঘুরল একপাক—মহকালের রথচক্র!

গ্রামবাসী সবিস্ময়ে দেখল, আবার এল নানান জাতের ঠিকাদার। এল গাড়ি গাড়ি বাঁশ। এল গাদা গাদা খড়।

পরিত্যক্ত প্রাণহীন পল্লীটি আবার কর্ম্মমুখর হয়ে উঠল। সারারাত পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে এখানে ওখানে। রাস্তার মোড়ে নৈশ ভ্রমণরত জীপের বাঁক নেবার সময় উজ্জ্বল আলোয় ধূমকেতুর পুচ্ছ ঘুরে যায় সমস্ত তল্লাটটার উপর। হাজার হাজার মিস্ত্রি মজুর কাজ করে যায়। আবার সমবেত হয় পাঞ্জাবী ছুতোর, সিন্ধি ঠিকাদার, ওড়িয়া প্লাম্বার আর মদ্রদেশীয় কুলি। এবার বঙ্গবাসীরাও উপেক্ষিত থাকে না। তারাও আসে. বস্তুত তারাই এবার অতিথি। সারি সারি ট্রাক এসে দাঁড়ায় কন্‌ট্রোল বিল্ডিংটার সামনের মাঠে। অতিথিরা নামে। রণসেনা নয়, মরণ সেনা। ওদের পরণে খাঁকি পোশাক নেই—ছিন্ন মলিন বসন! ওদের কাঁধে রাইফেল নেই, কাঁকে কঙ্কালসার শিশু! ওদের মনে যুদ্ধজয়ের দুর্বার প্রেরণা নেই—আছে জীবন-যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি! ফেলে আসা অতীতের বিভীষিকা আর অনিশ্চিত অনাগতের আতঙ্ক! ওরা এসে গেল দলে দলে। হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার। নবীনতম রাষ্ট্রের প্রবীণতম আদিম বিদেশী অধিবাসী! সেনানিবাস পরিণত হল আশ্রয়শিবিরে!

আদিপর্বে এটার নামকবণ হয়েছিল ট্র্যানসিট ক্যাম্প। অর্থাৎ দুর্দিনের মুশাফিরখানায় ওরা এসে আশ্রয় নিত মাত্র। তারপর বাছাই করা হত ওদের। যারা শক্ত সবল, তারা চলে যেত পুনর্বাসনে। কেউ কেউ চলে গেল নিজের চেষ্টাতেই ; তাদের কারও বা ছিল পুঁজির জোর, কারও বা এ পারে মুরুব্বিগোছের আত্মীয়। সরকারি সাহায্য পেল অনেকেই নতুন করে বাস্তু বাঁধার! বাকি এখন যারা রয়ে গেছে তারা পঙ্গু অথবা অশক্ত। এরা এখন সরকারের স্থায়ী পোষ্য। পার্মানেন্ট লায়েবিলিটি বা সংক্ষেপে 'পি. এল.'।

মিলিটারি হাসপাতালটাই ওদের আরোগ্যালয়। পাওয়ার হাউসটা এখন রেশনের গুদাম। ইলেকট্রিক লাইন উঠিয়ে নিয়ে গেছে। মিলিটারি কন্‌ট্রোল বিল্ডিংটা এখন ক্যাম্পের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস। এরোপ্লেন নামবার চওড়া ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডটায় এদের বাজার বসে। বাঁশের খুঁটির উপর টিনের

ছাদ দিযে সাবি সাবি দোকান বসে গেছে। পানবিডি, চাল-আটা, মিষ্টি-মশলাব দোকান। মায চুলকাটাব সেলুন, ডাইংক্লিনিং পর্যন্ত। ক্যাম্পেব মেবদণ্ডেব মতো উত্তব-দক্ষিণ পাকা সডক। একদিকে এটা শেষ হযেছে চাব মাইল দূবেব বেল-স্টেশনে , অপবদিকে বিসর্পিল গতিতে কালো পিচেব সডকটা থানা-সদব ছুঁযে স্বীয সত্তা হাবিযেছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক বোডেব মোহনায। এই সডকেব উপবেই ক্যাম্পে ঢুকতে বাঁ হাতে পডে ক্যাম্প-অফিস, ডানদিকে হাসপাতাল। হাসপাতালেব পিছনে দুটি ছোট ছোট ঘব। ও দুটোব নাম আইসোলেশন ওযার্ডস্। সংক্রামক বোগীদেব পৃথক বাখাব ব্যবস্থা।

বড বাস্তাটিকে দ্বিখণ্ডিত কবে তদোধিক চওডা যে কংক্রিটেব বাস্তাটা পূর্ব-পশ্চিমে প্রসাবিত, ওঠাই ছিল ক্রীট-ওযে—অর্থাৎ প্লেন নামবাব ল্যান্ডিং স্ট্রিপ্। এইটাবই পূর্বতম প্রান্তে বাস্তাটা গোল হযে বিবাট এক চক্কব খেযেছে। বোধহয় প্লেন ঘুববাব জন্যই এই ব্যবস্থা। ক্রীট-ওযেব এই অংশটাই এখন বডবাজাব। নাম গোলবাজাব। এটা ছাডাও হাসপাতাল ও বড অফিসেব কাছে আব একটা বাজাব বসে। এব ঠিক পাশেই ছেলেদেব মাইনব স্কুল। সেটাব নামকবণ হযেছে স্কুলবাজাব। স্কুলবাজাবেব পশ্চিমতম প্রান্তে ঋতব্রতেব অফিস, তথা মোকাম। উত্তব-দক্ষিণে বড বাস্তা এবং পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ক্রীট-ওযে যে পবস্পবকে সমকোণে ছেদ কবেনি তা ক্যাম্পেব ব্লু-প্রিন্ট দেখলেই বোঝা যায। কিন্তু এদেব পাবস্পবিক ছেদনে যে চাবটি ভাগ হযেছে, তাদেব নাম আলাদা। ক্লকওযাইজ ভাবে পডলে এদেব নাম দাঁডায গলাদ', টিফেনপুব, বকুলতলা আব মেমপাডা। সবটা মিলিযে ক্যাম্পেব নাম বকুলতলা পি এল ক্যাম্প।

এইখানে বলে বাখা ভালো, বকুলতলা ক্যাম্পে যাবাব সৌভাগ্য কোনদিন আমাব হযনি। ঋতব্রতেব কাছ থেকে শুনে আব তাব দেওযা ব্লু-প্রিন্ট দেখে যে বর্ণনা দিলাম, জানি না তাব সঙ্গে বাস্তবেব কতটা সম্বন্ধ। প্ল্যানে দেখছি, চাবটে জোনাল ডিভিশনেব মধ্যে আযতনে সর্বগবিষ্ঠ হল গলাদ', তাবপব মেমপাডা, তাবপব বকুলতলা। আইনত, মানে ডেমোক্রাটিক্যালি এ ক্যাম্পেব নাম সুতবাং গলাদ'ই হওযা উচিত। কিন্তু কেন জানি না এব নাম হযেছে বকুলতলা ক্যাম্প। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাতে খুশি। কাবণ চাবটে নামেব মধ্যে ঐ নামটাতেই আছে কিছু পবিমাণে মাধুর্যবস। ক্যাম্পবাসীব জীবনে শ্রী নেই, ছন্দ নেই, মাধুর্য দুর্লভ। অন্তত নামটাও যদি শ্রুতিমধুব হয 'তাতে কিবা কাব ক্ষতি?' তাছাডা ক্যাম্পেব ইতিবৃত্ত লিখতে বসে অনুসন্ধান কবেছিলাম নামগুলিব উৎপত্তিব ইতিহাস। তা থেকেও মনে হযেছে, ওদেব মধ্যে বকুলতলা নামটাই ববং ববণীয। মেমপাডায ছিল সেই সব অফিসাবেব বাস, যাঁবা পবিবাব নিযে বাস কবতেন মিলিটাবি ক্যাম্পে। মেমপদবজধন্য এ এলাকাব কৌলিন্য অবশ্য সেদিক থেকে নিকষ। টিফেনপুব সম্ভবত কোনও 'স্টিফেন্সে'ব স্মৃতিসংযুক্ত। আন্দাজ কবা যেতে পাবে, তিনি ছিলেন কালযুদ্ধে নিহত কোন বড জঙ্গী অফিসাব। গলাদ'ব নামকবণ নিযে মতবিবোধ আছে। অনেকে বলেন, ওখানে ছিল একটি দহ বা হ্রদ—গলা-জল থাকত তাতে। মিলিটাবি আমলে সে জমি ভবাট কবে ফেলা হয। তাই গলাদ' হচ্ছে 'গলাদহ' শব্দেব অপভ্রংশ। ঋতব্রত ইঞ্জিনিযাব মানুষ। ফিললজিব নজিব সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উডিযে দিযেছিল। তিনদিকে বিস্তীর্ণ মুক্ত প্রান্তব থাকা সত্ত্বেও জমি ভবাট কবিযে বাডি কবতে যাবে কেন মিলিটাবি ইঞ্জিনিযাব? তাই সে খোঁজ কবেছিল নামটাব উৎপত্তিব ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে এক বৃদ্ধ গ্রামবাসীব কাছ থেকে সে শুনেছিল গ্রাম্য কৃষক-বধূব এক বিচিত্র করুণ কাহিনী। দেশেব শত্রুদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধবত স্টিফেন্সবাই শুধু শহিদ হযনি , দেশেব মিত্র স্টিফেন্সদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবতে 'গলায দডি' দিতে হযেছে গ্রাম্যবধূকেও।

সে যাই হোক বকুলতলা নামটি সার্থক জোডা বকুলগাছেব উপস্থিতিতে। অনুবব লাল কাঁকবে জমিব মধ্যে এই বকুলতলা অঞ্চলেই আছে একটি পুকুব। ক্যাম্পে ছডানো আছে অসংখ্য নলকূপ। তাব অধিকাংশই অবশ্য অচল। তবু পানীয জল নলকূপ থেকেই সংগ্রহ কবে সবাই। সকাল থেকে সেখানে প্রতীক্ষমান কিউ সবীসৃপ। তবু এই পুকুবটিই ক্যাম্পেব প্রাণকেন্দ্র। পূর্ববঙ্গেব নদীমাতৃক

আবহাওযায ওবা মানুষ। নলকূপেব জলে কণ্ঠেব তৃষ্ণাই শুধু মেটে। চোখেব তৃষ্ণা মেটাতে বৃদ্ধবা বিকালে এসে বসে পুকুবেব ঢাল্ পাড়ে। অল্পবযসীবা ঝাঁপিযে পড়ে ওব নিস্তবঙ্গ জলকে উর্মিমুখব কবে তুলতে। ঐ একফোঁটা গোষ্পদই আজ পদ্মা মেঘনা-যমুনা-আড়িযেলখাঁ বিধৌত গ্রামবাসীব সান্ত্বনা।

এবা আসাব পব, এদেব মোটামুটি মাথা গোঁজাব ব্যবস্থা হবাব পব আব এ ক'বছব বাড়িগুলিব সংস্কাবেব কথা কাবও মনে জাগেনি। দীর্ঘদিনেব আবেদন নিবেদনেব পব এ বৎসব বাড়িগুলিকে আদ্যোপান্ত মেবামতেব ব্যবস্থা হযেছে। চাল ফেলে দিযে নতুন চাল হবে, দেওযাল মেবামত, শালেব খুঁটি বদলানো, দবজা জানলা সংস্কাব তো আছেই, উপবন্তু পুকুব কাটা, বাস্তা মেবামত, ড্রেন, পাকা স্কুলঘব প্রভৃতি নিযে বিবাট একটা অঙ্ক অনুমোদন কবেছেন সবকাব। মাত্র মাস-তিনেক কাজ চলছে, এমন সমযে চাকবি পেযে এসে হাজিব হল ঋতব্রত। এতদিন কাজটা দেখেছিলেন মিস্টাব ঘোষাল। মাসখানেক আগে সিনিযাব ওভাবসিযাব সুবেন সেনগুপ্তকে চার্জ বুঝিযে দিযে তিনি বদলি হযে গেছেন। সেনগুপ্তেব কাছ থেকেই কর্মভাব পেল ঋতব্রত, তাব চাকবিব প্রথম কর্মক্ষেত্রে।

ওখানে পৌঁছবাব পবদিনই ঋতব্রত সমস্ত ক্যাম্পটা ঘুবে ঘুবে দেখল সাইকেলে চেপে। ব্লু-প্রিন্টটা সঙ্গে নিযে সমস্ত এলাকাটাব সঙ্গে পবিচিত হযে নিল। মেমপাড়াব ঘবগুলো সব সাবা হযে এসেছে। বকুলতলা অঞ্চলে খান ত্রিশেক বাড়িতে কাজ হচ্ছে। অন্যান্য এলাকায এখনও কাজ শুরু হযনি। কালবৈশাখীব আগেই দুর্বল ঘবগুলোব খুঁটি পালটানো দবকাব, আব বর্ষা নামাব আগেই প্রযোজন চাল সাবাই কবা। স্কুল, বাস্তা বা পুকুব কাটাব কাজ বর্ষাব পবে হলেও চলতে পাবে।

ঘবগুলোও আবাব সব এক বকমেব নয। কিছু একেবাবে পাকা অধিকাংশই বাঁশেব চটাব উপব সিমেন্ট ধবানো। ড্যাব-ওযাল বলে এদেব। এছাড়া মুলিবাঁশ এবং দবমাব দেওযালও আছে। ছাদ অধিকাংশই খড়েব। টিন, টালি এবং পাকা ছাদও আছে। বাড়িগুলি ব্যাবাক-টাইপ। লম্বা লম্বা হল-ঘব। কোনটাব একদিকে, কোনটাব বা দুদিকেই বাবান্দা। হল-ঘবগুলিতে অনেকগুলিব মাঝে দর্মাব পার্টিশন ছিল বোঝা যায। দবমাব ফসিল ঝুলছে কোথাও কোথাও। শতকবা আশিখানা বাড়িবই পার্টিশন নেই। তবু শালেব খুঁটিব চিহ্ন ধবে ওবা নিজ নিজ এলাকা ঠিক কবে নিযেছে। এক হলঘবেব মধ্যেই নির্বিচাবে বাস কবেছে ব্রাহ্মণ, কাযস্থ, বৈশ্য, বৈদ্য—এমনকি জল-অচল জাত পর্যন্ত।

এছাড়া আছে আব এক জাতেব ব্যাবাক। লোহাব ফ্রেমেব উপব টিনেব গোলাকৃতি শেড। দুপাশেব দেওযাল ও ছাদ একটি অর্ধবৃত্তেব রূপ নিযেছে টিনেব ছাউনিতে। এগুলো ছিল মিলিটাবি গুদাম। প্রায আঠাব হাত চওড়া, পযতাল্লিশ হাত লম্বা এই গুদামগুলিব দুই প্রান্তে দুই নির্গমনদ্বাব ভিন্ন এতবড় ঘবগুলিতে বাযু গমনাগমনেব কোনও জানলা নেই। এদেব ইংবাজী নাম 'নিশেনহাট' অথবা 'লহোব শেড'। বাংলা নাম, ঋতব্রতেব পবিভাষায, 'অন্ধকূপ'।

"স্যাব।"

বতন এসে দাঁড়িযেছে।

"ডাক্তাববাবু একবাব দেখা কবতে চান।"

"কোথায তিনি? আসতে বল।" জবাব দেয ঋতব্রত।

পবদা সবিযে ঘবে প্রবেশ কবেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। পবনে ধুতি, হাফশার্ট। পাশ পকেট থেকে স্টেথোটা মাথা উঁচিযে পবিচয ঘোষণা কবছে। ভদ্রলোকেব মাথাব সামনেটা কেশ-বিবল, পিছন দিককাব দীর্ঘ কেশগুচ্ছ চিকনিব অমোঘ আকর্ষণে সামনে এসেছে উজান বেযে ঘাটতি মেটাতে। গোঁফদাড়ি কামানো। গলায তুলসিব কণ্ঠি। সৌম্য মাংসল মূর্তি। যুক্তকবে বিনযাবনত নম্র নমস্কাব কবে আসন গ্রহণ কবেন ডাক্তাববাবু।

"আপনি আজ প্রায় দিনসাতেক এসেছেন অথচ আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসা হয়ে ওঠেনি।"

"দোষটা আপনার একার নয় ; আমিও যেতে পারিনি আপনার কাছে।"

"আপনি কী করে যাবেন? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি তো সাইকেলে চেপে কাজ তদারক করে বেড়ান—আপনার সময় কোথা?"

"কাজ সকলেরই থাকে। সেটা প্রতিবেশির সঙ্গে পরিচিত হবার প্রতিবন্ধক হলে চলবে কেন?"

ডাক্তারবাবু চোখদুটি বন্ধ করলেন, যেন প্রণিধান করছেন ওর কথার সারমর্ম। তারপর ধীরে সুস্থে চোখ খুললেন, কিন্তু ঋতব্রতের দিকে না তাকিয়ে দৃষ্টিপাত করলেন তার মাথার আন্দাজ ছয় ইঞ্চি উপরে।

"কথাটা বলেছেন ভালো। কিন্তু কি জানেন মিস্টার বসু—সকলেই কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে, এই স্বাভাবিক সত্যটা বোঝেন না। আট মাস হ'ল আমি এখানে এসেছি, অথচ কারও সঙ্গে মেলামেশাটা জমে ওঠেনি। সকলেই যে যার কাজে ব্যস্ত। আলাপ করবার মতো সময় কারও নেই। এক ভৈরববাবুর সঙ্গে একটু গল্পসল্প করি।"

"ভৈরববাবু কে?"

"ডেপুটি ক্যাম্প-সুপার। অমায়িক ভদ্রলোক।"

বলে অমায়িক মুখ করে তিনি চোখ বুজে রইলেন। অল্পক্ষণের আলাপেই ঋতব্রত বুঝতে পারে, এটা ভদ্রলোকের একটা মারাত্মক মুদ্রাদোষ। অপরের কথা শোনার সময় উনি নিমীলিত নেত্র, আর কথা বলার সময় তাঁর দৃষ্টি পড়ে শ্রোতার মাথার উপরের কোন এক স্থির বিন্দুর প্রতি। ক্রমশই ঋতব্রত গলদঘর্ম হয়ে উঠল এই অদ্ভুত মুদ্রাদোষের জন্যে। কত রকম ইডিওসিনক্রেসিই না থাকে লোকের! গত আট মাসের মধ্যে ডাক্তারবাবুর বন্ধু না জোটার এটাই কি কারণ নাকি?

"আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসার অপর একটি বিশেষ কারণও ছিল। প্রথম আলাপেই সেকথাটা বলা সঙ্গত হবে কিনা বুঝছি না।"

এই পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখ হয়ে নিবেদন করে ডাক্তারবাবু নিমীলিত নেত্রে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। স্মিত হাসিটি লেগে রয়েছে ওষ্ঠপ্রান্তে। অর্থাৎ এবার ঋতব্রতকে বলতে হবে "না, না, তাতে কি হয়েছে? বলুন না।"

ঋতব্রত বললও তাই।

"হয়নি কিছুই। তবে আপনার হয়তো মনে হতে পারে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসাটা আমার শুধু সৌজন্যের খাতিরেই নয়—স্বার্থ প্রণোদিত।"

আবার হাসি হাসি মুখে উনি চোখ বোজেন।

অর্থাৎ তুমি বল' —'বা—ব, সে কী কথা, তা মনে করব কেন?'

ঋতব্রত কিন্তু এবার আর তা বলল না। দেখিই না কি হয়, ভাবখানা ওর। ডাক্তারবাবু ধ্যাননিমীলিত লোচনে প্রতীক্ষা করেই রইলেন। এ তো বড় অস্বোয়াস্তি। এতক্ষণে ঋতব্রত বুঝে নিয়েছে কেন লোকে ভদ্রলোককে এড়িয়ে চলে। মুদিত নেত্রে সহাস্য বদনে বসে আছেন তো বসেই আছেন তিনি। আর ঋতব্রত ভাবছে অন্য কথা- -আচ্ছা, ওর এই মুদ্রাদোষের সুযোগ নিয়ে কোনও বিড়ম্বিত আলাপনরত ব্যক্তি কখনও সরে পড়েনি?

"কী? তাও তো মনে করতে পারেন আপনি?" চোখ বুজেই তাগাদা দেন উনি। ভারী রাগ হয়ে গেল ঋতব্রতের। বললে, "দেখুন ডাক্তারবাবু, এ সন্দেহ যখন আপনার মনে জেগেছে, তখন আমার মনে হোক আর নাই হোক, আজ নাই বললেন কথাটা। জরুরী কিছু নয় নিশ্চয়ই।"

ডাক্তারবাবু চোখ খুললেন। মাথায় ছয় ইঞ্চি উপরে নয়—এই প্রথম তাঁর দৃষ্টি সোজা এসে পড়ল ঋতব্রতের চোখের উপর। একবার ঢোক গিলে বললেন, "না, ব্যাপারটা জরুরিতো বটেই। তাছাড়া আপনি যখন বলছেন যে তেমন কিছু মনে করবেন না, তখন বলেই ফেলি, কি বলুন?"

"বলুন।"

"ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। আমার কোয়ার্টার্সটা রিপেয়ার করবার সময় কয়েকটি কাজ করিয়ে দিতে হবে, যা নাকি এস্টিমেটে ধরা নেই। একটা বাউণ্ডারি দেওয়াল তুলতে হবে ;—বাথরুমটা একটু বাড়াতে হবে, আর ইয়ে, চাকরদের জন্য একটা বাড়তি ঘর করাতে হবে।"

গম্ভীর হল ঋতব্রত। বললে, আচ্ছা দেখি স্যাংশন্‌ড্ এস্টিমেটে কত টাকা ধরা আছে ওটা রিপেয়ারের জন্যে।"

"এই যে দেখুন না", ডাক্তারবাবু বুকপকেট থেকে ভাঁজ করা কয়েকখণ্ড কাগজ বার করলেন, তাতে এস্টিমেটের খানতিনেক পাতা কপি করা ছিল। তাঁর বাড়িটা মেরামতের অংশটুকু। অবাক হল ঋতব্রত। এস্টিমেটের কপি ডাক্তারবাবুর কাছে যায় কি করে?'

"অন্যান্য কাজগুলি ওভারসিয়ারবাবুই করে দিতে রাজি হয়েছেন শুধু ঐ বাড়তি ঘরটা বানাতে তিনি রাজি নন। বলেন, সাহেবের পারমিশন লাগবে। আপনি স্যর একটু—"

"ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত বলেছে এস্টিমেটের বাইরের ঐ কাজগুলি আপনাকে করে দেবে?"

"ইচ্ছা করলে আপনারা তো সবই পারেন স্যার!"

ঋতব্রত মনে মনে চটে গিয়েছিল। সেনগুপ্ত কোন সাহসে কথা দেয় ডাক্তারবাবুকে?

"তাহলে আজ উঠি। আপনি সুরেনবাবুকে একটু বলে দেবেন স্যর—"

"আমি দুঃখিত ডাক্তারবাবু। এই বাড়তি কাজগুলো করানো সম্ভবপর হবে না। স্যাংশন্‌ড্ এস্টিমেটে এর জন্যে টাকা ধরা নেই।"

ডাক্তারবাবু এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে আহত হন। বলেন গম্ভীর হয়ে "সেটাই যদি আপনার একমাত্র অসুবিধা হয়, টাকার ব্যবস্থা আমি করব। আপনি ওটা করিয়ে দেবার অর্ডার দেবেন শুধু।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কাজ করবে আমার ঠিকাদার, আর টাকা দেবেন আপনি! মানে?"

"মানে আবার কি? মানে ঐ।"

"কী আবোল-তাবোল বকছেন মশাই! নিজের পয়সায় বাড়ি সারাতে চান তো আমার কাছে এসেছেন কেন?"

এবার উঠলেন ডাক্তারবাবু—

"সরকারি বাড়ি নিজের পয়সায় সারাতে গেলেও এস. ডি. ও-র অনুমতি লাগে। আপনাকে আমি শুধু বলছি এই কাজগুলো করিয়ে দিন, টাকাটা দেওয়ার ব্যবস্থা আমি করব। অর্থাৎ আমার হাসপাতাল মেরামতের কয়েকটা আইটেম কম করিয়ে বাড়তি খরচটা পুষিয়ে দেবো। কোন্ ইঞ্জিনিয়ার আপনাদের এই এস্টিমেট করেছেন জানি না, কিন্তু ডাক্তারের বাড়ির বেড়া, বাথরুম যার নজরে পড়ে না—যাক্, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনি অনুগ্রহ করে একবার হাসপাতালে আসবেন, তখন কথা হবে। আচ্ছা নমস্কার।"

ডাক্তারবাবু মেদবহুল বপুটি নিয়ে রওনা দিলেন। ঋতব্রতের মনে হল, নাক থেকে ওলন ধরলে ভুঁড়ির কাছে দু'ইঞ্চি বেধে যাবে। মনে মনে হাসল সে। ভগবান যদি রাজমিস্ত্রি হতেন, তবে এমন "আউট-অফ-প্লাম্ব" গাঁথতির দাম দিতে না সে।

ডোল অফিসের সামনেটায় প্রচণ্ড ভিড়।

দরমার বেড়া দেওয়া অফিসের সামনে গাদাগাদি করে বসে আছে জনতা। পরিবার পিছু ওরা পাবে একখানা করে কম্বল। একধারে কম্বলের স্তূপ, অপর ধারে প্রতীক্ষমান ক্যাম্পবাসী ;—মাঝখানে ছোট্ট হাইফেনের মতো একটা টুল নিয়ে বসে আছেন ডিস্ট্রিবুশান কেরানি ললিতবাবু। একটা বৈজ্ঞানিক উপমা মনে পড়ল ঋতব্রতের। ললিতবাবু আজ 'ক্যাটালিটিক্ এজেন্ট' মাত্র! দ্বন্দ্ব-সমাসের হাইফেন-

সদৃশ ঐ ক্যাটালিটিক্ এজেন্টটিই রেশান-কার্ডে লিখিয়ে পরিবার-পিছু একখানা করে কম্বল বিতরণ করছে। কম্বলগুলো শীতকালে আসার কথা ছিল। ওয়াগন বিভ্রাটে এতদিনে এসে পৌঁচেছে। কী একটা বচসা বেধেছে প্রতীক্ষমান জনতার মধ্যে। সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে ঋতব্রত ফিরে যাবার উদ্যোগ করছে, দেখা হয়ে গেল ক্যাম্প-সুপার তফাদারের সঙ্গে।

"কী হল? ফিরে যাচ্ছেন যে?"

"হ্যাঁ, ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে কয়েকটা বিষয় আলোচনা করব, কিন্তু আপনারা এখন ব্যস্ত—"

"কিছু না, কিছু না। ও তো লেগেই আছে। আসুন ভেতরে।"

ক্যাম্প-সুপারের সঙ্গে ঋতব্রত ঘরে গিয়ে বসে। তফাদার চায়ের হুকুম দিলেন।

"তারপর? আপনার কাজকর্ম কেমন বুঝছেন?"

"এই ত সবে এলাম—এখনও কিছু দেখে উঠতে পারিনি।"

তফাদার মিশুকে লোক। দরাজ দিল। অল্পক্ষণের আলাপেই খুসি হয় ঋতব্রত। নানান আলাপের পর হঠাৎ গলাটা নামিয়ে নিয়ে তফাদার বললেন, "মিস্টার নত্র দেখলাম আপনার অফিসে গিয়েছিল আজ। ব্যাপার কী?"

"মিস্টার নক্রটি কে?"

"ওঃ, এখনও নামটা কানে যায়নি বুঝি? ক্যাম্পে ডাঃ সাধুচরণের নাম : শ্রীমান নক্র।"

হাসল ঋতব্রত। বললে, "নামকরণটা কে করেছে জানি না। তবে ওঁকে দেখে আমার অন্য একটি নামকরণ করতে ইচ্ছা হয়েছে। আউট-অফ-প্লাম্ব।"

"সেটা আবার কী?"

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাখিল করে ঋতব্রত। দিলখোলা হাসি হাসেন তফাদার। তারিফ করেন নামকরণের। ঋতব্রত জানালো ডাক্তারবাবু হাসপাতালের লেডিস ওয়েটিং রুমটা করাতে চান না। তিনি চান ঐ টাকায় তাঁর কোয়ার্টার্সে একটা চাকরদের ঘর করে দিতে। হাসেন তফাদার বলেন—"ভুল বুঝেছেন আপনি। মিস্টার আউট-আফ-প্লাম্ব লেডিস ওয়েটিং রুমটাই করতে বলেছেন। তবে সাইটটা হাসপাতাল সংলগ্ন না হয়ে গৃহসংলগ্ন হবে মাত্র।"

"আমি ঠিক বুঝলাম না।"

আবার হা হা করে হাসেন তফাদার। "বুঝবেন মশাই, বুঝবেন। যাক না দুদিন। একদিনে বেশি বোঝা ভাল নয়। আসুন, আপনার চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

চা খেতে খেতে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ে একজন বৃদ্ধ। মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি! চোখে উদাস অন্ধ দৃষ্টি। গায়ে অসংখ্য তালি দেওয়া ধূলিমলিন একটা কামিজ ; ছিন্ন বসন। বৃদ্ধ সোজা এসে উপুড় হয়ে পড়লো ঋতব্রতের প্রায় পায়ের উপর। সামলাতে সামলাতে খানিকটা চা পড়ে গেল ওর গায়ে। সারা অফিস হাঁ হাঁ করে উঠল। অন্ধ দৃষ্টি মেলে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলে যাচ্ছিল বৃদ্ধ, বিন্দু-বিসর্গও বোঝা যায় না। অফিসের দারোয়ান এসে জামার কলার ধরে টেনে তুললো বৃদ্ধকে। তফাদার ধমক দিলেন, "কেন ঢুকতে দাও এমন করে? কী হয়েছে ওর? ললিত!"

বারান্দার টুল থেকে উঠে আসেন ললিতবাবু। হাতে কলম। বলেন, "আর বলেন কেন স্যার! ও নিজের নামে একখানা কার্ড করিয়েছে আবার ছেলের নামে একখানা। কার্ড পিছু দুখানা কম্বল দাবি করছে। অথচ এভাবে দিতে গেলে সকলের কুলাবে কেন?"

"সেটা ওকে বুঝিয়ে বললেই পারো!"

"এক ঘণ্টা ধরে তাই তো বোঝাচ্ছি স্যার। তাছাড়া এই কি একটা কেস? এ বেটারা সবাই এমনি করে কার্ড বাড়িয়েছে। মায়ের নামে একটা কার্ড, মেয়ের নামে আর একটা। দু' ভাইয়ের আলাদা কার্ড। কী করব বলুন?"

তফাদার বৃদ্ধকে ডেকে পাঠালেন। অন্ধ দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধ এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালো ঋতব্রতের সামনে। ঘোলাটে চোখ দুটোর কোণায় পিচুটি লেগে আছে, মুখের কস্ বেয়ে নেমেছে সাদা একটা দাগ।

"আবার ওঁর কাছে গেলে কেন—আমি ডাকছি তোমায়।"

"আঁইজ্ঞা? বৃদ্ধ ঘুরে দাঁড়ায় শব্দ লক্ষ্য করে।

"তোমার নিজের নামে একখানা কার্ড করিয়েছ, আবার তোমার ছেলের নামে আর একখানা কার্ড কেন?"

"আঁইজ্ঞা এ হুজুর আমার ছের‍্যা না!"

দরজার কাছে থেকে হৈ হৈ করে ওঠে জনতার মিশ্র কণ্ঠ। '...পোলা নয়?....ছেইল্যা নয়?...ছের‍্যার মাথায় হাত রাইখ্যা কও দিকিন চাঁদু!...' দূর থেকে ভেসে আসে আরও কতকগুলি মন্তব্য—অশ্লীল ইঙ্গিত তাতে ভরা।

গর্জন করে ওঠেন তফাদার। ছুটে আসে দারোয়ান। ভিড় ফাঁকা হয়ে যায়।

"হরিদাস তোমার ছেলে নয়?"

"আঁইজ্ঞা না।"

"ওর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারো এ কথা?"

ঠোঁট দুটো ঈষৎ নড়ে ওঠে বৃদ্ধের। কী যেন বলতে যায়। তারপর বসে পড়ে। দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে সে।

'কী হল তোমার?" প্রশ্ন করেন তফাদার।

কান্নায় ভাঙা ঘড়ঘড়ে গলায় কী যেন জবাব দেয় বৃদ্ধ। সব কথা বোঝা যায় না। ভাবার্থটা—এত বড় কথা!..আজ না হয় সে দুর্দশায় পড়েছে...গাঁয়ে তারও পাঁচ বিঘা জমি ছিল....গাই ছিল....আজ তার দুরবস্থা দেখে হুজুর পর্যন্ত বলেন ছেলের মাথায় হাত দিয়ে কথা বলতে...বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র সন্তানকে হারালে কি খুশি হন হুজুর?

তফাদার বলেন, "কী আশ্চর্য! তুমিই তো বললে তোমার ছেলে নয়!"

"আঁইজ্ঞা, আমার ছের‍্যা না তো কার ছের‍্যা? অহন এ্যারে আমি তাজ্যপুত্তুর করছি।"

হেসে ফেলেন তফাদার। ঘরের ও-কোণা থেকে রসিকতা করেন ডেপুটি সুপার ভৈরবচন্দ্র, "করেছ কী? অত বড় সম্পত্তি থেকে একমাত্র ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করলে! আবার দত্তক নেবে নাকি? বল' তা হলে রাজি হয়ে যাই আমি।"

হঠাৎ কণ্ঠস্বর বদলে গেল তফাদারের। ভৈরবচন্দ্রের প্রতি একটা কঠিন দৃক্‌পাত করে তিনি বৃদ্ধকে বললে, "এখন যাও। সব বিলি হয়ে গেলে যদি বাঁচে, তবে আর একখানা কম্বল পাবে তুমি।"

বাহাদুর ওকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। ঘরে ক্ষণিক নীরবতা। তফাদার যেন ভৈরবচন্দ্রকে কী বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। হঠাৎ ঋতব্রতের দিকে ফিরে বলেন, "আসবেন এক সময়ে আমার বাসায়—আলাপ করা যাবে।"

ঋতব্রতও যেন রেহাই পেয়ে বেঁচে গেল।

সাইকেলে চেপে কাজ দেখতে বের হল সে। ....ছোট বড় ব্যারাক বাড়ি। পাশাপাশি। ওর কোটরে আশ্রয় নিয়েছে অসংখ্য ভূতপূর্ব-মানুষ। ওরাও নাকি একদিন আমাদেরই মতো হাসতো, খেলতো, রোজগার করতো, খরচ করতো, তুলে রাখতো ভবিষ্যতের সঞ্চয়!

হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত নমস্কার করে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। কাজের সম্বন্ধে কী জানাতে চায় সে। সাইকেল থেকে নেমে ঋতব্রত এগিয়ে যায় কাজের ওখানে।

পি/৩৭ নম্বর ব্যারাক। মিলিটারি আমলের নামেই ব্যারাকের পরিচয়। খালের খুঁটির উপর খড়ের চাল, বিরাট বড় একটা হলঘর। মাঝে পিঠা-মুলি বাঁশের ছেঁচা বেড়া।

সেনগুপ্ত বলে, "একত্রিশটা খুঁটি বদলাবার কথা আছে এটায়। সবশুদ্ধ একশো সতেরটা খুঁটি আছে। সবগুলোই প্রায় পচে গেছে। কী করব, একটু দেখে দিন।"

সত্যিই তাই। যে গোটা দশেক খুঁটির গোড়া খুঁড়ে রাখা হয়েছে তার সব কটির তলাই পচে গেছে। ঋতব্রত বললে, "আপাতত একত্রিশটা বদলে দিন। পরে এক্সিকিউটিভকে জানিয়ে দেখব।"

একসঙ্গে চিৎকার করে কথা বলে ওঠে আশপাশ থেকে কয়েকজন। "একত্রিশটা খুঁটি বদলানও যা, না বদলানও তাই...মরতাম হয় এইহানয়াই মরবাম্...আম্‌রার পরাণ পরাণ না...আমরা তো রিফুঃ...ঝড় যহন আইয়ে আপনারা তো থাহেন পাকা কোঠার তলাৎ!"

বিব্রত বোধ করলে ঋতব্রত। কোথা থেকে ধমক দিয়ে ওঠে সিংজী ঠিকাদার। ওরা চুপ করে যায়।

"কটা পোস্ট বদ্‌লালে ঘরটা যথেষ্ট শক্ত হয় মনে করেন সুরেনবাবু?"

"সবগুলোই বদলানো দরকার স্যর।"

"কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়।"

ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত নিরুত্তর। সিংজী বললে, "হামি বল্‌বে হুজুর? পঁচাশটা বদলিয়ে দিন।"

"পঞ্চাশটায় কিছু হবে না।" সেনগুপ্তের সাফ জবাব।

"হোবে উপারসিয়ারবাবু, হোবে। পঁচাশটা বদলিয়ে দেন, ঔর বাদ বাকিমে ঠেকা দিইয়ে দেন। না কি বলেন স্যর?"

অকূলে কূল পায় ঋতব্রত। হাঁ তাই করা হোক। সে আবার সাইকেলে উঠবার উপক্রম করে। সিংজী সেনগুপ্তকে মনে করিয়ে দেয়, "কোলটারিংটার কোথা ভি বলেন।"

"ও হ্যাঁ, শালের খুঁটিতে আলকাতরা মাখাবার জন্যে সিংজী দু ব্যারেল আলকাতরা এনেছিল। অতি রদ্দি মাল। আমি রিজেক্ট করেছি। সেই সম্বন্ধে সিংজী আপনাকে কি বলবে!"

ঋতব্রত সিংজীর দিকে মেলে ধরে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি। সিংজী পাগড়ির প্রান্তভাগ দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে ফেলে বলে, "হ্যাঁ জী, মাল খারাপ আছে—ই বাত হামি মানিযে নিলম। লেকিন হাতের পাঁচটা আঙ্গুলভি তো একসাইজ হোয় না স্যর! ও দু ব্যারেল ভি মিশায়ে লিই?"

ঋতব্রত গম্ভীর হয়ে যায়। না, তা সে হতে দেবে না। ভালো মাল নেবার জন্যে পয়সা দেওয়া হবে ঠিকাদারকে। দু ব্যারেল রদ্দি মালই বা সে নেবে কেন? আলকাতরার আবার ভালো-খারাপ মাল থাকে নাকি? ভাগ্যে সিংজী নিজেই মেনে নিয়েছে ব্যাপারটা। না হলে মুশকিলে পড়তে হত তাকে। বললে, 'হাতের পাঁচটা আঙুল পাঁচরকম হতে পারে—কিন্তু সরকারি নোটগুলো—যা আপনি বিনিময়ে পাবেন, তা সব এক মাপের। ওটা চলবে না।"

"দু ব্যারেল আলকাতরা নষ্ট হোবে স্যর?"

"নষ্ট হওয়াই উচিত। আপনি মাল ফেরত পাঠিয়ে দিন।"

"দুবার যাতায়াতে মালের ভাড়া যে দামের চেয়ে বেশি হোবে স্যর?"

"তার জন্যে আমি দায়ী নই। কলকাতার যে এজেন্ট আপনার মাল খরিদ করে, তার কমিশন বা মাইনা থেকে কেটে নেবেন লোকসান।"

অতি কাতরভাবে আরও দু একবার অনুরোধ করে সিংজী। ঋতব্রত কিন্তু নাছোড়বান্দা। এইসব ঠিকাদারের প্রতি একবিন্দু করুণা নেই তার। সে কিছুতেই একফোঁটা খারাপ মাল নিতে দেবে না। তখন বাধ্য হয়ে সিংজী প্রস্তাব করল—হুজুর যদি অনুমতি করেন, তবে পুরানো শালবল্লাগুলোতে লাগিয়ে দেবে ওটা। দাম সে চায় না। মালটা ফেলে দিলেও লোকসান, ফিরিয়ে দিলেও তাই। যাক ওটা ওভাবে খরচ হয়ে। এতে আপত্তি করার কোন কারণ ঋতব্রত খুঁজে পেল না। নতুন শালখুঁটিতেই শুধু

আলকাতরা মাখাবার কথা। পুরানোগুলোতে যদি সিংজী নিজের খরচে আলকাতরা মাখায় এবং দাম না চায় তবে তার আবার আপত্তি কিসের? সে অনুমিতি দিল। সেনগুপ্ত সাইট-অর্ডার বইখানি এগিয়ে দিল। লিখিত অর্ডার চায় সে।

"লিখিত-অর্ডার? বেশ' খস্‌খস্‌ করে লিখে দিল। ওভারসিয়ার যেন এই আলকাতরা মাখানোর জন্যে কোথাও কোনও মাপ না তোলে এম. বি. তে, এ কথাও লিখলো এবং আন্ডারলাইন করে দিল সেটা।

কলম থেকে মুখ তুলে দেখে সিংজী এবং সেনগুপ্তের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছিল একটা। ওকে তাকাতে দেখে দুজনেই সামনে নিল। ব্যাপার কী? সন্দিগ্ধ ঋতব্রত বললে, "কিন্তু এতে আপনার লাভ?"

লাভ সিংজীর কিছু নেই। ওটা দরিয়াতে ঢেলে দেবার চাইতে এটাই ভালো হল না কি? অর্থাৎ কিছু পুণ্-সঞ্চয় করল ঠিকাদার রামশরণ।

ঋতব্রত খুশি হয়। সাইকেলে উঠতে উঠতে ভাবে এই ধর্মজ্ঞানটুকু না থাকলে এই শ্রেণীর লোককে মানুষ বলে চেনাই যেত না। রওনা হয়ে পড়ল সে দ্বিচক্রযানে।

নামতে হল কিন্তু একটু পরেই।

পথের উপর একটি বিধবা মহিলা তাকে নামতে বলছেন। নিরাভরণা প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা। ক্যাম্পের বাসিন্দা। মাথায় আধো ঘোমটা।

"আমায় বলছেন?"

"হ্যাঁ. তোমাকেই বলছি বাবা।"

ঋতব্রত এগিয়ে আসে। প্রৌঢ়া বলেন, তাঁর ঘরে একটি দরমার পার্টিশন দিয়ে দেবার জন্যে ঠিকাদারের লোকজনকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি। তারা রাজি হয়নি। ওভারসিয়ারবাবুকেও তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর আবেদন। ফল হয়নি। ঋতব্রত বুঝিয়ে বললে পার্টিশন করার আদেশ নেই। যেখানে পুরনো পার্টিশন দেওয়াল আছে সেটাই শুধু মেরামত করা চলবে। নতুন পার্টিশন দেওয়াল করা যাবে না। প্রৌঢ়া কয়েকবার বিনীত অনুরোধ করলেন। ঋতব্রত ক্রমে বিরক্ত হল। এরা সবাই চায় নিজের ঘরটিকেই খালি ভালো করে সারাতে। শেষে বললে, "দেখুন, এখন কালবৈশাখীর সময়—যে কোনও দিন ঝড় আসতে পারে। আগে ঘর মেরামত শেষ হয়ে যাক। পরে টাকা থাকলে পার্টিশন দেওয়াল করা যেতে পারে। এখন ও অনুরোধ করবেন না।"

প্রৌঢ়া আর আপত্তি করেন না। ঋতব্রত সাইকেলে চেপে সোজা চলে আসে হাসপাতালে। ডাক্তারবাবু অত্যন্ত খুশি হয়ে ঋতব্রতকে আপ্যায়ন করলেন। সেদিনকার স্মৃতি তিনি মনে রাখেননি বোধ হয়। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁর হাসপাতালটা দেখালেন। ডিসপেনসারিতে একটা কাউন্টার জানলা বসাতে হবে। মেল-ওয়ার্ডটা ঝড়ে কাত হয়ে পড়েছে। ভগবান জানেন কটা খুঁটি বদলাতে হবে তার। ঋতব্রত ওভারসিয়ারকে বললে আজ বিকেলেই কয়েকটা শালখুঁটি দিয়ে বাইরে থেকে ঠেকা দিতে। ঝড় এলে এটা ভেঙে পড়া বিচিত্র নয়। স্টেরিলাইজিং রুমের ওপাশের একটি ঘর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ঋতব্রত বললে, ওটি কী ছিল?"

"ওটি ও. টি. ছিল।"

"মানে?"

'অপারেশন থিয়েটর।" একচালা ঘরটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ডাক্তারের বসবার ঘরের পিছনে আলমারি দিয়ে আড়াল করে অস্ত্রোপচার এবং প্রসবঘরের বিকল্প ব্যবস্থা হয়েছে।

ডাক্তারবাবুর বাড়ি হাসপাতালের লাগাও। সাধুচরণ নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসালেন

অতিথিকে। নিজেই চায়ের জল চাপিয়ে দিলেন স্টোভ জ্বেলে। ডাক্তার সাধুচরণ বিবাহিত। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কাউকেই তিনি এই ক্যাম্পে নিয়ে আসেননি। সাধুচরণের মতে ক্যাম্পের নৈতিক জীবন পরিবারভুক্ত অপরিণতদের মনে রেখাপাত করতে পারে। তাই তিনি একেবারে একাই থাকেন।

চা পানান্তে ডাক্তার সাধুচরণ তাঁর বাড়ির কাজগুলি দেখাতে লাগলেন। ঋতব্রত সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল তাঁর বাড়ির চারদিকে পুরানো টিনের বেড়া দেওয়া হয়ে গেছে। বাথরুমটাও ভেঙে সম্প্রতি বড় করা হয়েছে। এ বিষয়ে সেদিন ডাক্তারবাবুর অনুমতি নিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র।

"এগুলো স্যর ওভারসিয়ার বাবুই করে দিয়েছেন। এখন শুধু আমার সার্ভেন্টস্ রুমটা করিয়ে দিন আপনি। আপনার এস্টিমেটে একটা লেডিজ ওয়েটিং রুম করার কথা আছে হাসপাতালে ; সেটা আমার প্রয়োজন নেই। তার বদলে এখানে একটা বাড়তি ঘর করে দিন শুধু।"

"দেখুন ডাক্তারবাবু, মেয়েদের বিশ্রামাগারে আপনার প্রয়োজন না থাকতে পারে কিন্তু ক্যাম্পের মেয়েদের সেটা প্রয়োজন। এটা আপনি অন্যায় অনুরোধ করছেন।"

"আজ্ঞে না। আপনিই অন্যায় জিদ করছেন। হাসপাতালে কী করার দরকার না দরকার, সেটা আমিই বিবেচনা করব।"

"বিবেচনা আপনি করতে পারেন। আমি কিন্তু সরকারি স্যাংশন্‌ড এস্টিমেটের এক বিন্দু এদিক ওদিক করতে পারব না। এস্টিমেটের বাইরে এ কাজগুলোই বা ওভারসিয়ার কেন করেছে আমি খোঁজ নিচ্ছি। কিন্তু আর ওসব চলবে না।"

চোখদুটো বুজে গেল ডাক্তার সাধুচরণের। বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে বিগলিত হয়ে নিমীলিত নেত্রে তিনি বললেন, "দেখুন, সদ্ভাব বজায় রেখে আপনি এটা করে দেবেন, এটাই আশা করেছিলাম আমি। আপনি রাজি না হলে, উপর থেকে অর্ডার করিয়ে আনতে হবে আমাকে। সেই করবেন শেষ পর্যন্ত, মাঝের থেকে খামোখা হয়রানি হবে আমার।"

"উপর থেকে হুকুম নিয়ে এলে আমি আপনার ঘর করে দেবো ডাক্তারবাবু। তবে উপরওয়ালাকে আমিও জানাবো যে আপনার বাড়তি ঘরের চেয়ে হাসপাতালের ওয়েটিং রুমটার প্রয়োজন অনেক বেশি।"

হাসি হাসি মুখেই জবাব দেন সাধুচরণ, "গায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া করাটা যদি বাঞ্ছনীয় মনে করেন আপনি, করে দেখতে পারেন। তবে আমি বলছিলাম কি, বিদেশে বিভুঁইয়ে মানুষের হঠাৎ অসুখ বিসুখও তো হয়, তাই, কি বলে ভালো, জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদটা না করাই উচিত নয় কি?

ঋতব্রত চটেনি। ভারি হাসি পেল তার, বললে, "আপনি কিন্তু ভুল করছেন এবার ডাক্তারবাবু। জলে যদি কোনও মানুষ কখনও বাস করতে বাধ্যও হয়, তবু নক্র-জাতীয় কোন জীবের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব সম্ভব হয় না।"

"কী বললেন? কী জাতীয় জীব?" বৈষ্ণব সাধুচরণের মূর্তি তখন ঠিক তৃণাদপি সুনীচেন নয়।

ঋতব্রত প্রকাশ্যেই হেসে ফেলেছে, "ঐ যে, আপনি বলছিলেন না জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ না কারই ভালো। তাই বলছিলাম নক্র-জাতীয়। নক্র মানে কুমির।"

চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে সাধুচরণের। একটা কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বের হল না। 'নক্র' শব্দটা প্রকাশ্যে কেউ তাঁর সামনে উচ্চারণ করতে পারে—এবং তাঁকেই উদ্দেশ করে বলতে পারে এটা যেন বিশ্বাস হয়নি তাঁর।

ছোট একটা নমস্কার করে পথে নামলো ঋতব্রত। রাস্তায় এসেই ওভারসিয়ারের কৈফিয়ৎ তলব করল সে। ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত বললে—আগেই এস. ডি. ও-র মৌখিক আদেশ মতো এটুকু বাড়তি কাজে সে হাত দিয়েছে। সেনগুপ্ত বলে, "কিন্তু ডাক্তারবাবুটি...মানে...লোক খুব ইয়ে নন..."

বাধা দিয়ে ঋতব্রত বললে, "জানি ; কুমিরের ভয় থাকলে তাঁকে বলবেন আপনি—আমার হুকুমেই করতে পারেননি। তার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে আমার।"

মিস্টার নক্র! না, তফাদারেরই জিত হয়েছে। ঐ নামটাই ভালো। ছেলেমানুষের মতোই আপন মনে ঋতব্রত হেসে ফেলে।

রান্না করবার জন্যে একটি লোক খুঁজছিল ঋতব্রত। অন্যান্য সমস্ত কাজ রতনই করে ; কিন্তু রান্নায় সে কলির-দ্রৌপদী! রতনের বোধহয় বক্তব্য খাওয়াটাই আর্ট—রান্না করাটা কিছু না। ডালে লবণাধিক্য এবং ঝোলে লবণাভাব বলে হাহুতাশ করলে পাচকের কুখ্যাতির চেয়ে ভোক্তার নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায় বেশি। এটুকুও কি বলে দেবার প্রয়োজন, যে ডাল ও ঝোল একত্রিত করলেই লবণের পরিমাণ সমান হবে? ইঞ্জিনিয়ার হলে কি হবে, রতনের বিশ্বাস, ঋতব্রত অঙ্কশাস্ত্রে ঠিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেনি। ঋণাত্মক ও ধনাত্মক দুটি সমসংখ্যাব সমন্বয়ে কোন্ সংখ্যার উদ্ভব হয়, এটা যদি ঋতব্রত না বোঝে, তবে তার অঙ্কশাস্ত্রের পরীক্ষার খাতায় সেই সংখ্যাটারই উপস্থিতি প্রমাণিত হয় নাকি?

এ জটিল প্রশ্নেব সমাধানে মনোনিবেশ করেনি ঋতব্রত। সে খুঁজছিল একজন রান্না কবার লোক। অবশেষে তফাদার সাহেব একটি পাচিকার বন্দোবস্ত করেন। তাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল সিংজী ঠিকাদারের সঙ্গে। সিংজী ঋতব্রতকে অনুরোধ করেছে যেন ঐ বিধবা মেয়েটাকে অবিলম্বে জবাব দেওয়া হয়। হেতুটা খোলাখুলি বলা হয়নি। তবে যেটুকু ইঙ্গিত করেছে, তাতে বোঝা যায় গুড-কন্ডাক্টের সার্টিফিকেট দেওয়া চলে না কুসুমকে—সিংজীর মতে। কারণটা নৈতিক।

কুসুম এই ক্যাম্পেরই একজন পি. এল। বিধবা। বয়স ঋতব্রতের চেয়ে বছর চার পাঁচ বেশিই হবে বোধ হয়। ঋতব্রত ওর সঙ্গে কখনও কথাবার্তা বলেনি, প্রয়োজনও হয়নি। নিজের মতো এসে আপন মনে কাজগুলি সেরে সে চলে যায়। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে ঋতব্রত ভাববাচ্যে মনের ভাব প্রকাশ করতো। কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে কুসুম নীরবে হুকুম তামিল করে যায়।

রতন বাজাবে গেছে জেনেও ঋতব্রত হাঁক পাড়ে, "রতন, এক গ্লাস জল।" কুসুম ও জানে যে বাবু জানেন বতন বাজাবে গেছে। হাতের কাজ ফেলে এক গ্লাস জল গড়িয়ে সে রেখে আসে নীরবে, ওর নাগালের মধ্যে। এই নতনয়না, অনলসকর্মী, নীরব সেবাব্রতীর প্রতি একটি কোমল ভাব জাগে। সহানুভূতির পর্যায়ে ফেলা যায় সেটাকে।

কুসুমের কথা ঋতব্রতের প্রবাস-জীবনের অনেকখানি জুড়ে আছে। সুতরাং তার প্রাক-পি. এল. পর্বটার একটা পর্যালোচনার প্রয়োজন। কুসুমের উপকথা সে সংগ্রহ করেছিল অনেকের কাছ থেকে। তার মধ্যে শ্রীমান রতনের অবদানই সবচেয়ে বেশি। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বাঁশের ছয়পায়াতে যখন সে এলিয়ে দিত ক্লান্ত দেহটা, তখন রতন এসে বসতো তার হিসাবের খাতা নিয়ে। সারাদিনের খরচের হিসাবটা দাখিল করাব থাকতো একটা অজুহাত ; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য তার গল্প করার। এইজন্যে হিসাবের খাতা ছাড়াও সুপুরির থলি আব জাঁতিটাও নিয়ে বসতো সে। হিসাব চুকতো অল্পেতেই, কিন্তু মিটতে চাইতো না সুপুরি কাটার অনুপান হিসাবে তার গালগল্প। সারাদিন ক্যাম্পের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে যতো আজগুবি গল্প সংগ্রহ করে আনত রতন, আর সেগুলিতে আপনার মনের মাধুরি মিশিয়ে নিবেদন করত সান্ধ্য-আসরের একক শ্রোতাটিকে। ঋতব্রতের কবিতা লেখাব বাতিক ছিল, বাই ছিল ডায়েরি বাখার। এ ছাড়া ক্যাম্প থেকে বড় বড় চিঠি লিখত সে কলিকাতাবাসিনী কোন একজনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এসব কাজই তাকে মুলতুবি রাখতে হত, যে শুভসন্ধ্যায় রতন এলে হাজির হত তার সুপুরি তথা গল্পের ঝাঁপি নিয়ে।

যাক, যা বলছিলাম। কুসুমেব পূর্ব-ইতিহাস। সেকথা নিজের ভাষায় বলার চেয়ে একখানা চিঠির অনুলিপি তুলে দেওয়া যেতে পারে। এব লেখক ঋতব্রত। ক্যাম্প-জীবনের গোড়ার দিকে লেখা। সেই

কলকাতাবাসিনী কোন এক বিশেষ জনকে উদ্দেশ্য করে। এটা কি করে আমার হস্তগত হল, এ প্রশ্ন জাগতে পারে আপনাদের মনে। আচ্ছা, বলব সে কথাও। তবে বিশ্বাস করুন, ম্যাডাম বোসের কোন সেন্ট-সুরভিত বাক্স থেকে নিজে হাতে চুরি করিনি।

' সুচরিতাসু,

তোমার চিঠিতে আমার বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ আছে। জবাবে অনেক কথাই বলতে পারি আমি। বস্তুত যুক্তিতর্কে প্রত্যেকটিকেই খণ্ডিত করা যেতে পারে। প্রথমত, তোমার কাছ থেকে যতো চিঠি উজান বেয়ে আসে তার বেশি চিঠি বয়ে যায় ভাঁটার টানে কলকাতার মোহনায়—এ কথার নজির আছে আমার ডায়েরিতে। দ্বিতীয়ত, তোমার চিঠিগুলোর চেয়ে আমার খামগুলো গতরে ভারি , – প্রমাণ, আমার গত চিঠি তুমি বেয়ারিং পেয়েছিলে। তবে স্বীকার করি চিঠির পরিচয় তার ওজনে নয়, তার আন্তরিকতায়। শ্যামলীর ভাষায় 'তার মূল্য তার রচনায়, নয় তার বস্তুতে।' তা কি করবো বলো অমন মুক্তোর মতো হরফ বা অমন দরদভরা ভাষা আমার কলমের ডগায় আসে না। লোহা-পেটা কাঠ খোট্টা ইঞ্জিনিয়ারের আঙুলের চাপে কলম বেচারি পাল্লা দেবে কি করে তোমার মতো নরম হাতের লেখনীর সঙ্গে? কলম আমার হেরে গেল জরির দোষে।

তোমার তৃতীয় অভিযোগ, তোমাদের, মানে আমাদের 'অভিযাত্রিক' কাগজে আমি লেখা দিচ্ছি না। বিশ্বাস কর রেখা, একেবারে সময় পাই না। মানে সময় পাই, কিন্তু লিখবার মতো মনের প্রেরণা পাই না। ইঁট, কাঠ, চুন, সুরকির মধ্যে আমার সব কবিতা, সব সাহিত্য হারিয়ে গেল। তুমি আগামী সংখ্যার জন্যে একটা গল্প চেয়েছো আমার কাছে। বলেছো—'অভিযাত্রিকের জন্ম মুহূর্তে ছিল তোমারও স্বাক্ষর—আজ লেখা না দেওয়া মানে তারই মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণা করা।' অতটা বিশ্বাস করি না। যাই হোক, গল্পের একটা প্লট পাঠালাম। একটু সাজিয়ে গুছিয়ে এটাকে অভিযাত্রিকে প্রকাশ করতে পারো। অবশ্য প্লটটা যদি সম্পাদিকার মনোমত হয়।

পূর্ববঙ্গের কোন এক নদীর ধারে কি এক গ্রামে কুসুমের বাস। মনে করা যাক নদীর নাম ধলেশ্বরী গ্রামের নাম লক্ষ্মীপুর। কুসুমরা ছিল দুই বোন, ভাই ছিল না তাদের। ওর বাপ ছিলেন গ্রামের পণ্ডিতমশাই। কুসুমের চরিত্রটা বিচিত্র। অন্যান্য পোড়ো ছেলেদের সঙ্গে কুসুম ছেলেবেলা থেকেই দুষ্টামি করে বেড়াতো। ছেলের অভাব মেটাতে মা তাকে মালকোচা মেরে কাপড় পরাতেন, চুল বেড়া বিনুনী করে বাঁধা থাকতো মাথায়। সঙ্গিনী ওর একটিও ছিল না , সব ছেলেদের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব। পাঠাশালায় ছেলেরা তাকে দলে টানত। তবে ঐ বেড়া-বিনুনীটার জন্যেই তাদের ছিল কেমন একটা খুঁতখুতে ভাব। শেষে একদিন কুসুম রেগে মেগে কাঁচি চালিয়ে কেটেই ফেলে তার চুলের বোঝা। বাবা বকলেন , মায়ের হাতপাখার বাঁট ভাঙলো ওর পিঠের উপর, তবু কুসুম ভারি খুশি। পাঠশালার ছেলেরা উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওকে অভিনন্দিত করেছে। একমাত্র বিশ্বনাথদা ঠোঁট উল্টে বল্লে, 'রূপ খুলেছে।'

বিশ্বনাথ পাঠশালার পাঠ শেষ করে আদ্য পড়ছে তখন ওর বাপের কাছে। বিশ্বনাথকে কুসুম দু'চক্ষে দেখতে পারতো না। জোয়ান হলে কি হবে কুসুমের কোন কিছুই যেন প্রশংসার নয় বিশ্বনাথের কাছে। তা বয়েই গেল কুসুমের। সকলের সাথে দল বেঁধে কুসুম যেতো ধলেশ্বরীতে মাছ ধরতে। সাঁতরে গিয়ে কতদিন মহাজনী নৌকার গলুই ধরে চলে যেত মাঝনদীতে। কালবোশেখীর ঝড়ে আম কুড়ানো, এমন কি নষ্টচন্দ্রের রাত্রে পাকা কলার কাঁদি চুরি করার মধ্যেও তাকে খুঁজে পাওয়া যেতো। প্রথমটায় পণ্ডিতমশাই কান করেননি , কিন্তু প্রতিবেশিদের মধুবর্ষণে কান যখন তাঁর উপচীয়মান বোধ হল, তখন তিনি বাধ্য হয়ে কন্যার কানের দিকে হাত বাড়ালেন। কান সমেত কন্যার মাথাটা ততদিনে তার নাগালের বাইরে। ফলে ছোট মেয়ে কামিনীর উপর শাসন হল দৃঢ়তর। কুসুম তখন শাসনের বাইরে। সে ছেলে হয়ে গেছে।

পিতামাতার হাত এড়ালেও কুসুম শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো আর একজনের হাতে। তিনি প্রকৃতি। চুল কেটে ফেললেই যে ছেলে হওয়া যায় না, এ সত্য সে বুঝল একদিন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে। তখন ওর বয়স কতই বা? এই বারো, তেরো। ওকে মাঝে রেখে বেশ একদফা মারামারি হয়ে গেল দু'পক্ষ ছাত্রদের মধ্যে। ঝগড়াটার সূত্রপাত অতি সামান্য বিষয় নিয়ে। খেলোয়াড়দের মধ্যে দু'দলের কোন্ দলে কুসুম যোগ দেবে এটাই ছিল বিবদমান দু'টি দলের বিচার্য বিষয়। ঝগড়াটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিণত হল দুই বিপক্ষ দলের ক্যাপটেন আবদুল গনি আর নির্মলের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে। কুসুমের মালিকানা স্বত্বই সেখানে ঝগড়ার বিষয়বস্তু। কুসুম চুপ করে লক্ষ্য করছিল ঝগড়াটা, একপাশে দাঁড়িয়ে।

এখানটায় তুমি তোমার গল্পে দুই বিবদমান আদিম নরের মাঝে আদি অকৃত্রিম চিরন্তন নারীর একটা উপমা দিতে পারো। অথবা আধুনিক যুগের একটা বাস্তব উদাহরণ : নিরপেক্ষ নধর গাভীর। কলকাতার রাস্তার রণক্ষেত্রে যাদের প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় মল্লযুদ্ধরত অনডানদ্বয়ের অনতিদূরে।

আবদুল অপেক্ষাকৃত শক্তিমান। মার খেয়েছে নির্মলই বেশি। বিজয়ী বীর আবদুলের হাত ধরে কুসুম খেলতে যাচ্ছিল,—অতর্কিতে কোথা থেকে আবির্ভূত হল বিশ্বনাথ। হেঁচকা টানে ছিনিয়ে নিল কুসুমকে। আবদুল ঘুরে দাঁড়ালো ঘুষি পাকিয়ে। ফিরে দাঁড়ালো বিশ্বনাথও অগত্যা। তারপর আবদুল মাথা নিচু করে চলে গেল সেখান থেকে। বিশ্বনাথ শুধু জোয়ান নয়—অসীম বলশালী বলে খ্যাতি ছিল তার। গ্রামের আখড়ায় ছেলেদের কুস্তি শেখাতো বিশ্বনাথ। ক্রুর দৃষ্টিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না শেখের পো'র।

আবদুলের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল দলের বেশির ভাগ ছেলেই। ওরা সবাই মুসলমান পাড়ায় থাকে। আবদুল গণিই ওদের দলপতি। গ্রামের নাম লক্ষ্মীপুর হলেও মুসলমানপ্রধান স্থান সেটা।

কুসুম হেসে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। প্রচণ্ড ধমক দিল তাকে বিশ্বনাথ। ভয়ে, বিস্ময়ে, বিহ্বলতায় কুসুম নির্বাক হয়ে গেল। বিশ্বনাথের ধমক শুনে নির্মলের দলের বাকি ক'জনও রণস্থল ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করল। বিশ্বনাথ বজ্রমুঠিতে কুসুমের হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল তাদের বাড়ি পর্যন্ত। ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ছেড়ে দিল ওর হাত। কুসুমের তখন ভারি কান্না পাচ্ছে। জলভরা চোখদুটো হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছে নিয়ে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে বাগানের ফটকের সামনে ; একপাও নড়লো না। বিশ্বনাথ অল্প ইতস্তত করে বললে, "বাড়ি যাও কুসুম। তোমাকে দলে নেবার জন্যে ছেলের দল মারামারি করে...ছি...ছি...তুমি বোঝ না কেন?...আর শোন, ...ইয়ে, তুমি শার্ট পরো না, বুঝলে...শাড়ি পরলেই হয় এখন...."

মাথা না তুলেই কুসুম বুঝতে পারে বিশ্বনাথ চলে গেছে অনেকক্ষণ। লজ্জায়, অনুশোচনায় একটা ছিছিক্কারে মাটির সঙ্গে কে যেন মিশিয়ে দিয়েছে তাকে। পায়ে পায়ে বাড়িতে নিজের শোওয়ার ঘরে এসে ঢোকে। সামনের বড় আয়নাটায় পড়েছে ওর প্রতিকৃতি! ছিঃ ছিঃ! ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে সে খাটের উপর! তারপর ফুলে ফুলে কী কান্না তার।

এখানেই শেষ করছি আজ কুসুমের উপাখ্যান। তার কারণ কাহিনীর এটুকুই সংগৃহীত হয়েছে এ পর্যন্ত। পরে বাকিটা ক্রমশ প্রকাশ্য।

নিজের কথায় আসি। কাজ চলছে একরকম। ভাল লাগছে না আর। এখন এত্তো পুরাদমে কাজ চলছে যে, ছুটিও নেওয়া সম্ভব নয়। অথচ ভারি দেখতে ইচ্ছা করছে তোমায়। তুমি এতক্ষণে হয়তো দক্ষিণের বারান্দায় ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসেছ। আচ্ছা, লেডি হিলিংডন গাছটায় ফুল ফোটেনি এখনও? আজকাল বিকালে কোথায় যাও? সিনেমা দেখছ নিশ্চয়ই ;—কার সঙ্গে? 'ভারতের সিংহাসন খালি নাহি রবে'—তা জানি। আচ্ছা, আমিই না হয় যেতে অপারক, তোমার পক্ষে চলে আসাটা কি

এতই অসম্ভব? তোমার কলেজ তো বন্ধ। মেশোমশাইকে বল'না যে তোমার এক বান্ধবীর বিয়ে মধুপুর অথবা আসানসোলে। বলে বেরিয়ে পড়। হুট করে এসে হাজির হও যদি ক্যাম্পে, আমি ভারি চমকে যাব। এখানে কিছু অসুবিধা হবেনা। বাথরুম একটা বানিয়ে দেবো টিন দিয়ে ঘিরে। আরে হ্যাঁ বাপু, দুখানা শোবার ঘরই আছে। মাঝের পার্টিশনে দরজা থাকলেও তা ভিতর থেকে বন্ধ করা যায়।

আজ এখানেই থামছি। ওভারসিয়ারবাবু আসছে দেখতে পাচ্ছি জানলা দিয়ে। এবারও বাড়তি টিকিট দিলাম না। বেয়ারিং চিঠি খোওয়া যায় কম।

ভালবাসা জানাতে সাহস পাচ্ছি না। গ্রহণ তো করলে না কোনদিন, তাই রইল আমার শুভেচ্ছা।

—ইতি"

সূর্য মাথার উপরে উঠেছে। সাইকেলে চেপে কাজ দেখে ফিরছিল ঋতব্রত। কোথাও ঘরের চাল নামাচ্ছে কেটে কেটে। কোথাও পোয়ালগুলি দিচ্ছে বাতায়। কোথাও শালের খুঁটি পাচ্ছে নবকলেবর, কোথাও বা বানানো হচ্ছে মুলিবাঁশের লম্বা দেওয়াল। নানান জাতের কর্মীর কর্মব্যবস্থা। সাইকেল চলেছে দ্রুতগতিতে—গরম হাওয়া বইছে উল্টোদিক থেকে। বৃষ্টি এখনও নামেনি। বাঁ দিকে এল/২৯ ব্যারাকে পুরানো টিন বদলে নতুন টিন চাপাচ্ছে মিস্ত্রিরা। হাতুড়ির আওয়াজ উঠছে ঠক্-ঠক্-ঠক্। হঠাৎ ব্রেক কষল ঋতব্রত। সাইলেক থেকে নেমে ঘুরে ঘরখানার পিছন দিকে গেল। যা ভেবেছে তাই! পাঞ্জাবী ছুতার মিস্ত্রি হাতুড়ি মেরে স্ক্রু বসাচ্ছে টিনে। ধমক দিয়ে ওঠে ঋতব্রত। তার শিক্ষায়-সহবতে যতখানি তীক্ষ্ণ হওয়া সম্ভব—গালাগাল দেয় সে। পাঞ্জাবী মিস্ত্রি চালের উপর থেকে বারবার কসম খায়। হাতুড়ি পেটেনি সে। স্ক্রু-ড্রাইভার ঘুরিয়েই টিনগুলোকে আঁটছে সে পার্লিনের সঙ্গে। স্ক্রু কখনও হাতুড়ি মেরে বসাতে পারে! তা'হলে তো জোরই হ'বেনা কিছু। জুতো খুলে মই বেয়ে চালে উঠে পড়ে ঋতব্রত। বিব্রত হয় পাঞ্জাবী মিস্ত্রি। তার হাতের কাছে একটাও স্ক্রু-ড্রাইভার ছিল না। কাজ বন্ধ করে দিতে হুকুম দিল ঋতব্রত। ওয়ার্ক-সরকার কই?

সে নাকি খেতে গেছে। ঋতব্রত ঘড়িতে দেখলো সকালের কাজ ছুটি হতে তখনও কুড়ি মিনিট বাকি! ওয়ার্ক-সরকারের নাম, ব্যারাকের নাম নোট-বইতে টুকে নিযে সাইকেলে উঠতে যাবে হঠাৎ ঘর থেকে বের হয়ে এল একজন যুবক। সুগঠিত তৈলচিক্কন মসৃণ চেহারা। মশীকৃষ্ণ ব্যাক-ব্রাশ চুল, ঘাড়ের কাছে একেবারে ছাঁটা। পরিধানে একটি সবুজ লুঙ্গি ও হাতকাটা স্যান্ডো গেঞ্জি। বললে, 'দেউখ্যাইন স্যার! অ্যারার কাণ্ডটা দেউখ্যাইন্! খালি ফাঁকি দেওনের লগ্যা আছে হারামির বাচ্ছারা।"

হঠাৎ গর্জন করে উঠলো পাঞ্জাবী মিস্ত্রি, "তু চুপ রহ্ শালে শয়তান!"

বাঙালোর পো-ও তখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে একটা থান ইঁট হাতে! পাঞ্জাবীও দৃঢ় মুষ্টিতে ধরেছে তার হাতুড়িটা। ঋতব্রতের গালাগাল সে নির্বিবাদে হজম করেছিল—কাবণ তার কাছে সে ছিল অপরাধী। তাছাড়া সাহেব আদমির গালাগালটাও কিছু বাপ মা তুলে নয়! ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একে মোড়লি কবতে দেখেই সে রুখে দাঁড়িয়েছে। জনতা ঘিবে দাঁড়িয়েছে চারদিকে।

মুহূর্তে ঋতব্রত গিয়ে পড়লো ওদের দু'জনের মাঝখানে। দু'জনকে পৃথক করে পাঞ্জাবীকে বললে, 'আপ্ খামোশ্ হো যাইয়ে'!"

আর নওজোয়ানের দিকে ফিরে বললে, "আপনি ওকে গাল দিলেন কেন? ও কাজে ফাঁকি দিয়ে থাকে তা দেখবার জন্যে অন্য লোক আছে। আপনি ওকে গাল দেবার কে?"

"দিতাম না? গাইল দিতাম না? এ্যাকশো বার দিয়াম!"

ঘরের ভিতর থেকে আর একজন মহিলা এগিয়ে এসে ওর হস্তাকর্ষণ করে, "কারে কিতা ক'স বড়খুহা? দ্যাহস না চৌখ্যু মেইল্যা?"

"অন্যায়টা কি কইলাম?" প্রতিবাদ করে বড়খোকা।

"আপনি কোথায় থাকেন বলুন তো?" প্রশ্নটা ঋতব্রতেব।

'থাক্‌বাম্ ফিরাবার কই? এ ঘরই থাহি।"

"এই ঘরে? আপনি এ ক্যাম্পের বাসিন্দা?"

"হ! পাঁচ বচ্ছর থাহ্‌কলে যুদি বাসিন্দা কয় তা বাসিন্দাই।"

"আপনি পি. এল?"

"হ।"

অবাক হয়ে যায় ঋতব্রত। এই ষাঁড়ের মত তাগড়াই জোয়ান মদ্দ পি. এল? অর্থাৎ পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি? যাবৎ জীবেৎ সরকারি ডোলং ভক্ষেৎ? হেসে ফেলছে সে অতি দুঃখেও। পাঞ্জাবী মিস্ত্রি তখনও খামোস্ হয়ে প্রতীক্ষা করছে সুবিচারের। তার দিকে ফিরে ঋতব্রত বললে, "এই দুর্বল পি. এল. লোকটার উপর তোমার মতো জোয়ানের রাগ করা শোভা পায় না। ওর শরীরে কোনও পদার্থ নেই বলেই না সরকারি ডোল খেয়ে জীবন-ধারণ করে বেচারী।"

মুখ কালো করে ঘরে ঢুকে যায় বড়খোকা। অনুচ্চ কণ্ঠে বলে শুনিয়ে শুনিয়ে, "আমারে যেন্ আসামী পাইছে! কুথায় থাহো? কিতা কর? অত কথা ক্যান রে বাপু? এইডা যেন্ কাঠগড়া।"

ঋতব্রত সাইকেলটা ঠেলে বড় রাস্তায় তুলতে থাকে। পাঞ্জাবী তার যন্ত্রপাতি গুছিয়ে তোলে। কাটা চালের খড়ের গাদায় ঋতব্রতের সাইকেলের চাকাটা আটকে যায়। নিচু হয়ে ছাড়াতে ছাড়াতে জনতাকে উদ্দেশ করে বলে, "এগুলো আপনারা সরিয়ে রাখেন না কেন? বাড়ির চারপাশ এত নোংরা করে রাখে?"

ফোঁস করে ওঠে ভিড়ের মাঝে একজন, "ক্যান্? আমরা কি মশয় মুদ্দোফরাস? ময়লা ফ্যালাইমু ক্যান?"

ঋতব্রত নবম হয়ে বলে, 'ময়লা তো নয়, আপনাদেরই ঘরের চাল। নিজের ঘরের খড় কি সরাতেন না নিজেদের বাড়িতে? খড়কুটো এত চারপাশে ছড়ানো থাকাটা কি ভালো? গরমের দিন কে কোথায় একটা বিড়ি ছুঁড়ে খেয়ে ফেলবে—"

"প্যাটে খাতি পাইনা, আমরা রিফু, আর আমাগোরে কন্ বিড়ি খায়ী ফালাইবে!"

বিরক্ত হয় ঋতব্রত। লক্ষ্য করে সামনেব সারিতেই একজন বিড়িটাকে হাতের তালুতে লুকিয়ে ফেলে। বলে, "কী আশ্চর্য! খামখা তর্ক করছেন কেন? আপনারা কেউ বিড়ি না খেলেও পথচল্‌তি মানুষেও তো ফেলতে পারে। তাছাড়া সাপখোপ-পোকামাকড় হয়। একটু পরিষ্কার থাকতে পারেন না নিজেরা? এত নোংরা কেন?"

প্রতিবাদটা এবার শত কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে : "পেডে পুলাও কাল্যা পড়লি বেবাকই পরিষ্কার থাক্‌তি চায়।"

অর্থাৎ ওদেরই কি ইচ্ছা করে না শার্ট প্যান্ট পরে সাহেব সাজতে?...ওদের গাঁয়ে গেলে দেখতে পেতেন পরিচ্ছন্নতা কাকে বলে...একটি কুটো খুঁটে তুলুক তো কেউ বাড়ির দশ হাতের মধ্যে?...এটা তো ওদের গাঁয়ের বাড়ি নয়... এখানে এসব সাফা করার জন্যে সরকারি ঠিকাদার রাখা হয়েছে কেন?

এর পরেও ধৈর্য থাকা অসম্ভব ঋতব্রতের মতো রগচটা লোকের। তবু সে মিষ্ট কথায় বোঝাতে গেল। ময়লাগুলো যদি ওরা নিজেরাই সবাই সাফা করে তবে সাইট-ক্লিয়ারেন্স বাবদ সরকারী টাকাটা দেবে না সে ঠিকাদারকে। সে প্রমাণ করতে চায় পি. এল. মার্কা দেওয়া হলেও এরা মনুষ্যত্ব হারায়নি আজও। সুযোগ সুবিধা পেলে আবার মানবিকতার পরিচয় এরা দিতে পারে। কিন্তু হঠাৎ একটা মন্তব্যে ওর সব সংযম হারিয়ে গেল। কথাটা বলেছে ঘরের ভিতর থেকে— সেই বড়খোকা নামধারী যুবকটি।

"হ, হ, জানি! আমবায় ময়লা ফ্যালাইলাম্ আর হেই ট্যাহাডা ঠিকাদারের নামে লেইখ্যা তুমরা দুইজনে ভাগ্ বাটোয়ারা করবা!"

সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে পিচের রাস্তায় উঠে এলো ঋতব্রত। পিচ তখন গলতে শুরু করেছে। সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিম দিকে। নিজের ঘরে এসে পৌঁছলো ক্রমে। এ বেলার মতো চাকরি শেষ হয়েছে তার। রতন সাইকেলটা ঘরে তোলে। তার স্পোকে তখনও জড়িয়ে আছে কয়েক টুকরো খড়—এল/২৯ ঘরের গ্লানি।

জুতো জামা না খুলেই সে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল।

অফিসে একা বসে কাজ করছিল ঋতব্রত। পাঁচটা বেজে গেছে। সবাই চলে গেছে। বাইরে বেশ মেঘ করেছে আকাশে। আজ ঝড় হতে পারে। এ বৎসরের প্রথম কালবৈশাখী। প্রতি বৎসর এই প্রথম বর্ষণের দিনটি ওর ভারি আনন্দের। সারাদিনের দুর্দান্ত গরমের পর যখন আকাশের কোণ থেকে মত্ত মাতঙ্গের মত শুঁড় নাড়তে নাড়তে মেঘের দল ধেয়ে আসে ও তখন ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে প্রকৃতির বিপুল সমারোহ। বিশাল বনস্পতি মাথা নিচু করে অভিবাদন করে ঝড়কে। হৈ হৈ করে এসে পড়ে ফোঁটা! প্রতি বছরই সে ভিজতে ভালবাসে প্রথম বর্ষণের ধারা-পাতে। আবৃত্তি করে রবিঠাকুরের কবিতার বিশেষ অংশ।

এখনও ঝড় আসেনি। শুধু কালো করে থমকে আছে আকাশটা। এলোমেলো হাওয়া বইছে। দুলছে অফিস ঘরের পর্দাটা। পাশের ঘরে স্টোভে চায়ের জল বসিয়েছে রতন ;—একটানা শব্দ ভেসে আসছে তার—শোঁ।

কলকাতার ডাক দেখছিলো সে। সময়ে প্রগ্রেস রিপোর্ট পাঠানো হয়নি বলে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। অডিট অবজেকশনের কপি। এটা কী? ট্যুর প্রোগ্রাম। এক্সিকিউটিভ ইনস্পেকশনে আসছেন আসছে বুধবার। ওয়ার্কচার্জ স্যাংশন। নাঃ আর পারা যায় না। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে—বৃষ্টি বোধ হয় শুরু হয়েছে দূরে কোথাও। না, দূরে নয় কাছেই। ঐ তো ভিজে মাটির একটা সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। ডাক-ফাইলটা দূরে সরিয়ে রাখলো সে। একটা কবিতা লিখতে হবে তাকে। আজই, এক্ষুণি! লোটারহেডের একটা পাতা নিয়ে শুরু করতে যাবে হঠাৎ দমকা পূর্বের হাওয়ায় কাগজপত্র উড়িয়ে নিয়ে যায়। হাত থেকে উড়ে যায় অলিখিত কবিতার কাগজটাও। ছুটে আসে রতন। বন্ধ করে দেয় পূর্বদিকের দরজাটা। চলে যায় একটা লণ্ঠন রেখে। বাইরে নেমেছে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। খস্ খস্ করে চলে কলম—

"স্থপতিবিদের পরিচয় নিয়ে নেমেছি রঙ্গালয়ে
বলে যাই ভয়ে ভয়ে
সাবধানে শেখা পার্টটুকু মোর ফুটলাইটের কাছে,
ইঁট কাঠ আর চুন-সুরকির হিসাব সাজান আছে।
নাট্যকারের বাঁধা গৎ আছে জানা
বাইরে তাহার আপন খেয়ালে কোন কথা বলা মানা।।

অফিসের চেয়ারেতে
ফ্ল্যাট-ফাইলের নেশায় যখন একলা উঠেছি মেতে
দেখিনি তখন ব্যস্ত চক্ষু তুলে
পূবালী-পবন চাপরাশি হাতে কার্ড দিয়ে যায় ভুলে।
আপন খেয়ালে ঢুকে
পথের ধূলার চূর্ণ-মুষ্ঠি ছুঁড়ে মারে মোর মুখে।।

হ্যাট-র‍্যাক হ'তে ফেলে দেয় হ্যাট—ওড়ায় নক্সাগুলি
টেবিলেতে জমে ধূলি।
ক্ষ্যাপা মেয়েটির অঞ্চল দোলে দ্বারের পর্দাটিতে
খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে দেখি আপন দুষ্টামিতে।
এমনি করেই জ্বলায়েছে দিবারাতি
ও যে এ কবির ছেলেবেলাকার সাথী।।

টেবিলের উপর রতন চা রেখে গেল। হাত দিয়ে কাগজখানা চাপা দিল ঋতব্রত। সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতো বাঙলা হরফের লাইনগুলো দেখলে রতনের পক্ষেও বোঝা অসম্ভব হবে না সাহেব কি কাণ্ডটা করছে। ঝাড়ন দিয়ে টেবিলের ধূলার প্রলেপটা মুছে দিয়ে রতন চলে যায়। রুদ্ধ দরজার বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি। ঘরে তার প্রবেশ বন্ধ হয়েছে।

"হঠাৎ ও যায় থামি,
লজ্জা ও ভয়ে ব্লাউসের নিচে উঠেছে বেচারা ঘামি,
জড়িয়ে আঁচল ধূলামাখা এলো চুলে
এ কার ঘরে ও প্রবেশ করেছে ভুলে?
এতো সে তো কভু নয়!
কোট-প্যান্টের তলায় কোথায় সেদিনের পরিচয়?
এ ঘরে তো নাই খাতা ছবি রঙ্ তুলি!
চাপরাশি এসে ঝেড়ে দিয়ে যায় ধূলি।
সামলে আঁচল ধূলামাখা মৃদু পায়
পূবালী-পবন ধীরে ধীরে চলে যায়।"

জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে জলকাদার মধ্যে ছপ্ ছপ্ করে লণ্ঠন হাতে লোকজন যাতায়াত করছে। বৃষ্টিটা ধরেছে। বর্ষণের মধ্যে ওরা বোধহয় আটকে পড়েছিল এতক্ষণ। একশো তের নম্বর ঘরটার কথা মনে পড়লো ঋতব্রতের। আজই সকালে চালটা নামিয়েছে। মনে পড়লো একশো তের নম্বর ঘরের হাঁপানি রুগীটার কথা—আর এদিকে সদ্যোজাত শিশুক্রোড়ে উদ্বাস্তু জননীটিকে। এই প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে কোথায় মাথা গুঁজলো তারা?

রতন এসে দাঁড়াল। রাত্রে কী রান্না হবে? ঢালা হুকুম দিল ঋতব্রত খিচুড়ি আর পাঁপরভাজা।

"পাঁপরভাজা? এখানে পাঁপর কোথায় পাব স্যার?"

"তবে আলুভাজা।"

রতন চলে গেল ওঘরে।

দূরে কে যেন ডাকছে "বুধনা—এ বুধনা!"

একটা গরুর গাড়ি চলে গেল জলকাদা ভেঙে। ছত্রির ভিতর ঘোলাটে চোখ মেলে লণ্ঠনটা তাকিয়ে আছে একচক্ষু দৈত্যের মতো। দুটো বাদলা পোকা ওর টেবিলের কাছে ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরছে লণ্ঠনটাকে। সেই চিরন্তন খেলা! রূপবহ্নি! নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও, উত্তাপ প্রতি মুহূর্তে গায়ে লাগছে জেনেও পোকাদুটো দূরে সরে যাচ্ছে না। দীপশিখাই ওদের অন্তিম গতি। কী মূর্খ পোকা দুটো! মূর্খ? সে নিজেও কি ঐ রকম মূর্খ নয়? তবে রেখা মিত্তিরের রূপবহ্নির চতুর্দিকে পাক খেয়ে মরেছে কেন আজও? তিন পুরুষের অভিজাত ঘরের ঐ মেয়েটি কি কোনদিন এসে দাঁড়াবে ওর পাশে এই দরমার বেড়া দেওয়া ঘরে? যেখানে পিয়ানো নেই, সিনেমা সাপ্তাহিক নেই, যেখানে সেতার বাজানো চরম রসিকতা—যেখানে বৃষ্টির দিনে পাপরভাজার কথা মনে হলে ধমক খেতে হয় চাকরের কাছে!

দূর হোকগে রেখা মিত্তির। তার কথা ভাবা যাবে পরে। আজকে তার কবিপ্রিয়া রেখা মিত্তির

নয়—পূবালী-পবন। অভিমান কবে সেই যে চলে গেল আব তো ফিবে এল না সে?

"ওবে ও পূবালী হাওয়া
বিকিয়ে দিয়েছি ইঁট কাঠ-চুনে যতকিছু চাওয়া পাওয়া।
তবু ওবে শোন—কিছু আছে আজও বাকি,
স্লাইডকলেব নির্ভুল মাপে আছে হিসাবেব ফাঁকি।
প্রখব ববিব কিবণেব জালে দিবসে বয়েছে ঢাকা
আমাব গোপন কৃষ্ণপক্ষ বাকা।
মন-কেমনেব ওব ও পূবালী মেয়ে
সাথীহীন বাতে কবিব কুটিবে অমনি আসিস ধেয়ে।
অভিমানিনীব অভিমান কবি জয়
মৃদু চুম্বনে ফিবে দেব তোকে সেদিনেব পবিচয়।"

হুড়মুড় কবে ঘবে ঢুকে পড়লো পাঁচ সাতজন লোক।

"শিগ্‌গিব চলুন স্যব। হাসপাতালেব মেল ওয়ার্ডটা ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। দুজন লোক চাপা পড়েছে। একজনেব অবস্থা খুব খাবাপ।"

লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ঋতব্রত। গামবুটেব মধ্যে পা চালাতে চালাতে প্রাথমিক সংবাদটা সংগ্রহ কবে। অনেক লোক নাকি জমায়েত হয়েছে অকুস্থলে। সমস্ত ঘবটাই ভেঙে পড়েছে। কগীদেব সবিয়ে আনা হয়েছে বেশন-গুদামেব বাবান্দায়। টর্চটা নিয়ে সে বেবিয়ে পড়ে।

বতন ডাকতে এসেছিল। তাব খিচুড়ি তৈবি হয়ে গেছে। অবস্থা দেখে থেমে গেল। এতক্ষণে একটা দমকা হাওয়া উঠেছে।

খোলা দবজা দিয়ে শূন্যঘবে ফিবে এসেছে পূবে-হাওয়া। ঋতব্রত তখন অন্যমনস্ক হয়ে হনহন করে ছুটে চলেছে হাসপাতালেব দিকে। তাব শুধু চিন্তা সুবেন সেনগুপ্ত কি শালেব প্রপ্‌গুলো লাগায়নি ওব কথামতো? খিচুড়ি জুড়িয়ে যায়। টুলে বসে ঝিমায় বতন, লক্ষ্য কবে না দমকা হাওয়ায় সাহেবেব টেবিল থেকে উড়ে যায় একখানা কাগজেব টুকবা—জানলা পাব হয়ে পড়ে গিয়ে রাস্তায়। অন্তিম গতি লাভ কবে জলকাদাব মধ্যে।

কাজ দেখে বেড়াচ্ছে ঋতব্রত। অনেকগুলো দবখাস্ত এসেছে ক্যাম্পবাসীদেব বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে ক্যাম্প-সুপাব তফাদাবেব কাছে। এ বাড়িব ছাদ দিয়ে জল পড়ে, ও বাড়িব খড় নয় ইঞ্চি পুব হয়নি, সে বাড়িতে আবও খুঁটি না বদলালে ঘব পড়ে যাওয়াব সমূহ সম্ভাবনা। দবখাস্তগুলি ফবোয়ার্ড কবেছেন তফাদাব ওব কাছে, ওব জ্ঞাতার্থে। সেগুলি পকেটে নিয়ে সবজমিনে তদন্ত কবে বেড়াচ্ছিল। ভাবি মজাব সমস্ত আবেদনপত্র। উপবে "মাননীয় বকুলতলা ক্যাম্প সুপাব বাহাদুব সমীপেষু" এবং নিচে "হুজুব মালিক নিবেদন ইতি" থাকলেও অন্তবাব লাইন কটা সি-সার্প স্কেলেও কুলায় না। বীতিমত জ্বালাময়ী ভাষায় বলা হয়েছে ক্যাম্প-বিপেয়াবেব নাম কবে যথেচ্ছ ভাবে অর্থেব অপব্যয় কবা হচ্ছে শুধু। যে তীব্র ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তি আছে আবেদনপত্রগুলিতে তাতে মনে হয়—আব কিছু না হোক খববেব কাগজে সম্পাদকীয় লিখেও এবা অন্নসংস্থান কবতে পাবত। সদাশয় সবকাব বাহাদুবেব অর্থ এমন ভাবে নষ্ট হতে দেখে সকলেবই প্রাণ কেঁদে উঠেছে। অথচ মাসে মাসে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাশ ডোল হিসাবে বিতবণ কবা হচ্ছে ঐ বড়খোকা মার্কা পি. এল দেব, তাব বেলা—

"একটু শুনছেন?"

ব্রেক কষল ঋতব্রত। সেই বিধবা ভদ্রমহিলা। একটা চটেব থলিতে বাজাব কবে ফিবছেন। বেশন ব্যাগ থেকে বেবিয়ে আছে লাউডগাব মাথা। সঙ্কুচিত হয়ে পথেব ধাবে দাঁড়িয়ে ওকে ডাকছেন। ঋতব্রতেব মনে হল এব আগেব দিন 'তুমি' বলে কথা বলেছিলেন।

"আপনার কী চাই? দরমার পার্টিশন তো? বলেছি তো সেদিন।" মহিলা যেন লজ্জায় এতটুকু হয়ে যান। কি জানি, হয়তো ভদ্রঘরের বধূ, এভাবে অনুগ্রহ চাওয়াটা তাঁর অভ্যাস হয়ে যায়নি আজও। একটু নরম হল ঋতব্রত।

"তা আমি কী করব বলুন—একজনকে দিতে গেলে সবাই চাইবে। সব ঘরে পার্টিশন দেওয়াল করাতো সম্ভব নয়।"

"তা তো বটেই! না, আমি সেকথা বলছিলাম না আজ। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম আমাদের ঘরের উত্তর দিকে এল/৩০ ঘরটা কি মেরামত করানো হবে? ওখানে কেউ থাকে না, চাল নেই বলে। ওটা যদি সারানো হয়, আমরা সুপারেণ্ডেনকে বলে ওখানে সরে যেতাম।"

"এল/৩০ নম্বর? সেটা কোনটা?"

"এই তো কাছেই। এখন দেখবেন?"

"চলুন দেখেই আসি।"

সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে মহিলার পিছু পিছু সে এসে দাঁড়ায় তাঁর ব্যারাকটার সামনে।

"আপনি এই ব্যারাকে থাকেন? এল/২৯এ?"

"হ্যাঁ বাবা। এখানেই থাকি আমি। এস' না ঘরে। আমি বাজারটা রেখেই যাব তোমার সঙ্গে।"

আবার কখন আপনি এসে ঠেকেছে তুমিতে।

এল/২৯ হচ্ছে সেই ঘরটা যেটার বাস করে সেই বড়খোকা নামধারী লোকটা। ব্রজেন নায়েক, যে ছেলেটি ওয়ার্ক-সরকার-ইন-চার্জ, তাকে ধরে ঋতব্রত এমন ধমক দিয়েছে কাজে ফাঁকি দেবার জন্যে যে, ওকে দেখলেই ছেলেটি ঘেমে ওঠে। ঘরের ভেতরটা কেমন কাজ হয়েছে দেখবার জন্যে মহিলার পিছন পিছন, ঋতব্রতও ভিতরে যাচ্ছিল। পর্দার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে একটা চটের থলি ঝুলছে দরজার সামনে। না পর্দার বিকল্প তো নয়, পাল্লারই প্রতিভূ ওটা। দরজাটায় পাল্লাই ছিল না। পর্দা সরিয়ে ভিতরে মাথা গলিয়েই বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো বেরিয়ে এল ঋতব্রত। মহিলাও যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। একটু সময় নিয়ে ফের বললেন, "এসো এসো বাবা, ভিতরে এসো।"

আরও একমিনিট সময় দিয়ে পর্দা সরিয়ে ঋতব্রত ঘরে ঢুকলো। ভিতরের মেয়েটি ততক্ষণে ভিজে কাপড় ছেড়ে নতমুখে কী একটা কাজ করছে। ঋতব্রত চোখ তুলে চাইতে পারল না তার দিকে।

বিরাট লম্বা হলকামরা। অন্তত আশিফুট লম্বা এবং বিশফুট চওড়া। আটটা পরিবার বাস করে এটাতে। একেবারে এদিকের কোণটায় থাকেন এই মহিলা। মেয়েটি তাঁরই এলাকাভুক্ত বলে মনে হয়। একটা নারকোলের দড়ি টাঙানো রয়েছে অন্যান্য অংশ থেকে তাঁর এলাকাটা পৃথক করে। দড়ির উপর আড়াআড়ি করে ঝুলছে একখানা শাড়ি। দ্বিতীয় খোপটায় বসে আছে বড়খোকা। শালের খুঁটিতে হেলান দিয়ে একটা বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছিল অলসভাবে। ওদিককার অংশগুলিতে দুর্দশাগ্রস্ত নরনারীর সাধারণ সংসারযাত্রা নির্বাহের দৃশ্য। কেউ ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে; কেউ রেশনের চালের কাঁকর বাছছে ; ও পাশে একটা তোলা উনুনে ফুটছে সেদ্ধভাত। তার গন্ধে আমোদিত হয়ে আছে সারা হলকামরাটা। কোণায় এক বৃদ্ধ বসে বিড়ি পাকাচ্ছেন। একগাল সাদা ধপধপে দাড়ি। অনেকটা ব্রজেন শীলের মতো চেহারা। মাঝখানের একটা খুপরিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে একটা পাগল। লোকটা বিড় বিড় করে আপন মনে কী বকছে। দুটো বেড়াল বাচ্চা খেলা করছে এ কোণায়। ওরা বোধহয় পি. এল-দের স্থায়ী পোষ্য। পাগলটার পাশে ঘুমাচ্ছে একটা ন্যাংটো ছেলে—তারই এলাকাভুক্ত মনে হয়। অন্ধকারে সমস্ত হলকামরাটা থম্‌থম্ করছে। জানলাগুলোর অধিকাংশতেই পাল্লা নেই—সারানো হয়নি এখনও। পচা দরমা, ভাঙা টিন—যে যা পেয়েছে চাপিয়েছে জানলার ওপর। বৃষ্টির ছাট থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে ওদের। ফলে সমস্ত হলকামরাটা পরিণত হয়েছে অন্ধকারায়। কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেও হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্বলছে বড়খোকার চোখ দুটো—লেহন করে ফিরছে সদ্যস্নাতা নতমুখী মেয়েটার সর্বাঙ্গ।

ঋতব্রত বুঝতে পারে ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতেই মেয়েটি টাঙানো কাপড়ের আড়ালে ভিজে কাপড় ছাড়ছিল তখন। ওর দিকে পিছন ফিরলে যে দরজার দিকে মুখ করতে হয়, এক চক্ষু হরিণের মতোই তা খেয়াল করেনি বেচারি।

"আসুন আমার সঙ্গে।"

মহিলা ঋতব্রতকে সঙ্গে করে পথে নামেন। দু পা গিয়েই উত্তর দিকে দেখিয়ে দেন এল/৩০ নম্বর বাড়ির ভগ্নস্তূপ। বলেন, এই ভগ্নস্তূপটি যদি সারাই করা হয়, তাহলে তিনি এটায় উঠে আসবাব চেষ্টা করবেন।

ঋতব্রত এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে—কেন উনি বারবার পার্টিশন দেওয়ালের কথা বলেন। কেন ঐ পাকা হলঘর ছেড়ে এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে আশ্রয় নেবার ব্যাকুলতা। কিন্তু ঋতব্রত নিরুপায়। এ ঘরটি মেরামতের কথা নেই। বলে, "এটা তো মেরামত করা হবে না। তবে আমি দেখছি, আপনার ঘরটায় একটা পার্টিশন দেওয়াল দিয়ে দেব আমি। আপনার পরিবারে কজন লোক?"

"আমি আর আমার ওই মেয়ে কমলা।" তাবপর একটু ইতস্তত করে ফেব বলেন, "দেখলেই তো বাবা, সব নিজের চোখে। অমন হাটের মধ্যে কি থাকা যায় সোমত্ত মেয়ে নিয়ে? সারারাত দু চোখেব পাতা এক করতে পারি না। না আমি, না মেয়ে। একা মানুষ, হাটে বাজারে যাই, ডোল আনতে যাই—মনটা পড়ে থাকে বাড়ির দিকে। সরলা মরে বেঁচেছে—কমলাও যদি—"

কী ভেবে চুপ করে যান আবার। ওর দিকে ফিরে বলেন, "সরলা আমার বড় মেয়ে। পার্টিশনেব পরেই মারা যায়।"

"ও!" ঋতব্রত চুপ করে যায়।

"আর ওরই বা দোষ কী? ভগবান শুধু রূপই দিয়েছেন, কিন্তু...যাক্, তুমি বাবা যা হয় একটা ঝাঁপ টাঁপ টাঙিয়ে একটু আড়াল করে দিও আমার দিকটা।"

দেবে। ঋতব্রত তা নিশ্চয়ই দেবে। কথা বলতে বলতে ওরা ফিরে আসে এল/২৯ ব্যারাকে। মেয়েটি, কমলা নাকি যার নাম, তখন বাইরে একটা বাঁশের উপর মেলে দিচ্ছিল ভিজে কাপড়খানা। হঠাৎ চোখোচোখি হয়ে গেল ঋতব্রতের সঙ্গে। তৎক্ষণাৎ সে দৃষ্টি নত করল। সত্যিই সুন্দরী মেয়েটি। বছর-সতোরো বয়স হবে। ঠিকই বলেছে ওর মা। যে রূপ হতে পারত ওর পক্ষে পরম কাম্য নিজের বাড়িতে—এখানে এই পরিবেশে সেই রূপ-যৌবনই হয়তো হয়ে পড়েছে তার চরমতম শত্রু! এই হলাহল প্রভব পঙ্ক-সমুদ্রের মাঝ থেকে কী করে উঠে এল এমন সদ্যস্নাতা কমলা সুধাভাণ্ড হাতে? মনের পটে ভেসে উঠল ঋতব্রতের গ্রীক-ভাস্কর্যের সদ্যস্নাতা ভেনাসের ছবি—আর তারই পাশাপাশি ফুটে উঠল আর একখানা চিত্র।—ছিঃ! অন্তরবাসী পশুটার গলা টিপে ধরেছে ঋতব্রত।

অন্য কোনও সুদৃশ্যের কথা মনে করবার চেষ্টা করল সে—বোটানিক্যাল গার্ডেনেব ফুলেব সম্ভার—গঙ্গায় সূর্যাস্ত! অন্যদিকে মন দিতে হবে তাকে, অন্য কোনও দৃশ্য—কোনও ছবির কথা। মনের নেগেটিভটার উপর বার বার নিতে লাগলো অন্যান্য ছবির স্ন্যাপশট—যাতে প্রথম আলেখ্যটাব আব পাঠোদ্ধার করা না যায় কোনওদিন!

কথা হচ্ছিল তফাদাবের বাড়ির বারান্দায় বসে। সান্ধ্য আসরে ওরা দুজনে বসে গল্প করছে। ঋতব্রত বললে, 'এবার আপনার বাড়িটায় হাত দেওয়া যাক। আপনার ঘরের চালটাতো ঝাঁজরা হয়ে গেছে। এটা এতদিন সারায়নি কেন সেনগুপ্ত?"

"আমিই বারণ করেছিলাম।"

"আপনিই? কারণ?"

"এমনিতেই মশাই কত কথা শুনতে হয আমাদেব। আমি আপনার ঠিকাদারকে ডেকে বলে দিয়েছি— সব ব্যারাক সারিয়ে, সব স্টাফ কোয়াটার মেরামত করে তবে আমারটায় হাত দেবে। কোন

শালা না বলতে পারে কিছু।"—বলে হা হা করে হাসলেন খানিক। তারপর বললেন, "তা যেন হল, কিন্তু মিস্টার আউট-অব-প্লাম্বের পিছনে আপনি লেগেছেন কেন বলুন তো? দিন না মশাই ওর লেডিস রুমটা করে—"

"না, উনিতো লেডিস ওয়েটিং রুমটা চান না। উনি বলেন ওঁর বাড়িতে চাকরদের একটা ঘর করে দিতে।"

"আঃ! আবার আপনি উল্টোপাল্টা কথা বলেন। সেদিন বললাম না আপনাকে? চাকরের ঘর নয়—ওটাই লেডিস ওয়েটিং রুম। বউকে আনেননি—মাঝে মাঝে ওঁকে লেডিদের এন্টার্টেন করতে হয় না কি? একখানা ঘরে অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। পাশে আর একটা ছোট কামরা থাকলে কত সুবিধা।"

স্তম্ভিত হয়ে যায় ঋতব্রত। এত কথা জানতো না সে।

"আপনি আর জানবেন কোথা থেকে। এ ক্যাম্পে শ্রীমান নক্র এবং শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র হচ্ছেন যুগল কেষ্ট ঠাকুর। রাসলীলার অনেক খবরই পাই। এক একবার ইচ্ছাও হয় হাতে নাতে ধরে কিছু শিক্ষা দিয়ে দিই। তারপর ভাবি মরুগ্‌গে যাক্। ক্যাম্পের মেয়েরা যদি দু'পয়সা রোজগার করে আমি বাধা দেবার কে? তবে মাঝে মাঝে এমন বিশ্রি খবর আসে! মানে অর্থনৈতিক চাপে তিল তিল করে ভদ্রঘরের মেয়েকে এমন ছিপে খেলিয়ে গাঁথে ওরা, যে ভাবলে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আপনি জানেন, ক্যাম্প থেকে দৈনিক রেল স্টেশনে মেয়ে চালান যায়! তারা ফেরে ভোরের বাসে।"

ঋতব্রত বিহ্বল হয়ে পড়ে। বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না তার।

"আপনি কী করে জানলেন এত কথা? আমি তো কই শুনিনি কিছু?"

"আপনার না শুনলেও চলে। আমার পক্ষে সব খবর রাখতে হয়। কার হাঁড়িতে কত চাল মাপা হয় তা পর্যন্ত খবর রাখতে হয় আমাকে। ও হ্যাঁ, ভাল কথা। আপনার বিরুদ্ধে সাধুচরণ ডাক্তার কিন্তু গুরুতর অভিযোগ এনেছে উপরওয়ালার কাছে।"

"তাই নাকি? আমার বিরুদ্ধে? কেন?"

"আপনি নাকি তার মেল-ওয়ার্ডটা সময়মত সারিয়ে দেননি। ঘর চাপা পড়ে দুজন লোক জখল হয়েছে। ব্যাপারটা কী মশাই?"

ব্যাপারটা যে কি হয়েছিল ঋতব্রতও ঠিক জানে না। সেনগুপ্ত বলেছিল তার কথামত ছ'টা পুরানো শালের খুঁটির বাট্রেস দিয়ে দিয়েছিল বাইরে থেকে। তা সত্ত্বেও ঘরখানা পড়ে গেছে। ওয়ার্ক-সরকারও তাই বলেছে। মেজারমেন্ট বইতে উল্লেখ আছে ছটা বলার কথা। অথচ ডাক্তারবাবু এবং তাঁর লোকজনেরা বলে শালের খুঁটি আদৌ দেওয়া হয়নি। চাপাপড়া ঘরটার তলা থেকে অবশ্য অনেক শালের খুঁটিই বেরিয়েছে। তবে সেগুলো আগে থেকেই ছিল কিনা বলা শক্ত। সেনগুপ্তের সঙ্গে এই নিয়ে সাধুচরণের বেশ মতান্তর হয়ে গেছে।

ওকে চুপ করে যেতে দেখে তফাদার নিজেই কথার মোড় ফেরালেন।

"হ্যাঁ, আপনাকে আর একটা অনুরোধ করব।"

"বলুন?"

"ওই মেয়েটাকে—কী নাম যেন? হ্যাঁ, কুসুম—ওকে আমিই দিয়েছিলাম আপনাকে। আপনি ওটাকে আজই জবাব দিন। আজ-কালের মধ্যেই আপনাকে আর একটা নতুন লোক দিচ্ছি আমি।"

"কেন বলুন তো? মেয়েটি তো কোন দোষ করেনি।

"করেছে মশাই করেছে! সে খবর আপনি রাখেন না। গত বুধবার ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়নি আপনার কলতলায়?"

"হ্যাঁ, আপনি কী করে জানলেন সে কথা?"

"ওই তো বললাম, ক্যাম্পের সব খবর আমাকে রাখতে হয়।"

"তা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা কি অপরাধ?"

"অপরাধ সেটা নয়। অজ্ঞান হয়ে যাবার পর আপনারা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যান, সেখানেই প্রকাশ পেয়েছে সে অসুস্থা।"

"অসুস্থা? কিন্তু কাজকর্ম তো করছে ঠিকই।"

"আপনি মশাই বড় বাজে বকান। খবর পেয়েছি মেয়েটির স্বভাব চরিত্র ভালো নয়।"

একথা সেদিন রামশরণও বলেছিল বটে। সেদিনও ওর কথাটা বিশ্বাস হয়নি, আজও হল না। ও তখন আগ্রহ দেখালো কুসুমের কাহিনী বিস্তারিত জানবার জন্যে।

কুসুম এখানে প্রথম আসে একটি বছর তিনেকের শিশু নিয়ে। অল্পদিন পরেই ওর ঘরে যাতায়াত করতে দেখা গেল একটি লোককে। কঙ্কালসার প্রৌঢ় একটি লোক। কুসুম ক্যাম্পে ভর্তি হবার সময় বলেছিল, তার বাপ-মা, ভাই বোন অথবা শ্বশুরকুলের কেউ জীবিত নেই। তিন বৎসরের শিশুপুত্রটি নিয়ে একেবারে একা এসে সে আশ্রয় নেয় এই আশ্রয়শিবিরে। পরে এই বিধবাটিকে পি. এল. তালিকাভুক্ত করা হয়। তাই হঠাৎ ওই প্রৌঢ় লোকটির যাতায়াতে সন্দেহ হল তফাদারের। ডেকে পরিচয় নিলেন। লোকটি নাকি কুসুমের মামাতো বড় ভাই। নাম তারাপদ। কুসুম থাকতো এইচ. কিউ. ব্যারাকে। মাঝে মাঝে ওর দাদা তারাপদ আসে, খোঁজ খবর নেয়। দু'একবার জামা কাপড়ও এনে দিয়ে যায়। শেষে একদিন এইচ. কিউ. ব্যারাকের কয়েকজন বাসিন্দা এসে নালিশ করল কুসুমের সঙ্গে তারাপদের সম্পর্কটা সন্দেহজনক। অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতিতে নাকি দেখা গেছে ওদের দুজনকে দু'একবার। কথাটা তফাদার কানে তোলেননি ; কারণ এ জাতীয় অভিযোগ কানে তুলতে গেলে ক্যাম্পের পরিচালন করা অসম্ভব। মাসের ত্রিশদিনই উপস্থিত হয় এই রকমের অভিযোগ। দিন যায়। আবার নালিশ আসে তাঁর কাছে। তারাপদ নাকি যক্ষারোগাক্রান্ত। তার ক্যাম্পে আসা বন্ধ করতে হবে। এবার অভিযোগটা উপেক্ষা করা সম্ভব হল না—কারণ সেটা এসেছিল এবার লিখিতভাবে। ডাক্তার সাধুচরণ এবার অভিযোগকারী। কুসুমের বাচ্ছাটার হয়েছিল টাইফয়েড। তাকে চিকিৎসা করতে গিয়ে কুসুমের শুভাশুভের প্রতি আকৃষ্ট হন সাধুচরণ। তারাপদর উপস্থিতিটা তাঁর বরদাস্ত হয়নি। তাকে পরীক্ষা করে ঐ পত্র পাঠান তিনি ক্যাম্পের মঙ্গলাকাঙক্ষায়। তারাপদকে ডেকে পাঠানো হল। এসে দাঁড়ালো আবার কঙ্কালসার লোকটি। চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু হয়ে আছে। চোখ দুটো গভীর গর্তের থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চায়।

বাধা দিয়ে ঋতব্রত বললে, "আচ্ছা, লোকটার কি ডান গালে বড় একটা আঁচিল আছে?"

"হ্যাঁ, আপনি কি করে জানলেন?"

এই লোকটাকেই তাহলে ঋতব্রত দেখেছে। লোকটা প্রায়ই আসে। ওব বাড়ির সামনে গাছতলায় বসে থাকে উবু হয়ে। কখনও কথা বলতে দেখেছে বাড়ির পিছনে কুসুমের সঙ্গে। এত কথা ঋতব্রতের হয়তো মনেই থাকতো না—শুধু লোকটার কঙ্কালসার চেহারাটাই স্মবণ করিয়ে দিল সব কথা। কী করে যে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে শীর্ণ পা দুটো এটাই যেন বিস্ময়। অবশ্য ওজনই বা কত হবে তার!

"নিন চা খান—এটি আমার মেয়ে উমা। কলকাতায় স্কুলে পড়ে। গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেছে বাপের কাছে।"

হাত দুটি তুলে নমস্কার করে উমা। কতই বা বয়স! লীলার বয়সী হয়ে বোধহয়। লীলা ঋতব্রতের ভাইঝি। ওর মেজদা দেবব্রতের বড় মেয়ে। উমা নীরবে দু'কাপ চা নামিয়ে রেখে চলে যায়। ঋতব্রত তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। তার মনে পড়েছে লীলার কথা। মেজদা চিঠি লিখেছেন, লীলাকে পছন্দ করে গেছেন শ্রীরামপুরের সেই ভদ্রলোক। ওঁরা জ্যৈষ্ঠ মাসে ছেলের বিয়ে দেবেন না। পাত্র পিতাব জ্যেষ্ঠপুত্র। আষাঢ় মাসে বর্ষা নেমে যায় তাই ত্রিশে বৈশাখ ওঁরা দিন দিয়েছেন। ঋতব্রতকে দিনদশেকের ছুটি নিয়ে অবিলম্বে যেতে লিখেছেন মেজদা। আর তাছাড়া হাজাব দুই টাকার যোগাড

কবতে হবে মেজদাকে। ঋতব্রত কি কিছু ধার দিতে পারে না?

"কই চা খান। বিস্কুট নিলেন না যে?'

"হ্যাঁ নিই।"

আবার গল্প শুরু করেন তফাদার।

"বুঝলেন মশাইত। তারাপদকে তো ঢালা হুকুম দিয়ে দিলাম আমার ক্যাম্পে এলাকার যেন না আসে কখনও। বেটা আমার পা জড়িয়ে ধরল। কুসুমের ছেলে তাহ'লে নাকি বাঁচবে না। কুসুমের ছেলের তখন তৃতীয় সপ্তাহ চলছে। বুঝলাম সবই; পিসতুতো বোনেব ছেলের জন্যে তো প্রাণ কাঁদছে তার! ধমক দিয়ে বের করে দিলাম বেটাকে। তারপর থেকে আর সে কখনও আসেনি। আমি ভেবেছিলাম এরপর বুঝি কুসুমের মতিগতি বদলেছে। তাই আপনার ওখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন শুনছি,—স্বভাব না যায় ম'লে।"

"কুসুমেব ছেলেটির কি হল?"

"কে? ওর সেই বাচ্চাটা? সেটা ডাক্তারবাবুর ডেথ রেটের অঙ্কটাকে একঘর এগিয়ে নিয়ে গেল মাত্র। আর বলিহারি ডাক্তার, মশাই, ঐ সাধুচরণ! বাচ্চাটা মারা যাবার এক সপ্তাহের মধ্যেই খবর পেলাম জাল পড়েছে এইচ. কিউ. ব্যারাকে। ক্যাম্প-অবতংসেব বিচিত্র বীতংসে আটকা পড়ে ছট্‌ফট্ করছে মেয়েটা। তার কিছুদিন পরেই আপনি এলেন। আমি ওকে এনে ঢুকিয়ে দিলাম আপনার ওখানে। এইটাই হচ্ছে আপনার উপর ডাক্তার সাধুচরণের চটবার তৃতীয় কারণ।"

"প্রথম ও দ্বিতীয় কারণ দুটি কি জানতে পারিনে?"

"এক নম্বর লেডিস ওয়েটিং রুম, আর দু'নম্বর তাকে 'নক্র' বলা।"

বলে হো হো করে হাসলেন ভদ্রলোক প্রাণ খুলে। ঋতব্রত সত্যই অবাক হল। খবর রাখেন বটে তফাদার! কোথায় নিভৃত কক্ষে সে ডাক্তারকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছে তা পর্যন্ত খবর রাখেন উনি। অথচ এটা জানেন না যে, রাত্রের অন্ধকারে আজও আসে এখানে তারাপদ।

'আচ্ছা, কুসুমের পূর্ব-ইতিহাস জানেন না কিছু? ওর স্বামী মারা যায় কি করে?"

"আজ উঠুন। রাত নটা বেজে গেছে। মেয়েটাকে তাহলে কালই বিদায় করছেন তো?"

"ওকে কেন তাড়াবো তা তো বললেন না?"

"বললাম যে, ও অসুস্থা।"

"কিন্তু আমার ওখানে তো তেমন কোনও ভারী কাজ করতে হয় না।"

"ভারি মুশ্‌কিল তো মশাই আপনার মত ব্যাচিলরকে নিয়ে। ওকে তাড়াবেন না তো কি সব দায়-ঝক্কি নিয়ে নিজের কাঁধে নেবেন? শেষকালে লোকে যে আপনাকেই কলঙ্ক দেবে।"

ঋতব্রতের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে হো হো করে হাসলেন তফাদার।

"কি, এখনও বোঝেননি কিছু? বিধবা কুসুম অন্তঃসত্ত্বা! যান, বাড়ি যান।"

এক্সকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার ডাট এসেছেন কাজ পরিদর্শনে। বিলাতী ইউনিভার্সিটির তিলক আছে দত্তসাহেবের ললাটে। বিংশ-শতাব্দীতে জন্মালেও ঊনবিংশ শতকের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ছাপ রয়েছে তাঁর দেহে মনে। কথা বলতে গিয়ে বারবার' মেরিকার কথা উঠে পড়ে। ম্যাসাচুসেট্‌স্-এর দিনগুলো তিনি ভুলতে পারেননি আজও। সমুদ্রপারের দেশটাকে 'হোম' বলে উল্লেখ করেন যখন তখন। হেসে ফেললে কিন্তু আর রক্ষা নেই! চলনে, বলনে, টুপিতে, টাইয়ে তিনি পুরোদস্তুর সাহেব। বাংলা উচ্চারণে একটু বাধ বাধ ভাব—ইংরাজি ইয়াঙ্কিদের মত! পাইপটাকে কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলেব মতো তাঁব অঙ্গের একটি অংশ মনে করা অস্বাভাবিক নয়। কথা বলাব সময় লোকে মুখ থেকে পাইপটা হাতে নেয়—উনি কথা শুরু করার আগে হাতের পাইপটা মুখে তোলেন।

এসে নামলেনই তিনি তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে। কি জানি জংসন স্টেশনে কেলনারের হুইস্কি ফুরিয়ে যাওয়াই এটার কারণ কিনা! দত্তসাহেবের পিছন পিছন দুই ওভারসিয়ার আর ঠিকাদারের মিছিলের পুরোভাগে ঘুরছিল ঋতব্রত। কথাবার্তা হচ্ছিল আদ্যোপান্ত ইংরাজীতেই। তর্জমা করে দিলাম কিছু কিছু—

"এল/২৯ ব্যারাকটা কোনদিকে?"

"এগিয়ে গিয়ে বাঁ-হাতি।"

"আই সী।"

ওরা সদলবলে চলল এল/২৯ ব্যারাকের দিকে। এত এত ঘর থাকতে এটাই বা দেখতে চাইলেন কেন দত্তসাহেব? ভাবে ঋতব্রত। ওঁর পক্ষে তো কোনও ঘরের নম্বর জানা বা মনে রাখা সম্ভবপর নয়!

ওদের পিছু পিছু চলেছে একপাল ছেলে-বুড়ো। অকাজের খেয়াল খুশিতে দিন কাটে ওদের। এ এক নূতন দৃশ্য। চল, মজাটা দেখাই যাক, ভাবখানা তাদের। দত্তসাহেব এল/২৯ ব্যারাকে এসে পৌঁছলেন সদলবলে।

বড়খোকা উবু হয়ে বসে দাঁতন করছিল বাবান্দায়। কারা, রাস্তার টিউবওয়েলে কমলা বসে এঁটো বাসনগুলো ছাই দিয়ে মেজে তুলছিল। ওদের আসতে দেখে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে গায়ের কাপড় একটু টেনেটুনে নিল। ঘরের ভিতর সেই আবক্ষ দাড়িওয়ালা লোকটি কি একটা বই পড়ছিল জোরে জোরে। দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে খালি গায়ে পাগলটা একমনে যেন শুনছে তা। বেড়ালের একটা বাচ্চাকে ধরে টানাটানি করছে দু'টি উলঙ্গ শিশু।

ওদের ঢুকতে দেখে সবাই যে যার হাতের কাজ বন্ধ রেখে এগিয়ে এল। এল না কমলা। আর এল না পাগলটা ; একটা শিশুকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকল সে একটু দূরে।

"এ ঘরে ক'টা শালবল্লি বদলানো হয়েছে?" প্রশ্ন করেন দত্তসাহেব।

"একচল্লিশটা স্যার।" জবাব দেয় জীবেন কর। এম. বি. খুলে পাতাটা বের করে ধরে সে।

"লেট মি সী। দেখি, কোন্ একচল্লিশটা?"

জীবেন আর ব্রজেন একে একে গুনে যেতে লাগলো। বাধা দিয়ে দত্তসাহেব বললেন, "কিন্তু সবগুলোতেই তো আলকাতরা মাখানো। কোনটা নতুন, কোনটা পুরানো বুঝবো কি করে? পুরনো বল্লায় আলকাতরা দিয়েছ কেন?"

জীবেন তাকায় সেনগুপ্তের দিকে। সেনগুপ্ত ফিরলো ঋতব্রতের দিকে।

"আর য়ু অল ডাম্? বোবা নাকি সব? পুরানো বল্লায় আলকাতরা দেওয়া হয়েছে কার হুকুমে জানতে পারি কি?"

ঋতব্রত এগিয়ে আসে, "আমিই বলেছিলাম স্যর!"

'অ্যান্ড হোয়াই? কেন?"

"ঠিকাদারের মাল বেশি এসে গিয়েছিল। তাই কিছু বল্লাতে লাগিয়েছে। তার মাপ তোলা হয নি।"

"হ্যাঙ্ ইওব মেজাবমেন্ট ফর কোলাটারিং! আলকাতরার মাপ চুবি করে কেউ লাভ কবতে বসে না। একচল্লিশটাই নতুন খুঁটি দেওয়া হয়েছে তা আমি বুঝবো কি কবে? সব কটার রঙই তো নিগারেব মত কালো করে তুলেছ!"

সমস্ত দায়িত্বটা ঋতব্রতের। ওর অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে সেনগুপ্ত আর সিংজী মিলে এই কাণ্ডটা করেছে। মনে পড়ল লিখিত অর্ডার দেবার সময় ওদের দুজনের ইঙ্গিতপূর্ণ হাসির কথা।

দত্তসাহেব ঋতব্রতের দিকে ফিরে বললেন, "নাউ টেল্ মি বাবা মুস্তাফা, হুইচ ইস্ আলিবাবাস্ কোয়ার্টার্স?"

কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে ঋতব্রতের। মরিয়া হয়ে মিথ্যা কথা বললে সে। চাকরি-জীবনে তাব প্রথম অনৃতভাষণ!

"পুরানো শালের খুঁটিগুলোতে আলকাতরা লাগাবার আগে আমি গুনতি করে নিয়েছিলাম।"

"তবে বইতে সই করা হয়নি কেন?" ওর নাকের ডগায় মেলে ধরেন মেজারমেন্ট বইটা।

"তখনও মাপ ওঠেনি এম. বি-তে। আমার নোটবইতে টুকে রেখেছি।" মিথ্যাভাষণের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে কিন্তু এস. ডি. ও সাহেব! খাতাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মিস্টার ডাট। কুড়িয়ে নিলেন জীবেন কর। লজ্জায়, অপমানে ঋতব্রতের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করছিল। দেখলে ঘরসুদ্ধ লোক ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। মুখভঙ্গি করে তখন দাঁতন করছে বড়খোকা। একগোছা ঝকঝকে বাসন হাতে নিয়ে দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কমলা। চোখাচোখি হতেই সরে গেল আড়ালে। শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ উস্‌খুস্‌ করছে ও কোণয়। পাগলটা উঠে দাঁড়িয়েছে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে। তার বাঁধন আল্‌গা করে ন্যাংটো ছেলেটা এসে দাঁড়িয়েছে দত্তসাহেবের পায়ের কাছে।

"আমরার একটা দরখাস্ত আছে স্যর।"

দত্তসাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন। ভিড় ঠেলে বড়খোকা সামনে এগিয়ে এল।

"আমরার হকল ঘরই পার্টিশন করতে হইব।"

"টেল' এম নো পার্টিশন্‌স্‌ উড্‌ বি কন্স্‌ট্রাক্‌টেড্‌।"

সেনগুপ্ত তর্জনা করে বললে, "পার্টিশন করা হবে না কোথাও!"

"এইডা তবে কী?" কমলাদের ঘরের অসমাপ্ত পার্টিশনটার দিকে দাঁতনটা উঁচু করে দেখাল বড়খোকা।

"ইয়েস্‌! হোয়াটস্‌ ইট্‌? আই থিংক্‌ ইট্‌স্‌ নট্‌ এগেন ইন্‌ য়োর ডাইরেকশন্‌স্‌ বোস?"

"হ্যাঁ, এটাও আমিই করতে বলেছি। বিশেষ কারণ ছিল।"

"স্পিক্‌ইন ইংলিশ, বোস। আই ডোন্ট লাইক দীজ হিদেন্‌স্‌ শ্যুড্‌ ফলো আস্‌।"

"আই হ্যাড্‌ স্পেশাল রিজন্‌স্‌ স্যর।"

"স্পেশাল রিজন্‌স্‌ মাই ফুট!"

তারপর জীবনের দিকে ফিরে বললেন, "এটাকে ভেঙে দাও।"

অপমানে, লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে ঋতব্রতের মুখ। পাশ ফিরতেই নজরে পড়ল দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ম্লান হয়ে যাওয়া মা ও মেয়ে। আবার চোখাচোখি হল ঋতব্রতের সঙ্গে। খুক্‌ খুক্‌ করে কেশে উঠল ওপাশ থেকে বড়খোকা। হ্যাক্‌ থুঃ! বাইরে থুথু ফেলে এল সে।

"না, ওটা ভাঙবে না জীবেন!" হঠাৎ বেরিয়ে গেল ঋতব্রতের মুখ দিয়ে।

"বাই জোভ! হোয়াট ড্যু য়ু মীন্‌!" ঘুরে দাঁড়ালেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার ডাট্‌, কড়া মেজাজের অফিসার বলে সারা ডিপার্টমেন্টে যাঁর সুখ্যাতি আছে। ঋতব্রত তখন মরিয়া! মুহূর্তের মধ্যে চরম অবস্থাটাও ভেবে নিয়েছে সে। পদত্যাগপত্র? হ্যাঁ, তাতেও সে পেছপাও হবে না। তারপর দেখল জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে আছেন মিস্টার ডাট।

" আই মীন আই শ্যাল বেয়ার দি কস্‌ট্‌ ফ্রম্‌ মাই ওন পার্স। আই হ্যাভ অল্‌রেডি গিভ্‌ন্‌ হার ওয়ার্ডস।"

"হার?" চকিতে মিস্টার ডাটের নজরে পড়ে কমলা একদৃষ্টে চেয়ে আছে অপমানে লাল হয়ে যাওয়া ঋতব্রতের মুখের দিকে।

"আই সী! এ লেডি ইন্‌ কোশ্চেন? ওয়েল দেন এ্যাজ ইউ প্লীজ।"

খুশি হয়ে ওঠেন মিস্টার ডাট্‌। নিজের যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে সম্ভবত। হঠাৎ পাশে দাঁড়ানো ন্যাংটো ছেলেটাকে প্রশ্ন করেন, "তোমার নাম কী আছে?"

হয়তো সাহেব দেখতে অভ্যস্ত নয়, নয়তো অনভ্যস্ত এ জাতীয় খাস্তা বাংলায়। ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে শুধু। দত্তসাহেব হিপ পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে গুঁজে দিলেন ন্যাংটো

ছেলেটাব হাতে—"মিষ্টি খাবে তুমি।"

হঠাৎ লাফ দিয়ে পড়ে ওপাশ থেকে পাগলটা। ছেলেটাব হাত থেকে আধুলিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয়, ঠিক যে ভঙ্গিতে মিস্টাব ডাট ছুঁড়ে ফেলে ছিলেন মাপেব খাতাখানা। তাবপব নগ্ন শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে তাকে বললে, "Time on Da´na os et do´na fe-ren´tes, My boy"*

সমস্ত ঘবটা তখনও নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ। অশিক্ষিত পাগলটা যে হ্যাট-ম্যাট-ফ্যাট কবে ইংবাজি বলবাব ব্যর্থ চেষ্টা কববে এটা যেন অবিশ্বাস্য। সকলেব উপব দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে পাগল তাব শিশুকেই আবাব বললে, "আই অ্যাম স্পিকিং ল্যাটিন, মাই চাইল্ড। আই ডোন্ট লাইক দ্যাট্ কন্ভাবশেসন্স অফ্ দি হিদেন্স্ বি ফলোড বাই দীজ ইংলিশস্পিকিং জেন্টল্মেন ট্যু।

এবাব কান লাল হবার পালা মিস্টাব ডাটেব। অপমানে, লজ্জায় তিনি বেগুনী হয়ে গেলেন।

ঋতব্রত পবে জেনেছিল পাগল মৈমনসিং জিলা স্কুলেব বিটাযার্ড হেডমাস্টাব। ডবল এম এ।

কুসুমেব জীবনেব মাঝেব অংশটা, অর্থাৎ যৌবনাংশ সংগ্রহ কবেছিলাম ম্যাডাম বোসেব কাছে। গিয়েছিলাম ঋতব্রতেব বাসায় ওটা যোগাড়েব চেষ্টায়। সে বাড়ি ছিল না। মিসেস বোস বসালেন আমাকে। চা খাওযালেন। আমাব উপন্যাস কতদূব অগ্রসব হল সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ কবলেন। বাববাব বললেন, "আমাব কথাটা লিখেছেন তো? কই, কী লিখেছেন দেখি? আমাব কিন্তু অনেক কোয়ালিফিকেশন্স আছে। সব কথা লিখছেন তো?"

আশ্বাস দিলাম তাঁকে। যথাযোগ্য সম্মান দেব প্রত্যেকটি চবিত্রকেই। অর্থাৎ আমাব বচনাশৈলীতে যতখানি সম্ভব। একটু পবেই বললাম, "আজ উঠি। এসেছিলাম যে উদ্দেশ্যে তা তো আজ হল না দেখছি।"

উদ্দেশ্যটাব বিষয়ে উনি আগ্রহ প্রকাশ কবলেন। শুনে বললেন, "ওমা, তাই নাকি? কুসুমেব কথা সেই পর্যন্ত লিখে ফেলে বেখেছেন? আচ্ছা দাঁড়ান, দেখি আপনাকে সাহায্য কবতে পাবি কি না।"

উঠে গিয়ে আঁচল থেকে চাবি নিয়ে আলমাবিটা খুললেন। তাবপব একটা কাঠেব ছোট বাক্স খুলে বেব কবলেন একতাড়া চিঠি। বেছে বেছে একখানি নিয়ে বসলেন আমাব সামনে।

"শুনুন। মানে, সবটা শুনে কাজ নেই আপনাব। না হলে এটাই দিয়ে দিতে পাবতাম আপনাকে।"

তাবপব নিজেব মনেই পড়তে লাগলেন। কোথা থেকে শুরু কববেন বোধহয তাই স্থিব কবতে পাবছিলেন না। জানি তো ঋতব্রতকে। এত এলোমেলো কথাই লিখতে পাবে। হযতো মিসেস বোসেব লজ্জা পাবাব মতো কোনও কথা আছে ওটায। হঠাৎ একটা দুষ্টুবুদ্ধি চাপল মাথায। অতর্কিতে ছোঁ মেবে তুলে নিলাম চিঠিখানা। হক্চকিয়ে উঠলেন মিসেস বোস। খানিকটা হাত কাড়াকাড়িব পব চিঠিটা নিবাপদ আশ্রয় লাভ কবল আমাব বুকপকেটে।

"এ আপনাব ভাবি অন্যায় কিন্তু। ছি ছি, দিয়ে দিন বলছি ও চিঠি। না, ওখানা কিছুতেই দেখতে পাবেন না আপনি। উনি ভীষণ বাগ কববেন কিন্তু।"

"উনি যদি ভীষণ বাগই কবেন তবে সামলাবেন আপনি। চিঠিখানা যাব লেখা তাব আবাব মালিকানা কিসেব? যাব বাক্স থেকে খুঁজে পাওযা যায সত্ত্বটা তাবই। আব আপাতত যখন আমাব বুকপকেটে আছে তখন মালিক আমিই।"

এখন মনে হয ঋতব্রতেব আগেব চিঠিখানাব ঠিক পবেই এটা লেখা। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকেও ওব একখানা চিঠি এসেছে দেখা যাচ্ছে--

"সুচবিতাসু –

তোমাব একুশে বৈশাখেব চিঠি এই মাত্র পেলাম। তোমাব পত্রপ্রাপ্তি এবং আমাব কলম বাব কবে

---

* গ্রীকবা যদি উপহাবও নিয়ে আসে তবু তাদেব বিশ্বাস কবা চলে না খোকা।

লিখতে বসার মধ্যে আমার ঘড়ির বড় কাঁটাটা একটা সমকোণ রচনা করবারও সময় পেল না। বোঝ, কত ভালো ছেলে হয়েছি! কুসুমের গল্পটা কি হবে জানতে চেয়েছ তুমি। অর্থাৎ ছোট গল্প, বড় গল্প অথবা উপন্যাস। এবার ভারি মুশ্‌কিলে ফেলেছ কিন্তু। সেটা আমি কি জানি? আমার কাছে তো এ তিনের বার—একটা জীবনী। তোমার কলমের ডগায় সেটা কী রূপ পরিগ্রহ করবে তা আমি কী করে বলব? কুসুমের কথা বলছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে জানাতে চাই, ইতিমধ্যে তোমাদের কাগজের জন্যে একটা কবিতা লিখেছিলাম। নিশ্চয়ই যত্ন করে তুলে রেখেছি কোথাও। তবে কোন্ বাক্সের কোন্ খাপে অথবা কোন্ বইয়ের কোন্ ভাঁজে, তা এখনও উদ্ধার করতে পারিনি। তুমি কুসুমের কথা জানতে চেয়েছ, কিন্তু এখন আর তার গল্প লিখিতে ইচ্ছা করছে না। এখন লিখতে ইচ্ছা করছে অন্য একটি মেয়ের কথা। তার নাম কমলা। মেয়েটি সত্যই যেন কমলা! এই পঙ্কিল পরিবেশে কি করে ফুটল অমন কমল, তাই ভাবি। অবশ্য পঙ্কেই তো কমল জন্মায়! মেয়েটিকে দূর থেকে আমি কয়েকবার দেখেছি মাত্র। কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়নি। প্রথম তাকে দেখি একটি অসতর্ক মুহূর্তে। সব কথা তোমাকে আজ লিখতে পারলাম না। ভগবান যদি দিন দেন তখন জানাব। তবে প্রথম দর্শনের পর থেকেই ওর নামে একটা কবিতা লিখবো লিখবো ভাবছি। ঈস্, অত চটে যাচ্ছ কেন? আরে না না, মিথ্যা গল্প বানাচ্ছিলাম। কমলা বলে কোনও মেয়েই নেই ক্যাম্পে।

হ্যাঁ, কুসুমের কথা। কোথায় শেষ করেছিলাম যেন? সেই 'বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা' অবস্থায়। আরে, হ্যাঁ বাপু! তেরো বছরের মেয়ের প্রতি ও বর্ণনা খাটে না, সেটা আমিও বুঝি।

শিশু ভাবে 'যে দিন আমি প্রথম বড় হবো'। শুনে তোমরা হাসো। মানুষ কি এক দিনে বাড়ে? মানুষের বয়স বাড়ে দিনে দণ্ডে, পলে অনুপলে। তা কিন্তু সব ক্ষেত্রেই ঘটে না। অন্তত কুসুমের বয়স একমুহূর্তেই বেড়েছিল পাঁচ বছর—প্রায় রিপ্‌ভ্যান উইঙ্কল্-এর মতে। পরদিন থেকে সে একেবারে অন্য মানুষ।

ঘর থেকে বার হয় না। মায়ের হাতে হাতে কাজ করতে যায়। অনভ্যস্ত হাতে কিছুই করা সম্ভব হয় না। গাল খায় মায়ের কাছে। ছোট বোন কামিনীর কাছে শুনতো অভিযোগ—'মেজদি তুমি কী বোকা!' কামিনীর কাছে সংসারের পাঠ নিতে শুরু করল কুসুম। শিখল ড্রেস করে কাপড় পড়তে গেলে আঁচলের জন্যে কতখানি কাপড় হাতে রেখে কোমরে কুঁচি গুজতে হয়। ঝাঁট দেওয়া থেকে বিছানা পাতা, মোচা-এঁচড় কোটা। ক্রমে রান্না করা, বড়ি দেওয়া, আচার বানানো।

ঘরের জানলায় বসে বসে দেখত বাপের পাঠশালায় বসে সুর করে নামতা মুখস্ত করতে ছেলের দল। কখনও কখনও বিশ্বনাথ আসত। পণ্ডিতমশায়ের কাছে নিত কাদম্বরী অথবা বিক্রমোর্বশীর পাঠ। "অপর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা—" শ্লোকটা পড়বার সময় বিশ্বনাথের দৃষ্টি বই থেকে উঠে আটকে যেত পাশে বাতায়নে। কিশোর বয়সের বন্ধুরা কুসুমকে ভুলল সহজেই। ভুলল না বিশ্বনাথ। সে তখন তারুণ্যের মধ্যাহ্ন গগনে। নতমুখী ভৎর্সিতা বালিকার মুখখানা আর কিছুতেই ভুলতে পারল না সে।

কুসুম তার বিচরণ ক্ষেত্র সংকীর্ণ করল বটে, কিন্তু বাহির বিশ্ব তাকে ক্ষমা করল না। ওকে মাঝে নিয়ে যে ঝগড়াটা হয়েছিল সেটাকে বালসুলভ চপলতা বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ ছিল বালকদের পক্ষেই। সমাজপতিরা অত সহজে ক্ষান্ত হলেন না। আবদুলের বাপ এসে পণ্ডিতকে শাসিয়ে গেল। পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোকও এসে পাঁচ-কথা শুনিয়ে গেলেন নিরীহ পণ্ডিতকে। ঘরের মধ্যে চুপ করে সব সহ্য করল কুসুম।

পল্লীগ্রামে তের বছরের মেয়েকেই অরক্ষণীয়া বলে গণ্য করা হয়। কুসুমের জন্য পাত্রের সন্ধান করছিলেন পণ্ডিতমশাই, কিন্তু গেছো-মেয়ে বলে একটা দুর্নাম তার আগেই ওর সহজ পরিণয়ের পথটিকে করে রেখেছিল কণ্টকিত। যে মেয়ে গাছে ওঠে, ফুটবল খেলে, অপরের ক্ষেত থেকে

অনায়াসে কপি চুরি করে নিয়ে যায়—সে পণ্ডিত বংশসম্ভূতা হলেও গ্রহণীয়া নয়! কুসুমের বর জোটে না।

এ ভাবেই কেটে যায় দীর্ঘ দুটি বছর। ব্যর্থ সন্ধান পণ্ডিতমশাই হতাশ হয়ে পড়েছেন। ইদানীং 'মহিমার্ণবেষু' মার্কা চিঠিপত্র আর দিয়ে যায় না ডাকপিয়ন। তিনিও বন্ধ করেছেন চিঠিপত্র লেখা। পণ্ডিতগৃহিণী এসে মাঝে মাঝে তাগাদা দেন, "ওগো অমন হাত-পা গুটিয়ে বসে থেক না। যা হয় কিছু করো।"

পণ্ডিত জবাব দেন না। নস্যদানি থেকে একটিপ নস্য নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে পরিপাটিরূপে নাসাপ্রান্ত মুছে নিয়ে বলেন, "গোবিন্দ! গোবিন্দ!"

পণ্ডিতমশায়ের পরিবারে দুটি বছরে পরিবর্তনটা দৃষ্টিগোচর না হলেও এরই মধ্যে লক্ষ্মীপুর গ্রামে এসে গিয়েছিল যুগান্তর। ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেক্সনে প্রবীণ জমিদার হরিহরের পরাজয় এবং আবদুল গনির বাপের প্রেসিডেন্ট পদপ্রাপ্তিই লক্ষ্মীপুরের সমাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসের সংবাদ অন্য রকম। ঢাকার রায়টের নানান মুখরোচক সংবাদ পল্লবিত আকাবে এসে পৌঁছাত লক্ষ্মীপুর গ্রামে। পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ ধূমায়িত হচ্ছিল অন্তরালে। গোপন বৈঠক বসছিল এ পক্ষে ও পক্ষে। একদিন হরিহব গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে শান্তি-সম্মেলনও হয়ে গেল একটা। হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়ে শপথ নিল গ্রামে তারা কোন অশান্তি আসতে দেবে না। হরিহর গাঙ্গুলীর বাড়ির বড় আঙ্গিনায় জমায়েৎ হলেন গ্রামের গণ্যমান্য অতিথিবর্গ। আবদুলের বাপ হলেন সে সভার সভাপতি। হরিহর গাঙ্গুলী সকলকে মিষ্টিমুখ করবার আয়োজনও করেছিলেন। শান্তি সম্মেলনের আয়োজনে আশ্বস্ত হল সবাই। সভার উদ্বোধনে বিশ্বনাথের ক্লাবের ছেলেরা এল উদ্বোধন সংগীত গাইতে। বিশ্বনাথ তখন ব্যস্ত ছিল ভাঁড়ারে। সমবেতকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্, সুজলাং সুফলাং' গান শুরু হতেই সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন। দেখা দেখি উঠে দাঁড়াল সভাস্থ সবাই চিকের পর্দার ওপাশে কুসুমরা বসেছিল। তারাও উঠে দাঁড়াল। গান তখন চলেছে 'মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং'—সভাপতি মণ্ডপ ছেড়ে ধীরে ধীরে নেমে এলেন। নেমে এলেন অন্যান্য গণ্যমান্য মসুলমান অতিথিরা। ছুটে আসেন হরিহর প্রমুখ উদ্যোক্তরা। "ব্যাপাব কি, চললেন কোথায়?"

"মাপ করবেন গাঙ্গুলীমশাই। খোদা আপনায় দোয়া করবেন। কিন্তু আমরা তো এ গান শুনতে আসিনি। এ গান সম্বন্ধে সব কথাই তো জানেন। অপমান করবার জন্যেই যে আমাদের ডেকেছিলেন তা বুঝতে পারিনি।"

"সে কি? সে কি?"

বন্ধ হয়ে গেল বন্দেমাতরম্ সংগীত।

আপসে স্থির হল, 'সারে যঁহাসে আচ্ছা' গাওয়া চলতে পারে। কিন্তু সে গান কারও জানা নেই। অগত্যা আবার আপসে ঠিক হল 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা' গাওয়া হক। এ গান জানতো ক্লাবের ছেলেরা—কিন্তু কেউ রাজি হল না গাইতে। বিশ্বনাথ এসে বললে, "বন্দেমাতরম্ গাওয়া যেখানে পাপ, আমি বা আমার ক্লাবের ছেলেরা সেখানে থাকবে না।"

তেড়ে এলেন হরিহর গাঙ্গুলী, বাধা দিলেন সভাপতি।

"ওদেব যেতে দিন গাঙ্গুলীবাবু। আমরা কিছু মনে করিনি।"

তিনি খবর রাখেন অনেক গূঢ় ইতিহাসের। জানতেন, এ জাতীয় ছেলেদের মুখের 'বন্দেমাতরম্' সংগীত লাঠি চার্জ করে, গুলি চালিয়েও থামানো যায় না। বিনা সংগীতেই সভার কাজ সারা হল। ক্লাবে ফিবে গিয়ে ছেলেরা সার দিয়ে শেষ করল তাদের অসমাপ্ত সংগীত।

এই ঘটনার সাতদিন পরে প্রেসিডেন্টের বাড়িতে বসল 'মিলাদ শরিফ'। গ্রামের ইতরভদ্র সমস্ত হিন্দুর নিমন্ত্রণ ছিল সেদিন। বিশ্বনাথ ক্লাবে বসেই শুনতে পেল গান হচ্ছে ও পাড়ায় সমবেত কণ্ঠে

'সারে যঁহাসে আচ্ছা হিন্‌দুস্থাঁ হমারা হ্যাঁয়।'

উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দিল সে মহাকবি ইকবাল রচিত মহাসংগীতকে—সে দৃশ্য দেখল না কেউ।

কেউ দেখেনি একথা বলা চলে না। নির্জন কুস্তির আখড়ার অনতিদূরে ছিল একজন লোক। মাসাধিক কাল ধরে বিশ্বনাথের প্রতিটি পদক্ষেপ সে নোট করে যাচ্ছে।

এর পরেই লক্ষ্মীপুর গ্রামে দ্রুতগতিতে ঘটে গেল কয়েকটি ঘটনা। সবিস্ময়ে একদিন সকলে শুনল সদলবলে বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে পুলিশ রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার নাকি ছিল গোপন যোগাযোগ। শান্তি-সম্মেলন আর মিলাদ শরিফ দিয়ে কিন্তু অনিবার্য দুর্দৈবকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। কালবৈশাখীর মতোই এসে গেল দাঙ্গার ঢেউ লক্ষ্মীপুর গ্রামে।

স্মরণাতীত কাল থেকে যারা পাশাপাশি বাস করে এসেছে, কী আশ্চর্য, দেখা গেল তারা দুই জাতি। পরস্পরের শত্রু। যে বিজ্ঞানী এই অদ্ভুততম আবিষ্কারটি করলেন কলম্বস্, নিউটন, আইনস্টাইনের পাশে তাঁর স্থান হবে কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর আবিষ্কারের ফলাফলটা কম চমকপ্রদ নয়। দাঙ্গার দাবানল এসে পৌঁছাল লক্ষ্মীপুরেও। ডাকাতি হয়ে গেল একদিন গ্রামে।

লক্ষ্মীপুরে সবচেয়ে ধনী হরিহর গাঙ্গুলী—তারপর রায়রা। গনিরাও বড়লোক। ডাকাত পড়ল কিন্তু এ তিনবাড়ি বাদ দিয়ে পণ্ডিতের বাড়িতে। পণ্ডিতের পাঠশালা ঘরে আগুন দিয়ে, গৃহ-দেবতাকে বিকলাঙ্গ করেই তারা চলে গেল। টাকাকড়ি নিয়ে গেল না কিছু—কারণ তা তারা নিতে আসেনি। তারা যা নিতে এসেছিল, তা কিন্তু নিয়ে গেল ঠিকই। নির্মল অথবা বিশ্বানাথের কানে খবরটা অবশ্য পৌঁছয়নি ; তারা তখন লৌহ-কপাটের অন্তরালে।

ভাগ্যক্রমে সেই দিনই ধলেশ্বরী দিয়ে নৌকা করে যাচ্ছিলেন ফণী হাজরা—কী একটা তদন্তে। ফণী হাজরা থানার ছোট দারোগা। তাঁর প্রচেষ্টায় তালপুকুরের পাড়ের লখা সা'র পোড়ো ভিটে থেকে উদ্ধার করে আনা হল বন্দিনীকে। মেয়েকে ফিরে পেয়ে মা কপাল চাপড়ালেন, বাপ বসেছিলেন বিকলাঙ্গ গৃহ-দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে মাথায় হাত দিয়ে। ছোট বোন কামিনী রোয়াকের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে দেখছিল বিস্ফারিত চোখে। উঠান ভরে গেছে এক গাঁ লোকে। ধূলা-কাদার মাঝখানেই উঠানের উপর বসে আছেন মা। তাঁর কোলে মাথা গুঁজে নিশ্চল পড়ে আছে দিদি—একরাশ খোলা চুল লুটোচ্ছে কাদায়।

কলঙ্গিনী কুসুমের গল্প এখানেই আপাতত শেষ করছি। চিঠিটা এমনিতেই বেশ বড় হয়ে গেছে। শীঘ্রই একবার কলকাতা যেতে পারি। তোমার চিঠিতে অভিযাত্রিকের সম্পাদনায় অমন ঘোষের সহচর্য পাচ্ছ লিখেছ। তাঁকে তো চিনলাম না। এটি কি তোমার গগনের নবাবিষ্কৃত তারকা? আলাপ করার বাসনা রইল। লীলার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ত্রিশে বৈশাখ। মেজদা লিখেছেন। দিন সাতেকের ছুটি নিচ্ছি তাই। আচ্ছা, তুমি কি মাসীমা অথবা মেশোমশাইকে আমাদের কথাটার কোনও ইঙ্গিত দিয়েছ? নাকি আমিই লিখব? কয়েক দিনের মধ্যেই অবশ্য কলকাতা যাচ্ছি। মুখেই গিয়ে বলা চলতে পারে। তাতে কিন্তু ভারি লজ্জা করবে আমার। তুমি পত্রপাঠ জানিও। যাতে কলকাতা যাবার আগেই খবরটা তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। তাহলে তাঁদের জবাবটাও মৌখিক শুনে আসতে পারি। অবশ্য তুমি যখন আমার সহায় আছ তখন জবাবটা এখনই আন্দাজ করতে পারি।

ভালবাসা ও শুভেচ্ছা রইল—

ইতি—

"আপনার সঙ্গে একজন লোক দেখা করতে চায় স্যার।"

"ডেকে দাও।"

রতনের পিছন পিছন প্রবেশ করে একজন লোক। হাতে একটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ—একটা ভাঙা

ছাতা। পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো—তার ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আছে দুটি আঙুল। ধুতিটা খাটো করে পরা, কোঁচাটা পাট করে ফের কোমরে গোঁজা। হাত জোড় করে এসে দাঁড়ালো।

ঋতব্রত দেখেই চিনতে পারল তাকে—তারাপদ।

একটু মজা করবার জন্যেই পরিচিত সুরে ঋতব্রত বললে, "কী খবর তারাপদ? আবার তুমি ক্যাম্পে যাতায়াত করছ কবে থেকে?"

লোকটা হতভম্ব হয়ে গেল। বোকার মত চেয়ে রইল শুধু। গলার কাছে কণ্ঠার হাড়টা ওঠানামা করতে লাগল কেবল।

"কী হল? কী বলবে বল না? তোমার বোনের কথা তো?"

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে লোকটা কোনক্রমে বললে, "হুজুর কি আমাকে চেনেন?"

ঋতব্রত হাসল, বললে, "তোমাকে কি আজ থেকে চিনি? যাক, বল' তোমার কি আর্জি।"

"হুজুর আমার সম্বন্ধে কী জানেন?"

"সেটা এ ক্ষেত্রে বিচার্য নয়। তুমি যেজন্যে এসেছ তাই বল।"

"আপনি আমার কথা কার কাছে শুনেছেন?"

বিরক্ত হয় ঋতব্রত। এক কথা বারবার ভালো লাগে না তার। বলে, "বাজে কথা বল না। কাজের কথা কি বলতে চাও বল।"

হঠাৎ বদলে যায় কঙ্কালসার লোকটা। হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে বললে, "নমস্কার। আমার কিছুই বলার নেই।"

লোকটা চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। তাকে ফিরে ডাকে ঋতব্রত।

"কি হল তোমার? চলে যাচ্ছ কেন? কি বলবে বলনা।"

তারাপদ ফিরে আসে। একটু ইতস্তত করে বলে, "আজ্ঞে কুসুমের কথাই বলতে এসেছিলাম। ওর শরীরটা খারাপ। শুনলাম তফাদার সাহেব ওকে অবলা-আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন। তাই বলছিলাম—" মাঝপথে চুপ করে যায়।

"তাই কি বলছিলে—বল না?"

হঠাৎ লোকটা জড়িয়ে ধরে ঋতব্রতের দুটি পা, বলে, "আপনি আমাদের বাঁচান স্যার।"

"কী হল? আঃ, পা ছাড়।"

ওকে সোজা করে বসিয়ে সমস্ত খবরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংগ্রহ করে ঋতব্রত। কুসুমকে অবলা-আশ্রমে পাঠাতে তারাপদর ঘোর আপত্তি। অথচ এরকম অসুস্থ মেয়েকে হয়তো কাম্পে রাখতেও রাজি হবেন না তফাদার সাহেব। তাই তারাপদর অনুরোধ, যেন ঋতব্রত আর কিছুদিন কুসুমকে বাড়িতে আশ্রয় দেয়। ইতিমধ্যে তারাপদ কলকাতায় কোনও বস্তিতে বাসা ঠিক করে ওকে নিয়ে যাবে। ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে যায় ঋতব্রতের সর্বাঙ্গ। তবে তো তফাদারের অনুমান মিথ্যা নয়। এ অবস্থায় কুসুমকে নিয়ে গিয়ে কোনও বস্তিতে তোলার কল্পনা করে কি করে এই কঙ্কালসার লোকটা? আর সেই প্রস্তাবে ও সাহায্য প্রত্যাশা করে ঋতব্রতের কাছে।

"কুসুমের অসুখটা কী?" প্রশ্ন করে ঋতব্রত।

ইতস্তত করে তারাপদ। হাপরের মতো বুকটা ওঠাপড়া করে তার।

"তুমি জানো তার অসুখটা কী?"

নীরবে নতনেত্রে লোকটা মাথা নেড়ে জানায়, সে জানে।

"এ অসুখ তাকে কে এনে দিয়েছে তাও জানো অনুমান করি?"

হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেলল লোকটা। ভাঙা কান্নায় অনেক কথা বলে ওঠে একসঙ্গে।

"বিশ্বাস করুন, তার কোনও দোষ নেই। পাপ কুস্মি করতে জানে না।   ওকে যারা চিনতো তারা

কল্পনাও করতে পারে না....আমি হলপ করে বলতে পারি কোন অন্যায়, কোন পাপ করেনি কুস্‌মি। আমি যদি মিথ্যা কথা বলে থাকি আজ, তবে যেন বজ্রাঘাত হয় আমার মাথায়।" হাত দুটো শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে নাটকীয় ভঙ্গিতে।

এক ধমকে থামিয়ে দেয় তাকে ঋতব্রত।

"সমস্ত জেনেশুনে কুসুমকে নিয়ে একসঙ্গে কোনও বাড়িতে ওঠার কল্পনা করছ কি করে তুমি? কলকাতায় কি সমাজ নেই? সেখানে পাড়ার ছেলেরা তোমাকে গুঁড়িয়ে ফেলবে না?"

"কেন? অসহায় দুঃস্থা বোনকে নিয়ে এক বাড়িতে থাকা কি অন্যা'য়? পাপ? কুসুম আমার বোন, নিকট আত্মীয়।"

"নিকট? কত নিকট?"

"আজ্ঞে?" লোকটা হয়তো শুনতে পায়নি ঋতব্রতের প্রশ্ন।

"দেখ, হাড় ক'খানির মায়া রাখ? তা যদি রাখ, তা হলে আর ওপথে যেও না। পিসতুত বোনের প্রতি যেটুকু কর্তব্য তুমি করেছ, তাই যথেষ্ট। এটুকুর জন্যেই তোমাকে চাব্‌কে বের করে দেওয়া উচিত ক্যাম্প থেকে।

মাথা নিচু করে বসেছিল সে উবু হয়ে ওর চেয়ার থেকে অনতিদূরে। একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে নীরবে মাটিতে দাগ কাটতে থাকে।

আশ্চর্য! এই প্রেতযোনিসম্ভূত চরিত্রহীন যক্ষারোগীটাকে কী করে সহ্য করে কুসুমের মতো মেয়ে' ভেবে বিস্ময় লাগে। কুসুমও এমন কিছু সুন্দরী নয়—কিন্তু অপূর্ব স্বাস্থ্যবতী। ছেলেবেলা থেকে তার ব্যায়ামপুষ্ট শরীরটা একটা বলিষ্ঠতা লাভ করেছে। বয়সের অঙ্কে হয়তো তার অতিক্রান্ত যৌবন, কিন্তু শরীরে কোথাও ছাপ পড়েনি এক তিল। পড়লে আজ হয়তো তার এ দুর্দশা হত না। সাধুচরণের লোলুপ দৃষ্টি থেকেও হয়তো সে আত্মরক্ষা করতে পারত। আর ছিল তার চুল। কোমর ছাড়িয়ে নিতম্বের ওপর পড়ত খুলে দিলে। ঘনকৃষ্ণ কেশদাম যেন একটা চালচিত্র রচনা করত। আশ্চর্য! অথচ এই চুলই একদিন কেটে ফেলেছিল সে নিজের হাতে। সেই অনুশোচনাতেই পরবর্তী জীবনে বোধহয় বেশি যত্ন নিয়েছে চুলের। কতবার অসময়ে বাড়ি ফিরে ঋতব্রত দেখেছে ভিতরের বারান্দায় একটা আরশি আর চিরুনি নিয়ে সে বসেছে চুল আঁচড়াতে। ওকে দেখে দ্রুতপদে উঠে গেছে রান্নাঘরে। এই সব অসংলগ্ন মুহূর্তেই কুসুমের ঘনকৃষ্ণ কবরী নজরে পড়েছে ঋতব্রতের। না হলে সামনে সে সর্বদা মাথায় ঘোমটা তুলে থাকতো।

"স্যার?"

"হ্যাঁ, বলো।"

"তা হলে?"

"বললাম তো। তাছাড়া তুমি চাইলেও কুসুম তোমার সঙ্গে যেতে রাজি হবে না।"

"হবে স্যার। সে মত দিয়েছে। ডাকব তাকে?

"না সে মত দেয়নি। দিতে পারে না। দেওয়া অন্যায়। ডাকতে হবে না তাকে।"

ঘরে ক্ষণিক নীরবতা। হঠাৎ নড়ে উঠল ভিতরে ঝাঁপের দরজাটা।

দুজনেই চোখ তুলে দেখল সাদা থানের প্রান্তভাগ দেখা যাচ্ছে দ্বারের পার্শে। সমস্ত আলোচনাটাই তাহলে তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হয়েছে।

"ভেতরে এস কুসুম। বলো সাহেবকে যদি কিছু বলতে চাও।" বললে তারাপদ।

কুসুম তখনও দ্বিধাগ্রস্থ।

ঋতব্রত জোর দিয়ে বললে, "তুমি ভুল করছ তারাপদ। তুমি যে রাস্তা ওকে দেখাচ্ছ তাতে ওর সমূহ সর্বনাশ। অবশ্য সর্বনাশের বাকিও তুমি রাখনি কিছু। তুমি যাও। ওকে অবলা-আশ্রমে পাঠাবার

ব্যবস্থা করে দেব। ভদ্রভাবে, যতদূর সম্ভব এ অবস্থায়, জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করব আমি।"

আবার চুপচাপ।

ধীরে ধীবে ঘরে এসে দাঁড়াল কুসুম। মাথার কাপড়টা কপাল পর্যন্ত টেনে দিয়ে বললে, "আমি ওঁর সঙ্গেই যাব। আপনি শুধু ব্যবস্থা করে দিন।"

নতনেত্রে বললে কথা ক'টা। তারপর আনতনয়নেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঋতব্রত উঠল চেয়ার ছেড়ে। পায়চারি করতে থাকে চেয়ারের পিছনে। খানিকপরে থেমে বললে, "বেশ, তবে তুমি ব্যবস্থা করে এসে নিয়ে যেও।"

তারাপদকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়েই বেরিয়ে গেল সে। পথে নেমেই খেয়াল হল হ্যাটটা নিতে ভুলেছে। প্রখর হয়ে উঠেছে তখন রৌদ্রতাপ। ফিরে এসে টেবিল থেকে তুলে নিল হ্যাটটা। ওকে ফিরতে দেখে তারাপদ উঠে দাঁড়াল, বললে, "বিশ্বাস করুন স্যার, কুসুমেব সর্বনাশ আমি করিনি। তার সঙ্গে কোনও অবৈধ সম্পর্ক নেই আমার। ঈশ্বরেব দিব্যি!"

কোনও জবাব না দিয়ে ঋতব্রত আবার পথে নামল।

প্রস্তাবটা শুনে বিরক্ত হলেন তফাদার। বললেন, "এটা কি রকম হল মিস্টার বোস? অবলা-আশ্রমের সেক্রেটারি রাজি হয়েছে ওকে নিয়ে যেতে। আমিও সব রকম ব্যবস্থা করে ফেলেছি। এখন তো আর রদ হতে পারে না। আর তা ছাড়া ওকে রেখেই বা আপনার লাভ কি?"

"কুসুম যেতে চায় না।"

"না, চাইলেও আপনার বোঝা উচিত যাওয়াটাই ওর পক্ষে মঙ্গল। ক্যাম্পের ভেতব ওকে আর রাখা চলে না। ক্যাম্প হলেও এখানে একটা সমাজ আছে। সেখানে সে ক্ষমা পাবে না। এসব বিষয়ে আলোচনা কত মুখরোচক তা তো বোঝেনই—বিশেষ যারা নিষ্কর্মা বসে ডোল খায়। তারাপদ হতভাগা আর ক্যাম্পে আসে না। সময়েই সরে পড়েছে সে।"

"না, তারাপদ এ জন্যে দায়ী নয়।"

"তারাপদ নয়? আপনি কি করে জানলেন?"

ঋতব্রত চুপ করে যায়।

"আপনি যে মশাই আরও ঘুলিয়ে দিলেন ব্যাপারটা! আপনি কিছু জানেন?"

"না; তবে তারাপদ নয়, এটুকু জেনেছি।"

"আই সী!" ভ্রূকুঞ্চিত করেন তফাদার।

"যাই হোক। ও নোংরা ব্যাপারে আমাদের যাবার দবকার কি? কিন্তু ক্যাম্প-সুপার হিসেবে ওকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়াই আমি কর্তব্য মনে করি। ওকে কেন্দ্র করে এখানে একটা অসন্তোষ অথবা কেলেঙ্কারি হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।"

"সরিয়ে অবশ্য আমিও দিতে চাই। তবে অবলা-আশ্রমটা আপনি বাতিল করে দিন।"

"আপনি সরিয়ে দেবেন? কোথায় পাঠাবেন ওকে?"

"ওর একজন আত্মীয়ের কাছে, কলকাতায়।"

তফাদার তীক্ষ্ণচোখে চেয়ে রইলেন ঋতব্রতের দিকে। ভাবছিলেন তিনি অনামনস্কভাবে—এ ছোকরাকে তো সে রকম মনে হয়নি প্রথমে! প্রসঙ্গটা এখানেই চেপে যাওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে হল তার। আবার তাকালেন তিনি ঋতব্রতের দিকে। নাঃ! প্রাচীন অভিজ্ঞ অফিসার হিসাবে এই নাবালকটিকে স্রোতের মুখে ছেড়ে দেওয়াটা অধর্ম হবে।

"একটা কথা বলব ঋতব্রতবাবু, কিছু মনে করবেন না?"

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল ঋতব্রত।

"আমি আপনার চেয়ে বয়েসে অনেক অনেক বড। আজ বাদে কাল রিটাযার করব আমি। সংসারে অনেক কিছু আমি দেখেছি যা দেখবার সুযোগ আপনার হয়নি। সেই দাবিতেই বলতে চাই কয়েকটা কথা—"

"বলুন। আপনাকে আমি বড় ভাইয়ের মতোই দেখেছি এখানে এসে পর্যন্ত।

"দেখুন, আপনার বিরুদ্ধে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে। আপনি এ বিষয়ে কত দূর অবহিত, আমার জানা নেই। এর সঙ্গে আপনার অফিসিয়াল পোজিশন কতখানি জড়িত, তাও আমার অজানা। সে-কথা আলোচনা করাও আমার পক্ষে অন্যায়। চাকরিজীবিদের একটা 'মটো'র কথা হয়তো আপনি শুনে থাকবেন : "যু শুড নট ওনলি বি অনেস্ট বাট্ শুড অ্যাপিয়ার টু বি দি সেম।" আপনার বিরুদ্ধে কতগুলি দরখাস্ত উপরে গিয়েছে জানেন? জানেন না। আপনার ডিপার্টমেন্টে ক'খানা পড়েছে আমার জানার কথা নয়। যদিও আন্দাজ করি সেখানেও যাচ্ছে ওগুলো। তা না হলে আপনার দত্তসাহেব সোজা এসে এল/২৯ ব্যারাকের নাম করতেন না—"

"আমি অবশ্য এতকথা কিছুই জানতাম না। তবে সন্দেহ হয়েছিল আমারও।"

"আমার কথা এখনও শেষ হয়নি ঋতব্রতবাবু। আমি তো বলেছি, আপনার ডিপার্টমেন্টে কি দরখাস্ত যায় তা আমি জানি না, জানা সম্ভবও নয়, কিন্তু আমাদের হেড অফিসে আপনার নামে যে-ক'খানা দরখাস্ত গেছে, প্রত্যেকটিই দেখেছি আমি।"

"কি কি অভিযোগ এসেছে আমার নামে?"

এতক্ষণে হা হা করে হেসে ওঠেন মিস্টার তফাদার।

"এটা যে আমার ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়াল সিক্রেট!"

অপ্রস্তুত হল ঋতব্রত। কথাটা আগে খেয়াল হয়নি তার।

"তাই বলছিলাম, কুসুমকে আটকে রাখা আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না। এমনিতেই এল/২৯ ব্যারাকে নিজের পয়সায় একখানা পার্টিশন তুলে দেওয়ায় আপনার নামে যথেষ্ট মুখরোচক কাহিনি তৈরি হয়ে গেছে।"

"কিন্তু আপনি তো জানেন না—এল/২৯ ব্যারাকে—"

"আবার ভুল করছেন ঋতব্রতবাবু। আমি সব জানি। কিন্তু ওই ; শুধু সাধু হলেই চলবে না, আপনি যে সাধু এটার প্রচার চাই। এ বড় বিচিত্র জায়গা। তিল অনায়াসে গালগল্পে তালে পরিণত হয় এখানে শুনবেন? সেদিন লেডি সুপারের ফেয়ারওয়েলে আপনি কয়েকটা ফটো তোলেন মনে আছে? সেটাকে বলা হয়েছে,—"

গট গট করে ভেতরে চলে যান তফাদার। একখণ্ড কাগজ নিয়ে এসে পড়ে শোনালেন মাঝখান থেকে—"ক্যামেরা হস্তে যিনি দিবারাত্র ক্যাম্পের ষোড়শী এবং যুবতী মেয়েদের ফটো তুলিয়া বেড়ান তাঁহার পক্ষে এই প্রকার গর্হিত কার্য অস্বাভাবিক নহে। হ্যাঁ, ইনি পরিদর্শক বটে ;—সমস্ত ক্যাম্পটিকেই চুটাইয়া পরিদর্শন করিতেছেন, স্নানরতা যুবতীর ফটো তোলা তো সামান্য কথা—দিবারাত্র যখন তখন যে কোন ঘরে ঢুকিয়া নারীর রূপ সন্দর্শন করাই নাকি ইহার একমাত্র কার্য। কোনও একটি যুবতী ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িতেছে জানিয়াও ইহাকে বিনা সংবাদে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াছে, এমন প্রত্যক্ষদর্শীর সংবাদ আমরা রাখি। বাস্তু হারাইয়াছি বলিয়া কি আমরা শালীনতাবোধও হারাইয়াছি?"

কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে রেখে তফাদার একটা সিগারেট ধরালেন। দুজনেই নীরব। ঋতব্রতই প্রথমে কথা বললে, "না, কুসুমকে পাটানোতে আমার আপত্তির অন্য কোনও কারণ নেই। আচ্ছা তবে খুলেই বলি আপনাকে—"

"থাক না!" বাধা দিলেন তফাদার "আমার তরফের অফিসিয়াল সিক্রেট যেমন আপনাকে জানালাম না—তেমনি আপনারও যদি কোন বাধা থাকে, তবে থাক না। আমি শুধু বলছিলাম কাজটা করার আগে

ভেবে দেখুন দুদিন। তার পরেও যদি ওকে রাখতে চান, সে দেখা যাবে তখন।"

"আচ্ছা বেশ, তবে তাই হোক। আজ উঠি।"

পায়ে পায়ে ঋতব্রত নিজের ব্যারাকের দিকে এগিয়ে চলে। কিউ. সি. আই ব্যারাকের চালটা ছাওয়া হচ্ছে। উপরে উঠে পাঁচ ছয় জন লোক খড়ের আঁটি গুঁজে দিচ্ছে বাতার গায়ে। নিচে থেকে জন দুই লোক ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে পোয়ালগুছি। স্তূপাকার করা আছে খড়ের আঁটি। এন/৩ বিল্ডিংটার চাল নামানো হয়েছে। এটায় রানীগঞ্জ টালি বসবে। একটা লোক নিচে বসে পুরানো টালি থেকে সিমেন্টের চটা ছাড়াচ্ছে। ছুতার মিস্ত্রি রাফ্‌টারের ওপর পার্লিনগুলো আঁটছে স্ক্রু করে। ঋতব্রতের নজরে পড়ল পর্লিনগুলোতে রঙ করা নেই। রাফ্‌টারেও রঙ করা হয়নি। অথচ তার বার বার করে বলা ছিল প্রাইম কোট রঙ না দিয়ে কোনও ট্রাস্-মেম্বার ওঠাতে পারবে না। ওয়ার্ক-সরকার গদাধর ছাতি মাথায় দিয়ে কাজ তদারক করছে। ঋতব্রতের মনে পড়ল এই গদাধরকেই সপ্তাহ খানেক আগে ও বুঝিয়েছিল কেন রঙ না দিয়ে কাঠ চাপাতে বারণ করছে সে। বুঝিয়েছে যে আগে রঙ করা না থাকলে রাফ্‌টারের উপর পার্লিন যেখানটায় বসে সেই সঙ্গমস্থলটি আর পরে কিছুতেই রঙ করা যায় না। দুদিন আগে হলে সে ছুটে গিয়ে পড়তো ঐখানে। কৈফিয়ত তলব করত ওয়ার্ক-সরকারের। বাধ্য করতো ঠিকাদারকে সব কটি পার্লিন খুলিয়ে, রঙ করিয়ে ফের লাগাতে। কিন্তু আজ আর তার কোনও উৎসাহই নেই। দেখেও মুখ ঘুরিয়ে সে চলে গেল। ক্যাম্পের দৈনন্দিন জীবন চলেছে একই ছাঁদে। সিংজীর ট্রাকখানা চলে গেল পাশ দিয়ে। করোগেটেড টিন আসছে কলকাতা থেকে সোজা ট্রাকে। হাত তুলে ইয়াসিন নমস্কার করল তাকে। ইয়াসিন রামশরণের ড্রাইভার। স্টেশন থেকে ইয়াসিনই ওকে ক্যাম্পে নিয়ে এসেছিল প্রথম দিন, রামশরণের জীপ চালিয়ে। রাস্তার পাশে টিউবওয়েলে স্নান করছে কয়েকটি মেয়ে। বালতি, ঘড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন। এক নজর দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিল ঋতব্রত। স্নানরতা যুবতীর কানে পার্শ্ববর্তী একজন কি একটা কথা বলল। কলকণ্ঠে হেসে উঠল সবাই নিজেদের মধ্যে। দ্রুতপদে পার হয়ে গেল সে এই এলাকাটা। পিচের রাস্তার উপর গুল, ঘুঁটে, ধান বিছিয়ে শুকোতে দিয়েছে ওবা। ঠিক রাস্তার মাঝবরাবর ; যাতে দুদিকে গাড়ির চাকা দুটো চলে যেতে পারে। এর পরেই রাস্তার বাঁ হাতি কয়েকটা পাবলিক ল্যাট্রিন। অ্যাসবেস্টস শীটের ছোট ছোট শেড। পাশাপাশি আট দশটা। সামনের একটার চটের পরদা সরিয়ে বেরিয়ে এল একজন মেয়ে। ওকে দেখে অ্যাবাউট-টার্ন করল। এক হাতে মগ অপর হাতে মাটি। ঘোমটা টানার উপায় নেই। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাই এসব ক্ষেত্রে এদের লজ্জা প্রকাশের প্রকৃষ্টতম ভঙ্গী। এ এলাকাটাও ঋতব্রত দ্রুতপদে পার হল।

দুপাশে দুঃস্থ নরনারীর সংসার যাত্রা নির্বাহের সাধারণ দৃশ্য। দেয়ালময় ঘুঁটে। টিনের চালে উঠিয়ে দিয়েছে লাউ-কুমড়ার ডগা। কাঁথা, কাপড়, বড়ি শুকোচ্ছে রোদ্দুরে। তেল মাখিয়ে পিঁড়ি পেতে বারান্দায় শুইয়ে দিয়েছে সদ্যোজাত শিশুকে। দড়ির উপর একটা কাপড় টাঙিয়ে রৌদ্র থেকে মাথাটা বাঁচিয়ে রেখেছে। পিটপিট করে দেখছে নবাগত অতিথিটি আজব দুনিয়াকে। এদের দেখলে মনে হয় না এগুলো এদের ঘর নয়, এরা এখানেই মানুষ হয়নি ;—এরা এখানে প্রবাসী। বরং মনে হয়, এরা যেন এখানে এমনিভাবে আবহমান কাল ধরে বসবাস করে আসছে। কংক্রিটের চওড়া ক্রীট-ওয়েটার উপর খাপরা দিয়ে ঘর কেটে কী একটা খেলা খেলছে অর্ধউলঙ্গ শিশুর দল। কে জানে ওদের খেলার আইন কেমনতর! একটা বাচ্চা মেয়ে চোখ বুঁজে একটা একটা করে ঘর এগুচ্ছে আর সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করছে—'আউট?' তার সঙ্গীরা বলছে 'নট!' আউট-নট, আউট-নট করে খেলা এগিয়ে চলেছে। ম্লান হাসি হাসল ঋতব্রত। ওর মনে হল ওই চক্ষুষ্মতী মেয়েটির বাধ্যতামূলক অন্ধপদক্ষেপের আর্ত-জিজ্ঞাসায় যেন গভীরতর কোন করুণ রাগিনীর মূর্ছনা আছে। পদস্খলন ওর অনিবার্য নিয়তি। দাগের বাইরে ওর পা পড়বেই, আর সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ হৈ-হৈ করে উঠবে "আউট! আউট! আউট!"

ওপাশে এল/২৯ ব্যারাকে একজন কাকে উদ্দেশ্য করে যেন চোখা চোখা গাল পাড়ছে। অশ্রাব্যতম ভাষা তার। সেখানে জটলা পাকিয়েছে মেয়েপুরুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। অশ্লীল ভাষাটায় প্রতিবাদ নেই কারও। বস্তিজীবন সম্বন্ধে ঋতব্রতের অভিজ্ঞতা নেই। উপন্যাসলব্ধ জ্ঞানমাত্র। কিন্তু এরা তো বস্তিবাসী নয়। এদের মধ্যে আছে ভদ্র, শিক্ষিত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের লোক। ওরা বিড়ি পাকাতে পাকাতে গীতাপাঠ করে, অম্লানবদনে ল্যাটিন উদ্ধৃতি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে। এদের পক্ষে অশিক্ষিত বস্তিবাসীর ক্লেদাক্ত রুচি তো স্বাভাবিক নয়। দুদিন আগেও ছিল এরা সমাজবদ্ধ জীব। পূজা-অর্চনা করত, সত্যনারায়ণ, কথকতা, পাঁচালী গান শুনতো। ছেলেদের পড়াত পাঠশালে। ক্ষেত-খামারে, কোর্টে-কাছারিতে নিজের নিজের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করত। ঐশ্বর্য হয়তো ছিল না, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। স্বাচ্ছন্দ্যও হয়তো সব ঘরে ছিল না—ওপারেও হয়তো ছিল অভাব-অনটনের সংসার। তবু সংযম-শালীনতাবোধ ছিল। অন্তত পাকা-সড়কের উপর দাঁড়িয়ে মেয়ে পুরুষে মিলে অশ্লীল গালাগাল উপভোগ করবার মতো রুচি ছিল না। কেন এমন হয়? মনে আছে এই নিয়ে তর্ক করেছিল একদিন তফাদারের সঙ্গে।

তফাদার বলেছিলেন, "কোনও 'গেইনফুল অকুপেশনে' ওদের রাজি করাতে পারবেন না মশাই।"

ঋতব্রত সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল। খুঁজে খুঁজে সে আবিষ্কার করেছিল তিনচার ঘর লোককে। নিজের গ্রামে তারা ঘরামির কাজ করত। বেতের কাজ, বাঁশের কাজ করতে জানে, জানে চাল ছাইতে। ওদের কাউকে কিছুতেই রাজি করাতে পারেনি। রামশরণ অবশ্য ফুরনে খাটায় তার ঘরামিদের। কিন্তু তাদের ডেলি রেট দাঁড়ায় সওয়া তিনটাকার মত। ঋতব্রত পাঁচ টাকা পর্যন্ত দর দিয়েছিল। হাজরিতে কাজ করাবে সে। রাজি হয়নি। সাড়ে পাঁচ? ছয়? সাড়ে ছয়? রোখ চেপে গিয়েছিল ঋতব্রতের। দৈনিক মজুরি মিটিয়ে দেয় যদি? শেষে ছ'টাকা বারো আনায় দুজন মাত্র রাজি হল। বিজয়ীর হাসি হেসে ঋতব্রত ফিরেছিল অফিসে। সে হাসি কিন্তু ফুরিয়েছিল রাত পোহালেই। কেউ কাজে আসেনি! কৌতূহল হয়েছিল ওর। কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছিল সে। বিশ্বাস হয়নি, নগদ টাকার লোভ সত্ত্বেও এই লোকগুলো কর্মবিমুখ হয়ে থাকবে। পরদিন সকালেই সে আবার গেল সেই দুজনের খোঁজে। একজন বাসায় ছিল না। অপর জন বসে বসে গল্প করছিল। ওকে দেখে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকে গেল। ঋতব্রত কিন্তু নাছোড়বান্দা, শেষ পর্যন্ত দেখতেই হবে। ডেকে পাঠাল তাকে। লোকটা এসে বললে, "জ্বর হয়েছে স্যার। আজ যেতে পারব না।"

নতশিরে ফিরে এসেছিল ঋতব্রত। ঘটনাটা অকপটে জানিয়েছিল তফাদারকে। শুনে হা হা করে হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, "আরে মশাই ছ'টাকা বারো আনা কেন—দশটাকা করে আগাম মজুরি মিটিয়ে দিলেও ওরা রাজি হবে না।"

বিশ্বাস হয়নি ঋতব্রতের ; কিন্তু প্রতিবাদও করেনি। কারণ যেটুকু প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে পেয়েছে সেটাই যে অবিশ্বাস্য!

"বুঝছেন না, আপনি? যত টাকাই দিন না—আপনি তো দেবেন তিন চার মাস। তারপর?"

"তারপর? তারপর কি?"

"তারপর তো আর তাকে পি. এল. রাখব না আমি। রোজগার করবার ক্ষমতা আছে প্রমাণিত হয়ে গেলে স্থায়ী পোষ্য হবে কি করে? ডোলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা কেউ অত সহজে খোয়াতে চায়? পাঁচ সাত বছরেই আমরা এদের করে তুলেছি এক সৃষ্টিছাড়া জীব। পৃথিবীর ইতিহাসে জানি না এমন শ্রেণীর জীব কোনও যুগে কখনও ছিল কিনা। দে আর এ ক্লাস অফ পারপিচুয়াল প্রফেশনাল লিগালাইজড বেগারস্!"

কথাটা আজও বাজে ওর কানে। ওরা নাকি আইনসম্মত চিরস্থায়ী এক শ্রেনীর ভিক্ষাজীবি প্রাণী!

"তোমাকে একটা কথা বলছিলাম বাবা। শুনছ!"

ঘুরে দাঁড়ালো ঋতব্রত। এতক্ষণে বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁচেছে সে। সেই প্রৌঢ়া বিধবা ভদ্রমহিলাটি। কমলার মা।

"বলুন?" বিবক্তভাবে তাকালো সে।

"বলছিলাম কি...ইয়ে...শুনলাম দরমার বেড়াটা আপনি নিজের খরচে করে দিচ্ছেন? দেখুন, এ নিয়ে নানান কথা...মানে, তাছাড়া আপনিই বা কেন....অর্থাৎ—"

"প্রয়োজন হলে খুলে টান মেরে ফেলে দেবেন ওটা।"

সশব্দে ঝাঁপের দরজাটা সরিয়ে ভিতরে চলে গেল সে। অসহ্য! এরা কি তাকে এক মুহূর্তও স্থির হতে দেবে না?

ঋতব্রত জানতেও পারল না, বাইরে দাঁড়িয়ে নতমুখী একটি মহিলার সমস্ত মুখ অপমানে, লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে!

মেজদা আবার তাগাদা দিয়ে চিঠি দিয়েছেন। জবাব দিতে হবে একটা। ছুটির দরখাস্ত আগেই করেছে। ক্যাজুয়াল লিভ সে পাবেই। টাকাটার কিন্তু কোনও কূলকিনারা করতে পারেনি। মেজদা অবশ্য এবারের চিঠিতে লিখেছেন হাজার খানেক টাকা অফিস থেকে ধার পেয়েছেন। বাকি এক হাজার টাকা তিনি ধার হিসেবে আশা করছেন ঋতব্রতের কাছে। প্রথম মাসের মাহিনা এখনও এসে পৌঁছয়নি। এ মাসেই ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে সবে চাকরিতে ঢুকেছে ঋতব্রত। শীঘ্রই শ'তিকে টাকা সে মাহিনা পাবে। তাও যদি এ. জি. বি-র পে-স্লিপ এসে পৌঁছয়। ট্রেনিং পিরিয়ডে শ' আড়াই টাকা জমেছে তার পোস্ট অফিসে। হাজার টাকা রাতারাতি সে কোথা থেকে যোগাড় করবে? ভরসার মধ্যে আছে একটা ইন্‌সিওরেন্স পলিসি। বছর দুই চলছে সেটা। শুনেছে, পলিসি বন্ধক দিয়ে কোম্পানি থেকে নাকি টাকা ধার নেওয়া যায় ; কিন্তু ওর পলিসির এখন শৈশবাবস্থা। এ অবস্থায় কি ধার দেবে কোম্পানি? কি জানি! অভিজ্ঞ একটা লোকও নেই যার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া চলে।

"স্যার, ঠিকাদার সাহেব একবার দেখা করতে চায়।"

"কে রামশরণ? আসতে বল।"

যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে রামশরণ সিং এসে প্রবেশ করল।

"কী খবর সিংজী?"

"হামার ইনডেন্টটা স্যর? আজ সাতদিন হইয়ে গেল সতীশবাবু ওটা পাস করাচ্ছেন না। হমাব লরি আজ বসিয়ে গেল।"

"সতীশ?"

ও পাশের টেবিল থেকে সব-ডিভিশনাল ক্লার্ক সতীশ উঠে আসে।

"ইন্‌ডেন্টটা তৈরি হয়ে আছে স্যার—উনিই হ্যান্ড-রিসিটে সই করছেন না।"

"হ্যান্ড-রিসিট তো কালিবাবুকে দিয়ে সই করিয়ে লিতে পারেন সতীশবাবু।"

"কালিবাবু কেন রাম, শ্যাম, যদু, মধু যে কোনও বাবু সই করলেই চলতে পারে ; কিন্তু যাকে সই করতে পাঠাবেন তার নামে একটা অথরাইজেশন লেটার থাকবে তো?"—জবাব দেয় সতীশ।

"ব্যাপারটা কি?" প্রশ্ন করে ঋতব্রত।

"ব্যাপার কিছুই নয়। আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলছি। কনট্রাক্ট অনুযায়ী আমরা ওঁকে চব্বিশ গেজি টিন সরবরাহ করব এখানে, অর্থাৎ সাইটে। বিল থেকে প্রতি হন্দরে সাতাশ টাকা করে রিকভারি হবে। এ ভাবেই চলছিল। একবার ওয়াগন আসতে দেরি হওয়ায় উনি ঘোষাল সাহেবের আমলে দরখাস্ত করেন যেন মালটা ওঁকে কলকাতাতেই ডেলিভারি দেওয়া হয়। উনি নিজ ব্যয়ে ওটা সাইটে আনেন নিজের লরিতে।"

ঋতব্রত জিজ্ঞাসা করলে সিংজীকে, "তাই নাকি? এতে আপনার লাভ?"

"হ্যাঁ স্যার! লাভ কুছু নাই আছে। লেকিন ওয়াগনে মাল আসতে দুতিন মাস কোরে দেরি হোবে আর হমার মিস্ত্রি বসে থাকবে ঈ কেমন কোরে চলে? ফিন কাজ যেতোদিন দেরি হোবে, হমার এসট্যাবলিস্‌মেন্ট ভি বাড়তে চলবে।"

এই জন্যেই এ পরিশ্রমটুকু স্বীকার করে নিয়েছে রামশরণ। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে চায় সে। ঠিকাদাব রিকুইজিশন দেয়, ওভারসিয়ার রেকমেন্ড করে। তখন ঠিকাদারের কাছে হ্যান্ড-রিসিটে সই করিয়ে এস. ডি. ও. একটা রিকউইজিশন দেয় কলকাতায় স্টোরের উপর। সেখান থেকে সিংজীর লরিতে মাল আসে। লিস্ট মিলিয়ে সেটা ঠিকাদারের স্টোরে ওঠে। টিনের সংখ্যা, সাইজ, রোড-পারমিট প্রভৃতি মিলিয়ে দেখে নেয় স্টোরের ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ক-সরকার।

হ্যান্ড-রিসিটে সই করে ইনডেন্টটা নিল রামশরণ। বললে, "রোড পারমিট দিলেন না সতীশবাবু?

ঘরের ও প্রান্ত থেকে জবাব দিল সতীশ, "ওর সঙ্গেই পিন দিয়ে গাঁথা আছে।"

আবার ব্যাগ খুলে কাগজগুলি দেখে মিলিয়ে নিয়ে উঠল রামশরণ।

"আচ্ছা রাম রাম স্যার।"

"আপনি কি এখনই কলকাতা যাচ্ছেন?"

"হাঁ, কেন?"

"তাহলে বসুন। একটা চিঠি দিয়ে দিই। খুব জরুরী। এটা পৌঁছে দিতে হবে।"

"হাঁ হাঁ জরুর।"

প্যাড বার করে চিঠি লিখতে বসল ঋতব্রত। একখানা নয়, দুখানা চিঠি লিখল সে। মেজদাকে লিখল শনিবার সন্ধ্যা বেলা পৌঁছাবে। টাকার যোগাড় এখনও হয়নি। দ্বিতীয় চিঠিখানা সে লিখল এক বন্ধুর কাছে। যে বন্ধু মারফৎ জীবনবীমাটা করেছিল। তাকে খুলে লিখল হাজার খানেক টাকার বিশেষ প্রয়োজন। পলিসিটা বাঁধা রেখে টাকাটা ধার করা চলে কিনা এটাই তার জিজ্ঞাস্য। খামদুটো বন্ধ করে উপরে ঠিকানা লিখে রামশরণের হাতে দিল। বললে, "আজই যেন পৌঁছয় এ দুটি।"

"বহুৎ খুব" বলে সসম্ভ্রমে চিঠি দুটো ব্যাগে পুরে রামশরণ রওনা দিল। তারপর জীপটা দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেতেই খামদুটি বার করে খুলে ফেলল রামশরণ।

রামশরণ যে চিঠিদুটি খুলে পড়েছিল এ কথা আমি, এ কাহিনীর লেখক, আমি তা কী করে জানলাম এ প্রশ্নটা জাগা স্বাভাবিক। বলছি। মেজদার চিঠিখানা যে সে খুলেছিল তার প্রমাণ যথাস্থানে দেবো। বন্ধুর চিঠিখানা যে খুলে পড়েছিল তার প্রমাণ আমি নিজে।

অফিসে বসে কাজ করছি। বেয়ারা এসে কার্ড দিল—"আর. এস. সিং, কন্ট্রাক্টর অ্যান্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স।" বেহারার পিছন পিছন যে ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন তিনি আমার পূর্ব পরিচিত নন। হাতের ইঙ্গিতে বসতে বলে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালাম।

"হামি রিৎবাবুর কাছ থেকে আসছে।"

"রিৎবাবু? তিনি কে?"

"রিৎবৃৎবাবু!" ব্যাগ থেকে একখানি চিঠি বার করে দিলেন মাড়োয়ারী অথবা সিন্ধি ভদ্রলোক। খামটা উল্টে পাল্টে দেখলাম। হস্তাক্ষর সম্পূর্ণ অপরিচিত। কে এই রিৎবৃৎ বাবু অথবা হৃদবৃৎবাবু? খামখানা খুলে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল ঋতব্রতের চিঠিখানা। ভাবলাম, খামটা বন্ধ করে ঠিকানাটা বোধ হয় ডিক্‌টেট্ করেছিল কাউকে, হয়তো ক্লার্ককেই। অপর সম্ভাবনাটা মনে জাগেনি। সেটা বুঝি আজ, যখন পরে শুনলাম ঠিকানাটা ঋতব্রত স্বহস্তেই লিখেছিল। আমি তখন চিঠিটার মধ্যে তন্ময় হয়ে গেছি। পড়ে বললাম, "আচ্ছা এর জবাব ডাকে দেব আমি। আর কিছু কথা আছে?"

একটু ইতস্তত করে ভদ্রলোক বললেন, "কি বলব রিৎবৃতবাবুকে? রূপেয়ার ইন্তেজাম হয়ে যাবে?"

বুঝলাম ঋতব্রত চিঠিব মর্ম পত্রবাহককে জানিয়েছে এবং জেনে আসতেও বলেছে। অর্থাৎ ব্যাপাবটা জরুবী। ভদ্রলোককে বসিযে আমি ব্রাঞ্চ ম্যানেজাবেব ঘবে খববটা জানতে গেলাম। ঘুবে এসে জবাবটা তখনই লিখে দিলাম ঋতব্রতকে। ব্রাঞ্চ-ম্যানেজাবেব ঘবে খবব নিযে জেনেছিলাম গত দুটো প্রিমিযাম না পডায তাব পলিসিটা ল্যাপস্ হযে পডে আছে। কলেজ-হোস্টেল থেকে আনডেলিভার্ড হযে ফিবে এসেছে প্রিমিযাম নোটিশ। কোম্পানি ওকে দেশেব ঠিকানায চিঠি দিযেছে তাবপব। সেটা ফিবে আসেনি বটে, কিন্তু জবাবও আসেনি। এক্ষেত্রে পলিসি নতুন কবে চালু না হওযা পর্যন্ত ঋণের প্রশ্নই ওঠে না। এই কথা কটা জানিযে বন্ধ খামটা ভদ্রলোকেব হাতে দিলাম।

ভদ্রলোক শুধালেন, "রূপেযাব কি হোবে স্যাব?"

"এখন হবে না।"

"দুচাব বোজ বাদে ভি হোতে পাবে না?"

ভাবলাম, টাকাটা এঁবই গর্ভে যাবে বোধহয, না হলে এঁব এত গবজ কেন?

বললাম, "আমাব যা লেখাব চিঠিতেই লিখেছি।"

"বহুৎ খুব" নমস্কাব কবে নিষ্ক্রান্ত হলেন ভদ্রলোক।

মেজদাকে লেখা চিঠিখানাও যে বামশবণ খুলেছিল তাব সাক্ষী ইযাসিন।

"তুমি সত্যি কথা বলছ?"

"হ্যাঁ স্যাব, মিথ্যা বলে আমাব লাভ?"

"লাভ আছে বইকি। বামশবণ তোমাকে অপমান কবে, জুতো মেবে তাডিযে দিযেছে বলছ—বামশবণেব নামে দুটো মিথ্যা কথা বললে আমি যদি তাব উপব বেশি বাগ কবি, তাহলেই তোমাব লাভ।"

"আমি যদি মুসলমানেব বাচ্চা হই, তবে যা বলছি সত্যি বলছি হুজুব। আপনি আপনাব দাদাকে, আব সেই বীমা কোম্পানিব অফিসে দু'খানা চিঠি খামবন্ধ কবে দিলেন, গার্ডি ক্যাম্প এলাকা পাব হবাব সঙ্গে সঙ্গে ওই হাবামি সেই দুটো খামই খুলে পডল। কলকাতায পৌঁছে বাস্তাব ধাবে গাডি দাঁড কবিযে আমাকে পযসা দিল। আমি খাম কিনে আনলাম। তাব উপবে ঠিকানা লিখে আবাব বন্ধ কবে দিলে স্যব।"

"আচ্ছা তুমি যেতে পাব।"

অবশ্য ইযাসিনেব সঙ্গে ঋতব্রতেব এ কথোপকথন হযেছিল অনেক পবে। সে কথা যথাসমযে বলব।

সুচবিতাসু,

কলকাতা থেকে আজই ফিবলাম। লীলাব বিযে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হযে গেছে। তাব বিযেব খবব দিযে এবং আমাব চাবদিনেব ছুটিতে কলকাতা যাবাব খবব দিযে ইতিপূর্বে অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখ তোমাকে যে চিঠি দিই তা নিশ্চযই তুমি পেযেছ এতদিনে। আশা কবছি, আব শুধু আশা কবছি কেন নিশ্চিত জানি আমাব চিঠি পাওযাব আগেই তুমি বওনা হযে গিযেছিলে। কিন্তু তুমি কলকাতা ত্যাগ কবেছিলে ২৭শে। দুদিনেও কেন আমাব চিঠিখানা পৌঁছলো না, তা বুঝলাম না। চিঠি আমি নিজে হাতে ডাকবাক্সে দিযেছি এবং তাবিখটাও মনে আছে। কাবণ ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে দিযে ফিবছি, দেখলাম মাইনব স্কুলেব প্রাঙ্গনে একটা জনতা। ভাবলাম 'আমাদেব দাবি মানতে হবে' জাতিয মিটিং বুঝি। অন্যমনস্ক হযে চলে আসছিলাম। বক্তাব কযেকটা কথা কানে গেল, 'তিনি সুদূব চীন থেক্যা, জাপান থেক্যাও নানান সম্মান পাসিলেন।' কে এই ভাগ্যবান পুরুষ? তবে কি কোন শোকসভা? একটু আগিযে যেতেই দেখলাম টেবিলেব উপব একখানি ফটো। ফুলে ফুলে ঢেকে গেছে মুখখানি। তবু সাদা ফুলেব

মধ্য থেকেও দেখা যাচ্ছে শুভ্রকেশ, সিত-শ্মশ্রু! প্রণাম করলাম কবিকে। এই কর্মহীন লোকগুলি এটুকু আয়োজন না করলে আমার মত কর্মবীরের খেয়ালই ছিল না সেদিন পঁচিশে বৈশাখ! প্রতি বৎসর, গত বৎসরও এ দিনটা কী উন্মাদনার মধ্যেই কেটেছে। আর আজ?

যাই হোক। সুতরাং, পঁচিশ বৈশাখ চিঠি ডাকে দেওয়া হয়েছে এতে কোনও সন্দহ নেই—অথচ সাতাশের আগে সেটা নিশ্চয়ই কলকাতা পৌঁছায়নি। কারণ, পেলে আমি কলকাতা যাচ্ছি জেনেও তুমি বান্ধবীর বিয়েতে মধুপুর চলে যেতে না। এর আগের চিঠিতে লিখেছিলাম, বাড়িতে মধুপুর যাচ্ছি বলে আমার এখানে চলে এস। তোমাদের বাড়ি গিয়ে যখন শুনলাম মাসীমার কাছে, যে তুমি বান্ধবীর বিয়েতে মধুপুর চলে গেছ, তখন ছ্যাঁৎ করে উঠল মনের মধ্যে। ভাবলাম বকুলতলা ক্যাম্পে সত্যিই যাওনি তো? অসম্ভব মনে হলেও তোমাদের মত দুঃসাহসিকাদের পক্ষে সবই স্বাভাবিক! তাই যে কদিন কলকাতায় ছিলাম ঘুরে ফিরে ঐ কথাই মনে হত। ভাবতাম, না, তাহলে তো ক্যাম্প থেকে পরদিনই ফিরে যেতে তুমি।

অভিযাত্রিক অফিসে গিয়েছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল ঘোষেব সাক্ষাত পাওয়া গেল না। শুনলাম কয়েকদিন ধরে তিনি আসছেন না। তাঁরও কোন বন্ধু বিয়ে করছিল নাকি ঐ সময়ে জসিডি অথবা দেওঘরে? কুসুমের গল্পটা এ সংখ্যায় প্রকাশ করছ দেখলাম। আমি গ্যালি প্রুফ সংশোধন করে দিযে এসেছি। বাকি গল্পটা এই সঙ্গে পাঠালাম।

হ্যাঁ, কোথায় যেন শেষ করেছিলাম? ও এবারও তো সেই "বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা" অবস্থায়।

দিন কেটে যায় লক্ষ্মীপুর গ্রামে। দাঙ্গার বিভীষিকা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসে গ্রামবাসী। তবু দুপাড়ায় সেই আগেকাব দিনগুলো আর সত্যিই ফিরে এল না! অত সহজে কি ভোলা যায়? যায় হয়তো, কিন্তু যাতে ভোলা না যায়—একদন লোক সেই প্রচেষ্টাই করে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু ওদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস লিখতে বসিনি আমি। আমার কাহিনী একটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সে কথাই বলি। পণ্ডিতমশাই অল্পদিন পরেই শয্যা নিলেন। মাস দুই তিন রোগ ভোগের পব সংসারের ভাবনা ভাবার হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন তিনি। পণ্ডিতের বিধবা দুটি অনূঢ়া কন্যা নিয়ে পড়লেন অগাধ জলে। পণ্ডিতের কিছু ব্রহ্মোত্তর ছিল পিতৃপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তারই আদায়ে সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন চলত। সমাজে ওঁরা ছিলেন পতিত। দুটি অনূঢ়া মেয়েকে নিয়ে বিপদগ্রস্ত হলেন বিধবা। পণ্ডিতের মৃত্যুসময়ে বিধবার ভ্রাতুষ্পুত্র তারাপদ এসেছিল দেখাশুনা করতে। এ অবস্থায় এ পরিবার ছেড়ে তার চলে যাওয়া সম্ভব হল না অচিরে। বিধবার ভাই লিখলেন সপরিবারে তাঁর সংসারে চলে যেতে, কিন্তু কুসুমের মা তাতে রাজি হলেন না। প্রথমত তা হলে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির আদায়পত্র যাবে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে, আব দ্বিতীয়ত ভ্রাতৃবধূকে তিনি চিনেছিলেন ভালোবকমই। খররসনা সেই রমণীটির সম্মুখে কলঙ্কিনী অরক্ষণীয়া অষ্টাদশী কন্যা নিয়ে উঠতে কিছুতেই তিনি রাজি হলেন না। অগত্যা তারাপদই থেকে গেল এ সংসারে। ভ্রাতৃবধূর তাতে আপত্তি নেই। আদায়পত্র করে যদি টিকে থাকতে পারে, থাকুক না।

গেল কেটে আরও বছর তিনেক। কুসুম একেবারে বাড়ি থেকে বার হয় না। সাত আট বছর পরেও কোনসূত্রে সেই একদিনের কলঙ্কের কথা যদি কোথাও উঠে পড়ে! বাড়ির পিছনের ছোট ডোবাটায় স্নান কবতে যাওয়া ছাড়া বাড়ির চৌকাঠ পার হত না সে। বাইরের যা কিছু কাজ করতেন বিধবা নিজে অথবা তারাপদ। কামিনী শুধু ধলেশ্বরী থেকে জল নিয়ে আসতে যেত। কুসুমের গোটা ইতিহাসটা একমাত্র কুসুমই জানে। বাড়ি থেকে ডাকাতেরা ধরে নিয়ে যাবাব পর তাকে উদ্ধার করবার পূর্ব পর্যন্ত কী ঘটেছিল কিছুই সে বলেনি কাউকে। ফণী দারোগার কাছেও সে বারবার মাথা নেড়ে অস্বীকার

করেছিল। না, সে কাউকে চিনতে পারেনি। তাকে অপহরণের সময় সে নাকি চীৎকার করে ওঠে। তখন ডাকাতদলের মধ্যে একজন তার মাথায় আঘাত করে এবং ফলে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান হলে দেখে পুলিসে তাকে ঘিরে আছে। তার কথা বিশ্বাস করলে মেনে নিতে হয় পুরো আঠারো ঘণ্টা সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। না, শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন সে দেখেনি। ফণী দারোগা ডাক্তার দিয়ে তাকে পরীক্ষা করাতে চেয়েছিলেন। তাঁর দুটি হাত ধরে পণ্ডিত বলেছিলেন, "যা হয়ে গেছে তারপর আর টানা হেঁচড়া করবেন না দারোগা বাবু। মা তো বলছেন তাঁর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।"

যারা নির্যাতিত তারা কেস চালাতে চায় না। বড় দারোগা কাশেম আলিও কেসটা চেপে যেতে পারলেই বাঁচেন। অগত্যা নিবৃত্ত হতে হল ফণী দারোগাকেও।

অথচ অনেকেরই বিশ্বাস, পুরো আঠারো ঘণ্টা সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল না। তবে সে স্বীকার করল না কেন? কেন করবে? নিজের কলঙ্কের কাহিনী নিজমুখে স্বীকার করা কি এতই সোজা? কামিনীও মাঝে মাঝে আড়ালে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছে—কিন্তু লজ্জায় পারে নি। ছি ছি, কি ভাববে মেজদি! কুসুম নিজে থেকেই বরং কখনও বলেছে কামিনীকে, 'অজ্ঞান যদি না হয়ে পড়তাম, তাহলে নিশ্চয়ই চিনতে পারতাম ওদের! গাঁয়ের কেন—ভিনগাঁয়ের অনেক ছেলেকেই তো আমি চিনি। ওরা প্রায় সবাই আমার ছেলেবেলার বন্ধু।" বন্ধু! কথাটা উচ্চারণ করে হাসে সে। কামিনী হঠাৎ ইচ্ছা করেই অন্য কথা পাড়ে, "আমার টেবিলক্লথটায় সুতো তুলে দিবি মেজদি?"

"দে।" হাত বাড়ায় কুসুম।

আবার একটা বজ্রপাত হল এ সংসারে!

একদিন সন্ধ্যায় ধলেশ্বরীতে জল আনতে গিয়ে কামিনী আর ফিরল না। পরদিন তার লাস পাওয়া গেল ইসলামপুরের ঘাটে। কামিনী সাঁতার জানত না। আগেই বলেছি, পণ্ডিতমশায়ের সংসারে এই মেয়েটিকে দৃঢ়শাসনে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাই নদীমাতৃক দেশ ধলেশ্বরী-বিধৌত লক্ষ্মীপুর গ্রামে সেই ছিল বোধ হয় একমাত্র নারী যে সাঁতার জানত না। এটাকে সবাই আকস্মিক দুর্ঘটনা বলে মেনে নিল। কিন্তু সেটা যে দুর্ঘটনা নয়, কুসুম তা জানতে পেরেছিল অনেকদিন পরে। সে কথা যথাসময়ে বলা যাবে।

বাড়িতে আবার একটা শোকের ছায়া পড়ে। কি জানি নিভৃতে বিধবা জননী যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তখন 'মেয়েটা মরে বেঁচেছে' ভাবখানা আসে কিনা! কামিনীর মৃত্যুর মাস দুই পরে একদিন তিনি কুসুমকে বললেন, 'বৃন্দাবনে যাবি কুসমি? চল্, এখানকার সব বেচে দিয়ে জগন্নাথকে নিয়ে আমরা বৃন্দাবনে চলে যাই। সেখানেই পড়ে থাকব দুটি প্রাণী। রাধারমণের দেশে কি ভিক্ষা মিলবে না?"

গৃহদেবতা গোবিন্দের নতুন নামকরণ করেছিলেন পণ্ডিত—জগন্নাথ! অঙ্গহানি হবার পরও পণ্ডিত গৃহদেবতার নিত্যপূজা অব্যাহত রেখেছিলেন। গ্রামের অন্যান্য পণ্ডিতেরা এসে বলেছিলেন, "এ কিসের পূজা তুমি করছ পণ্ডিত! তোমার গোবিন্দের হাত ভেঙ্গে গেছে। অঙ্গহানি হলে পূজা করা যায় না ঠাকুরের! তুমি নবদ্বীপ থেকে বিধান আনাও।"

পণ্ডিত হেসেছিলেন ওদের মূর্খামিতে।

"পাগল! এ আমার ঠাকুরের লীলা। লুকোচুরি খেলাই স্বভাব যে ওঁর। গোবিন্দ আমার হাত গুটিয়ে জগন্নাথ সেজেছেন।"

তাঁর নিত্যপূজা অব্যাহত ছিল। উপরন্তু ভোগের সময় নিমীলিত নেত্রে তিনি ভোগ খাইয়ে দিতেন ঠাকুরকে। গোবিন্দ যে হাত গুটিয়ে জগন্নাথ হয়েছেন! ফলে পরিবারবর্গের কাছে সেদিন থেকে গোবিন্দের নতুন নামকরণ হয়েছিল—'জগন্নাথ'। এবং পরিবারের বাইরেও নতুন নামকরণ হয়েছিল পণ্ডিতের—'পাগল'!

মায়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল কুসুম। তারও আর ভাল লাগছিল না। লক্ষ্মীপুরের বিষাক্ত বাতাস!

ঠিক হল মাসখানেকের মধ্যেই সমস্ত বিক্রয় করে, টাকাটা পোস্ট-অফিসে রেখে, সামান্য পাথেয় সম্বল করে ওরা বেরিয়ে পড়বে বৃন্দাবনের তীর্থপথে। হয়তো হতও তাই। কিন্তু আবার একটা ঘটনায় ছেদ পড়ল এ ব্যবস্থায়।

একদিন সন্ধ্যায় বাড়ির পিছনে পুকুরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে ফিরছে কুসুম—কাঞ্চন গাছের আড়াল থেকে কে যেন এসে পথরোধ করে দাঁড়াল।

অস্ফুটে কুসুম বললে, "বিশুদা!"

"হ্যাঁ আমি। চিনতে পেরেছ দেখছি।"

দীর্ঘ চার বছর পরে ওদের সাক্ষাৎ।

"তুমি কোথা থেকে এলে বিশুদা? কবে এসেছ গ্রামে?"

"গ্রামে আমি এসেছি আজই। রাত ভোর হবার আগেই আমি চলে যাব। আমার সময় অল্প। শোন, আমি ফেরারী আসামী, এ অঞ্চলেই গোপনে অর্গানাইজ করছি। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে কাউকে বলবে না। বুঝেছ?"

কুসুম ঘাড় নেড়ে জানায় সে বুঝেছে।

"আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনেছি গাঙ্গুলীমশায়ের কাছে। হ্যাঁ, হরিহর গাঙ্গুলীমশাই। তিনি আমাদের পিছনে না থাকলে এ গ্রামে কাজ করা অসম্ভব হত আমাদের পক্ষে। শোন কুসুম, তোমাকে এসব কথা বলছি বটে কিন্তু এগুলি অত্যন্ত গোপণীয় খবর। কখনও কাউকে কোনও কথা বলবে না।"

প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও অল্পেই স্থৈর্য ফিরে পেয়েছে কুসুম। ছেলেবেলা থেকে আঘাত পেয়ে পেয়ে কুসুম হয়ে উঠেছিল কুলীশকঠোর। সে হেসে বললে, "তবে এত কথা বলছ কেন আমাকে? জান না, মেয়েদের পেটে কথা থাকে না?',

বিশ্বনাথের কথা শুনে ওর মুখের হাসি কিন্তু মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল।

"তোমাকে তো সে জাতের মেয়ে বলে ভাবি না আমি। জানো কুসুম, আমাদের দলে এমন মেয়েও আছে যারা—যাক, তোমাকে যা বলতে চাই বলে নিই এই বেলা। আমার সময় অল্প—"

বাধা দিয়ে কুসুম বলেছিল, "আমাকে তোমাদের দলে নিতে পার না বিশুদা?"

"না, এখন নয়। মাসিমার কথাটাও ভেবে দেখো!"

"তবে আমি কী করব? বৃন্দাবনে চলে যাব?"

"না, তাহলে তুমি আমাদের দলে আসবে কি করে? তুমি এখানেই প্রতীক্ষা কর—"

"কিন্তু—" ইতস্তত করে কুসুম।

"হ্যাঁ, আমি বুঝি। তুমি বরং এক কাজ কর। আমাদের দলের কোনও ছেলেকে বিয়ে করে আপাতত গ্রামেই থাক।"

হাসল কুসুম।

"তুমি কি আমার সব কথা এখনও শোননি বিশুদা?"

"হ্যাঁ শুনেছি।"

"তবে যে ও কথা বলছ? সব কথা জেনে আমাকে কে বিয়ে করবে?"

"আমি যদি পাত্র এনে দিই? তুমি রাজি আছ?"

আবার হেসে ফেললে কুসুম, "পাত্রটি কি রকম না জেনে বলি কি করে?"

"তুমি . তুমি আমাকে বিয়ে করবে কুসুম?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো এক পা, সরে গেল কুসুম, কথাটা শুনে।

"না।"

"না?.. তবে অবশ্য অন্য পাত্র দেখতে হবে। আমি ভেবেছিলাম....হয়তো আমারই ভুল

হয়েছে তুমি আমাকে মাপ কর কুসুম।"

"মাপ চাইবার কি আছে এতে? কিন্তু তুমি কি করে ভাবতে পারলে বিশুদা, আমার সমস্ত কলঙ্কের বোঝা নিয়ে তোমার নির্মল জীবন কালিমালিপ্ত করতে রাজি হব আমি?"

"ও শুধু এই জন্যেই—"

"নিশ্চয়।"

"অন্য কিছু নয়?"

"অন্য আবার কি?"

"ও বুঝেছি! শোন, ভুল বুঝেছ তুমি। তোমার ও ঘটনাটাকে কলঙ্ক বলে মনে করিনি আমি। সে রকম গুরুর কাছে শিক্ষা পাইনি তো। তুমিই বা কি করে ওটাকে কলঙ্ক বলে মেনে নিয়েছ তাই ভাবি।"

একটু হেসে আবার বলে, "হবেই তো! বাপের পাঠশালায় গিয়ে তো বসনি কোনদিন! তাঁর শিক্ষা আর পেলে কোথায়?"

"আমার এতবড় কলঙ্কটাকে তুমি হেসে উড়িয়ে দিতে চাও? তুমি জানো, সে আঠারো ঘণ্টা আমি কোথায় ছিলাম? কী ভাবে ছিলাম? সত্যিই আমি অজ্ঞান হয়েছিলাম কি না? সজ্ঞানে আমার উপর—?"

"না, তা জানি না। তবে এটা জানি, যে তা ঘটে থাকলেও তুমি সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমের মতই অপাপবিদ্ধ।"

এত মধুর কথা জীবনে শোনেনি কুসুম। আবেশে তার চোখ মুদে এল। স্বপ্নাবেশে সে শুনলে বিশ্বনাথের কথা—"জান না আমার গুরুদেব বলতেন হাত ভাঙলে ঠাকুর অশুচি হয় না। হাত যে ভেঙেছিল সেটা তো প্রত্যক্ষ সত্য, কিন্তু তাতে তো তাঁর নিষ্ঠা একদিনও কমেনি। সমাজের চোখে তোমার বাবার ঠাকুর বিকলাঙ্গ বর্জনীয়, তুমি কলঙ্কিনী। সমাজের চোখে আমিও পতিত—জেলফেরত আসামী! জেলে বসে পাঁচ জাতের সঙ্গে লপসি খেতে হয়েছে আমায়। তুমি যদি কীটদষ্ট কুসুম হও, তবে আমিও নীলকণ্ঠ বিশ্বনাথ! থাক কলঙ্ক, তুমিই আমার কলঙ্কিনী রাই!

মধু! মধু! এত মধুর কথা সহ্য করতে পারবে না কুসুম। তার সদ্যস্নাত সিক্ত মাথাটা আশ্রয় খোঁজে কুস্তিগীর বিশ্বনাথের কবাট বক্ষে।

এর পরে কুসুমের বিবাহের কথা বলতে হয়, কিন্তু সে বিয়ের খবর কে রাখে? পণ্ডিতমশায়ের মেয়ের বিয়েতে বাজল না সানাই। বাজল না শাঁখ। হুলুধ্বনি দিল না কেউ। ভূরিভোজে আপ্যায়িত হল না গ্রামের ইতরভদ্র। হরিহর গাঙ্গুলীর উপস্থিতিতে গোপন কক্ষে রাত্রির তৃতীয় যামে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন পুরোহিত,—মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা উচ্চারণ করে গেল কুসুম আর বিশ্বনাথ। বিধবা জননী দাঁড়িয়েছিলেন দ্বারের পাশে—তারাপদ পুরোহিতের নির্দেশমতো ফাইফরমাস যোগান দেয়, আর বাইরের দ্বারে দাঁড়িয়ে ঘড়ি হাতে প্রতীক্ষা করছিল একজন ছেলে। বিশ্বনাথের দলের লোক। বিবাহ অন্তে সে বরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে রাত ভোর হবার আগেই।

পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে আসে। তারাপদ কয়েক গ্লাস শরবৎ নিয়ে এল। তাই পান করে পথে বের হতে গিয়ে বিশ্বনাথ দেখল রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। সঙ্গী একাই চলে গেল। বিশ্বনাথকে সমস্ত দিন অপেক্ষা করে যেতে হল। লুকিয়ে থাকতে হল বিশ্বনাথকে গোয়ালে। পরদিন সে বেরিয়ে পড়ল রাত্রের অন্ধকারে। কালরাত্রি!

এরপরে কুসুমের বিবাহিত জীবন। যতদূর আন্দাজ করছি রঙ চড়িয়ে গল্প করবার অবকাশ সেখানে অল্প। কচিৎ কখনও আসত বিশ্বনাথ রাতের অন্ধকারে—আবার বেরিয়ে পড়ত রাত পোহাবার আগেই। প্রতিবেশীরা কোন সূত্রে খবরটা পেল জানি না—কিন্তু বোঝা গেল আঁধার রাতের বরের স্বরূপ জেনে

ফেলেছে অনেকেই। ফলে নবদম্পতির বিচ্ছেদগুলি দীর্ঘতর হতে লাগল শুধু।

চিঠিটা এমনিতেই বড় হয়ে গেছে। সংক্ষেপে শেষ করছি তাই কুসুমের ইতিকথা। কুসুমের বিয়ের বছর চার পাঁচ পরে ওর মা মারা যান। বেয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় ধরা পড়ে বিশ্বনাথ। বছর তিনেক সে ছিল এবার জেলে। তারাপদই কুসুমকে দেখাশুনা করত। পঁয়তাল্লিশ সালের মাঝামাঝি ওরা দেশের বাড়ি ছেড়ে চলে আসবে মনস্থ করলে। অনেকেই তখন ক্রমে ক্রমে চলে আসছে বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তে—অনিবার্য কারণে। জিনিসপত্র, আসবাব, গরু, একে একে বিক্রি করে দিল তারাপদ। বিশ্বনাথ তখন হিজলির জেলে। জমি ও বাড়ির জন্যেও খদ্দের খুঁজে বেড়ায় তারাপদ। এই সময়ে পুরানো বাক্স ঘাঁটতে গিয়ে কামিনীর একটা লক্ষ্মীর কৌটো খোলে কুসুম। কৌটোটার চাবি ছিল না! মাঝে মাঝে আনি দোয়ানি ফেলতো ঐ কৌটায়। দুই বোনে আন্দাজ করত কত জমল। কামিনীর মৃত্যুর পর এটা খোলেনি কুসুম। বিশ্বনাথের জেল হবার পর—যুদ্ধের বাজারে, দুর্ভিক্ষের বাজারে যখনই খুলতে গিয়েছে—কামিনীর স্মৃতি এসে বাধা দিয়েছে তাকে। আজ বাড়িঘর ছেড়ে যাবার আগে কৌটোটা ভেঙে ফেলল সে। একরাশ আনি দোয়ানির মাঝ থেকে বের হল একটুকরা জীর্ণ চিঠি—

"মেজদি! তুই কবে এই চিঠি পড়বি জানি না। ততদিনে আমার শোকটা সামলে যাবে—আমার অপঘাত মৃত্যুর কারণটাও সইতে পারবি তুই। মাকে কিছু বলিস্ না লক্ষ্মীটি! কথাটা না বলে যেতে পারছি না। যে তোর সর্বনাশ করেছে, সেই আমার এই পরিণামের জন্য দায়ী। যে কারণে মুখ ফুটে তুই স্বীকার করতে পারিসনি, সেই কারণেই আমিও কিছু বলতে পারলাম না তোকে মুখ ফুটে। তার চিঠিগুলো সব পুড়িয়ে দিয়ে গেলাম—নইলে দেখতিস্ অশ্লীল প্রস্তাবটার বিনিময়ে কী পরিমাণ লোভ আর ভয় সে দেখিয়েছে প্রতিনিয়ত। সমাজে একঘরে পতিত পরিবারের অরক্ষণীয়া একটি মেয়ের অনেক রকম পরিণামই হতে পারত। তবে আবদুল গনির অঙ্কশায়িনী হওয়ার চেয়ে ধলেশ্বরীকেই বরণ করে নিলাম।

যতদিন পরেই পাস্ এ চিঠি, আমার জন্যে দুফোঁটা চোখের জল ফেলিস্।

—ইতি হতভাগিনী তোর কুমু।"

কুমুর শেষ অনুরোধ কুসুম রাখতে পারেনি। চোখ দিয়ে তার একফোঁটা জল আসেনি। জ্বালা করে জ্বলে উঠেছিল তার চোখ দুটো। কতগুলো বিস্মৃতপ্রায় দৃশ্য মনে পড়েছিল তার—আর মনে পড়েছিল সদাহাস্যময়ী তার স্নেহের বোনটিকে—কামিনী, তার আদরের কুমু!

তারাপদকে চিঠিখানা কুসুম দেখায়নি। দেখিয়েছিল বিশ্বনাথকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর সে যখন জেল থেকে ছাড়া পেল। বিশ্বনাথ চিঠি পড়ে একটা কথাও বলেনি। চোয়ালের হাড়দুটো শুধু কঠিন হয়ে উঠেছিল তার।

দলে দলে গ্রামবাসী তখন বেরিয়ে পড়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব। সদ্যোজাত শিশুরাষ্ট্রের সন্তান তখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছে। এপার ওপার! বিশ্বনাথের ক্লাবের সদ্যমুক্ত কয়েকটি সভ্য আবার ধরা পড়ল জননিরাপত্তা আইনে। কুসুম আর দেরি করতে রাজি নয়। বললে, "ওগো চল আজই বেরিয়ে পড়ি। ফিরে এসে পরে সম্ভব হলে জমি বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করা যাবে। এখানকার দেনাপাওনা তো চুকলো।"

বিশ্বনাথ শুধু বললে, "দেনাপাওনা সব চোকেনি কুসুম। একটা বড় কাজ এখনও বাকি আছে! তুমি আর তারাপদ আজ রাতেই রওনা হয়ে যাও। যেমন করে পার কলকাতায় পৌঁছে এই ঠিকানায় উঠো। আমি কয়েকদিন পরে গিয়ে মিলব তোমাদের সঙ্গে। আমার হাতের কাজটা সেরেই যাব।"

"কি আবার তোমার এমন জরুরী কাজ?" শুধায় কুসুম।

"ঐ যে বললাম একজনের ঋণ শোধ করতে হবে।"

"কে সে?"

"আবদুল গনি।"

শিউরে উঠেছিল কুসুম। বারণ করেছিল বিশ্বনাথকে। তার পায়ে মাথা খুঁড়েছিল—কিন্তু সংকল্প থেকে একপাও টলাতে পারেনি তাকে। সেই রাত্রেই তারাপদের সঙ্গে শিশুপুত্রের হাত ধরে রওনা হয়ে গেল কুসুম। বিশ্বনাথও রওনা হয়ে গেল তার আবদ্ধ কাজের উদ্দেশ্যে। বিদায় নিল স্বামিস্ত্রী।

এই বিদায়ই ওদের চিরবিদায়। কুসুমের সঙ্গে বিশ্বনাথের নাকি আর দেখা হয়নি। আবদুল গনি খুন হবার খবরটা সে পড়েছিল কাগজে, কারণ আবদুল তখন একটি রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতা। বিশ্বনাথের ফটোসমেত পুরস্কার ঘোষণার বিজ্ঞপ্তিটাও সে দেখেছে। বিশ্বনাথকে কিন্তু পুলিসে খুঁজে পায়নি। কুসুমও নয়। যে ট্রেনে বিশ্বনাথরা কলকাতা রওনা হয়েছিল কোন দুর্ঘটনায় সে ট্রেনের কোন হিন্দু যাত্রীই পৌঁছতে পারেনি তাদের এপারের নিরাপদ আশ্রয়ে!......

ঋতব্রতের সে চিঠিতে কুসুমের কথা ছিল ঐটুকুই। বাকি যা, তা এ কাহিনীর পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। এ চিঠিখানা সে কলকাতা থেকে ফিরে এসে লিখেছিল দেখা যাচ্ছে। কাহিনীর পারম্পর্য রাখতে হলে ঋতব্রতের কলকাতা যাবার আগে যে ঘটনাটা ঘটে, সেটা এখানে লিপিবদ্ধ করা দরকার।

করোগেটেড টিনের ইনডেন্ট আর দু'খানা চিঠি নিয়ে রামশরণ যেদিন চলে যায় তার পরের দিনই সন্ধ্যাবেলা সে ফিরে এল ক্যাম্পে। ঋতব্রত তখন তার ছ'পায়াতে চিৎ হয়ে শুয়ে ভাবছে নানান কথা। কলকাতার ডাকে ক্যাজুয়াল লীভের কোনও জবাব আসেনি তখনও। জবাব পায়নি রেখা মিত্তিরকে লেখা চিঠিখানারও।

রতন এসে খবর দিলে সিংজী দেখা করতে চায়। ঋতব্রত উঠে বসে। গায়ে একটা গেঞ্জি চড়ায়। রামশরণ এসে বসে নমস্কার করে।

"সিংজীর কি খবর?"

"খবর তো আচ্ছাই। আপনার চিট্রি ভি লিয়ে এসেছি।" শার্টের কানাটা তুলে ফতুয়ার পকেট থেকে দুখানি চিঠি বার করে রাখল টেবিলে। ঋতব্রত ক্ষিপ্র হাতে চিঠি দুখানা নিয়ে পড়তে লাগল। প্রথমেই মেজাদর চিঠি ; সেখানা শেষ করে আমার লেখা চিঠিখানা পড়তে লাগল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল রামশরণ। ঋতব্রতের কপালে যে কুঞ্চন-রেখা জাগছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে ঋতব্রত সচেতন ছিল না—কিন্তু সমস্তই নজরে যাচ্ছিল্ল রামশরণের, টেবিলের উপর রাখা শেভিং-সেটের গোল আয়নাটায়।

রতন এসে দাঁড়াল, "চায়ের জল বসাব?"

রামশরণ তাকে ডাকলে, "এ রতন ভাই, শুনোতো। পহিলে মেরে লিয়ে এক পাকিট সিগ্রেট লাও। দেখো ভাই কাঁচি মৎ আনা—ক্যাপটান্ লাও গে।"

একটা টাকা সে গুঁজে দিলে রতনের হাতে।

রতন একটু বিরক্ত হল হয়তো, কারণ কাঁচি ছাড়া ক্যাপস্টান সিগারেট কাছের স্কুলবাজারে পাওয়া যাবে না। তাকে যেতে হবে সেই গোলবাজার অবধি। তবু টাকাটা নিয়ে রতন বেবিয়ে পড়ে।

ঋতব্রতের খেয়াল হল রামশরণের উপস্থিতিটা সে অগ্রাহ্য করেছে এতক্ষণ। বললে, "সিংজী আবার সিগারেট ধরলে কবে থেকে?"

"খাইনা হামি, আবার কভি কভি ভি খাই।"

জানলা দিয়ে গলা বার করে কি দেখল রামশরণ। রতন ততক্ষণে বড় রাস্তায় উঠে পড়েছে।

"আপনার ে.ে ভি একটা চিট্রি আছে স্যার।"

"আরও চিঠি? কই দেখি?" হাত বাড়ালে ঋতব্রত।

আংরাখার আব এক পকেট থেকে বার কবে আনল সিংজী একটা মোটা খাম। দিল ঋতব্রতেব হাতে। নাম ঠিকানা কিছুই লেখা নেই উপরে। ঋতব্রত খামটা খুলতে লাগল। খুক্ খুক্ কবে কাশল

রামশবণ। হঠাৎ থুথু ফেলতে উঠে গেল বাইরে। ঘরে যখন ফিরে এল খামের অবগুণ্ঠন তখন আবার বন্ধ হয়ে গেছে। সিংজী আসন গ্রহণ করল। পকেট থেকে একটা ডিবা বার করে একখিলি পান ফেলে দিলে মুখ গহ্বরে, বললে, "একটা লিবেন নাকি স্যার?"

ঋতব্রত স্থির হয়ে বসে রইল, হ্যাঁ না জবাব দিলে না। একটু ইতস্তত করে সিংজী ফের বললে, "কবে কলকাতা যাচ্ছেন স্যার?"

"এটা আপনি নিয়ে যান।"

বন্ধ ভারী খামটা ঋতব্রত ছুঁড়ে দিলে রামশরণের কোলের উপর। একটু চমকে উঠল সিংজী, "কেন স্যার? কি কসুর হল হমার?"

"কসুর আপনার নয়, কসুর আমার! আপনার সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে। আপনি ভুল বুঝেছেন মিস্টার সিং, আমি ও জাতের লোক নই।"

"এতে অন্যায় কি আছে স্যার? আপনি হমার জন্যে এত পরিসন করলেন—"

"আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আর কোনও আলোচনা করব না। আপনি যেতে পারেন।"

উঠে দাঁড়াল ঋতব্রত। চোখমুখ তার লাল হয়ে উঠেছে।

"আপনি হমার জন্যে পরিশ্রম করেন নাই?"

"না! আপনার জন্যে আমি কিছুই করিনি। যা করেছি, তা শুধু আমার কর্তব্য বলেই করেছি। তার পারিশ্রমিক আমি ঠিকই পেয়ে থাকি। ছিঃ, এ বিষয়ে—"

"লেকিন—", বাধা দিয়ে বললে রামশরণ, "—কোলটারিং? ওহি রোজ আপনি হমাকে না বাঁচাইলে তো হামি মরতম্ স্যার!"

মুচকি হাসল রামশরণ। আপাদমস্তক জ্বলে গেল ঋতব্রতের। সেদিনকার অপমানের দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল বুঝি। বললে, "আমি আবাব বলছি আপনি ভুল বুঝছেন মিস্টার সিং। পুরনো বল্লাতে আলকাতরা লাগাতে দেওয়ার পিছনে যে এই হীন ষড়যন্ত্র ছিল, তা আমি তখন বুঝিনি। হ্যাঁ, আপনারা আমাকে বোকা বানিয়েছেন! তার জন্যে যথেষ্ট অপমানও হয়েছে আমার সেদিন। কিন্তু আজকের এই অপমান—এ আমি জীবনেও ভুলব না। আপনি যেতে পারেন।"

যাবার কিন্তু কোন লক্ষণ রামশরণের দেখা গেল না।

"যো হইয়ে গেছে, ও হইয়েই গেছে স্যার! বিল্ তো হামি পাইয়েই গেছি। এখন তো ও ফিন্ লোটানো যাবে না। লেকিন আপনি ভি কুছু না নিলে যে হমার মন মানবে না। ও তো স্রিফ অধরম্ হোবে।"

"জানি না ধর্মজ্ঞান বলতে আপনি কি বোঝেন! টাকাটাই বোধহয় আপনাদের কাছে চরম ধর্ম! কিন্তু টাকাব উপরেও একটা জিনিস আছে দুনিয়ায়, যাব নাম ইমান্। কথাটার মানে আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না—তাই ও আলোচনা থাক। কিন্তু এক্ষুণি আমার ঘর থেকে আপনি চলে না গেলে, আমি লোকজন ডাকতে বাধ্য হব।"

এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল রামশরণ।

"আপনি হমাকে ঘরসে নিকাল দিলেন স্যার?"

"এই সোজা কথাটা আরও আগে বুঝতে পারবেন আশা করেছিলাম।"

অপমানে এতক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে রামশরণ ঠিকাদার। ঋতব্রত যে এতটা রূঢ় হতে পারবে এটা সে কল্পনাই করেনি। তবু অদ্ভুত তার সংযম। কোনও কথা না বলে ধীরপদে সে এগিয়ে গেল দ্বারের দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে বললে, "আজ আপনি আমীর এস. ডি. ও আছেন ;—হামি গরীব ঠিকাদার আছি। আজ আপনি হমাকে ইনসল্ট কবতে পারেন। লেকিন হামি ভি কুত্তা নেই, হামি ভি আদমি আছি।"

"সে পরিচয় পেলে খুশি হব।"

দপ্ করে জ্বলে উঠল সিংজীর চোখ দুটো। ঠোঁট দুটি ঈষৎ উন্মোচিত হল—কিন্তু কিচ্ছু বললে না। যুক্তকর অবহেলাভরে কপালে ঠেকিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল রামশরণ সিং।

অন্ধকার ঘরে ঋতব্রত পায়চারি করে। রতন লণ্ঠন জ্বেলে রেখে যায়নি। কথায় কথায় সন্ধ্যা উৎরে গেছে। পকেট হাতড়ে একটা দেশলাই জ্বালে ঋতব্রত। সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজতে থাকে। একটা সিগারেট না ধরালে উত্তেজনাটা কমবে না। আঃ, কোথায় যে ফেলে কাজের জিনিস! টেবিলের উপরে নাই, বালিসের তলায় নাই, ছাড়া বুশ-কোটটার পকেটে? তা-ও নাই।

"কি খুঁজছেন স্যার? রতন এসে দাঁড়ায়।

আমার সিগ্রেটের প্যাকেট?"

"এই যে।" রতন এগিয়ে দেয় আনকোরা একটা নতুন প্যাকেট। আগ্রহে সেটা থেকে খুলে একটা মুখে দিতে গিয়ে কি ভেবে হঠাৎ থেমে যায় ঋতব্রত। সিগারেট সমতে প্যাকেটটা টান মেরে ফেলে দেয় বাইবে। থমকে দাঁড়ায় রতন, "স্যার?"

"যা এক প্যাকেট ক্যাপস্টান নিয়ে আয়।" একটা টাকা বার করে দেয় ঋতব্রত। একটুখানি অবাক হয়ে চেয়ে থেকে আবার পথে নামে রতন।

তাকে গোলবাজার যেতে হবে। স্কুলবাজারে ক্যাপস্টান পাওয়া যায় না।

লীলার বিয়েতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। ঋতব্রতের বন্ধু হিসাবেই নয়! ওর মেজদা এবং মেজবৌদির পরিচিত গণ্ডীর একটা নিকটবর্তী স্থলেই ছিল আমার অবস্থিতি। বিয়েবাড়িতে ঋতব্রতের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কথাবার্তা বিশেষ কিছু বলার সময় ছিল না ; কাজের ভিড়ে একবার শুধু বললে, "কাল তোর অফিসে যাব বারোটা নাগাদ। বিশেষ জরুরী দরকার।"

পরদিন সে সত্যিই এসেছিল আমার অফিসে। আমার কাছে ও হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিল। তার নাকি তখনই এক হাজার টাকা ধার চাই। যে কোনও সুদে, যে কোনও শর্তে। সন্দেহ হল। পীড়াপীড়ি করলাম। ভাঙলে না কিছু। শুধু বললে, লীলার বিয়েতে তাকে একজনের কাছ থেকে টাকাটা ধার নিতে হয়েছে ; কিন্তু তার কাছে অধমর্ণ থাকতে চায় না। লোকটা কে, সেখানে কত সুদ দিচ্ছে কিছুই বলবে না। অগত্যা নিজের একাউণ্ট থেকে টাকাটা দিতে হল। জিজ্ঞাসা করল, কত সুদ? বললাম "টাকাটা আমারই ; পোস্টাফিসের সেভিংস খাতা থেকে তুলে দিয়েছি মাত্র।" বৎসর খানেক ধরে ইনস্টলমেন্টে টাকাটা ফেরত পেয়েছিলাম। আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ! সেভিংস ব্যাঙ্ক হাবে সুদ কষে সে শেষ ইনস্টলমেন্টে সে টাকাটাও যোগ দিয়ে দিয়েছিল। মনে আছে, মনি-অর্ডার কুপনে লিখেছিল, "জানি এ ক'টাকায় তুমি কিছু বড়লোক হবে না। কিন্তু ব্যাঙ্কে থাকলে তোমাব যে টাকাটা জমত, আমিই বা তার থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব কেন?"

এটা ওর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। ওর বিবেকটার একমাত্র উপযুক্ত উপমান সজারুর কাঁটা। তার জন্য কষ্টও পেয়েছে সারাজীবন। 'আদর্শ' বলে কি একটা অবাস্তব জিনিসকে আঁকড়ে ধবে কতকগুলো মূর্খ লোক দুনিয়াব যাবতীয় অত্যাচার সহ্য করে যায়—ও হচ্ছে সেই মূর্খ দলেরই একজন। ঐ আদর্শে আঘাত লাগলে সজারুর কাঁটার মতো ওর বিবেকটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই জন্যেই হয়তো চাকরিজীবনে সকলের সঙ্গে শুধু ঝগড়াই করে গেছে। দেখেও দেখতে না পাওয়াটা যে একটা বড় বিদ্যার অন্তর্গত, তাতে যে প্রত্যক্ষ দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণ পার করে দেখবার পারদর্শিতা চাই, এটা বুঝতে অমিত রায়ের মত পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। সংসারের চৌদ্দ আনা লোক এ সত্যটা বোঝে। দুনিয়ার এ চৌদ্দ আনা অংশের কত ভগ্নাংশ অন্যায় করে তা জানি না, তবে বাকি অংশটা যে নির্বিচারে 'অন্যায় সহে' তা হলপ করে বলতে পারি। জগতের তাবত অন্যায় দৃশ্যেব সম্মুখে এরা শর্টসাইট—অনুচিত কাজের বাজারে অন্যমনস্ক। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আন্‌জেলরা' যেখানে পদক্ষেপ করতে দ্বিধাগ্রস্ত—বাকি দু'আনা সেখানে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। তাদের সংজ্ঞা মূর্খ। ঋতব্রত এই মূর্খের দলের একজন। আব

সেই মূর্খামিটা করতে পারার জন্যেই তার যেন একটা বেপরোয়া বড়াই আছে। পাঁচজনের মতের তোয়াক্কা না রেখে এই বেপরোয়া ভাবপ্রকাশটার সংজ্ঞা সাধুভাষায় দৃষ্টিকটু। ক্যাম্পজীবনে সে যে বাড়াবাড়িটা করেছিল তার পিছনে ছিলেন সমধর্মাবলম্বী আর একজন মূর্খসম্রাট! তাঁর কথাই বলব এবাব ; কিন্তু তার আগে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে ওর টাকা ধার করার ব্যাপারে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল। এ সন্দেহের নিরসন করেনি কোনও দিন ঋতব্রত। তবে সন্দেহটা নিরাকরণ হল মেজবৌদির সঙ্গে আলাপচারিতে একদিন। মেজবৌদি বললেন, "ঠাকুরপো তো আজকাল চিঠিপত্রই লেখে না। তোমাদের লেখে-টেকে নাকি?"

বললাম, "কই না। লীলার বিয়ের আগে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল লোক মারফৎ। সেটাও কাজের চিঠি। কে এক আর. এক. সিং নিয়ে এসেছিল চিঠিটা।"

"ও রামশবণ সিং? ওকে চেনা না? ও হচ্ছে ঠাকুরপোর ঠিকাদার। লীলার বিয়েতে একটা জড়োয়া হাব দিয়েছিল। এমন চমৎকার হারটা, জানলে, একটা করে ফুল আর তার পাশে—"

গহনার প্যাটার্নের প্রসঙ্গ থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এ লোকটাকে চিনলেন কি করে আপনারা? ঋতব্রতই নিমন্ত্রণ করেছিল বুঝি?"

"কে ঠাকুরপো? ওরে বাবা! তাকে নেমতন্ন করার জন্যে কী রাগ। কি করে জানব বল ভাই? ও লোকটাকে তো ওই পাঠিয়েছিল আমাদের বাড়িতে। একবার চিঠি নিয়ে এল। পরের বার ওর হাতেই টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছিল। টাকাটা যেদিন নিয়ে এল সেদিন কী কাণ্ড! তোমার দাদা সেদিন বাড়িতে। টাকাটার ভাবনায় উনি তখন উদ্‌ভ্রান্ত। বিয়ের মাত্র তিন দিন বাকি। হঠাৎ ঠাকুরপোর পাঠানো টাকাটা এসে পৌঁছাল। উনি এত খুশি হয়ে উঠলেন যে ভদ্রলোককে বসিয়ে নিয়ে রসগোল্লা সন্দেশ খাওয়ালেন।"

খিল খিল করে নিজেই হেসে ওঠেন মেজবৌদি, "তোমার দাদাকে তো চেন ভাই। হাত দিয়ে একটা পয়সা কখনও গলতে দেখিনি। হঠাৎ ভিতরে এসে হুকুম করলেন বাইরে দু'কাপ চা পাঠিয়ে দাও শিগগির! বল্টুকে নগদ একটা টাকা দিয়ে খাবার কিনতে পাঠিয়ে দিলেন। আমি ভাবলাম লীলার শ্বশুরবাড়ির বুঝিবা এল কেউ। বললেন, 'না, রিতু টাকা পাঠিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিঠি দেয়নি?' বললেন, 'না। মুখে বলতে বলেছে কয়েকদিনের মধ্যেই আসবে!' তা ভদ্রলোক লোক ভালো। চা-টা খেয়ে অনেক গল্পসল্প করল। কোথায় লীলার বিয়ে দিচ্ছি, পাত্র কি করে। এর পর ওকে মৌখিক নিমন্ত্রণ না করাটা খারাপ দেখাতো না?"

"নিশ্চয়ই।" জবাব দিলাম অন্যমনস্কের মতো "কেন, ওকে নিমন্ত্রণ করায় কি অসন্তুষ্ট হয়েছিল বিতু?"

"অসন্তুষ্ট? ভাগ্যিস সম্পর্কে বড়, তাই মারতে বাকি রেখেছে! তোমার দাদা বারণ না করলে উপহারটাও ফেরত দিয়ে দিত। আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'মেজদা ওকে চিনল কি করে? বললাম, 'বারে' ওর হাতেই তো তুমি প্রথমবারে চিঠি পাঠালে, তারপর টাকা পাঠালে।' শুনে ঠাকুরপো চুপ করে গেল। সব কথা ওর মনে পড়ল বোধ হয়। শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'টাকাটা কবে দিয়ে গিয়েছিল।' হিসাব করে তারিখটা বললাম। ও চুপ করে গেল।"

এখন বুঝতে পারি আমার দেওয়া হাজার টাকা কোথায় গিয়েছিল। ভারি ইচ্ছে হয় দৃশ্যটা জানতে। নোটের বাণ্ডিলটা কি ছুঁড়ে মেরেছিল রামশরণেব মুখে? টাকাটা ফেলে দেওয়ার সময় নাটকীয় ভঙ্গিতে কিছু নাটুমে ডায়ালগ ঝেড়েছিল নিশ্চয়ই! দুর্ভাগ্য আমার, সে দৃশ্য আমার অজানা। ঋতব্রত সেকথা বলেনি আমাকে!

কিউ. সি আই. ব্যারাকটা সারানো শেষে হয়ে গেছে। এল/৩ বিল্ডিংটার উপরের টালিগুলি বসানো হয়ে গেছে। মুলিবাঁশের দেওয়াল নতুন করে বাঁধছে ঘরামিরা। আগেকার দেওয়ালটা অনুমোদন

করেনি ঋতব্রত। কারণ বাঁধুনি নয় ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ নয়। এই দেওয়ালটা তৃতীয়বার বাঁধছে ঘরামিরা। প্রথমবার ঋতব্রত ওটা খুলতে আদেশ দেয়, কারণ সেটা ছিল "বুকা বাঁধুনি" ; অর্থাৎ মুলিবাঁশ ফাটিয়ে তার অমসৃণ ভিতর দিক, বুকের দিক দিয়ে সেটা তৈরি করা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার মসৃণ অংশ, অর্থাৎ পিঠা-মুলির বাঁধুনি দেওয়া হল বটে, কিন্তু বাঁধুনির খোপগুলা নয় ইঞ্চির জায়গায় দশ, সাড়ে-দশ ইঞ্চি ফাঁকে বাঁধা হয়েছে। সুতরাং রিজেক্টেড!

ওয়ার্ক-সরকার নির্দেশ জানাতে গেল ঘরামিদের। ফলে একটা রীতিমত ঝগড়ার সৃষ্টি হল। ঘরামি মিস্ত্রিরা রুখে উঠেছে, এ কি অত্যাচার! বাঁশের চাটাই বুনানিতে আবার এক আধ ইঞ্চি কি? এ কি ঢালাই ছাদের রড সাজানো? গণ্ডগোল শুনে ছুটে এল ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত। ব্যাপারটা শুনে স্পষ্টই বিরক্ত হল সে। বিরক্তি প্রকাশ করতেও বিরত হল না। বস্তুত তার মতেও এটা অন্যায় জুলুম। ফলে ঘরামি মিস্ত্রিরা জো পেয়ে গেল। তারা আরও চড়া গলায় অস্বীকার করল আবার বদল দিতে। জিনিসটা হয়তো ঘনিয়ে উঠতো। সমাধান হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। রামশরণ সমস্তটা শুনে ঢালা হুকুম দিলে, "ফিন বদল দেও!" ঘরামিরা ফুরণে কাজ করে, তারা অস্বীকার করল। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল রামশরণ, "অত কোতায তোমার কাম কি বাবা? এটো হামি তুমার কাছে লিয়ে লিলম। তুমি হমার কাছে এর নাপি পাবে। লেকিন সাবকো ফিন্ বদল দেও।"

এর পর আর কথা চলে না। ওয়ার্ক-সরকারের দিকে ফিরে হেসে বললে, "আপনার সাহেবকে বলবেন—নাফা হামি জরুর করবে। সূঁচ না যাইতে দিলে কি হোবে—হাঁথি আমি জরুর চালিয়ে লিবে!"

প্রতি পদে ঠোকাঠুকি চলেছে তখন ঠিকাদারের সঙ্গে। প্রতিটি আইটেম এত খুঁটিয়ে পরখ করছে, যে সন্দেহ হতে পারে—রিফ্যুজিদের বাড়ি নয়—তাজমহলের মেরামতি কাজ তদারক করছে কেউ। মাপে এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ কম হলেও শালখুঁটি নাকচ হয়ে যায়—নির্ভেজাল মগরা বালি ছাড়া কাজ হয় না—এমন কি এই কাজের জন্যেও এস. ডি. ও 'স্লাম-টেস্ট', 'সিভ-টেস্ট' করিয়ে কাজ করাতে হবে বলে হুকুমজারি করতেও দ্বিধা করল না। রামশরণ কোনও প্রতিবাদ করেনি! অননুমোদিত মাল গাদা দেওয়া থাকল ঠিকাদারের গুদামে। একটা প্রত্যাঘাত প্রতিনিয়তই আশঙ্কা করছিল ঋতব্রত। অচিরেই দেখা দিল সেটা। মিস্টার ডাট আর একবার পরিদর্শনে এলেন। হাতে রামশরণের দেওয়া ক্ষতিপূরণের একটা লম্বা ফিরিস্তি। বিভাগীয় গাফিলতিতে তার কি কি ক্ষতি হয়েছে তারই লম্বা লিস্টি। রামশরণকে ডেকে ধমক দিলেন দত্তসাহেব, "এসব কি ছেলেমানুষি করেছেন? তিন লাখ টাকার কাজে পাঁচ টাকা সাত টাকার দুশো খেসারত দাবি করতে দেখিনি কখনও আমার বিশ বছরের চাকরি জীবনে!"

কথাটা তিনি জানিয়েছিলেন ইংরাজীতেই এবং যে জবাবটা রামশরণ দিয়েছিল তার বিচিত্র ভাষায়—তার মর্মার্থ হল : লাখো শালবল্লার ভিতর বেছে বেছে এক সুতো মাপে ছোট বল্লা বাদ দিতে সেও দেখেনি তার ত্রিশ বছরের ঠিকাদারী জীবনে! কথাটা বলেছিল সে বিনীত ভঙ্গিতেই, কিন্তু আকুঞ্চিত হল দত্তসাহেবের।

স্টোর ঘুরিয়ে রামশরণ দেখাল অননুমোদিত মালের গাদা। দত্তসাহেব বিস্মিত হয়ে ঋতব্রতকে জিজ্ঞাসা করলেন সেগুলো কেন বাতিল হয়েছে।

"ওগুলো আণ্ডার-স্পেসিফিকেশনের মাল স্যার।"

"আণ্ডার-স্পেসিফিকেশন? মাই ফুট! দে আর শর্ট বাই ফ্রাক্শনস অব ইঞ্চেস! অ্যাকসেপ্ট দেম অল।"

"আপনি তা হলে লিখিত অর্ডার দিন স্যার।"

"দ্যাট আই কান্ট, ইউ নো!"

"ওয়েল, দেন আই কান্ট অ্যাকসেপ্ট!"

ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হল ডাট সাহেবের। পাইপটা ধরিয়ে নিলে বললেন, "অ্যাম আই দেন টু বিলিভ দি স্টোরি অব্ দি কন্ট্রাক্টর দ্যাট ইউ হ্যাভ পারসোনাল মোটিভস্ ইন হ্যারাসিং হিম, বোস?"

"ইট্স্ আপ্ টু ইউ টু বিলিভ এনিথিং ইউ প্লিস্।"

"আই সী!"

কোনও কাজ পরিদর্শন না করেই জীপে গিয়ে বসলেন দত্তসাহেব। একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করলেন "বাই দি ওয়ে, হু কুক্স য়োর ফুট?"

"আমার একজন মেইডসার্ভেণ্ট আছে এখানে ; সেই রান্না করে।"

"মে আই নো হার নেম?"

সেনগুপ্ত শুনতে না পাওয়ার ভান করে এক পা পিছিয়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে নিল রামশরণ। কা দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল ঋতব্রতের, বললে, "নো য়ু মে নট! বিকজ দ্যাটস্ এগেন অ্যাবসোলিউটি মাই পার্সোনাল অ্যাফেয়ার্স!"

"আই সী!" জীপে উঠে ডাটসাহেব শুধু বললেন, "ইউ স্যাল হ্যাভ টু পে হেভিলি ফর য়ো ইনসোলেন্স!"

একরাশ ধুলো উড়িয়ে জীব রওনা হয়ে গেল।

ঘরে ফিরেই একটা ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত লিখে ডাকে দিয়ে রওনা হয়ে পড়ল ঋতব্রত! তা চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলবে তাঁকে, তারপর দরকার হ পদত্যাগ করবে সে।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংটার সামনে ঋতব্রত পায়চারি করছিল। স্টেশনের বাস কখন আসবে জা নেই। তাড়াতাড়ি কলকাতা যাওয়ার প্রয়োজন, সুতরাং অবিলম্বে বেরিয়ে পড়েছে। কখন বাসের টাই আছে, স্টেশনে ট্রেনই বা আসবে কখন, খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। খেয়াল হয়নি ট্রেন বাস না থাকলে তাকে অহেতুক অপেক্ষা করতে হবে পথের মধ্যে।

ওর ওই সব ছোটোখাটো কাজেই বুঝতে পারি কেন সে চাকরিজীবনের প্রথম অধ্যায়ে শু ঝগড়াই করে গেল সবার সঙ্গে। যেটা করণীয় মনে করেছে, তখনই করেছে সেটা, অগ্রপশ্চাত বিবেচ না করেই এবং কোনও রকমে রেখে ঢেকে করার চেষ্টা করেনি। ফলাফল বা লোকে কী ভাববে ভে দেখাটা যেন ওর প্রয়োজন নেই। এর জন্যে যেন কোনও ক্ষেদও নেই তার। এই যে একঘণ্টা ধ রাস্তার উপর পায়চারি করছে আর সিগারেট ধ্বংস করছে এর মাঝে কি একবারও অনুশোচনা হয়ে তার—কেন কোনও খবর না নিয়ে রওনা হয়েছিল? আমার তো মনে হয় না!

"এক্সকিউস্ মি, আপনিই কি কন্‌সট্রাকশন এস. ডি. ও. মিস্টার হৃদয়ব্রত ঘোষ?"

ঘাড় ঘুরিয়ে ঋতব্রত দেখল একটা ল্যাণ্ড-রোভার এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। এক ভদ্রলো নিজেই চালক, ওকে জিজ্ঞাসা করছেন মুখ বাড়িয়ে। এগিয়ে এল সে, বললে, "আমার নাম ঋতব্রত বো

"ঠিকই ধরেছি!" ল্যাণ্ড-রোভার থেকে নেমে এলেন ভদ্রলোক। পরনে একটা কর্ডের প্যাণ্ট অ বুশ-কোর্ট। মাথায় একমাথা প্ল্যাটিনাম-ব্লণ্ড পাকা চুল, মুখে ধূমায়মান মস্ত চুরুট।

"আমার নাম সঞ্জীব চৌধুরি। আপনার সহপাঠী ত্রিদিব চৌধুরি আমার বড় ছেলে।"

"তাই নাকি? ও, ত্রিদিব এখন কোথায়?"

"ডি. ভি. সি-তে চান্স পেয়েছে একটা। বাই দি ওয়ে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? চলুন, আমি এ লিফট্ দিয়ে দি।"

"আমি যাব স্টেশনে। কলকাতা যাচ্ছিলাম। আপনি আমাকে তুমিই বলবেন। ত্রিদিবের ব আপনি।"

"দ্যাটস্ অল্, দ্যাটস্ অল। কলকাতা যাচ্ছেন? তাহলে স্টেশনে কেন—আমি বাই রোড কলকা

যাচ্ছি। আমার সঙ্গেই যাবেন চলুন।"

সঞ্জীব চৌধুরীর ল্যাণ্ড-রোভারে ঋতব্রত চলল কলকাতামুখো। সঞ্জীববাবু অত্যন্ত আমুদে লোক—গল্পটা একটু বেশিই করতে ভালবাসেন। সারা রাস্তা তিনি নাগাড়ে ড্রাইভ করতে করতে চুরুট খেলেন এবং চুরুট খেতে খেতে গল্প চালালেন। কোন একটি বিখ্যাত টার এণ্ড পেন্ট প্রডাক্টস-এ কাজ করেন তিনি। চার অঙ্কের মাহিনা পান। এ গাড়িখানা কোম্পানির। বার তিনেক সাগরপাড়িও দিয়েছেন কোম্পানির টাকায়। টার ম্যাকাডাম্ হাই-ওয়ে হচ্ছে বকুলতলা ক্যাম্পের ছ'মাইল উজানে। সেখানেই কাজ দেখতে আসেন তিনি প্রায়ই। ত্রিদিবের কাছেই শুনেছিলেন তিনি, তার এক সহপাঠী হৃদয়ব্রত ঘোষ ক্যাম্পে রিপেয়ার্সের কাজের তদারকিতে আছে। ওকে দেখে তাই আন্দাজে ধরেছিলেন। ঋতব্রত দেখল ওর নামটা আবার বিকৃত করেছেন ভদ্রলোক। সংশোধন করে দিল আবার, "আমার নাম ঋতব্রত বোস।"

"সো য়ু সেড জাস্ট নাউ। আই নো।"

সঞ্জীববাবু খোঁজ নিলেন কেমন কাজকর্ম চলছে। কী বুঝছে সে। নতুন চাকরিজীবন কেমন লাগছে তার। সে জিজ্ঞাসার মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতার সুর ছিল যে, এই শুভ্রকেশ বৃদ্ধের কাছে অকপটে অনেক গল্পই করে গেল ঋতব্রত। ধৈর্য ধরে সবটা শুনলেন চৌধুরী-সাহেব। বললেন,

"অ্যান্ড হি আসক্‌ড হার নেম ; এ?"

"হ্যাঁ, তাই তো জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।"

"উড য়ু টেক্ মাই অ্যাডভাইস?"

"বলুন?"

"সেই লোকটা—কী যেন নাম, তারাদাস না কি বললে, সে এলে মেয়েটিকে তার সঙ্গে যেতে দেবে না।"

"ক্যাম্প সুপারের পরামর্শ মত্রে নারী-আশ্রমেই পাঠিয়ে দেবো?"

"সার্টেনলি নট্!"

"তবে?"

"ভালো রান্না করে যখন, রাখ না তোমার কাছে। অবশ্য আমার একথা বলা উচিত নয়। তোমাব বিবেক যা বলে, তাই কর। তবে আমি হলে ঐ রকম করতাম।"

"কিন্তু লোকে তো অন্য রকম ভাবতে পারতো আপনার সম্বন্ধে?"

"আই কেয়ার এ ফিগ্ ফর দ্যাট্! ভাবলো তো বয়েই গেল। কে কী ভাবছে তার কী জান তুমি? এই তো আমি। আমি তো তোমার কাজে অন্যায় কিছু দেখিনি।"

উৎসাহিত হল ঋতব্রত। এই তো, তার মতো দৃষ্টিভঙ্গির মানুষও তো আছে দুনিয়ায়! সে আরও কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার পাশে। চৌধুরী-সাহেব পিছনের সীট থেকে ফ্লাস্কটা তুলে নিয়ে তরল মত কি একটা গলাধঃকরণ করলেন।

"উড ইউ লাইক টু হ্যাভ সম্ ড্রিংক?"

তীব্র গন্ধে পানীয়টার জাত সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ধারণা করা যায় অনায়াসে। মাথা নেড়ে ঋতব্রত অসম্মতি জানায়।

"দেন হ্যাভ সম্ স্মোক অ্যাট লীস্ট।

সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে ধরলেন চৌধুরী।

"না থাক।" ত্রিদিবের বাবার সঙ্গে বসে ধূমপান করতে ইতস্তত করা অস্বাভাবিক নয়! দরজা খুলে নেমে দাঁড়ালেন চৌধুর-সাহেব। কন্যাপক্ষের লোক যে ভঙ্গিতে দুটি হাত বাড়িয়ে বরকর্তাকে অভ্যর্থনা করেন 'আস্তাজ্ঞা হোক' বলে—সেই ভঙ্গিতেই চৌধুরী বললে, "দেন গেট ডাউন প্লীজ।"

বিস্মিত ঋতব্রতের কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দটার কোনও আক্ষরিক রূপ নেই। 'অ্যাঁ'—'আজ্ঞে' জাতীয় কি একটা বলতে চাইল সে। জবাবটা আসলে তাঁর?" গম্ভীর ভাবে বলেন চৌধুরী, "আই ডোণ্ট এন্টারটেন সচ্ কোম্পানি।

"কেন কি দোষ করলাম আমি?"

"ক্যাম্পের সামনে দেখলাম সিগারেটের স্মোকস্ক্রীন রচনা করছিলে, আর আমার অফার করা সিগারেট তুমি খাবে না?"

হেসে ফেলে ঋতব্রত। বললে, "কী আশ্চর্য! সিগারেট খেতে ইচ্ছে না করলেও জোর করে খাওয়াবেন আপনি?"

"নিশ্চয়ই না। সিগারেট খেতেই হবে এ কথাতো বলিনি। আমি বলেছি সিগারেট না খেলে তোমাকে নেমে যেতে হবে শুধু।"

ধু ধু করা প্রান্তরটার দিকে তাকিয়ে অগত্যা ঋতব্রত সিগারেট নিয়ে ধরালো, বললে, 'হ্যাঁ, আপনি যেন কি বলছিলেন?"

গিয়ার বদলাতে বদলাতে চৌধুরী-সাহেব বললেন, "লোকে কি ভাবছে না ভাবছে না ভেবে যা মন চায় করে যাবে।"

"আমি তো তাই করি—"

"ছাই কর! তা হলে এতক্ষণ সিগারেট ধরাচ্ছিলে না কেন? ইচ্ছে করছিল না বলে? দিব্যি তো ধোঁওয়া গিলছ এখন! অপরে কি ভাবছে না ভাবছে তোয়াক্কা না রেখে চললেই জীবনে উন্নতি করা যায়। য়ু অলওয়েস্ গেইন বাই দ্যাট।"

"কিন্তু আমার তো তাতে বরাবর ক্ষতিই হয়েছে।"

"আল্‌টিমেট্‌লি লাভ হবেই। এ অনেকটা ইংরেজদের যুদ্ধনীতির মতো, মাইণ্ড নট লুজিং অল দি ব্যাটল্‌স্ বিকজ ইউ স্যাল আল্‌টিমেটলি উইন দি ওয়ার! বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা তবে আমার গল্প শোন। আঃ সিগারটা নিভে গেল। উড য়ু হেল্প মি?"

ঋতব্রত দেশলাইটা জ্বেলে হাতের আড়াল করে ধরে। সমান বেগে গাড়ি চালাতে চালাতে সিগারটা ধরিয়ে নিলেন চৌধুরী সাহেব। আশ্চর্য ওঁর ধূমপান রীতি। ল্যাণ্ড-রোভারে দূর পাল্লার ড্রাইভ করার সময় যত ধোঁয়া বের হয় একজস্ট পাইপ দিয়ে, তার চেয়ে বেশি ধোঁয়া ছাড়ে তাঁর চুরুট। চেন-স্মোকিং-এর অপকারিতা সম্বন্ধে কেউ কিছু উপদেশ দিতে এলে বলতেন, "কী করব বল? দেশলাই কিনতে কিনতে ফৌত হয়ে গেলাম। দিস্ ইজ ওনলি টু কাঁট ডাউন বাজেট-হেড এক্সপেনডিচার অন ম্যাচবক্স।"

তাঁর গল্প শুরু করলেন চৌধুরী-সাহেব।

"কী বলছিলাম? আমার নিজের অভিজ্ঞতা? আজ আমি মস্ত অফিসার। অনেকের ঈর্ষার পাত্র কিন্তু কী ভাবে আমি জীবন শুরু করি জান? একজন সাধারণ রোড-সরকার হিসাবে। ছাব্বিশ বছর বয়সে এনট্রান্স পাশ করি, ত্রিশ বছরে বি, এস্‌সি!"

অবাক হয়ে গেল ঋতব্রত। ওয়ার্ক-সরকার থেকে ঘষে ঘষে এতদূর উঁচুতে উঠেছেন সঞ্জীব চৌধুরী?

"কী করে এতটা উঁচুতে উঠেছি জান? শুধু বাঙালের গোঁর জোরে। তখন আমি উড়িষ্যায় পোস্টেড, ওয়ার্ক-সরকারি করি। সে যুগে উড়িষ্যার অনেকটাই ছিল বেঙ্গল পি. ডাব্লু. ডি-র অধীনে আজকালকার মতো পঞ্চাশটা ডিপার্টমেন্ট ছিল না তখন। বেঙ্গল পি, ডাব্লু ডি-র চীফ ইঞ্জিনিয়ারই ছিলেন সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মহান অধিপতি! আমার বয়স তখন চব্বিশ পঁচিশ। বন্ধুদের বাবাদের সামনে তো নয়ই—লুকিয়েও বার্ডসাই খেতে শিখিনি তখন। ঠিক মনে নেই, বোধহয় টাকা বারো-

চৌদ্দ মাইনে পেতাম। ছাতি মাথায় দিয়ে রাস্তায় কুলি খাটাই। একদিন কাজ তদারক করছি, আগের বাত্রে 'রোড-ক্লোজ্‌ড্‌' লেখা সাইনবোর্ডটা সরিয়ে দিয়ে কয়েকটা লরি গিয়েছিল কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে। তাই এজিং ভেঙে গিয়েছিল অনেকটা। সেটা মেরামত করাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা মস্ত মটরগাড়ি এসে দাঁড়াল রাস্তা বন্ধের নিশানাটার কাছে। আমি যেখানে কাজ দেখছি সেখান থেকে ফার্লং দুই দূরে হবে। তবে রাস্তাটা সোজা থাকায় বেশ দেখতে পেলাম—ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে সাইন-পোস্টটা সরিয়ে দিল ; তারপর আবার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। হর্ন দিতে দিতে তীর বেগে গাড়িটা এগিয়ে আসছে। রাস্তা থেকে সরে গিয়ে মিস্ত্রি মজুরেরা পথ করে দিচ্ছে। আপাদমস্তক জ্বলে গেল আমার। রাস্তার পাশে শোয়ানো খালি ড্রামটা এনে রাখলাম রাস্তার ঠিক মাঝখানে। নিজেও দাঁড়ালাম তার পাশে। কুলিরাও উঠে দাঁড়াল। গাড়িটা হর্ন দিতে দিতে এসে থামল আমার ফুট-তিনেক দূবে। দেখলাম দুজন সাহেব আর একজন মেমসাহেব বসে আছে। ইংরাজি তখন বলতে পারিনা। সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যে—ঐ যে তোমরা যাকে বল ক্লাস নাইন। তাই হিন্দিতে ধমক দিলাম ড্রাইভারকে। '—দেখতে পাওনা রাস্তা বন্ধ? অন্ধ নাকি তুমি?' নোটবই বার করে টুকে নিলাম গাড়ির নম্বর। ওকে বললাম ব্যাক করে গাড়ি পেছিয়ে নিয়ে যেতে। ডাইভারশন দিয়ে যেতে হবে।

ড্রাইভারও খেঁকিয়ে উঠল, 'দেখছ না দামী গাড়ি, নিচে নামলে কাদা লাগবে। আর তো এসেই গেছি। ড্রামটা সরাও।'

রুখে উঠলাম আমি। পাঁচকথা শুনিয়ে দিলাম। দামী গাড়ি বলে মাথা কিনেছে নাকি? বেটা বোধহয ভেবেছে সাহেব-মেম দেখে ভিরমি খাবো আমি। আম্মো যশোরের বাঙাল! তেড়ে ধমক দিলাম। ড্রাইভার রুখে উঠল। তাকে থামিয়ে দিয়ে পিছনের সীটের মেমসাহেব বললে, 'এ বাবু, হমলোগকো যানে দো। বহুৎ জরুরী কাম হ্যায়।'

জরুরী কাম না হাতি! আপাদমস্তক জ্বলে গেল। নেহাৎ মেয়েছেলে—তাই শুধু বললাম, 'তা হয় না, মাপ করবেন।'

তখন তার পাশের সাহেবটা আমাকে কাছে ডেকে হাতের মধ্যে গুঁজে দিলে দুখানা নোট! 'যানে দো হমলোগকো! গর্দামে যানে সে গাড়ি খরাব হো যায়গী।'

ছুঁড়ে দিলাম নোট দুটো ওর কোলে। কী ভেবেছে বেটাবা? কালা আদমি মাত্রেই কুত্তা? দু'টুকরো রুটি ফেলে দিলেই কুঁই কুঁই করবে? কিছুতেই যেতে দেব না ওদের।

মেমসাহেবের মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। বললে, 'চলাও!'

গাড়ি ঘরঘর করে স্টার্ট নিল। কিন্তু যাবে কী হবে, রাস্তার মাঝখানে ড্রাম—বাকি রাস্তাটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছি আমি বিবেকানন্দের ভঙ্গিতে, বাহুবদ্ধপাশ!

তখন নেমে এল ও পাশের লালমুখো বিরাটাকার সাহেবটা। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। বেটার কোমরে ঝুলছে রিভলবার। ঝোলে ঝুলুক, আমারও পিছনে আছে দুশো কুলি—তাদের হাতে ধাবালো গাঁইতি। হাতির মত গোদা গোদা পা ফেলে সাহেবটা এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। ঠিক মুখোমুখি নয়, আমার মাথাটা তার বুকের প্রায় কাছাকাছি। বললে, 'ইউ ওন্ট লেট আস গো?'

বললাম: 'নো, নেভার!'

সাহেব আমার কাঁধে সের দশেক ওজনের হাতখানা রেখে বললে, 'ডু ইউ নো হু অ্যাম আই?'

বললাম, 'নো। হমার জাননে কো কোই জরুরৎ নেহী।'

আমার কথায় কর্ণপাত না করে সাহেব বললে, 'আই অ্যাম দি চীফ ইঞ্জিনিয়ার—বেঙ্গল পি. ডব্লু. ডি!'

এর চেয়ে বজ্রপাত হলে ভাল ছিল!

চীফ ইঞ্জিনিয়ারের নামটাই শুনেছি কেবল। সুপারিন্টেন্ডেট ইঞ্জিনিয়ারকেই জীবনে কখনও দেখিনি।

এক্সিকিউটিভ একবার এসেছিলেন রাস্তা দেখতে। দুশো রোড কুলি সার দিয়ে সেলাম করেছিল তাঁকে। ওভারসিয়ার বাবুও তাঁর কাছে কেঁচোটি। অথচ এই ওভারসিয়ারকেই আমরা যমের মত ভয় করি। ওভারসিয়ার, এস. ডি. ও., ই. ই., এস. ই—তার ওপর নাকি থাকেন সি. ই.। ঈশ্বরকে না দেখেও আমরা যেমন তাঁর উপস্থিতিটা স্বীকার করে নিই—তেমনি কলকাতার কোন একটি ঘরে সি. ই. বলে একজন আছেন এঁটা পুঁথিগতভাবেই জানা ছিল শুধু। সে দেবতাটি সাকার না নিরাকার জানা ছিল না। ভয়ে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল!"

চৌধুরীসাহেবের ল্যাণ্ড-রোভারটা মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল। হুংকার দিয়ে উঠলেন তিনি, "অব তুম মেরা গাড়িপর চড়, নেহী তো ম্যায় তুমারা উপর চড়ুঙ্গা!"

চমকে উঠল ঋতব্রত। ব্যাপারটা কিছুই নয়। একসার গরুর গাড়ি আসছিল রাস্তার মাঝ বরাবর। একেবারে পাশ দেয়নি। পাশ কাটিয়ে রোড ক্রেশট থেকে নেমে অনায়াসেই যাওয়া চলত ; কিন্তু সঞ্জীব চৌধুরী সে জাতীয় লোক নন। এক তিল পথ তিনি ছাড়বেন না মাঝরাস্তার। তাতে অ্যাকসিডেন্ট হয় সো ভি আচ্ছা! গরুর সিং-এ বনেটটা গিয়ে ঠেকল। ব্রেক কষে চুপ করে বসে রইলেন তিনি। গাড়োয়ানের দোষ নেই ; সে তাঁর গাড়ি আসছে দেখেনি। ফাঁকা পথ পেয়ে বেচারী ঘুমিয়ে নিচ্ছিল একটু। হঠাৎ শশব্যস্তে উঠে বসে গরুগুলোর ল্যাজ মল্‌তে মল্‌তে পাশে নামল। স্টার্ট দিলেন ফের চৌধুরী। গল্পেরও।

"কতদূর বলেছি? ও হ্যাঁ, চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে দেখে ঘাবড়ে গেছি। কিন্তু ঐ যে বললাম। আম্মো যশোরের বাঙাল! এক মিনিট পরে বললাম 'আপনাকে আমি চিনতাম না স্যর! সেলাম! কিন্তু তাহলেও বলব আপনারও যাওয়া উচিত নয় এই কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে। কারণটা তো আপনিই ভাল জানেন।'

সাহেব আমার কাঁধটা ধরে একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকানি দিলেন। তারপর দুটা হাত পকেটে পুরলেন। আমার মনে হল বোধহয় আমার কলার-বোনটাই খুলে নিয়ে পকেটজাত করলেন তিনি। আমার দিকে তাকিয়ে ইংরাজীতে একটা কিছু বললেন। মনে হল 'ওঁয়াও! ওঁয়াও!'

ঈশ্বর জানেন কি বলেছিল সে। তার ভাষা তো বুঝিইনি, এমন কি ওটাতে আমাকে গালাগালিই দিলে, রাগ প্রকাশ করল, না, খুশি হল তাও বুঝলাম না। গোদা গোদা পা ফেলে আবার গাড়িতে গিয়ে বসল। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল। চীফ ইঞ্জিনিয়ার শব্দটাই মালুম হয়ে থাক অথবা আমার সেলাম করাই লক্ষ্য করে থাক—মেট মুন্সি ততক্ষণে ড্রামটা সরিয়ে দিয়েছে। সামনের রাস্তা খোলা।

গোদা সাহেব ড্রাইভারকে কীযেন বললে। পিছনের সাহেবের সঙ্গে কি কথাবার্তা হল। বিন্দু-বিসর্গও বুঝলাম না। শেষে গোদা সাহেব, মানে চীফ ইঞ্জিনিয়ার আমায় কাছে ডাকল। তখনও আমার কাঁধটা টনটন করছে। ভাবলাম কলার-বোনটা ফেরৎ দেবে বোধ হয়। জিজ্ঞাসা করলে, 'হোয়াট্‌স্ য়োর পোস্ট?'

বললাম। দুই সাহেবে কি কথাবার্তা হল আবার। মনে হল পিছনের সাহেব আমার হয়ে কিছু সুপারিশ করছে। শেষে গোদা-সাহেব রাজি হল যেন। ভাবলাম আমার কাঁধের হাড়খানাই ফেরৎ দেবার কথা হচ্ছে বুঝি। হঠাৎ পিছনের সাহেব পকেটে হাত চালিয়ে কি একটা সাদা মত বার করে আমার হাতে ফেরত দিল। বললে, 'মিট মি অ্যাট ক্যালকাটা!'

কাঁধের সাদা হাড়টা ফেরত নিলাম। গাড়ি স্টার্ট দিল—সামনে খোলা রাস্তা থাকলেও, অবাক কাণ্ড, গাড়ি ব্যাক করে ড্রাইভারশন্ হয়ে ঘুরে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেয়েছি। ছুটলাম তখনই ওভারসিয়ার বাবুর কাছে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পরদিনই এস. ডি. ও. সাহেবের অফিসে। সব শুনে সবাই অবাক। চীফ ইঞ্জিনিয়ার যাবেন তা কেউ জানত না। কোথায় গেলেন তিনি, কবে ফিরবেন কেউ খবর রাখে না। সাতদিন পরেও যখন তিনি ফিরলেন না তখন সবাই সন্দেহ প্রকাশ করল। আমি তখন কলার-বোনটা প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করলাম। আসলে সেটা পিছনের সাহেবের নাম লেখা একটা কার্ড।

ঠিকানাও ছিল তাতে। গাড়ির নম্বরও দেখালাম। এস. ডি. ও. নম্বরটা জানতেন। সবাই আমার হঠকারিতার জন্য ব্যাপান্ত করতে লাগল। মুখ বুজে গাল খেলাম সবার কাছে।"

বাধা দিয়ে ঋতব্রত বললে, "তা হলে লাভ কী হল? চীফ ইঞ্জিনিয়ারও গাল দিলে, তার ড্রাইভারও গাল দিলে—আবার সব শুনে আপনাব অফিসের সবাইও গাল দিলে—"

সে কথায় কর্ণপাত না করে চৌধুরী-সাহেব বলে চলেন, "কার্ড দেওয়া আর দেখা করার কথা যাকে বলি সেই তেড়ে মারতে আসে। ওখানে গেলে কয়েদ করে রাখবে। অপমানের শোধ নেবে। দিন-সাতেক ইতস্তত করে একদিন ছুটি নিয়ে রওনা হলাম কলকাতামুকো। দেখিই না কী হয়! সেই আমার প্রথম পদার্পণ কলকাতায়। ঠিকানা খুঁজে গিয়ে পৌঁছলাম। বিরাট অফিস। টার প্রডাক্টস! সাহেব চিনতে পারলেন আমাকে। বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কত মাইনে পাই, কতদূর পড়েছি—বাড়তি কে কে আছে ইত্যাদি। শেষে বললেন 'হমার কাছে কাজ করবে বাবু?'

রাজি হয়ে গেলাম। সেই থেকে এই ফার্মেই আছি আজ বত্রিশ বছর। আমার সততা আর একগুঁয়েমিতে মুগ্ধ হয়েছিল গ্রে সাহেব। ভীষণ ভালোবাসতো আমাকে। নাইট ক্লাসে সেই আমাকে ভর্তি করিয়ে দেয়। চাকরি করতে করতে পরীক্ষা দেওয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত করে ;—মায় এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফি-টাও দিয়েছিল। পরে অবশ্য স্কলারশিপের টাকাতেই পড়েছি আমি।

পরে জেনেছিলাম গ্রে-সাহেব চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই সৎ কর্তব্যনিষ্ঠ ছেলেটিকে তুমি পুরস্কৃত করতে পার না? কোনও ইনক্রিমেন্ট অথবা লিফ্‌ট্‌?'

চীফ বলেছিলেন, 'এটা তোমাদের মতো প্রাইভেট ফার্ম নয় গ্রে, এখানে একটা নন-ম্যাট্রিককে তো আমি সাব-ওভারসিয়ার করতে পারি না।'

গ্রে বলেছিলেন, 'তাহলে ওকে দিয়ে দাও আমাকে। আমি ওকে দিয়ে প্রকৃত কাজ আদায় করে নেব। ও খাঁটি লোক। দেবে ওকে?' 'উইথ নো রিগ্রেট!'—হেসেছিলেন চীফ।

ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে আজ আমি উঠে এসেছি এইখানে। গ্রে সাহেবই অবশ্য এর জন্য প্রধানত দায়ী ;—কিন্তু তবু আমার মনে হয়—আমার উন্নতির মূলে রয়েছে সেই একদিনের গোঁয়ার্তুমি।"

ওদের গাড়ি তখন হাওড়া ব্রীজে উঠেছে।

ঋতব্রতের ডায়েরি থেকে খানকতক পাতা তুলে দিচ্ছি।

"কাল সকালে ক্যাম্পে ফিরে আসা গেল। পরশু সারা দিনটা চষে বেড়িয়েছি সারা কলকাতা। বন্ধু-বান্ধব যার বাড়িতেই গেছি খোঁজ নিতে—সে-ই অনুপস্থিত। এক একটা দিন এমনিই হয়। ভাগ্য যেন দিনের সবকটি যাত্রাকে নিষ্ফল করবার উদ্দেশ্যে আগে থেকে ওদের সরিয়ে দেয়। রেখাদের বাড়িতে সকালে গিয়েছিলাম—তখন সে ছিল না। সন্ধ্যাবেলা আবার আসব বলে এসেছিলাম। অথচ দেখি সে সন্ধ্যায় সিনেমায় গেছে। রেখা যে আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান। চিঠিপত্রও লেখে না বহুদিন। সন্দেহ হচ্ছে আমার পূর্বের আশঙ্কা অমূলক নয়। আমার চিঠি পাওয়ার পরই সে মধুপুরে রওনা হয়। মধুপুরেই গিয়েছিল কিনা কে জানে? হয়তো একটা Pleasure trip দিয়ে এল কোথাও অমন ঘোষের 'উইনসাম ম্যারো' সেজে। হবে নাই বা কেন? অমল ঘোষ বড়লোকের ছেলে। ওকালতি পাশ। ব্রিফলেস হলে কি হবে উর্ধ্বতন চর্তুদশ পুরুষই ব্যবস্থাটা পাকা করে গেছেন অধোস্তন চতুর্দশ পুরুষের অধোগমনের। সুতরাং রেখার মনের কথা আজ বোঝা সোজা। তার সব প্রহেলিকার অবসান হয়েছে। শ্রীমতী রেখা আজ আমার কাছে 'সরল-রেখাই', যদিও নগদ পেলাম তার প্রস্থের বিস্তারটাই—জ্যামিতিক অর্থে। ভাল। খেলায় হারজিত আছেই—কিন্তু সাতখানা গোল খেলেও পরাজিত দলকে একবার খেলা-সমাপ্তির টানা হুইশলটা শুনিয়ে দেওয়া হয়! আমার খেলা যে ফুরোল সেটা স্পষ্ট জানিয়ে হুইস্‌লটা বাজিয়ে দেওয়ার ভদ্রতাটুকুও কি আমি আশা করতে পারি না?

কলকাতায় চীফেব সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও বোকা হলাম। তিনি কাজের কথাই আলোচনা

করলেন শুধু। যে জন্যে কলকাতা গেলাম সে কথা বলবার উপক্রম করতেই ধমকে উঠলেন, 'আই ডোন্ট লাইক টু হিয়ার য়োর পারসোনাল ম্যাটারস্, বোস। অ্যাপার্ট ফ্রম সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলস, আই হোপ, ইউ হ্যাভ য়োর ওন সেন্স অব মরালিটি।'

এই সময় পিয়ন এসে দাখিল করল একটা ভিজিটিং কার্ড।

সেটা দেখে তিনি বললেন, 'আনে বোলো।'

তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে ও প্রসঙ্গ চাপাই পড়ে গেল।

ক্যাম্পে যখন এসে পৌঁছলাম—মেজাজটা খিঁচিয়েছিল। আমার ঘরের সামনে এসে দেখি বিরাট জটলা! বারান্দায় একখানা চেয়ার পেতে তফাদার সাহেব আসীন। ঘটনাটা মুখরোচক তো বটেই—নাটকীয়ও! এঁরা সমবেত হয়েছেন মহান উদ্দেশ্য নিয়ে—ক্যাম্পে দুর্নীতি বন্ধ করতে। রান্নাঘরের ভিতর উবুড় হয়ে পড়ে আছে কুসুম। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। শোনা গেল নাপিত ডেকে তার কেশমুণ্ডণ করা হয়েছে। শাস্তিটা সামান্যই—এই সেদিনও ইংল্যাণ্ডে ডাইনীদের পুড়িয়ে মারার নজির আছে। কুসুম দু নম্বর আসামী। প্রধান আসামীর দেখা পেলাম না—তাকে নিয়ে গেছে হাসপাতালে। রতন তো আমাকে দেখে হাউমাউ করে উঠল। তাকে থামিয়ে দিলাম। ঘটনাটা শোনা গেল তফাদারের মুখে। অপরাধ গুরুতর। এঁদের সদাজাগ্রত দৃষ্টি না থাকলে এই রকম দুর্নীতি বন্ধ করা যেত না।

আগের দিন তারাপদকে বাস থেকে নামতে দেখেছিল ক্যাম্পের কয়েকটি সমাজসেবী উৎসাহী কর্মী। তারা খবর রাখে আমি কলকাতা গিয়েছি এবং আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে রতনও গেছে গোলবাজারে যাত্রাদলের আসরে। কুসুমকে তার নির্দিষ্ট ব্যারাকে রাত দশটার সময়েও ফিরতে না দেখে এদের সন্দেহ হয়। অতঃপর অনুসন্ধান করা হয় আমার ঘরে। সেখানে দরমার দেয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাওয়া গেল কুসুম ও তারাপদকে আপত্তিজনক অবস্থায়।

দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর হঠাৎ পাওয়া নির্জন সুযোগটা ওদের হয়তো একটু বেশি আত্মহারা করে দিয়েছিল। কারণ সমাজসেবীরা দরজার বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে তফাদার প্রমুখ গণ্যমান্য কয়েকজনকে নিয়ে আসবারও সময় পায়। মধ্যরাত্রে লণ্ঠনের আলোয়, সোরগোল মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকাটা। বিনা খরচায় সার্কাস দেখবার দর্শকের অভাব হয়না কোথাও। ভাঙা যাত্রার আসর থেকে রতনও ফিরে এসেছে সেই সময়।

কাল অত রাত্রে ব্যবস্থা করা যায়নি, তাই আজ আমারই বারান্দায় হচ্ছে কোর্ট-মার্শাল! প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা সবাই হাজির। বিচারপতি নিজেই নাকি প্রধান সাক্ষী। বিচারে জুরীর অর্থাৎ তাবৎ দর্শক আসামীদ্বয়কে দোষী সাব্যস্ত করলেন। বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্পের পেনালকোডে বলে এ অপরাধে পুরুষ অপরাধীকে ফরিয়াদী পক্ষের লোকেরা চাঁদা করে চপেটাঘাত বর্ষণ করবে এবং নারী অপরাধিনীর গায়ে হাত দেওয়া যাবে না—শুধু তার মস্তক মুণ্ডণ করা হবে। প্রথম শাস্তিটি বিচারের পূর্বে এবং দ্বিতীয়টি বিচারের পরে সম্পন্ন করাই প্রথা।

আমি আসবার আগেই পরামানিক দু নম্বর আসামীর শাস্তিবিধান সমাপ্ত করেছে। বারান্দার এক পাশে ধুলোকাদায় লুটোপাটি খাচ্ছে মেঘকৃষ্ণ একরাশ চুল।

মনে পড়ল আর একদিনের কথা।...ছোট বোন কামিনী রোয়াকের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে দেখছিল বিস্ফারিত চোখে। উঠান ভরে গেছে এক গাঁ লোকে। ধুলোকাদায় উঠানের উপর বসে আছেন মা। তাঁর কোলে মাথা গুঁজে পড়ে আছে দিদি—একরাশ খোলা চুল লুটাচ্ছে কাদায়।

সেই একই দৃশ্য ;—তফাতের মধ্যে এখানে কাদামাখা চুলগুলো ওর দেহচ্যুত, এখানে নেই মায়ের কোলে মাথা গোঁজার সান্ত্বনা—আর বোধহয় তফাত এই যে এখানে বিচার করে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে—এবারে গুণ্ডা কর্তৃক ধর্ষিতা নয় সে!

তফাদার বললেন, "মেয়েটাকে এখুনি চলে যেতে বল ক্যাম্প ছেড়ে। রাস্তায় গিয়ে বসে থাকুক।

তারাপদ অবশ্য দু-চারদিন ক্যাম্পেই থাকবে এখন।"

কে একজন হুকুম তামিল করতে যাচ্ছিল ; হয়তো ধরেই আনতো কুসুমকে। বাধা দিল রতন। বললে, "বেশ তো। সাহেব তো এসে পড়েছেন। ব্যবস্থা উনিই করবেন এখন। আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?" বেশ বাগিয়ে বললে কথাটা—সেই হাউমাউ ভাবখানা নেই। তার বাধা দেবার ভঙ্গিতে থতমত খেয়ে থেমে গেল লোকটা।

কর্ণার্জুন যদি কখনও মঞ্চস্থ করি, কথা দিচ্ছি রতন, বিকর্ণর রোল তোর বাঁধা!

খেঁকিয়ে উঠল মারমুখী জনতা।

নরম সুরে হেসে তফাদারকে বললাম, "কেশাকর্ষণ পর্যায়টা তো সুসম্পন্ন হয়েছে—রাজসভার মাঝে বস্ত্রহরণ পর্বটা কি না করলেই নয়? সর্বসমক্ষে পথে আর তাকে নাই বার করলেন!"

তফাদার কথাটার জবাব দিলেন না। হয়তো বিচারকও আইনের দাস। এতটা করতে তাঁর আন্তরিক ইচ্ছাও ছিল না। জবাব দিলেন ডেপুটি ক্যাম্প সুপার ভৈরবচন্দ্র, "দুঃশাসনরা চেষ্টা করলেই কি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সম্ভব হয়? কলির কেষ্ট ঠাকুর ঠিক সময় হাজিরা দেয়ই!"

সে কথায় কর্ণপাত না করে তফাদারকে বলি, "ওর মাথাটা কামিয়ে দেওয়াই বোধহয় চরম শাস্তি হয়েছে। এরা চলে যাক, আমি কুসুমের যাওয়ার জন্য গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করছি।"

"উঃ! কী দরদ রে"!—জনতার কণ্ঠ।

মাথা তুলে মনে হল দ্বিতীয় সারি থেকে কথাটা বললে বড়খোকা।

আমি তফাদারকে বললাম, "এদের এখন যেতে বলুন।"

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল বড়খোকা, "আমরা সরকারি জমিৎ খারাইয়া আছি।"

এ উক্তিতে ক্যাম্প-সুপার তফাদার কোনও প্রতিবাদ করেন না। বুঝলাম তাঁরও অনুমোদন রয়েছে কথাটায়। এবারও ধীরকণ্ঠে বললাম, "মিস্টার তফাদার, আশা করি আপনি এদের বুঝিয়ে দেবেন যে, আমার বাড়ির সামনে কাউকে আমি এভাবে হল্লা করতে দেব না।"

তফাদার উঠে দাঁড়ালেন, "বেশ তো মেয়েটাকে আপনিই বার করে দিন না কেন?"

"না, তা আমি দেব না।"

"কেন জানতে পারি কি?" প্রশ্নটা ভৈরবচন্দ্রের।

"আমার খুশি।"

অশ্লীলতম একটা ইঙ্গিত ভেসে এল ভিড়ের মধ্য থেকে। জনতার মধ্যে রয়েছে ঠিকাদারের লোক, মিস্ত্রি, মজুর, ওয়ার্ক-সরকারেরা। রতনও আছে। এবার ধৈর্যচ্যুতি হল আমার—

"ক্যাম্পটা আপনার হতে পারে, এ ঘরখানা আমার। আমি দুঃখিত মিস্টার তফাদার, কিন্তু আপনি যখন এই সব কথা বরদাস্ত করছেন, তখন আপনাদের এখান থেকে চলে যেতে বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি।"

তফাদার তখন দাওয়া থেকে নিচে নেমেছেন। বললেন, "আমি যাচ্ছি, কিন্তু কতদিন পরে মেয়েটিকে ছেড়ে দেবেন জানতে পারি কি?"

"পারেন। যতদিন না তারাপদ আরোগ্যলাভ করে, একমাসও হতে পারে, বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়। আপনারা তাকে কতটা ঠেঙিয়েছেন তা তো জানি না।"

আবার একটা কি মন্তব্য শোনা গেল ভিড়ের মাঝে। এবার গর্জে উঠলেন তফাদার। ভিড় পাতলা হয়ে গেল। তফাদাররাও চলে গেলেন।

ঘরে এসে বসলাম। ক্যাম্পে এসে সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করেছি। একজন মাত্র বন্ধু পেয়েছিলাম ক্যাম্পে। খোয়ালাম আজ। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। রতনকে বললাম, কুসুমকে বলে দিতে সে যেন বাড়ির বাইরে না যায়। তার জন্য দুটি বেশি চাল নিতে বললাম হাঁড়িতে। রতন বললে, "আজ একাদশী।"

রান্না কুসুমই করল। সামলে নিল সে নিজেকে অল্পক্ষণেই। অনেক দুঃখের আগুনে পুড়ে কঠিন হয়েছে সে। অপমান তার অঙ্গের ভূষণ!

দুপুরে দেখতে গেলাম তারাপদকে। আমাকে দেখে কি বলতে গেল, পারল না। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুর ধারা। হাতখানা তুলে দেখাল—ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতখানা।

ফিরে এলাম ঘরে। কাজে গেলাম না সারাদিন। চুপ করে পড়ে থাকলাম শুধু। কুসুমকে আমার বাড়িতেই রাখব, যতদিন না ভালো হয় সে। এতে যে যত বাধা দিতে আসে আসুক, শুনব না। মনে পড়ল সঞ্জীব চৌধুরীর কথাগুলো। অফিসের ডাক নিয়ে এল রতন। চিঠি, চিঠি, আর চিঠি। বিল, প্রগ্রেস রিপোর্ট আর প্রোফর্মা। একখানা চিঠি এসেছে দেখলাম নতুন ধরনের। ক্যাম্প থেকে একটা দরখাস্তে জানানো হয়েছে এল/২৯ নম্বর ব্যারাকে কমলা নাম্নী একটি মেয়ের শ্লীলতাহানি করবার চেষ্টা করেছে আমাদেব ডিপার্টমেন্টের কোন স্টাফ। নাম উল্লেখ নেই—না অভিযোগকারীর, না আসামীর। গোপনীয় ছাপ মার্কা সেটা এসেছে আমার কাছে অনুসন্ধান এবং রিপোর্ট করার নির্দেশ সমেত। এ ভালো কাজ হয়েছে আমার!

সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ভালো লাগে না। পায়ে পায়ে চললাম এল/২৯ ব্যারাকের উদ্দেশ্যে। আজও দেখলাম বৃদ্ধ বসে বিড়ি পাকাচ্ছেন—পাগলটা কয়েকটা কাককে খাওয়াচ্ছে উচ্ছিষ্ট ভাত। সামনের মাঠে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে আর উড়ে উড়ে কাকগুলো খাচ্ছে তাই। মাঝে মাঝে উল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠছে পাগলা। বড়খোকা নেই, কমলার মাকেও দেখলাম না। পার্টিশনটা গাঁথা শেষ হয়েছে দেখছি। কমলা একটা ছেঁড়া শাড়ির প্রান্ত সেলাই করছিল। আমাকে যে দেখেছে তার প্রমাণ পেলাম আমার দিকে ভুলেও একবার তাকালো না দেখে। অনুসন্ধানটা কি করে করা যায়? কমলার মা ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা কব্বতে হবে। বসলাম গিয়ে বৃদ্ধের কাছে।

"আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম।"

চশমাটা কপালের উপর তুলে, আমাকে দেখে বৃদ্ধ হকচকিয়ে গেলেন—"আউহাইন, আউহাইন, বউহাইন,—আর বইবানই বা কই?" উঠে দাঁড়ালেন তিনি শশব্যস্তে!

কাঠের একটা ছোট বাক্স টেনে ততক্ষণে আমি বসে পড়েছি। আলাপ হল বৃদ্ধের সঙ্গে। আদি বাড়ি মৈমনসিং জিলা, থানা বাজিতপুর, গ্রাম মামুদপুর। বিড়ির বাণ্ডিল আর কুলো ভর্তি তামাকপাতা সরিয়ে রেখে বৃদ্ধ ভালো হয়ে বসেন গল্প করতে। বৃদ্ধের নাম রামনিধি চৌধুরী, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, আসল উপাধি লাহিড়ী। তাঁর পৈত্রিক ব্যবসা পৌরোহিত্য করা। ঘরে সাতপুরুষের নারায়ণ ছিলেন। তাঁরই সেবা করতেন। বিশ-পঁচিশ ঘর বর্ধিষ্ণু যজমান ছিল। পাঁচ ঘর থেকে যা পেতেন তার উপর ছিল রানীপুরের জমিদারের মাসোহারা। গল্প বলতে বলতে মেতে উঠলেন বৃদ্ধ। যেন ফিরে গেছেন তিনি জন্মভূমিতে। প্রকাণ্ড চক্‌মেলানো রানীপুরের জমিদারবাড়ি। সামনে বার মহল, এ পাশে কাছারি—তারপর একটা বিরাট অঙ্গন পার হয়ে অন্দরে আসতে হয়। বার বাড়ি আর অন্দর বাড়ির মাঝের অংশটায় গোল-পোস্ট পুঁতলে অনায়াসে ফুটবল খেলা চলে। অন্দর মহলেও বিরাট ব্যবস্থা। বড়বাবু, মেজবাবু, সেজবাবু আর ছোটবাবুর তরফ। প্রত্যেক তরফে কাজ করবার জন্যে আলাদা চাকর, আলাদা ঝি। এপাশে সমস্ত পশ্চিম দিকটা জুড়ে রান্নাঘর। পশ্চিম দিকের দীঘির পাড়ে রানীপুরের বর্তমান জমিদারের প্রপিতামহ বরেন্দ্রকিশোর লাহিড়ী চৌধুরির প্রতিষ্ঠিত "ধর্মরাজ" শিবলিঙ্গ। প্রচলিত নাম "বুড়ো রাজা"। বরেন্দ্রকিশোর এ পরিবারে দত্তক এসেছিলেন বর্ধমান থেকে, শিবের নামকরণ থেকেই সেটা অনুমান করা যায়। সরোবরের ভিতর একটা নকল দ্বীপ, তার মাঝখানে শ্বেত পাথরের একটা বাঁধানো চত্তর। কাঠের সেতু বেয়ে দ্বীপে যাওয়া যায়। মেজবাবুর ছিল বাগানের শখ—তাঁর লাগানো পদ্মফুলে লাল হয়ে থাকতো দীঘিটা।

বাধা দিয়ে বলি, "জমিদারের কথা থাক, আপনার কথা বলুন।"

হাসেন সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ, "আমার কথা আর কি কইতাম বাবা? আছিলাম জমিদারের পুষ্য, অহন হৈছি সরকারের পুষ্য!"

যেন একটা চরম রসিকতা হল। পরাণখোলা হাসি হাসলেন তিনি হা হা করে। হাসির ধমকে কমলা একবার মুখ তুলে চাইল শুধু। আবার শুরু করেন তাঁর গল্প। দেশের কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ।

বর্ষায় ভেসে যায় দেশ। যে মাঠে কপাটি খেলত ছেলেরা ফাগুন-চৈত্র মাসে, সেখানে পাঁচ সাত হাত ঘোলা জলের ঘূর্ণিপাক ভেসে চলে। এপাড়া ওপাড়া যাতায়াত করতে হয় ডিঙ্গি নৌকায়। তর্ তর্ করে বাড়ে জল। সন্ধ্যায় দেখা দৃশ্য বদলে যায় সকালে। জলের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে ধানের চারা। সেই ধান যখন পাকে, নৌকা করে কাটতে যেতে হয়। তলাকার খড়গুলো অবশ্য পায় না চাষীরা। পচে যায় জলে। তা যাক, ধানই মা লক্ষ্মী—সেখানে মায়ের অকৃপণ দান!

সেই জল একদিন সরে। তরতরিয়ে সরে যায় গৈরিক বসনা চঞ্চলা মেয়েটি। পলিমাটির চাদর মুড়ি দিয়ে তলা থেকে দেখা দেয় নিচেকার মাটি। আর সেই সঙ্গে আকাশে এসে জোট পাকায় পুঞ্জ পুঞ্জ তুলোপেঁজা মেঘ! নৌকা ছেড়ে পথে পা দেয় মানুষ। এই মহালগ্নেই হয় মায়ের বোধন। সে মহাপূজার আনন্দ কোথায় পাবেন?

গলা ভারি হয়ে আসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের। উদ্দেশ্যে যুক্তকর কপালে ঠেকান তিনি। তাঁর মানসচক্ষে ভেসে উঠেছে মায়ের মূর্তি,—'মা যা ছিলেন!'

আমার দেরি হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে বৃদ্ধকেই জিজ্ঞাসা করি তাঁদের ব্যারাকে আমার কোনও কর্মচারী কখনও কোন দুর্ব্যবহার করেছে কি না। বৃদ্ধ বিস্মিত হন, বলেন, "কই না!"

কমলার মা তখনও ফেরেননি। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আমি উঠি। বৃদ্ধ উঠে হাত দুটি জোড় করেন। আমি কমলার দিকে এগিয়ে আসি। সেও উঠে দাঁড়ায়।

"তোমার মাকে বলতো সময়মত আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে।"

"মার যাওয়া সম্ভবপর হবে না।"

নত নয়নেই বলল কথা কটা। মনে পড়লো তার মার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের দিন কটা কড়া কথা বলেছিলাম। ও! তাই উনি যেতে পারবেন না। বললাম, "খুব পারবেন। এই ত আমি এসেছি তাঁর কাছেই। তিনি নেই তাই ফিরে যাচ্ছি। তুমি তাঁকে বল' কাল একবার আমার ওখানে যেতে।"

"তাঁর যাওয়া সম্ভব নয়—তাঁর শরীর খারাপ।"

স্পষ্টই বোঝা যায় মিথ্যা কথা বলছে কমলা—না হলে তার মা বাইরে বেড়াত না এই সন্ধ্যা পর্যন্ত। রাগ হয়ে গেল। বললাম, "ভালো কথা। তবে কর্তব্যটা এখনই সেরে যাই। তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি। আমার কোন কর্মচারী তোমার, মানে, তোমাদের উপর কোনও দুর্ব্যবহার করেছে কি?

"দুর্ব্যবহার?"

"হ্যাঁ, মানে কারুর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আছে তোমার?"

"কেন বলুন তো?" চোখে চোখে চাইল কমলা স্পষ্ট করে।

"তাহলে আমি তার প্রতিবিধান করতাম।"

একমিনিট চুপ করে রইল। একটু ইতস্তত করে বললে, "ক্যাম্পে এতলোক থাকতে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করবে এ সন্দেহ হল কেন আপনার?"

"কারণটা তো বোঝই ; এবং সে সম্বন্ধে তোমাকে তো বেশ সচেতনই মনে হয়।"

কমলার মুখখানা লাল হয়ে উঠল ক্ষণিকের জন্যে—কিন্তু আঘাতটা সে ফিরিয়ে দিলে দৃঢ়স্বরে, "সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে উপায় কি? আপনারা পাঁচজনেই তো আরও সচেতন করে তুলেছেন আমায়!"

আশ্চর্য! নতমুখী মেয়েটাকে যতটা লাজুক, যতটা সাধারণ মনে হয়েছিল সে তো তা নয়! ভেবেছিলাম আমাকে অগ্রসর হয়ে কথা বলতে দেখেই বুঝি জড়পুঁটুলির মতো শম্বুকবৃত্তি গ্রহণ করবে। তা তো নয়ই, বরং কাটা কাটা কথায় আঘাত করতে ছাড়ে না। বললাম, "আমরা পাঁচজন? অর্থাৎ আমিও! তোমার বড় বড় চোখ দুটোয় তো অনেক কিছুই ধরা পড়ে।" বলেই দংশন করলাম জিহ্বা! একথাটা কেন বললাম! ছি ছি! মেয়েটা কী ভাবল?

কী যে ভাবল তা বোঝা গেল পরক্ষণেই। দপ্ করে জ্বলে উঠল ওর চোখ দুটি "নিশ্চয়ই! কেন নয়? ক্যাম্পের আর কোনও ঘরে তো পার্টিশন হতে দেখলাম না?...যাই হোক আপনি অনেক উঁচুতে ; আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার শোভা পায় না। আপনার প্রশ্ন ছিল কন্সট্রাক্শন ডিপার্টমেন্টের কেউ আমার প্রতি কোনও দুর্ব্যবহার করেছে কিনা। আমার জবাবটা্ও শুনে যান। হ্যাঁ করেছে। তবে সে অভিযোগ আমি এমন কোনও অফিসারের কাছে করতে চাই, যিনি অপরিচিতা যুবতীর চোখ বড় বড কিনা লক্ষ্য করেন না।"

কানে কে যেন সিসা ঢেলে দিল। ক্যাম্পে এসে ঝগড়া করেছি অনেকের সঙ্গেই। মাথা উঁচু করে প্রত্যাঘাত করেছি সকলকেই ; অথচ এই এক ফোঁটা মেয়েটার কাছে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কোনরকমে বললাম, "তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি সেভাবে কথাটা বলিনি। হয়তো অন্যায়ই হয়েছে আমার ও কথা বলা। তবু বিশ্বাস কর, তোমাকে অপমান করার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না আমার।"

মাথা নিচু করে ফিরে এলাম। বৃদ্ধ রামনিধি তখনও বসে আপন মনে বিড়ি পাকাচ্ছেন। পাগলটা বসে আছে বাইরে।

ঘরে ফিরে এলাম যখন, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ। ক্যাম্পের এখানে ওখানে শাঁখ বাজছে—কোথায় যেন কাঁসর ঘণ্টাও বাজছে। যেন ক্যাম্প নয়, এটা গ্রাম! দেখি ঘরের সামনে একটি গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার উপর শুয়ে আছে তারাপদ। আমার প্রত্যাবর্তনের জন্যেই ওরা অপেক্ষা করছিল বোধকরি। আমি আসতেই কুসুম বেরিয়ে এসে আমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। তারপর গরুর গাড়িতে তারাপদর মাথার কাছে গিয়ে বসল। মালপত্র যে কটি ছিল আগেই তোলা হয়েছে গাড়িতে। গাড়ি ছেড়ে দিল।

বুঝলাম, রতনকে দিয়েই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়েছে কুসুম। ডেকে ধমক দিলাম রতনকে, সে কেন জানায়নি আমাকে পূর্বাহ্নে। রতন চুপ করে গাল শুনল। বোধহয় হতভাগার ধারণায় কুসুমের চলে যাওয়াটাই তার মনিবের পক্ষে মঙ্গলকর মনে হয়েছে এবং এ-ও সে মনে করেছিল আগে জানলে আমি বাধা দিতে পারি।

রাত্রে আহারাদির পর রতন একটি বন্ধ খাম এনেদিল আমাকে। কুসুম এটা নাকি আমাকে দিতে বলে গেছে। খুলে দেখি তার মধ্যে রয়েছে একখানি চিঠি আর একটি ফটো। ফটোখানা ডায়েরিতে ধরে রাখা যাবে না তাই চিঠিখানাই শুধু তুলে দিলাম।

চিঠিখানা সত্যিই আমাকে বিহ্বল করেছে। এই তাহলে কুসুমের ইতিহাস? আমার ক্যাম্প জীবনে কুসুমের নাটক এখানেই শেষ। তাই ভাবছি নাটকটা বিয়োগান্তক, না মিলনান্তক? মেলোড্রামা নয় তো?

'শ্রীচরণকমলেষু,

আপনার দয়া ও দাক্ষিণ্য জীবনে ভুলিব না। আমার জীবনের অনেক কথাই রতনদা আপনাকে গল্পচ্ছলে বলিয়াছে জানি,—নিজের কানেও কিছু শুনিয়াছি। কিন্তু একটা কথা রতনকে আমি বলি নাই, কাহাকেও বলি নাই। বলিবার উপায় ছিল না। আপনাকে আজ তাহা না বলিয়া যাইতে পারিতেছি না। কারণ সত্যটা আপনার নিকট গোপন করিয়া গেলে আপনার নিকট একজন অযথা মিথ্যাবাদী থাকিয়া

যাইবেন। আমি ঘৃণ্য জীব—আমার কথা ভাবি না—কিন্তু উনি আপনাকে মিথ্যা বলেন নাই। আমার সহিত তাঁহার কোনও অবৈধ সম্পর্ক নাই।

আমি জানি আমার একথা আজ বিশ্বাস করা কঠিন। তাই প্রমাণ-স্বরূপ এই ফটোখানি রাখিয়া গেলাম। এটি আমার বিবাহের পরদিন আমার দাদা তারাপদ উঠাইয়াছিলেন। আমার এপাশে মা, পিছনে হরিহর গাঙ্গুলী মহাশয়। দাদা ফটো তুলিয়াছিলেন—চিত্রে তিনি নাই।

ফটো দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যাঁহাকে আপনি তারাপদ নামে চিনেন তিনিই আমার স্বামী। তাঁহার আসল নাম বিশ্বানাথ। আমার দাদা পথেই মারা যান। আপনি শুনিয়াছিলেন আমার স্বামী মারা গিয়াছেন। অনাথা বিধবা বলিয়া পি. এল. কার্ড পাই এবং ক্যাম্পে আশ্রয় পাই। আমার স্বামী গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘদিন পরে খুঁজিতে খুঁজিতে আমার সাক্ষাৎ পান এই ক্যাম্পে। তখন তাঁহার যক্ষা হইয়াছে। ফেরারী আসামী বলিয়া এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য রোজগারের কোনও ব্যবস্থাই তিনি করিতে পারেন নাই। তাই আমার বৈধব্য-বেশ ঘুচাইতে পারি নাই। আশা ছিল শীঘ্রই স্বামীপুত্র লইয়া আবার সংসার পাতিতে পারিব; কিন্তু আজ যে অবস্থায় ওনাকে লইয়া যাইতেছি—ভয় হয় এ বেশ পরিবর্তনের সুযোগ হয়তো আর ইহজীবনে আসিবে না।

এ জীবনে এ কলঙ্কিনীর মুখ আর কখনও দেখিবেন না। বিচারে যাঁহারা আমাদের দোষী সাব্যস্ত করিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই, কিন্তু বলিতে পারেন কোন্ পাপে আজ আমরা এই অপরাধে অপরাধী?

আপনার সৌজন্য ও মহানুভবতার কথা জীবনে ভুলিব না।

—ইতি প্রণতা হতভাগিনী কুসুম।

পুঃ—ফটোখানি নষ্ট করিয়া ফেলবেন।"

কুসুমের শেষ অনুরোধ রাখেনি ঋতব্রত। তার কাছে সেই ফটোখানা দেখেছিলাম। বরবধূ বেশে কুসুম ও বিশ্বনাথ। ঋতব্রত বলেছিল গালের ঐ আঁচিলটা আর মুখের আদলটা না থাকলে বিশ্বনাথকে চেনাই যায় না ফটো দেখে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবাপুরুষের ফটো। বরকণের ছবি।

ক্যাম্পেব কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। মেমপাড়ার ঘরগুলো সবই সারানো হয়ে গেছে। বকুলতলার সমস্ত ঘরও মেরামত শেষ হয়েছে। কাজ জোর চলেছে এখন গলাদ' অঞ্চলে। স্টেশন রোড থেকে গোলবাজার পর্যন্ত বিস্তীর্ন অঞ্চলটায় এখন কাজের চাপ বেশি। ঘুরে ঘুরে কাজ দেখে ঋতব্রত। একঘেয়ে কাজে বিরক্তি আসে তার। বর্ষা ভালো ভাবেই নেমে গেছে। তফাদারের ঘরটা এখনও ছাওয়া হয়নি। তিনি দেননি। বৃষ্টির মধ্যেই মালপত্র টানাটানি করেন। হাসপাতালটা সারানো হয়েছে। লেডিজ ওয়েটিং রুমটা তৈরি হয়েছে; ডাক্তারের জন্যে একটি বাড়তি চাকরের ঘরও তোলা হয়েছে। বিশেষ আদেশ আনিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। বেশ ঘটা করে নূতন ঘরটির উদ্বোধন করলেন ডাক্তার সাধুচরণ। এক সন্ধ্যায় নৈশ ভোজনে নিমন্ত্রণ করলেন কয়েকজন বন্ধুকে। দফাদার অবশ্য সেদিন কলকাতা গিয়েছিলেন। ডাক্তারের তাতে খুব অসুবিধা হয়নি অবশ্য। রামশরণ তার ইয়ারবন্ধু নিয়ে এসেছিল। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি-সুপার ভৈরবচন্দ্র। অনেক রাত পর্যন্ত পানাহার চলেছিল। গুজব, নিমন্ত্রণকর্তা ডাক্তারবাবু হলেও সমস্ত খরচ রামশরণের।

ক্যাম্পের একটানা জীবনে বৈচিত্র্য নেই। ভিড় হয় ডোল অফিসের কাউন্টারে। কার্ডে দাগ দিয়ে হিসাব করে টাকা দেন ললিতবাবু—ডোল ক্লার্ক। মাথাপিছু চার টাকা নয় আনা করে পায় প্রাপ্তবয়স্করা পক্ষকালের জন্যে। ছোটরা পায় তিন টাকা দুই পয়সা। প্রাপ্তবয়স্কের সংখ্যাটা এখানে বিচিত্র। আট বছর বয়স হলেই এবা সবালক পি. এল.! এই আট বছর বয়স হয়েছে কিনা এ নিয়ে কি বাক্-বিতন্ডা হয় এক একদিন।

ক্যাশ-ডোল অফিসের উল্টোদিকে রেশনের গুদাম। থলি ভরে রেশনও নিয়ে যায় কার্ডে লিখিয়ে। দু' সের চাল, দু' সের আটা আর চৌদ্দ ছটাক ডাল। পনের দিনের রসদ। আট বছরের কম বয়স হলে অর্ধেক রেশন। রেশনের গুদামে ইঁদুরের গর্তটা আর কিছুতেই বন্ধ করতে পারল না ঋতব্রত। সমস্ত মেজেটা খুঁড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চার ইঞ্চি সিমেন্ট কংক্রিট করে দিল চার : দুই : এক মশলা দিয়ে। অথচ দুর্দমনীয় ইঁদুরের দল এই কুলিশকঠোর কংক্রিট ভেদ করে উঠে আসে। এ নিয়ে বহুবার বকাবকি শুনতে হয়েছে তাকে। কিন্তু ইঁদুরগুলোও নাছোড়বান্দা। ছেনি নয়, হাতুড়ি নয়, শুধু নখ আর দাঁত দিয়েই ওরা অসম্ভবকে সম্ভব করে চলেছে। এখনও প্রতি মাসে ইঁদুরের খাতে একটা বিরাট অঙ্ক খরচ লেখা হয়। বড় বড় চিঠি আসছে কৈফিয়ৎ তলব করে—নিশ্চয়ই ঠিকমত মশলা দেওয়া হয়নি, না হলে কী করে গর্ত হয়?

মন্থরগতিতে চলে ক্যাম্পের জীবন। দিন আনে, দিন খরচ করে ওরা। কোনও ভাবনা নেই, কোন চিন্তা নেই। অসুখ হলে ভগবানকে ডাকে, ডাক্তার ডাকে না। সন্তান হলে প্রথম কর্তব্য হল কার্ডে লিখিয়ে নেওয়া—মরে গেলেও হাঙ্গামা নেই—খবর দিয়ে আসে ক্যাম্প-অফিসে। ওদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, চাল-চুলো-ঘর-বাড়ি কিছুরই বালাই নেই। একেবারে কৌপীনবন্তং খলু ভাগ্যবন্তং। কিন্তু ঋতব্রতের মনে হয় সবচেয়ে বড় 'নেই'টা হচ্ছে এদের ভবিষ্যতের চিন্তা। ওদের জীবন-নাট্যের শেষ যবনিকা যেন পড়ে গেছে ক্যাম্পে ঢোকার পরেই। আর কারও কিছু করণীয় নেই—অভ্যাসমত দিনে কয়েকবার হাহুতাশ করা ছাড়া। মীরাবাঈ যেমন তনুমনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন কৃষ্ণে—এরা তেমনি সমস্ত সমর্পণ করেছে সরকারকে! দায় ঝক্কি নেই কোন!

দীনতম দিনমজুর, দরিদ্রতম কৃষক, কলকাতার ফুটপাতে শায়িত ভিক্ষুককেও দেখেছে সে। তাদেরও থাকে আয়ের চিন্তা, উন্নতির আকাঙ্খা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন! এদের তাও নেই। এদের তুলনায় কয়েদীদের জীবনও ভাল, বরণীয় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের জীবন। প্রথম জন স্বপ্ন দেখে মুক্তি দিনের, দ্বিতীয় জন প্রত্যাশা করে যুদ্ধাবসানের। ফাঁসীর আসামীরও থাকে একটা সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পরিণতি!

হঠাৎ নিজের উপরই বিরক্ত হয় ঋতব্রত। সে কি অন্যায় করছে না এদের প্রতি? ঐ তো বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামনিধি চৌধুরী বিড়ি বানাচ্ছেন—ঐ তো পীচের রাস্তার উপর বিছিয়ে ধান শুকাচ্ছে ওরা। গৃহসংলগ্ন একমুঠো জমিতে লাউ-কুমড়ো-ঢ্যাঁড়সের গাছ লাগিয়েছে সবাই। বাঁচবার জন্যে আকাঙ্খা কি ওদের কম? এই পরিবেশেও তো পঁচিশে বৈশাখে স্মরণ করেছে কবিগুরুকে—যখন তার মনেও ছিল না সেকথা!

এদের জন্যে মাসে মাসে বছরে বছরে অপর্যাপ্ত হস্তে সরকার খরচ করে চলেছে। এদের প্রয়োজনের তুলনায় হয়তো পর্যাপ্ত নয়, তবে সরকারের তহবিলের পক্ষে তা ক্ষমতার অতিরিক্ত। যতটা খরচ হয় সবটা ওরা হাতে পায় না, তবু তো এরা আজও প্রাণে বেঁচে আছে। কিন্তু এ বাঁচার শেষ কোথায়?

আট-দশ বছরের যে নাবালক ছেলেটি মায়ের হাত ধরে একদিন ঢুকেছিল ক্যাম্পে আজ সে হয়তো পনের-ষোল বছরের প্রাণচঞ্চল কিশোর। তবু আজও সে ডোলভুক্ পি. এল.! চল্লিশ বছরের পঙ্গু স্বামীটি যখন স্ত্রীর হাত ধরে ক্যাম্পের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন তখনও তিনি ছিলেন পি. এল.—আজও তাই। কিন্তু এই ছ' সাত বছরের তিনি যে তিনটি রুগ্ন শিশুকে পৃথিবীর আলোকে নিয়ে এলেন, তারাও পি. এল.! এই অনন্তপথযাত্রীদের শেষ তীর্থ কোথায়?

"স্যার!" রতন এসে দাঁড়িয়েছে।

"কিরে?"

"কমলা এসেছে স্যার। আপনার সঙ্গে দেখা করবে।"

"কমলা? এখানে? না তার মা?"

"না স্যার, কমলা নিজেই এসেছে।"

"ও আচ্ছা, ডেকে দে।"

কমলা এসে প্রবেশ করে। মলিন শাড়ি একখানি সাধারণ করে পরা। গায়ে একটি ব্লাউজ। মাথার চুলগুলি রুক্ষ। বোধহয় কয়েকদিন তেল মাখে না, অথবা সাবান দিয়ে মাথা ঘষেছে। রতন ওকে পৌঁছে দিয়ে চলে যাচ্ছিল—ঋতব্রত ডেকে বললে ওর বিছানাটা পেতে দিতে। রতন বিছানা পাততে থাকে। নির্জন ঘরে কমলার সঙ্গে কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল বোধহয়।

"বস" বললে ঋতব্রত।

কমলা বসল না। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে আঁচলটা পাকাতে লাগল শুধু।

"বল, কী বলবে?"

একটু ইতস্তত করে কমলা। আশে পাশে তাকায়। তারপর বলে, "আই ওয়াণ্ট টু স্পিক ইউ এলোন।"

ইংরাজি শুদ্ধ নয়, উচ্চারণও তথৈবচ। তবু ওর এ কথায় অবাক হল ঋতব্রত। এতটা সপ্রতিভ ভাব যেন আশা করেনি। সময় নেবার জন্যে উঠে গিয়ে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা এনে ধরালো একটা। রতন বিছানা পেতে বেরিয়ে যায়।

"এবার বলো। তোমার মাকে নিয়ে এলে না কেন সঙ্গে করে? একা তোমার আসাটা ঠিক হয়নি। জানোই তো ক্যাম্পের ব্যাপার।"

"মা আসতে পারতেন না। তিনি আজ আঠারো দিন হাসপাতালে।

"হাসপাতালে? কেন, কী হয়েছে তাঁর?"

"তা জানি না। তবে তিনি আর বোধহয় বাঁচবেন না!"

"কেন, এমন কী হয়েছে তাঁর? রোগটা কী?"

"দারিদ্র্য এবং দুর্ভাবনা বোধহয়। আরও উপসর্গ আছে।"

দুজনেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঋতব্রতই বললে, "কই, তুমি তো সেদিনও বলনি কিছু?"

"আপনি তো জানতে চাননি।"

তা বটে! মা যে অসুস্থ এবং হাসপাতালে পড়ে আছে এ খবর সম্পূর্ণ অপরিচিত তাকে জানাবার কি প্রয়োজন? বললে, "যাক্, আমাকে কী বলবে?"

ইতস্তত করে কমলা।

তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পার। কোন সঙ্কোচ করার প্রয়োজন নেই। সেদিন তুমি আমার উপর রাগ করেছিলে। হঠাৎ আমিও বোধহয় বেফাঁস কিছুই বলে ফেলেছিলাম—কিন্তু আমি সে জাতীয় লোক নই।"

"না না, সেজন্যে আমি কিছু মনে করিনি সেদিন।"

"করেছিলে। না হলে কে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিল আমাকে জানালে না কেন?'

বড় বড় চোখ দুটি তুললে কমলা। চোখচোখি হল ঋতব্রতের সঙ্গে। সত্যিই কমলা সুন্দরী। কিন্তু না। ঋতব্রত ওকথা ভাববে না আর!

"আপনার কর্মচারীরা কেউই আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেনি।"

"এ তুমি মিথ্যা কথা বলছ।"

"মিথ্যা কথা আমি বলি না।"

"বলো। সেদিন বললে কেউ তোমাকে অপমান করেছে;—আজ বলছ কেউই করেনি। একটা তো মিথ্যা নিশ্চয়ই।"

আবার চোখাচোখি হল দুজনের। হেসে ফেললে কমলা, "একটাও মিথ্যা কথা নয়। সেদিন রাগ

করে বলেছিলাম। আপনাকেই 'মীন্' করেছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি। আপনি যা কিছু করেছেন আমার ভালোর জন্যেই করেছেন।"

"বেশ, এবার তা হলে বলো তোমার বক্তব্য। না না, কোনও সঙ্কোচ করার দরকার নেই। তোমার বড় ভাই থাকলে যেভাবে বলতে সেইভাবেই খোলাখুলি বল তোমার বক্তব্য—"

"আপনি....আপনি.....আমার অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন? অন্য কোনও ব্যারাকে—"

"অন্য কোনও ব্যারাকে? কেন বল তো?"

"কারণটা তো আপনি জানেনই। যে কারণে নিজের পয়সায় পার্টিশন করিয়ে দিলেন। মা আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হাসপাতালে। ওখানে থাকা আমার পক্ষে আর এক রাত্রিও সম্ভব নয়। প্রথমদিকে লতিকাদি—সেই যে স্বামী-স্ত্রী পরিবার—তিনি এসে আমার দিকে শুতেন। আজ চার পাঁচদিন সুবলবাবু, মানে লতিকাদির স্বামীর বুকের বেদনাটা বেড়েছে—জ্বরও হয়। তাই উনি আর শুতে আসছেন না। এ ক'রাত একেবারে...মানে...আপনি একটা ব্যবস্থা করতে পারেন না? আমার অন্য কোনও ব্যারাকে যাওয়ার, যেখানে...মানে...মেয়েছেলেই বেশি?"

"তা আমি কি করে করব? এসব ব্যাপারে তফাদার সাহেবের কাছে যেতে হবে।"

"তফাদার সাহেব ছুটিতে আছেন। এখন ডেপুটি-সুপার ভৈরববাবু অফিসিয়েট করছেন। দফাদার সাহেব থাকলে কোন ভাবনাই ছিল না। কিন্তু ভৈরবচন্দ্র...মানে...তিনি নিজেই একটু....ইয়ে প্রকৃতির।"

খেঁকিয়ে উঠল ঋতব্রত, "হোন ইয়ে প্রকৃতির। তোমাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা তো এমন কিছু নয় ;—এটুকুও কি তিনি করবেন না মনে কর তুমি, অনুরোধ করলে?"

কমলা প্রথমে ওর গলার আওয়াজে চমকে উঠেছিল। পরক্ষণেই বুঝল ধমকটা তাকে নয়—ভৈরবচন্দ্রের উদ্দেশ্যেই প্রযোজ্য। তাই হেসে বললে, "অনুরোধ করবারও দরকার হবে না! আমি না বলতেই তিনি অন্য ভালো ঘরে আমাকে সরাবার ব্যবস্থা করতে উন্মুখ।"

"তবে তো মিটেই গেল সেখানে গেলেই পার—"

"সেখানে যেতে পারলে আর আপনার কাছে আসব কেন? এক গা গহনা আর আজীবনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে আপনার কাছে এ অনুরোধ নিয়ে আসার কারণ আছে কিছু নিশ্চয়ই!"

"ও! ওটা আমি বুঝতে পারিনি!"

খানিকটা পরে বললে, "আচ্ছা আমি ভেবে দেখছি কী করতে পারি। তোমাকে একটা দরখাস্ত করতে হবে! আমি লিখে দেব তুমি সই করবে খালি। এক জাতীয় রিলিফ ক্যাম্প আছে, যেখানে শুধু মেয়েরাই থাকে—সেই রকম ক্যাম্পে চলে যাবার দরখাস্ত দিতে হবে একটা।" কমলা তবুও চলে গেল না।

"আরও কিছু বলবে আমাকে?"

"হ্যাঁ, আর একটা কথা বলছিলাম। ইয়ে...'

"বলো।"

"যতদিন কিছু ব্যবস্থা না হয় ততদিন রতনদা আমার ওখানে রাত্রে গিয়ে শুলে আপনার অসুবিধা হবে কি?"

"রতন? আমার পিয়ন? ওকে তুমি কতটুকু চেন?"

'যা চিনি তাই যথেষ্ট। রতনদা আমার সব কথাই জানে।"

"তবে তার সামনে বলছিলে না কেন?"

"রতনদা শুধু বড় খোকার কথাই জানে! বড় খোকা যে আসলে আরও বড় একদল লোকের

আড়কাঠি তা সে জানে না।"

এটা ঋতব্রতেরও জানা ছিল না! বড়খোকা লোকটি যে এতদূর ক্ষমতাশালী তা তারও ছিল অজানা। তাই কি সেদিন তফাদার সাহেব তাকে ঘাঁটাতে সাহস করেনি?

"রতনদা ওখানে শুলে অসুবিধা হবে কি আপনার?"

"বিন্দুমাত্র না। তবে অনুরোধটা তুমিই তাকে কর। তার আপত্তি না থাকলেই হল।"

ঋতব্রত ভাবছিল ক্রমশ তার জ্ঞানোদয় হচ্ছে বুঝিবা। ক্যাম্পের অনেকের স্বরূপই সে বুঝতে পেরেছে। বুঝেছে এখানে কী ভাবে সাবধানে চলতে হয়। তাই নিজের ঘরে কমলার সঙ্গে কথা বলার সময় রতনকেও আটকে রাখতে চেয়েছিল। অভিজ্ঞতা বাড়ে মানুষের ক্রমশই।

সে ভুল তার ভাঙল পরদিনই। এল/২৯ ব্যারাকে কাল রাত্রে চুরি হয়ে গেছে। চুরি গেছে বড় খোকার বাক্স থেকে পাঁচ টাকার একখানা নোট। কোন রকমে মাথাটা বাঁচিয়ে রতন পালিয়ে এসে খবর দিল ঋতব্রতকে। খবর পেয়ে ঋতব্রতও গিয়েছিল ঐ ব্যারাকে। সেখানে বড়খোকা সদলবলে উপস্থিত। শুনিয়ে দিল ওকে সবাই পাঁচকথা। যেমন মনিব তেমনি চাকর হবে তো?...সাহেব যদি বাড়িতে বিধবা মেয়েমানুষ রেখে ফুর্তি করতে পারে, তবে তার পিয়নই বা কেন একরাত ব্যারাকে ফুর্তি করে যাবে না!....তা, বেটা বিনি পয়সায় মজা লুটছিস লোট....টাকা চুরি করিস কেন?

সেখান থেকে ঋতব্রত গেল ক্যাম্প অফিসে। অফিসের ইনচার্জ এখন তফাদার নন। ভৈরবচন্দ্র। সাধুচরণের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাভ করছিলেন তিনি। ঘাঘী ও ঘুঘু! ভৈরবচন্দ্র উল্টে অভিযোগ করলেন, "তা আপনার পিয়ন ক্যাম্পে রাত কাটায় কেন? চুরি করা-না-করা পরের কথা!"

"পিয়ন আমাকে জানিয়ে গিয়েছিল। আমিই তাকে পাঠিয়েছিলাম।"

"তাই নাকি? আশা করি পুলিশ এন্‌কোয়ারিতেও আপনি একথা বলবেন?"

"পুলিশ এন্‌কোয়ারী? সেটা কেন?"

"আমরা থানায় খবর দিযেছি। আচ্ছা, কাল রাত্রে কি কমলা বলে মেয়েটি আপনার ঘরে এসেছিল?"

ঋতব্রত বুঝল ব্যাপারটা গড়াবে অনেকদূর। না ভেবে চিন্তে কিছু করা উচিত নয়। এরা রতনকে গাঁথতে চায় না, তাকেই জড়াতে চায়! না হলে প্রকাশ্য দিবালোককে 'রাত' বলে উল্লেখ করবে কেন?

কোনও জবাব না দিয়ে ঋতব্রত ফিরে এল ঘরে। একটু পরেই হয়তো দারোগা আসবে। হয়তো চালান দেবে রতনকে। তাকে অবশ্য বিশেষ কিছু বলতে সাহস পাবে না। গেজেটেড্ অফিসার সে। তবে পাঁচজনের সামনে দুটো বাঁকা ইঙ্গিত করলেই বা ঠেকাচ্ছে কে? সাধুচরণ এবং ভৈরবচন্দ্র যখন এ জাতীয় কারবার চালাচ্ছেন ক্যাম্পের বুকে বসে, তখন থানার দারোগার সঙ্গে নিশ্চয়ই সদ্ভাব আছে এঁদের। প্রতি মুহূর্তেই দারোগার আবির্ভাব আশঙ্কা করছিল। যথাসময়ে থানার ভারপ্রাপ্ত ও সি. এলেন এবং সোজা এসে উঠলেন ওর ঘরেই। খবর পাঠালেন ভৈরবচন্দ্রকে। ভৈরবচন্দ্র একটু বিচলিত হলেন। এটা নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রথমত দারোগা সাহেব ভৈরবচন্দ্রের অফিসে উঠে আসামীকে তলব করে পাঠাবেন এটাই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। তাহলেও সপার্ষদ তিনি এলেন ঋতব্রতের ব্যারাকে। সাধুচরণও সঙ্গদান করলেন—মজা দেখতে আপত্তি কি?

এসেই ওঁদের নজরে পড়ল ঋতব্রতের ঘরের সামনে একটা ল্যাণ্ড-রোভার দাঁড়িয়ে—তার পিছনে একখানা সাইকেল বাঁধা। বারান্দায় খান তিনেক চেয়ার পাতা। ঋতব্রত, ও. সি. এবং একজন অপরিচিত ভদ্রলোক সেগুলি দখল করেছেন। ভৈরবচন্দ্র জানতেন এখন দীর্ঘক্ষণ ধরে জবানবন্দী, প্রশ্ন-উত্তর চলবে—এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না। অথচ বসবার চেয়ার আর নেই! বেঞ্চি একখানা পাতা আছে বটে, তবে তাতে বসলে অফিসিয়েটিং ক্যাম্প-সুপারের মর্যাদায় লাগে!

ভৈরবচন্দ্রের সমস্যাব সমাধান হল কিন্তু অচিরেই। ও. সি. ওঁকে আসতে দেখে নিজেই চেয়ার

ছেড়ে উঠলেন, বললেন, "এইসব পেটি ব্যাপারের ফয়শালা আপনারা নিজেরাই করতে পারেন না? পাঁচটাকার একখানা নোট হারিয়েছে—তাই এফ. আই. আর. দিতে থানায় লোক ছুটেছে? যতসব..."

একটা ঢোঁক গিলে ভৈরবচন্দ্র বলেন, "তাছাড়াও একটা কেস আছে স্যার,—ঐ অনধিকার প্রবেশ করে রাত কাটানো—"

হা হা করে হেসে ওঠেন দারোগা সাহেব, "কোথা থেকে এইসব খবর পান মশাই? তিলকে তাল করছে এরা, বুঝছেন না? আমি মিস্টার বোসের পিয়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। ব্যাপারটা কিছুই নয়!"

"কিন্তু এটাতো ভালো কথা নয়—"

"না, তা তো নয়ই! রতন, তুমি বাবা বোসসাহেবের ঘরেই রত্নদীপ হয়ে থেকো, অন্য কারও ঘরে সাঁজের দীপ জ্বালাতে যেওনা আর।" বলেই হা হা করে হাসেন তিনি। ভৈরতচন্দ্র হয়তো আরও কিছু বলতেন, কিন্তু তাতে বাধা দিয়ে দারোগা-সাহেবই বললেন, "বাই দি ওয়ে...চামেলীর কেসটার কি হল? আপনারা নিজে যদি কিছু করতে না পারেন তবে আমাকে সেটা জানান—আমিই ইনভেস্টিগেট করি।"

সাবধান হয়ে গেলেন ভৈরবচন্দ্র। চামেলীর কেস? সেটার বাবদ তো পাওনা গণ্ডা সব চুকিয়েই দেওয়া হয়েছে! আবার সেই পুরানো কাসুন্দির কথা উঠছে কেন? বুঝলেন, ও. সি. ঋতব্রতের কাছ থেকে মোটা রকম দাঁও মেরেছে। এ যাত্রা আর কিছু হবে না। ছেলেটাতো কম ধড়িবাজ নয়! আগে থেকে দারোগাকে হাত করল কি করে? ভৈরবচন্দ্র নিভে গেলেন একেবারে।

"আসুন মিস্টার চৌধুরী এবার যাওয়া যাক্!" উঠলেন দারোগা-সাহেব। তৃতীয় ভদ্রলোকটি এতক্ষণ চোখ বুজে সিগার টানছিলেন শুধু। বললেন, "উঁ?" একটা আড়ামোড়া ভেঙে বললেন, "আমার যাবার দেরি আছে। আর আমি তো কলকাতা যাব। আপনি যাবেন উল্টোমুখো থানায়। আপনাকে ছেড়ে রেখে এসে আমাকে নিয়ে যাবে।"

সেইমতো নির্দেশ দিলেন তিনি ড্রাইভার হরদয়ালকে। বিশালবপু হরদয়াল গাড়ি ব্যাক করিয়ে নিল। দারোগা-সাহেব রওনা হলেন। আসর ভেঙে গেল। সসাধুচরণ ভৈরবচন্দ্রও বিদায় হলেন।

"আপনি দারোগাকে চিনলেন কি করে—" ঋতব্রতর প্রশ্ন।

"আই জাস্ট হ্যাপ্‌ন্ টু নো। রাস্তায় গাড়ি হাঁকিয়ে আসছি, দেখি পাংচার হয়ে যাওয়া সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে চলেছে ও। গাড়ি থামালাম। বললে, 'ক্যাম্পে যাব।" আমি বললাম, 'চল, পৌঁছে দিই ; ওখানে আমারও একজন পরিচিত লোক আছে, ইঞ্জিনিয়ার বোস। দেখা করে যাওয়া যাবে।' বেটা বললে, 'ইঞ্জিনিয়ার বোস আপনার পরিচিত? তারই ব্যাপারে এন্‌কোয়ারিতে যাচ্ছি।' তখন সব শুনলাম ; বললাম, 'পাগল! ঋতব্রত আমার ছেলের ক্লাস ফ্রেণ্ড। ওর পিয়নকেও চিনি আমি।' তা লোকটা আমার কথা মেনে নিয়েছে দেখছি।"

ঋতব্রত অবাক। বলে, "শুধুমাত্র আপনার কথাতেই এতটা?"

"হবে না? ওর সঙ্গে আমার কোথায় আলাপ জান? ডি. আই. জি. রায়চৌধুরীকে নেমন্তন্ন করেছিলাম আমার ওয়ার্ক-সাইটের ওপাশে বড় বিলটায় গেম বার্ড্‌স শিকার করতে। রায়চৌধুরী আমার একগেলাসের বন্ধু। আনঅফিসিয়াল ভিজিট হলেও কোথা থেকে খবর পেয়ে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল এই দারোগাটি আমার ক্যাম্প সাইটে। নিজ চোখেই তা দেখে গেছে রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা।"

খুব খুশি হয়ে উঠল ঋতব্রত সঞ্জীব চৌধুরীকে পেয়ে। তার মনে যেন বল ফিরে এল। বললে, "কী খাবেন বলুন। কী ভাবে আপনাকে এন্টারটেইন করতে পারি?'

"ইউ নো বেটার। অফার মি কফি, সিগারস্, ড্রিংস এনিথিং ইউ প্লীজ!"

"ওর তো একটাও পারব না। তবে চা খাওয়াতে পারি। বিস্কুটও বোধহয় আছে।....আর হ্যাঁ....বৌদির দেওয়া আমসত্ব আছে। খাবেন?"

"দি আইডিয়া! চায়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে আস্তই খাব আজ! নিয়ে এসোতো হে—কি নাম যেন তোমার!"

"আঁজ্ঞে আমার নাম রতন।" বলে সে চা বানাতে যায়।

"তারপর হোয়ার ইজ্‌য়োর দ্রৌপদী?"

"দ্রৌপদী?"

"সেই যে—কি নাম যেন, ভালো রান্না করতো?"

"কে কুসুম? সে চলে গেছে।"

"চলে গেছে? তাহলে তোমার রান্না করছে কে।"

"কেউই না। নিজেই রতনকে দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছি।"

"সে কি? আর কাউকে পেলে না? স্যাল আই সেণ্ড য়ু এ কুক?"

"সে তো ভালোই হয়। কিন্তু ও কথা যাক। আপনাকে আসল কথাটাই বলি। একটা পরামর্শ দিন!"

"দাঁড়াও। ইউ কাণ্ট হিয়ার ব্রতকথা উইদাউট তুলসীপত্র ইন য়োর হ্যাণ্ডস্।"

একটা চুরুট বার করলেন চৌধুরীসাহেব। সেটাকে ধরিয়ে জমিয়ে বসলেন। ঋতব্রত তাঁকে বলে গেল কমলার বৃত্তান্ত। মন দিয়ে শুনলেন চৌধুরীসাহেব। দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে ঋতব্রত বললে, "এখন বলুন কি করি?"

"উড্ ইউ হিয়ার মাই অ্যাডভাইস্?"

"বলুন?"

"বলুন ফলুন নয়। আমার উপদেশের একটা মর্যাদা আছে। গতবারের উপদেশটাতে তো তুমি কর্ণপাতও করনি। ফলং স্বপাক রন্ধনম্! ভুগছো তুমিই।"

"না এবার শুনব ঠিক। বলুন আপনি।"

"কিল বোথ্ বার্ডস ইন ওয়ান ফায়ার!"

"মানে?"

"ঐ মেয়েটি, সরলা না কি যেন নাম? ওকে নিয়ে এসে তোল তোমার এখানে। তুমি আর রতন এ ঘরে থাকব—ও ওঘরে শোবে। মা ভালো হয়ে গেলে চলে যাবে। বাঙালীর বেটি যখন, বাঁধতে জানেই। তুমিও দুটি খেয়ে বাঁচো—সেও বাঁচুক ঘুমিয়ে। অফার হার স্লীপ অ্যান্ড য়ু উড গেট গুড ফুড,—অ্যান্ড পারহ্যাপস্ সাম হ্যাপি ড্রীমস্ ইন টু দি বারগেন!"

"বলেন কি! আপনি ঠাট্টা করছেন।"

"নো! আই অ্যাম নট!"

টেবিলের উপর প্রচণ্ড চাপড় মারেন একটা চৌধুরীসাহেব। "আই অ্যাম সিরিয়াস টু দি টিপ অফ মাই হেয়ার। তুমি যদি ওকে এখানে এনে রাখতে না পার তবে আমিই ওকে নিয়ে যাব। অবশ্য ওর মা এখানে অসুস্থ ; ও হয়তো যেতে চাইবে না। আর তাছাড়া আড়ালে নিয়ে গেলে তো ঠিক জমবে না। ওদের নাকের ওপর এখানে এনেই রাখতে হবে তাকে। ভয় কি?"

"না ভয় আর কি...মানে...'

"মানে, দেয়ার আর এনাফ অ্যান্ড টু স্পেয়ার! ও মানে খুঁজতে গেলে চলবে না। তোমাকে পারতেই হবে এটা।"

উৎসাহের আতিশয্যে কাঁধের উপর চাপড় মারলেন ঋতব্রতের।

ঋতব্রত মিন মিন করে তবুও, "না তা নয়।....আচ্ছা তাই হবে। আমি ওকে বলে দেখি—যদি রাজি হয় ..আপনি কিন্তু মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেবেন। মানে, একটা ভীষণ গণ্ডগোল হবে আশঙ্কা করছি।"

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সঞ্জীব চৌধুরী। এ কথায় বসে পড়লেন।

"নাঃ! তুমি পারবে না। ও তোমার কর্ম নয়।"

"কেন? কী হল আবার?"

"তুমি শুধু আমার ভরসায় এগুচ্ছ—নিজেব জোরে নয়। এ কাজ তার পক্ষেই সম্ভব যে নিজেব হিম্মতে চলতে পারে।"

"আচ্ছা হল বাপু হল! আপনি ভুলেও আমার খোঁজ নেবেন না। এবার হল তো? এখন উঠুন, আপনার গাড়ি অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে।"

ওঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না চৌধুরীসাহেবের। বললেন "তুমি তো বেশ লোক হে ছোকরা। হোয়াট এ্যাবাউট আমসত্ব ডিপ্‌ড্‌ ইন্‌ এ হোলি কপ অফ টি?"

"ও হ্যাঁ।" লজ্জিত ঋতব্রত তাড়াতাড়ি সুটকেস খুলে আমসত্ব বের করে আনে। চায়ের কাপ হাতে রতনও প্রবেশ করে।

চা পর্বের পরে আমসত্ব চুষতে গিয়ে চৌধুরীসাহেব আবার খুশি হয়ে ওঠেন। গ্র্যান্ড আমসত্ব। গাড়ি থেকে হরদয়ালকে দিয়ে বোতল গ্রাস আনালেন। ড্রিংক করতে করতে গল্প চলল আরও খানিকটা। শেষে উঠে ঋতব্রতকে বললেন, "গেট আপ!"

"আমি কোথায় যাব?" ঋতব্রত অবাক।

"কাজটা এখনই সেরে রাখা ভালো। বেটারা জেনে রাখুক সঞ্জীব চৌধুরীও আছে এর ভেতরে।"

ঋতব্রতের কিন্তু এটা ইচ্ছা নয়। এই আধপাগলা ভদ্রলোককে নিয়ে কমলার কাছে যেতে তার মন সরে না। ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে হবে কমলাকে—এ ভদ্রলোক কি করতে কী করে বসবেন হয়তো মুখে কিন্তু বললে সে অন্য কথা, "আপনি যে এর মধ্যে আছেন সেটাই হচ্ছে আমাদের ট্রাম্প কার্ড আগে ভাগে সেটা দেখাব কেন?"

চোখ দুটি কুঞ্চিত করে চৌধুরী বললেন, "হাতের তাস লুকিয়ে রাখতে হয় বলেই তাস আমি জীবনে খেলতে শিখিনি। ইনডোর গেম্‌সের মধ্যে আমি খেলি দাবা। ষোল দুগুনে বত্রিশটা ঘুঁটি চোখের উপর থাকবে, তার মধ্যেই মাৎ করতে ভালোবাসি আমি। রাখা ঢাকা আমার পোষায় না। নাও ওঠ!"

যেটুকু চিনেছে ভদ্রলোককে তাতে এরপর আর প্রতিবাদ করতে সাহস হল না ঋতব্রতের। গিয়ে বসল রোভারে। গাড়ি এসে থামল এল/২৯ ব্যারাকের সামনে। গাড়ি থেমে নেমে চৌধুরীসাহেব গট্‌মট্‌ করে ঘরে ঢুকে গেলেন—পিছন পিছন ঋতব্রতও এল। হরদয়াল স্টিয়ারিঙে বিশালবপু এলিয়ে দিয়ে বসে রইল গাড়িতেই। ঋতব্রতের ইঙ্গিতে চৌধুরীসাহেব এগিয়ে গেলেন কমলার দিকে। এ পাশে বৃদ্ধ খেতে বসেছেন। পাগলটা ছেলে কোলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওপাশের দম্পতি বিশ্রম্ভালাপরত সুবলবাবুর বোধহয় জ্বর ছেড়েছে। উঠে বসে আছেন তিনি। বড়খোকা একটা নীল লুঙ্গি পরে উবু হয়ে বসে আম খাচ্ছিল। কমলা মাদুর পেতে শুয়েছিল নিজের এলাকায়। ওদের আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

"তোমার নামই সরলা?"

"না, আমার নাম কমলা—সরলা আমার দিদির নাম।"

"দেন ইউ আর নট্‌ দ্য গার্ল আই অ্যাম আফটার। সরলা কই?"

ঋতব্রত পাশ থেকে বললে, "না, এর কথাই হয়েছে আপনার সঙ্গে।"

"আই সী! তুমিই সরলা তাহলে। আচ্ছা শোন। তোমার তো বাপু এখানে থাকা চলবে না।"

কমলা এ জাতীয় আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সকাল থেকে যে ঝড় বয়ে গেছে তাতেই সে ক্লান্ত। কর্দয ইঙ্গিতে, অশ্লীল ভঙ্গিতে সারা সকাল গালাগালি করেছে বড়খোকা। বন্ধুদের শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, "আচ্ছা তোরাই বল্‌, ঐ শালা রতনার চেয়েও কি আমি কালো কুচ্ছিৎ আমিও তো শালা বিনে কড়িতে তেল মাখছিনা, তোরাই বল্‌।" নিজের ভাষায়, বিকৃত মুখভঙ্গি করে

এ জাতীয় বক্র ইঙ্গিতে বড়খোকা জিনিসটাকে ন্যক্কারজনক করেই রেখেছিল। মুখ বুজে সহ্য করে গেছে কমলা। সারা সকালটাই সে আশঙ্কা করেছে থানার দারোগা কখন আসে। চৌধুরীসাহেবকে সে ভেবেছিল কোনও বিশিষ্ট অফিসার। বললে, "আপনি কে?"

"হু? মি? আই অ্যাম্ দি ফাদার অফ্ হিজ্ ফ্রেণ্ড। হৃদয়ব্রতের পিতৃবন্ধু।"

চৌধুরীসাহেবের বিচিত্র বাংলা শুনে হেসে ফেলেছে ঋতব্রত।

কমলা বললে, "আমাকে কি বলছিলেন?"

"বলছিলাম তোমার তো এখানে থাকা চলবে না।"

"তবে কোথায় থাকব আমি?"

"অ্যাট হিজ্ প্লেস। ওর রান্না করার লোক নেই—তোমারও থাকবার জায়গা নেই। সো অফার মিউচুয়াল হেল্প! আই মীন—"

"আই ফলো", জবাব দিল কমলা। অন্য কেউ নজর না করলেও কমলা লক্ষ্য করেছিল আধ-খাওয়া আম হাতে বড়খোকা উঠে এসেছে। তাই তর্জমাটা বাংলায় করতে দিল না ওঁকে।

"আমি একটা কথা কইয়াম!"

আম চাটতে চাটতে উঠে এল বড়খোকা। সে কথাবার্তা দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিল না।

"কও!" জবাব দিলেন চৌধুরী।

"আমরার ঘর দিয়া বিষ্টি হইলে জল পড়ে।"

"ওয়াণ্ডারফুল ডিস্কভারি! বৃষ্টি হলে ছাদ দিয়ে জল পড়বে না তো কি হোয়াইট হস্ হুইস্কি পড়বে?"

"আইগ্যা জলই যুদি পরে তে। কি রহম্ সারাইলান আপনারা? সরকারের অর্থ গুলাইন ব্যোবাক্ নষ্ট করলাইন কেরে?"

চৌধুরী ঘুরে ঋতব্রতকে জিজ্ঞাসা করলেন; "অ্যাম আই হ্যাভিং দি প্লেজার অফ্ টকিং টু দি ফিনানশিয়াল অ্যাডভাইসর টু দি গাভার্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল?"

ঋতব্রত হাসল। বললে, "না! ও ক্যাম্পের একজন পি. এল.—বড়খোকা।"

"আই সী। খোকা, তুমি বাইরে যেতে পার—"

"ক্যান্? এ ঘরে আমি বসৎ করি। আমি ঘর ছাড়তাম কেরে?"

"হরদয়াল!" হাঁক দিলেন চৌধুরী। ছ ফুট দীর্ঘ পাঞ্জাবী সিংজী এসে সেলাম করল। হাতের ইঙ্গিত করলেন শুধু চৌধুরী। মুখে কিছু বললেন না। হরদয়ালও বাইট টার্ন করে মুখোমুখি দাঁড়াল বড়খোকার। ডানহাতখানা বাড়িয়ে দিল শুধু দ্বারের দিকে। মুখে কিছু বললে না। তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল বড়খোকা। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল ঘরের সকলেই। উৎকর্ণ হয়ে উঠল সবাই। এগিয়ে এল না আর কেউ। হরদয়াল স্থান ত্যাগ করল।

"আমি তোমার বাপের বয়সী। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার। আজ বিকেলেই তুমি ঋতব্রতের ওখানে গিয়ে উঠবে। রাঁধবে, বাড়বে, খাবে, খাওয়াবে। ছেলেটার খাওয়ার বড় কষ্ট। তুমি একটু দেখ। আর যদি কখনও প্রয়োজন হয়, আমায় খবর দিও। কিপ ইট।"

একটা কার্ড বার করে দিলেন কমলাকে। নামটা পড়ল সে।

"কী? ইজ্ ইট ফাইনালি সেট্‌লড?" প্রশ্ন করেন তিনি।

কমলা তাকায় ঋতব্রতের দিকে।

"বিকেলে রতনকে পাঠিয়ে দেব?" শুধায় ঋতব্রত।

ঘাড় নেড়ে জবাব দেয় কমলা।

"দ্যাটস্ সেট্‌ল্‌ড্ দেন্। কম অন্। আচ্ছা চলি, বাই বাই।"

ঋতব্রত এবং চৌধুরীসাহেব এসে গাড়িতে ওঠেন।

ঘটনাটায সাবা ক্যাম্পে একটা বিবাট আলোড়ন দেখা দেবে, সর্বত্র এটাই হবে আলোচনাব বিষয়—এই রকমই আশঙ্কা ঋতব্রত করেছিল। সেটা করাই স্বাভাবিক। কুসুমের ব্যাপারটা তার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই চুকে গেছে। চামেলীর আলোচনায় নতুনত্বের আস্বাদ নেই। ক্যাম্পের আড্ডাগুলিতে অনেক দিন ধরে মুখরোচক বিষয়-বস্তুর অভাব ছিল—এমন সময় যদি প্রচারিত হয় এল/২৯ ব্যারাকের কমলা প্রকাশ্য দিবালোকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাসায় গিয়ে উঠেছে—এবং সেখানেই রাত্রি বাস করছে—তাহলে সেটায় 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব' আড্ডার আগুনে আহুতি দেবে না কি?

কিন্তু ঘটনাটা ঠিক তা ঘটল না। কারণ নতুন একটা ব্যাপারে সবাই জড়িয়ে পড়েছিল। ক্যাম্প অফিস থেকে প্রচার করা হয়েছিল—কয়েকটি পরিবারকে পুনর্বাসনে পাঠান হবে শীঘ্রই। পরিবারগুলি এতে প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু এদের প্রতিবাদের জোর কী? হয়তো অনায়াসেই পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পন্ন হত, কিন্তু এই সুযোগে কয়েকজন ছোকরা কলকাতা থেকে এসে জোট পাকালো। নিখিল বঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের শুভাশুভ নির্ধারণ করবার একটা সংস্থা নাকি আছে কলকাতায়। এর নাম জানা যায়নি এতদিন। সেখান থেকেই দুটি ভদ্রলোক এসে ক্যাম্পবাসীর একটা অভাব অভিযোগের ফিরিস্তি দাখিল করলেন ভৈরবচন্দ্রকে। প্রথমটায় আমলই দিলেন না ভৈরবচন্দ্র। ফলে যা হয়। স্ট্রিট-কর্নার মিটিং হল, প্রসেশন বার হল, এবং ক্রমশ ব্যাপক মিটিংও দু একটা হয়ে গেল। এসব ঝামেলার খবর ঋতব্রত রাখে না—কিন্তু জিনিসটা ব্যাপক আকার ধারণ করায় শুনল সবই। কয়েকজন নাকি অনশন করবার হুমকিও দেখিয়েছে। অটল বটব্যাল নামে একজন অক্লান্ত কর্মী ক্যাম্পের প্রতিরোধ-সংগঠনে কাজ করতে এসেছে শুনল। দু একদিন গরম গরম বক্তৃতাও দিতে শুনল তাকে।

ভৈরবচন্দ্র এই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তবু অখণ্ড অবকাশ ছিল ডাক্তার সাধুচরণের। কিন্তু একা তিনিই বা কী করবেন? তাছাড়া তিনি যেন এতটা দুঃসাহস আশঙ্কা করেননি ঋতব্রতের তরফ থেকে। একফোঁটা একটা ছেলে যে এমন ঢাক পিটিয়ে একটা মেয়েছেলেকে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে নিজেব বাড়িতে, এটা যেন কল্পনাতীত! আজকালকার ছেলেগুলোর হল কি? এসব কারবার তো অনেকেই করে, ভাবেন সাধুচরণ ; তিনিও করেছেন অনেক কিছুই। কিন্তু এমন বেপরোয়া প্রকাশ্যভাবে? এতটা সাহস হয় কি করে মানুষের? কিসের জোর আছে ছোঁড়াটার? ব্যাপারটা আলোচনা করতে গেলেন ভৈরবচন্দ্রের সঙ্গে—কিন্তু তিনি নিজের ব্যাপার নিয়েই ব্যতিব্যস্ত।

রামশরণ কিন্তু উল্লসিত হয়ে উঠল এ সংবাদে। একটা সুযোগই খুঁজছিল সে। বেশ বড় রকমেব একটা স্ক্যাণ্ডাল পাকাতে পারলেই বাছাধন বদলি হয়ে যাবেন। চতুর বামশরণ বুঝে নিয়েছে যে ঋতব্রতকে নোয়ানো যাবে না। পোষ মানবে না যে পাখি তাকে খাঁচায় ভরে রেখে লাভ কী? ভরসার মধ্যে ছোকরা বাগ না মানলেও কাজ বোঝে না কিছুই। সূঁচ অবশ্য গলতে দিচ্ছে না সে কাজের কোনও ফাঁকফোকর দিয়ে—সেদিকে প্রখর দৃষ্টি এস ডি ও-র। তাতে ক্ষেদ নেই রামশরণের। আপন মনেই হাসে অভিজ্ঞ ঠিকাদার "সূঁই যানে না দিবে তো কি হইল? হাঁথি হামি জরুর চালিয়ে লিবে।"

এত কম রেটে, এত কড়া সুপারভিশনে কী করে যে কাজ করে যাচ্ছে ঠিকাদার—সে এক বিস্ময় ঋতব্রতের কাছে। বোধহয় জেদের বশেই হাজার কয়েক টাকা লোকসান দিয়ে যাবে বেটা—ভাবে ঋতব্রত। করোগেটের টিনের ছাদে সীট্ বল্টুর সংখ্যা কম আছে এবং বিটুমিনাস ওয়াসার কয়েকটি লিম্পেট ওয়াসারের সঙ্গে দেখা যায়নি বলে টিনের মাপ দেয়নি সে এই বিলে। শুধু এই একটা আইটেমেই হাজার ছয়েক টাকা আটকে গেল ঠিকাদারের। ঐ সামান্য অজুহাতে গোটা আইটেমটায এক পয়সা পেমেন্ট হল না এ বিলে। না পার্ট-রেটও দেবে না সে। সুরেশ সেনগুপ্ত খবর পাঠাল রামশরণকে। বস্তুত কন্ট্রাক্টরকে কথাটা বলতেই সঙ্কোচ হচ্ছিল সুরেন সেনগুপ্তর। কিন্তু ঠিকাদাব

হাসিমুখেই বললে, "ও তো ঠিক হ্যায়! হাম সীট বল্টু ঔর বিটুমিন ওযাসার লাগায়ে দিব। পিছারি বিলমে নাপি উঠাইয়ে।" প্রত্যেকখানি টিন পরীক্ষা করে চলল টিন মিস্ত্রি।

"আজকে কী কী রান্না হবে?" কমলা এসে শুধায়।

"উঁ? ডায়েরি লিখতে লিখতে মুখ না তুলেই সাড়া দেয় ঋতব্রত।

"বলছি আজকে কী রান্না হবে?"

"তার আমি কি জানি?"

"আঃ, খাবেন তো আপনি। কী খাবেন বলুন।"

"আমি তো একা খাবো না, সবাই খাবে। যা হয় খাওয়াও।

"আচ্ছা বেশ, এখন উঠুন দেখি।"

"হুঁ!" আবার অন্যমনস্ক হয়ে কলম চালায় ঋতব্রত।

"কী আশ্চর্য! উঠুন!"

এবার ঋতব্রত বিরক্ত হয়। "আঃ, কী হয়েছে কি? একটু লিখছি শুয়ে শুয়ে—সকাল বেলাতেই সবাই বিরক্ত করতে শুরু করেছ।"

"হয়েছে আর কি? সকাল থেকে বিছানা কামড়ে পড়ে আছেন, ওগুলো ঝাড়তে হবে না?"

বাধ্য হয়েই উঠতে হয়। কমলা বিছানা ঝেড়ে, মশারিটা তুলে একটা নীল বেড-কভার পেতে দিল। চার দিক ভাঁজ করে, হাত দিয়ে টেনে টেনে সমান করে দিয়ে বললে, "নিন শুন এবার! কী এমন মহাভারত রচনা হচ্ছে শুনি?"

সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে ঋতব্রত বললে, "এ বেড-কভারটা কার?"

"আপনার। রতনকে দিয়ে আনিয়েছি স্টেশন বাজার থেকে। আপনি দৈনিক বাজার খরচের যে টাকা দিয়েছিলেন তার থেকে একুশ টাকা তের আনার বাজার করিয়েছি। টাকাটা আমাকে মিটিয়ে দেবেন।"

"একুশ টাকার বাজাব একদিনে? বল কী? আমাদের তো রোজ পাঁচসিকে দেডটাকার মধ্যেই হয়ে যেত।"

"সে তো দৈনিক বাজার। এটা স্টেশনারি। এই বেড-কভার আনিয়েছি, একটা পাপোষ, চায়েব কাপ দুটো, ফুলদানি একটা আড়াই টাকায়, আপনার তো দেখছি কিছুই ছিল না। সরষের তেলই নাকি মাথায় মাখতেন শুনলাম—কিন্তু কাপড়কাচা সাবানটা গায়ে মাখতেন কি করে?"

"সানলাইট তো গায়ে মাখা যায়।"

"ভাগ্যি জানলাম আপনার কাছে।"

তারপর হেসে বললে, "আচ্ছা, এতটাকা জমিয়ে কী করবেন আপনি বলুন তো?"

"আমার অনেক ধার দেনা আছে বাজারে।"

দুজনেই চুপ করে যায়। কমলার কথাতে ঋতব্রত যেন নতুন দৃষ্টি পেল। সত্যিই, ঘরের শ্রীই যেন পালটে গেছে। উটাকার মশারিটা টান টান করে টাঙানো হয়েছে। ফুলদানিতে রক্ষিত হয়েছে বজনীগন্ধার একটি ডাঁটি। টেবিলের জিনিসপত্র আগে যা ছিল তাই আছে, কিন্তু বই ও ফাইলপত্র সারিবদ্ধ হয়ে যায়গা খালি করে দিয়েছে অনেকটা। স্লাইডরুলের খাপটা হারিয়ে গিয়েছিল বহুদিন—কোথা থেকে সেটাকে উদ্ধার করে এনে কোষবদ্ধ যন্ত্রটিকে রাখা হয়েছে টেবিলের প্রান্তে।

কমলাও হয়তো ভাবছিল এই অদ্ভুত চরিত্রের লোকটির কথাই। নিজের সুখ-সুবিধা আরামের দিকে কোনও নজর নেই। এত পরিশ্রম করে সে ঘরটা সাজালো, একটা প্রশংসাবাণীও শোনা গেল না গৃহস্বামীর কাছ থেকে। হয়তো তার নজরেই পড়ে না। আজ প্রায় মাসাধিক কাল কমলা এসেছে এ বাড়িতে। প্রথম প্রথম যে সংকোচের ভাবটা ছিল ক্রমেই সেটা সরে গেছে। ধীরে ধীরে এ ছোট

সংসারের যাবতীয় ঝামেলা ঝেড়ে ফেলছে ঋতব্রত কমলার স্কন্ধে। ধোপাবাড়ির হিসাব রাখে কমলা,—কোনটা কাচতে যাবে, কোনটা যাবে না ঠিক করে সেই। ছাড়া জামার পকেট থেকে উদ্ধার করে কখনও রেলওয়ে মানি-রিসিট ভাউচার, কখনও অসমাপ্ত কবিতা, কখনও বা দশটাকার নোট। যাবতীয় খরচের হিসাব তুলে রাখে খাতায়। গোয়ালাকে হিসাব বুঝিয়ে টাকা মেটায়। বেশ লাগছে কমলার—এই নতুন সংসারে এসে। সকালে বিকালে হাসপাতালে যায় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। মায়ের অবস্থার কোনও উন্নতি হচ্ছে না কিন্তু।

ঋতব্রত হঠাৎ বলে, "একটা কথা রোজই বলব বলব ভাবি, বলা হয় না।"

"বলে ফেললেই হয় সেটা।"

"মানে ইয়ে,—তোমার টাকাটা দেওয়া হয়নি।"

"আমার টাকা?" অবাক হয় কমলা।

"কুসুমকে আমি মাসে দশটাকা করে দিতাম।"

ম্লান হয়ে যায় কমলা। হঠাৎ মনে পড়ে যায় ঋতব্রতের সঙ্গে তার সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সে রান্না করছে, ঘর পরিস্কার রাখছে, ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখছে ফুল, বোতাম আঁটছে ধোপাবাড়ি থেকে ফেরত আসা প্যান্টের গায়ে—কিন্তু সে তো অন্য কোনও কারণে নয়—সে যে পরিচারিকা! দয়া করে তাকে দেওয়া হয়েছে এই কাজ—সে নেহাৎ অনাথা বলে। ম্লান কণ্ঠে কমলা বললে, "কুসুমের ছিল অভাবের সংসার, সে অর্থের বিনিময়ে কাজ করতে এসেছিল। আমাকে আপনি খেতে দিচ্ছেন, থাকতে দিচ্ছেন—এর বিনিময়েই আমি আপনার সেবা করি স্যার। টাকার কথা তো ছিল না আপনার সঙ্গে।

একটু কুণ্ঠিত হয় ঋতব্রত, "তুমি আমাকে 'স্যার' বল কেন?"

"কী বলব তবে?"

"ঋতুদা বললেই পার।"

"আপনার অফিসের সব কর্মচারীই তো আপনাকে স্যার বলে।"

"তুমি কি আমার অফিসের কর্মচারী?"

"না, তা অবশ্য নই। আমি আপনার পার্সোনাল মেড সার্ভেণ্ট।"

"কমলা! ছিঃ! কী বলছ তুমি?"

"ঠিকই তো বলেছি! 'ঝি' কথাটা বলতে আজও জিবে আটকায়, তাই ইংরেজি করে বললাম। তা না হলে টাকা দেওয়ার কথা বলে আপনি আমাকে অপমান করতেন না।"

জল ভরে আসে হঠাৎ কমলার দু'চোখে। স্তম্ভিত ঋতব্রতকে কোনও জবাব দেওয়ার অবকাশ না দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় কমলা।

কমলার স্থান পরিবর্তনে ক্যাম্প মহলে যে আলোচনাটা শুরু হয়েছিল সেটা গুঞ্জন আকারেই রয়ে গেল কিন্তু। তেমন কোন ব্যাপার, তেমন কোনও কথা গোচরে এল না ঋতব্রতের। মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ায় বড়খোকা বীভৎস রকম কিছু একটা করত হয়তো—কিন্তু উদ্বাস্তুদের ধর্মঘটের ব্যাপারেও সে পাণ্ডা-জাতীয় একটা কিছু হয়ে উঠেছিল। ভৈরবচন্দ্র আর সাধুচরণ হয়তো হকচকিয়ে গেছেন সঞ্জীব চৌধুরীর আকস্মিক আবির্ভাবে। লোকটা কে? অথবা দারোগা-সাহেবের স্বরূপ পরিবর্তনে হয়তো বিচলিত হয়েছেন ওঁরা। কিংবা ধর্মঘটের ব্যাপারেই সবাই ব্যস্ত। কারণ যাই হোক, ফল হল এই যে নিরুপদ্রব মেলামেশার অবকাশে ওরা দুজন এল পরস্পরের কাছাকাছি। ঋতব্রত যে দীর্ঘ সময়টা নিয়োজিত করত চিঠি লেখা বাবদ, আজকাল সেটা ব্যয়িত হয় কমলার সঙ্গে গল্প করায়। মাঝে মাঝে রতনও এসে যোগ দেয়। ঋতব্রত বলে তার হোস্টেল জীবনের বিচিত্র গল্প। নিদ্রিত সহপাঠীব

মশারির চালে ভিজা গামছা রেখে কেমন মজা দেখতো তারা—পরস্পরের কার্টুন ছবি এঁকে টাঙিয়ে রাখতো ডাইনিং হলের নোটিস বোর্ডে। সূয্যি নামে যে লোকটি পান দিয়ে যেত খাবার পরে, তার সঙ্গে ওরা মজা মারত। একবার একজন অধ্যাপকের মুর্গী চুরি করে খেয়েছিল—রাত তিনটেয় স্লেটার হাউসের দ্বিতলে ইলেকট্রিক স্টোভে রান্না হয়েছিল মাংস—এমনি হাজারো গল্পের ভাণ্ডার তার। শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে কমলা।

আবার কোনও কোনও দিন কমলা বলতে শুরু করে তার গল্প। হোস্টেল জীবনের হাস্যজনক গল্পের খোরাক না থাকলেও তার সতের বছরের জীবনেও ঘটেছে নানান ঘটনা। ছোট ছোট হাসির কথা দিয়েই সূচনা হত বটে—তবে পরিশিষ্টটা করুণ পরিচ্ছেদে এসে সমাপ্ত হত। উপায় নেই। ওর সতের বছরের উচ্ছল যৌবন ঢাকা পড়ে গেছে বিষাদের এক অমোঘ কৃষ্ণ যবনিকায়। কমলার বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার। এক পোস্টঅফিস থেকে আর এক ডাকঘরে বদলি হয়েছেন কেবল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে পরিবার। কমলার ছোট ভাই ছিল একটি। শৈশবেই মারা যায়। দেশদেশান্তর অনবরতে ঘুরে বেড়াতে হত বলে মেয়েদের স্কুলে পড়ানো হয়ে ওঠেনি। তবু পড়াশোনা ভালবাসতেন তিনি। রোজ সন্ধ্যাবেলায় মেয়ে দুটিকে কোলের কাছে নিয়ে মাদুর পেতে তিনি পড়াতে বসতেন। ইংরাজি, বাংলা, গল্প। দেশবিদেশের ইতিহাস। কখনও বা গান গাইতে বলতেন। অধিকাংশই গীতাঞ্জলি অথবা নৈবেদ্যর ববীন্দ্রসঙ্গীত। নিজেও মেয়েদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতেন কখনও বা। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রং ছিল তাঁর প্রিয় সঙ্গীত—আর শিবাষ্টকম্!

তারপর হঠাৎ একদিন আবার যেন বদলির অর্ডার পেলেন তিনি। রেজিস্ট্রেশন লেজার, সেভিংস একাউন্টের মোটা মোটা ফোলিও, মনিঅর্ডারের অসমাপ্ত হিসাবের মতই বিধবা স্ত্রী এবং দুটি মেয়েকে বেখে গরঠিকানার ডাকঘরে ডাকে সাড়া দিলেন একদিন। চোখ বুঝলেন পোস্টমাস্টার মশাই:

প্রভিডেন্ট ফান্ডের আর ইনসিওরেন্সের টাকাটা এক করে বিধবা রাখলেন ব্যাঙ্কে। আয়ের পথ বন্ধ। এ পুঁজি ভেঙেই চলে দিন। মুখ শুকিয়ে যায় বিধবার। বসে খেলে কুবেরর ভাণ্ডারও শেষ হয় একদিন। তাই ছাঁটা কাপড়ের কাজ শুরু করলেন তিনি। বাড়ি, কাঁথা, আচার,—মেলায় বেচবার ব্যবস্থা করেছিলেন। হয়তো সামলেও উঠতেন ঠিক,—এমন সময় এল র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ! নাবালক মেয়েদুটির হাত ধরে রওনা হলেন তিনি কলকাতামুখো। গিয়ে কোথায় উঠবেন স্থিরতা নেই। ভার লাঘব হল পথেই। এক রাত্রে অব্যাহতি দিল সরলা! ঘরবাড়ি ছাড়তে যত বড় আঘাত পেয়েছিলেন তার চেয়ে কঠিন আঘাত পেলেন তিনি সরলাকে ছাড়তে হল বলে, কিন্তু তার চেয়েও বড় আঘাত পেলেন—যেদিন শুনলেন তাঁর সমস্ত গচ্ছিত ধন সমেত ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেছে! ভদ্রঘরের বধূ হয়ে থাকবার আর উপায় রইল না তাঁর। তিনি একেবারে অনাথা! কমলার হাত ধরে এসে পৌঁছলেন আশ্রয়শিবিরে। ঘুরতে ঘুরতে এসে আজ আশ্রয় পেয়েছেন বকুলতলা পি. এল ক্যাম্পে। গল্প সারা হয়। চুপ করে বসে থাকে কথক আর শ্রোতা। হোস্টেলের হাসির গল্পগুলো মনে হয় চরম মিথ্যা।

হঠাৎ উঠে পড়ে কমলা। বলে, "আগুন দিতে বলি রতনকে। এবেলা কী হবে ভাত না রুটি?"

"খিচুড়ি। দেখছ না কি রকম জল আসছে!"

"রোজ রোজ কী খিচুড়ি খান আপনি! না, আজ রুটি হবে।"

উঠে যায় কমলা। ডাল বের করে ভিজতে দেয়। বড়া করবে। খিচুড়ির সঙ্গে ডালের বড়া ঋতব্রত খুব ভালবাসে। খিচুড়িই করবে সে আজ।

সঞ্জীব চৌধুরী অনেকদিন আসেন না। দত্তসাহেবের ইনস্পেক্শনও হয়নি বহুদিন। বস্তুত কাজে কোনও খুঁত পান না তিনি পরিদর্শনে এসে। প্রতিটি মালমশলা উৎকৃষ্ট। ওয়ার্কম্যানশিপ নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত মাপ নেওয়া হয় না। তিনি আপত্তি করবেন কিসে? দিন চলে যায় একই ভাবে। মেজদার চিঠি

আসে মাঝে মাঝে। কয়েকটা পর পর চিঠি লিখেও রেখা মিত্তিরের কাছ থেকে জবাব না পাওয়ায় চিঠি লেখা বন্ধ করেছে ঋতব্রত ও। মেজবৌদি লিখেছেন ওর বিয়ের সম্বন্ধ আসছে নানা জায়গা থেকে। মেজদা ব্যস্ত হয়েছেন। কয়েক জায়গায় কথাবার্তাও চলছে। মেজবৌদি পূর্বেই সচেতন করছেন তাই ওকে। বলেছেন, তার কোনও বক্তব্য থাকলে যেন সে অবিলম্বে জানায়। রেখা মিত্তিরের ব্যাপারটা মেজবৌদিরও মোটামুটি জানা ছিল। এ চিঠির জবাব সে দেয়নি। তার অল্প কয়েকদিন পরে এল মেজদার চিঠি। লীলার বিয়ে দিয়ে এবার তাঁর ইচ্ছা ভাইয়ের বিয়েটাও সেরে ফেলেন। পিতৃদেবের অসমাপ্ত কাজ নাকি ওটা। এ বিষয়ে ছোট ভাইয়ের মতামত জানতে চেয়েছেন।

ঋতব্রত আবার চিঠি লিখতে বসল রেখাকে। খোলাখুলি জানতে চেয়ে পত্রাঘাত করল। রেখা কি তার কাছ থেকে মুক্তি চায়? জবাব না দিলে তো সেটা স্পষ্ট হবে না। খোলাখুলি জানিয়ে দিলে দুপক্ষই নিশ্চিন্ত হতে পারে। বিজনেস্ লেটারের মত চিঠিখানা খসড়া করে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠাল সেখানা।

কেন এমন হয়? ভাবে ঋতব্রত। দুদিন আগেও রেখা মিত্তিরের হাবে ভাবে মনে হত ঋতব্রত বোস ছাড়া যেন তার জীবনই বৃথা। বন্ধুমহলে এ নিয়ে কত হাসি ঠাট্টা-ইয়ার্কি! আজ ক'মাস সে চলে এসেছে দৃষ্টির আড়ালে—অমনি সেই সুযোগে তার শূন্য সিংহাসন দখল করে বসেছে আর একজন। ঋতব্রত বোস আজ রেখা মিত্তিরের জীবনে একটা বাহুল্য—বিষময় স্মৃতিমাত্র! যেন একটা কাটা দাগ—ব্যথা চলে গেছে কিন্তু দাগটা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই।

"ইয়াসিন এসেছে স্যার—দেখা করতে চায়।" রতন খবর দেয়।

"ডেকে দে।"

ইয়াসিন এসে দাঁড়ায়। রামশরণের ড্রাইভার। লম্বা সেলাম করে। রতন চলে যায় নিজের কাজে।

"কি খবর ইয়াসিন?"

"আপনাকে এর বিচার করতে হবে স্যার!"

"বিচাব? কিসের বিচার?"

"আজ সতের মাস আমার মাইনে মিটিয়ে দেয়নি স্যার। যখনই হাত পাতি দু দশটাকা দিয়ে বলে পরে হিসাব মেটাবো। কতটাকা পাব তাই বলে না। কাল স্যার টাকা চাইতে গেছি—আমাকে যা নয় তাই বলে গাল দিল। হারামির বাচ্ছা বলেছে আমাকে। কেন? আমি আমার হক্কের টাকা চাইলেই হারামি? আর তুই শালা চুরি জোচ্চুরি করে—"

"কী আবোল তাবোল বকছ?" ধমক দেয় ঋতব্রত।

"না স্যার, তাই বলছি।"

"কিন্তু আমার কাছে বলে কী লাভ? আমি তো তোমার টাকা আদায় করে দিতে পারব না। আর ঠিকাদারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো জানই। তাকে অনুরোধও আমি করতে পারব না।"

"তাহলে আমি স্যার আমার হক্কের টাকা পাব না?"

"তুমি নিজে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পার। আমি কিছু বলব না।"

বতন এসে আবার জানায়—কালিবাবু এসেছে। চোরের মত সরে পড়ে ইয়াসিন্। কালিবাবু, রামশরণের এজেন্ট এসে ঢোকে। সঙ্গে একজন লোক। তার হাতে দুটো রেডি-মিক্‌শড রঙের ড্রাম। কালিবাবু ড্রাম দুটো টেবিলে তুলে দেখাল।

"না না—এসব রঙ চলবে না। আমি যা লিখে দিয়েছিলাম তাই আনলেন না কেন?"

"এই তে স্যার জেনসনের রঙ—এই দেখুন ৮/৩ ফিল্ড গ্রীন!"

"আপনি কি নিজেই কিছু বোঝেন না—অথবা আমাকেই বোকা বোঝাতে চান?"

"স্যার?"

"জেনসন হচ্ছে কোম্পানির নাম—৮/৩ শেডের নাম। ও কোম্পানির নানান দামের রঙ পাওয়া যায়। আমি বলেছি 'উডকোট' আনতে। সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা করে যার ইম্পিরিয়াল গ্যালনের দাম। বুঝলেন? এ চলবে না, নিয়ে যান।"

"সাড়ে সাঁইত্রিশ?"

"সস্তায় আনতে পারলে আমার আপত্তি নেই। সীল করা টিন দেখিয়ে গেলেই হল।"

"না, আমি বলছিলাম কি লোকাল-উড কাঠে অত দামী রঙ...মানে..."

"মানে টানে নেই। আইটেমে লেখা আছে 'অ্যাপ্রুভড্ কোয়ালিটি।' উডকোট অথবা ঝিলমিল ছাড়া আমি আর কিছু অনুমোদন করব না।"

"কিন্তু আমাদের রেটে পোষায় কিনা তাতো দেখবেন স্যার?"

"নিশ্চয়ই নয়। রেট দেবার সময় আমার পরামর্শ নিয়েছিলেন? কে বলেছিল অত 'লো-রেটে' কাজ নিতে? আমি? যান।"

ম্লানমুখে টিন দুটো সমেত ফিরে গেলেন কালিবাবু। অস্ফুটে কী বার হল তার মুখ দিয়ে। ঋতব্রত ভাবে ভাগ্যে এ সব কথাগুলো শোনা যায় না। পিতৃকুল-মাতৃকুল—কোন কুল উদ্ধার করে গেলেন কালিবাবু কে জানে!

দুপুরবেলা খেতে বসে ক্ষেপে গেল ঋতব্রত। ক'দিন ধরেই রাগটা নেপথ্যে ধূমায়িত হচ্ছিল। বিস্ফোরণ হল হঠাৎই। সেদিন রবিবার। রবিবারে সাধারণত মাংস হয়। দু-একটা ভালমন্দ পদ রান্না করার একটা অলিখিত আইন তৈরি হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই। আজ আলু সেদ্ধ ভাত দেখে চটে উঠেছিল সে।

"শুধু আলু সেদ্ধ দিয়ে ডাল-ভাত রোজ রোজ খাওয়া যায়? কমলা কই?"

"দিদিমণি হাসপাতালে।" কুণ্ঠিত রতনেব কৈফিয়ৎ!

"তবে আর কি? উদ্ধার করেছেন।"

ডালটা হরিদ্বারের গঙ্গার সঙ্গে তুলনীয়। স্ফটিকস্বচ্ছ ধারার তলায় নুড়িগুলি দৃশ্যমান—উপরে ভাসছে তর্পণের ফুল বেলপাতার মত দু-চারটি ফোড়ন! আঙুল দিয়ে এই ত্রিতল-ডালকে ক্লাসলেস সোসাইটি করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে ঋতব্রত ঢেলে দিল সেটা ভাতের ক্রেটারে। প্রথম গ্রাস মুখে তুলেই টান মেরে ফেলে দিল সব। হরিদ্বারের গঙ্গাজলের সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গাজলের তফাৎ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কথাটা মনে হল না ঋতব্রতের।

শশব্যস্তে ছুটে আসে রতন রান্নাঘর থেকে। সে আম কাটছিল।

"কি রান্না হয় আজকাল? কাল রাত্রেও রুটিগুলো পুড়ে গিয়েছিল। আজ ডালে নুন নেই!"

অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল রতন। যেন অপরাধটা তারই।

আসলে অপরাধটা কিন্তু রতনেরই। কমলা আজ ক'দিন রান্না করছে না। ঋতব্রত হাত ধুয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল। রতন কয়েকটা আম কেটে নিয়ে গিয়ে অনেক সাধাসাধি করল। একটাও মুখে দিল না ঋতব্রত। রাগের চেয়েও অভিমান হয়েছিল তার বেশি! কেন আজকাল তার খাওয়ার কাছে কমলা এসে বসে না? কমলা আজ ক'দিন ধরেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেদিন ঋতব্রত ওকে ডাকল সন্ধ্যাবেলায় গল্প করতে—মাথা ধরেছে বলে পাশ কাটাল কমলা। খাবে না। কক্ষনও সে খাবে না। আজ আসুক কমলা হাসপাতাল থেকে। সে নিজে খাবে না, ফলে ওরাও কেউ খেতে পারবে না। দেখি কি করে কমলা।

ঘুমিয়ে পড়েছিল ঋতব্রত। স্বপ্ন দেখছিল কমলা এসে ওকে সাধাসাধি করছে,—"ওঠো খাবে চল, আচ্ছা, আর কোনও দিন অবাধ্য হব না কথার।"

"তবে আজ সন্ধ্যাবেলায় একটা গান শোনাবে বল।"

"গান? গান শোনাব কি করে? গান তো আমি জানি না।"

"মিছে কথা! সেদিন না তুমি বললে সন্ধ্যাবেলা বাবাকে গান শোনাতে?"

"আচ্ছা বেশ বাপু, বেশ। শোনাব আজ। এবার খেতে চল।"

ঋতব্রত হাতখানা বাড়িয়ে দেয়, "উঠতে পারছি না, আমি ;—তুমি একটু টেনে নাও!"

"স্যার! স্যার!"

"কে?" ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ঋতব্রত, ঘুম ছুটে যায় মুহূর্তে। কী ব্যাপার?

"হাসপাতাল থেকে লোক এসেছে স্যার আপনাকে ডাকতে।"

"হাসপাতাল থেকে? কমলা ফেরেনি? খায়নি?"

"দিদিমণি তো আজ ক'দিনই খাচ্ছেন না। আমিই রান্নাবান্না করি।"

"কেন? সে খায় কোথায়?"

"তাঁর আবার খাওয়া! আপনি তাড়াতাড়ি চলুন। দিদিমণির মার অবস্থা ভাল নয়।"

চমকে ওঠে ঋতব্রত। তাড়াতাড়ি প্যান্টের মধ্যে পা দুটো গলিয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে রওনা হয়। যে কম্পাউন্ডারটি ডাকতে এসেছিল সে আগে আগে চলে।

"ওদিকে কেন? হাসপাতাল তো এদিকে?"

"ওঁকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।"

"আইসোলেশন ওয়ার্ড? কেন? ওঁর কি কোনও ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে?"

"না। শেষ অবস্থায় আমরা রোগীকে জেনারেল ওয়ার্ড থেকে সম্ভব হলে সরিয়ে আনি। নাহলে অন্যান্য পেসেন্টদের মনে শক লাগে।"

"ও!"

ঋতব্রত যখন গিয়ে পৌঁছল বৃদ্ধার তখন শেষ অবস্থা। দীর্ঘ দিনের রোগভোগে চক্ষু কোটরাগত। চৈতন্য কিন্তু পুরোমাত্রাতেই আছে। মাথার পাশে বসে আছে কমলা পাষাণ প্রতিমার মতো। দেখলে বোঝা যায় কদিন তার স্নানাহারও হয়নি। অনাহার-অত্যাচারে তাকেও মৃত্যুপথযাত্রীর মতোই দেখাচ্ছে। বাইরের বারান্দায় দুটো টুল পেতে ডাক্তার সাধুচরণ গল্প করছিলেন ভৈরবচন্দ্রে সঙ্গে। একটা ইনজেকশন সিরিঞ্জ ধুয়ে তুলছিল নার্স। ঋতব্রত সোজা গিয়ে দাঁড়াল রোগিনীর শিয়রে। তার হাতখানা গিয়ে মিশল মৃত্যুপথযাত্রিনীর রোগপাণ্ডুর হাতে। কোটরাগত চক্ষুর কোল বেয়ে ঝরে পড়ল অশ্রু। কমলা আঁচলে চোখ মুছল।

"কমলা রইল"—ধীরে ধীরে বললেন মৃত্যুপথযাত্রিনী।

কি জবাব দেবে ঋতব্রত ভেবে পেল না।

ডাক্তারবাবু সিরিঞ্জটা নিয়ে এসে বললেন, "দেখি হাতখানা।"

"আর থাক না ডাক্তারবাবু। ফোঁড়াফুঁড়ি তো অনেকই করলেন। এবার আমাকে শান্তিতে যেতে দিন। কটা কথা বলার আছে, বলে নিই।

ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে বলেন তিনি। ডাক্তারবাবু বিরত হলেন। তিনিও বুঝেছিলেন আর খোঁচাখুঁচি বৃথাই। তবে এতটা গ্লুকোজ নষ্ট হবে ভেবে গা কচ্‌কচ্‌ করতে লাগল তাঁর।

"কই, কমলা কই রে?"

"এই যে মা।" ঝুঁকে পড়ে কমলা।

চোখ বুজলেন রোগিনী। বলেন, "আমি সব শুনেছি বাবা। তোমাকে যে কি বলে আশীর্বাদ করব—। ওর মতো মেয়ে হয় না। নিজের মেয়ে বলেই বলছি না। তুমি....তুমি..." দম বন্ধ হয়ে আসছে তাঁর।

"কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আপনার। এখন থাক না। পরে বলবেন।"

"না। কষ্ট আর কী? আর পরে?" ম্লান হাসলেন বিধবা।

"ওকে দেখ। তোমাকে আর কী বলব বাবা? আমরা অনাথা। দেখ' যেন দু মুঠো খেতে পায়....ভদ্রভাবে জীবনটা যেন কাটাতে পারে। ওর বাবার বড় আদরের মেয়ে ও। উঃ মাগো!"

"আপনি কিছু ভাববেন না। ওর ব্যবস্থা করে দেব। আপনার মেয়ের মত মেয়ের বিয়ে হবেনা? সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"তুমি ওর দায়িত্ব নিচ্ছ তো? আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি?"

উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে কমলা।

"হ্যাঁ মাসিমা। ওর সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।"

"আঃ! মাগো! কইরে কমলি মা, কোথায় গেলি?"

উদগত অশ্রু দমন করে আঁচল থেকে মুখ তুলে কমলা সাড়া দেয়, "এই যে মা আমি।"

সে সাড়া আর তাঁর কানে পৌঁছায় না। তাঁর বুকের উপর উবুড় হয়ে পড়ে কমলা।

ওকে এখন কাঁদতে দিতে হবে কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ঋতব্রত। ডাক্তার এবং ভৈরবচন্দ্র তখনও আলোচনা করছেন। ক্যাম্পে ওঁরা একটা প্লে করবেন সব স্টাফ মিলে। সেই সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছিল বোধহয়। হঠাৎ সাধুচরণ বললেন,

"অরক্ষণীয়ার ড্রামাটাইজড্ ভার্সান আছে নাকি মশাই?"

"কেন বলুন তো?" প্রতিপ্রশ্ন করেন ভৈরবচন্দ্র।

"জ্ঞানদা আর অতুলের পার্ট নেবার মত দুটো লোকের সন্ধান পেয়েছিলাম।"

"তাই নাকি?"

পাশ দিয়ে ঋতব্রত অন্যমনস্কের মত চলে যায়—একটা কথাও তার কানে যায়নি। সে চলেছিল আপন খেয়ালে।

দুনিয়া কারও জন্যে বসে থাকে না। মাতৃবিয়োগের শোকও ভুলতে হয় একদিন কমলাকে। তার চারিদিকে বিপদের বহুমুখী উদ্যতফনা নাগিনী! চোখের জল মুছে ফেলতে হল তাকে। অনাথার আবার শোক কিসের? যন্ত্রচালিতের মতো কাজ করে যায়। সব কাজের হারানো খেই একে একে তুলে নেয় হাতে। দৈনন্দিন কার্য-তালিকা তার আবার পূর্ব্ববৎ হল। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম সকাল সন্ধ্যায় হাসপাতাল যাওয়াটা রইল বন্ধ। মাঝে মাঝে উদাস হয়ে বসে থাকে। ভাবে, তার অতীত জীবনের কথা—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। তার ছেলেবেলাকার সাথীদের মনে পড়ে। বন্ধু তার ছড়ানো আছে সারা বাংলায়। যেখানে যেখানে তার বাবা বদলি হয়েছেন সেখানেই তার আলাপ হয়েছে নতুন বন্ধুদের সঙ্গে।

রতন বাজার নিয়ে আসে। সাজিয়ে সাজিয়ে তুলে রাখে ডালায়। হঠাৎ কখন ঋতব্রত এসে বলে একখানা রুমাল লাগবে। ট্রাঙ্ক খুলে রুমাল বার করে দেয় কমলা। আজকাল ট্রাঙ্কের চাবি কমলার কাছেই থাকে। জামাকাপড়, টাকা পয়সা সবই থাকে কমলার হেপাজতে। শুধু সুটকেসের চাবিটা থাকে ঋতব্রতের কাছে। ওর মধ্যে আছে ওর ডায়েরি, কবিতার খাতা, চিঠির বাণ্ডিল।

একদিন রাতে আবার হঠাৎ এল ইয়াসিন। চোখ দুটো লাল। গায়ে মদের গন্ধ। ঋতব্রতের ইচ্ছা করে না ওর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু আলাপ শুরু করেই বুঝতে পারলে কী মর্মান্তিক দুঃখে আজ মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করেছে ইয়াসিন।

ইয়াসিন তার মাহিনার প্রাপ্য টাকা নিতে গিয়েছিল রামশরণের কাছে। বাকবিতণ্ডাও হয়েছে কিছু। কালিবাবু রাগের মাথায় বলে দিয়েছে ইয়াসিন নাকি নালিশ করতে এসেছিল সাহেবের কাছে। শুনে হঠাৎ ক্ষেপে গেল রামশরণ। ঋতব্রত তার নাগালের বাইরে কিন্তু ইয়াসিন তো ছিল হাতেব কাছেই। পা থেকে জুতো খুলে বসিয়ে দিল ইয়াসিনের মুখে। রুখে উঠেছিল ইয়াসিন। তখন রামশরণের

আদেশে তার ভৃত্যবর্গ নির্মম প্রহার করেছে ইয়াসিনকে। ইয়াসিন থানায় গিয়েছিল নালিশ করতে। সেখানে দারোগা তাকেই লক্-আপে রেখে দেয় সারা দিনরাত। মোটর পার্টস্ চুরির অভিযোগ ছিল পূর্বাহ্ণেই রামশরণের। ইয়াসিনের সহকারী ক্লীনাব মতিয়া নাকি মোক্তারবাবুকে খবর দিয়ে জামিনে খালাস করে এনেছে ওকে। শুনে একেবারে ক্ষেপে গেল ঋতব্রত। এরা কী? গরিব বলে কি মানুষ বলেই গণ্য করা হবে না ইয়াসিনকে? জিজ্ঞাসা করলে, "এখন কী করবে?"

"জেল হলে জেলে যাব। খালাস পেলে বাড়ি চলে যাব।"

"বাড়ি কোথায়?"

"আজ্ঞে, ছিলাম তো বরাবর শ্রীরামপুরে। পার্টিশনের পর পরিবার পাঠিয়ে দিয়েছি কুষ্টিয়ায়। সেখানেই চলে যাব।"

"টাকা আদায়ের কী হবে?"

"টাকা আর দেবে না হারামির বাচ্ছা। আগেই চলে যাওয়া উচিত ছিল আমার। শালা লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে আটকে রেখেছিল এতদিন।"

চুপ করে রইল ঋতব্রত।

"তবে আমিও এর শোধ নেব। আমিও একবার দেখে নেব শালাকে। জেলে যেতে ইয়াসিন মিঞার ভয় নেই। জেলের বাইরেও লপ্সির চেয়ে কীই বা ভালো খাইয়ে রেখেছিল? তবে ও শালাকে যদি না জেলের ভাত খাওয়াতে পারি—"

অতি দুঃখেও হাসি আসে ঋতব্রতের, "তুমি কী করতে পার ওর বিরুদ্ধে? টাকা দিয়ে সব ঢেকে দেবে সে। ওর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজাতে পারবে তুমি?"

"মিথ্যা কেন স্যার? সত্যি কথাই বলব আমি। তাই তো এসেছি।" ঋতব্রত কৌতূহলী হল। কী বলতে চায় ইয়াসিন?

নিম্নকণ্ঠে ইয়াসিন নিবেদন করে তার অভিযোগ। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যায় না। একথা কি সত্যি? কিন্তু টিন তো সত্যিই কিছু খারাপ আসছে না! বললে, "সত্যি জানো তুমি?"

"হ্যাঁ স্যার! আমি জানব না? প্রতিবার তো আমিই গাড়ি চালিয়ে আনি। স্টোর থেকে সরকারি টিন ওঠে কলকাতায়। তারপর আমরা যাই লিলুয়ায়। সেখানে আপনাদের সরকারি সব ভালো টিন নেমে যায়। গাড়িতে লাদ করা হয় খারাপ টিন। কালিবাবু আমাকে বুঝিয়েছে লিলুয়া থেকেও সরকারি টিনই ওঠে। ও ভাবে আমরা জানি না কিছু। আমি শালা যে জেনে শুনে চুপ মেরে আছি এটা বিশ্বাসই করেনি ওরা। ভেবেছে জানলে নিশ্চয়ই ভাগ চাইতাম কোনও দিন না কোনও দিন।"

ঋতব্রত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কথাটা কেমন করে বিশ্বাসযোগ্য? যে করোগেটেড টিন সাইটে এসে পৌঁছয় তাও তো বাণ্ডিল বাঁধা ঝকঝকে নতুন টিনই! কলকাতার স্টোর থেকে লিস্ট আর রোড পার্মিট সমতে লরি ছাড়ে—এখানে ওর ওয়ার্ক-সরকার লিস্ট মিলিয়ে মাল খালাস করে। এত বাণ্ডিল, এত ফুট। কোনও দিন তো হিসাবের গণ্ডগোল হয়েছে এরকম রিপোর্ট পায়নি কিছু! নতুন মাল, একই বাণ্ডিল বাঁধা ভালো মাল—একই দৈর্ঘ্যের একই মাপের টিন যদি আসে তবে বদল করার মানেটা কী?

"আপনি বিশ্বাস করছেন না স্যার?"

অন্যমনস্কের মত ঋতব্রত শুধু বললে, "হুঁ?"

ইয়াসিন বুঝতে পারে টিন বদলানোর ব্যাপারে বিশেষ কিছু হবে না। মুখে যতই বড়াই করুক, ভালো টিন আর খারাপ টিন শব্দ দুটি তার রচনাই। বস্তুত ব্যাপারটায় একটা গোপন করার প্রয়াস দেখেই কিছু একটা সন্দেহ করেছিল সে—আসলে রহস্যটা কিছুই বোধগম্য হয়নি তারও। তাই এবার সে অন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করলে. "আর তাছাড়া আপনি শেঠজীর হাতে যে দু'খানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন কলকাতায়—সে দুটো সে খুলে পড়েছিল স্যার!"

"তুমি সত্যি কথা বলছ?"

"হ্যাঁ স্যার, মিথ্যা বলে আমার লাভ?"

"লাভ আছে বই কি। রামশরণ তোমাকে অপমান করে, জুতো মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে বলছ —রামশরণের নামে দুটো মিথ্যা বললে আমি যদি তার উপর বেশি রেগে যাই তাহলেই তোমার লাভ।"

তখন কসম খেয়ে ইয়াসিন বললে সে সত্যি কথাই বলছে। কেমন করে খাম খুলে চিঠিগুলো পড়ছিল শেঠজী, সে কথাও বললে সবিস্তারে।

"আচ্ছা তুমি যেতে পারো।"

সেলাম করে চলে গেল ইয়াসিন।

আর কোনও দিন টাকার কথা বলেনি ঋতব্রত কমলাকে। কমলা এতে খুশিই হয়েছিল। আবার সে গৃহকর্মে ডুবে গিয়েছিল। ওদের সম্পর্কটা যে প্রভু-ভৃত্যের—এ কথাটা ভুলে থাকতে চায় কমলা। সে যেন ঋতব্রতের কোনও আত্মীয়া। মামাতো কি পিসতুত বোন, এসেছে ক'দিন ওর সংসারটা চালিয়ে দিতে। সম্পর্কটা এতদূর সহজ হয়ে উঠেছে যে, কমলা একদিন এসে ঋতব্রতকে অম্লান বদনে বললে, "আচ্ছা আপনার বাড়িতে একটি মেয়ে থাকে জানেন?"

কবিতার খাতাখানা বন্ধ করে উঠে বসে ঋতব্রত, "কেন বলতো?"

"সে শাড়ি-ব্লাউজ-সায়া পরে তা জানেন?"

"আন্দাজ করছি—যেহেতু সে ভদ্রসমাজে মুখ দেখায়—কিন্তু কেন বলতো?"

'এখনও কেন? সেগুলো ব্যবহার করলে ছিঁড়ে যায় তা জানেন?"

এ কথার পরেও অন্যমনস্ক কবি প্রকৃতির লোকটির নজর পড়বে না এতটা স্থূল নয় সে। ছি ছি—এটা তার আগেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল। শাড়িটার বিভিন্ন জায়গায় তালি দেওয়া আর সেলাই করা। ব্লাউজটাও তথৈবচ। হাতার কাছে অনেকটা অনাবৃত। ছেঁড়াটার পাশ দিয়ে লম্বা সেলাই চিহ্ন। অর্থাৎ ব্লাউজের কাপড়টা পচে ফেঁসে গেছে—সেলাইয়ে আর বাগ মানানো যাচ্ছে না তাকে?

"এর জন্যে তুমিই দায়ী। টাকা পয়সা তোমার কাছই থাকে। প্যান্ট নেই বলে রতনকে দিয়ে ন'গজ খাঁকি কাপড় আনালে। দর্জি ডাকিয়ে মাপ নেওয়ালে। অথচ শাড়ি-ব্লাউজ কিনলে না কেন?"

"বা রে! আপনার টাকা না বলে নিজের জন্যে খরচ করি কি করে?"

"আমার টাকা তোমার টাকা খুব জ্ঞান হয়েছে দেখছি যে!"

খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে কমলা।

"বেশ, ব্যবস্থা আমিই করছি। কত ইঞ্চি শাড়ি পর তুমি?"

আবার হেসে লুটিয়ে পড়ে কমলা।

"শাড়ির মাপ ইঞ্চি মেপে হয় না ধুতির মতো। হাতে মেপে হয়। দশ হাতি।"

"তা অত হাসির কি আছে? কিনিনি তো কখনও, তাই জানি না।" আর ব্লাউজ? সেটা তো হাত মেপে নয়—-সেটা কত ইঞ্চি?"

"তা আমিও জানি না। কিনিনি তো কখনও, তাই জানি না।"

"তবে নমুনা দাও একটা।"

"নমুদা কোথায় পাব? একটাই আছে—সেটা গায়ে। সেটা খুলে দিতে পারি—কিন্তু কথা দিন যতদিন না নতুন ব্লাউজ হয়—বাড়ি ঢুকতে পাবেন না আপনি।"

কান দুটো লাল হয়ে ওঠে ঋতব্রতের। এতদূর শোচনীয় অবস্থা হয়েছে কমলার? অথচ ঘুণাক্ষরেও কোনও দিন জানায়নি কিছু। অত্যন্ত রূঢ় কণ্ঠে ধমক দিয়ে ওঠে, "ফাজলামি রাখ। মাপটা দিও আমায়।

সব সময় ফাজলামি ভাল লাগে না।"

নিজের রূঢ় স্বরে নিজেই চমকে ওঠে সে। এতটা কঠিন স্বরে ধমক দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? প্রয়োজন ছিল। ধমকটা সে দিয়েছে নিজেকেই! নিজের অন্যমনস্কতাকে, নিজের অক্ষমতাকেই। কেন সে এটা লক্ষ্য করেনি এতদিন। তাছাড়া হঠাৎ এই মুহূর্তেই তার শিক্ষিত ভদ্র মনের অন্তরালবাসী পশুটা একটা ভুলে যাওয়া ছবির উপর থেকে পর্দা তুলে ধরবার উপক্রম করেছিল বোধহয়। ধমকটা সে নিজেকেই দিয়েছে রূঢ়স্বরে।

কমলা কিন্তু বিন্দুমাত্রও রাগ করে না। হেসে বলে, "আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না মশাই। আমাব শাড়ি-ব্লাউজ বাবদ কিছু টাকা স্যাংশন করুন! আমি নিজেই ব্যবস্থা করে নেব!"

ঋতব্রত তৎক্ষণাৎ খান কয়েক দশটাকার নোট এগিয়ে দিল কমলার দিকে। বিনাবাক্যব্যয়ে কমলা গ্রহণ করল তা হাত পেতে। বললে, "আপনি তো কই বললেন না, শুধু খাওয়া শোওয়ার কথাই ছিল আমাব। পবতে দেওয়ার কথা তো হয়নি।"

"আঃ! আবার ঐ কথা! তুমি ভারি ইয়ে—"

"কিয়ে?" হেসে ওঠে কমলা।

"আপনাকে একটা কথা বলব?" জিজ্ঞাসা করে ফের।

"বল।"

"আপনি একটা বিয়ে করুন। এ ভূতের বেগার আর কতদিন খাটব আমি? একা একা থাকতে হয আমাকেও সারাদিন। একটা লোক হলে কথা বলে বাঁচি।"

ঋতব্রত উঠে বসে। ক'দিন ধরেই ভাবছে কমলার সঙ্গে কথাটা আলোচনা করবে কিনা। মেজদা আর বৌদি তাগাদা দিয়েছেন, অথচ জবাব আসেনি রেখা মিত্তিরকে লেখা রেজিস্ট্রি চিঠির। একটা পরামর্শেব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ঋতব্রতের। শুধু নিজে থেকে প্রসঙ্গটা তুলতে কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল তার।

বলিসটা জুত করে টেনে নিল বুকের তলায়। বাইরে অন্ধকার হয়ে আসছে। কমলা দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। ঋতব্রত বললে সব কথা খুলে। মেজেদা পীড়াপীড়ি করছেন। বৌদিও। কথার তোড়ে রেখা মিত্তিরের সঙ্গে পূর্বরাগের কথাও বলল অকপটে। অনেকদিনের নিরুদ্ধ-বাণী উজাড় করে দিল নীরব শ্রোতাটির সামনে। চুপ করে শুনল বসে কমলা। দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে ঋতব্রত বললে, "এখন বল, কী করা যায়।"

"দাঁড়ান, একটা আলোটা জ্বেলে আনি।"

উঠে যায় কমলা। অপেক্ষা করে ঋতব্রত। খানিক পরে আলো রেখে যায় রতন। রান্নাঘর থেকে ওঠে ঠুনঠান আওয়াজ। কমলা বোধহয় রান্না শুরু করে দিয়েছে। একটু অপেক্ষা করে আবার লিখতে শুরু করে ঋতব্রত।

কবিতাটা লিখছিল সে কমলাকে উদ্দেশ্য করেই।

পরদিন কমলার সঙ্গে দেখা হতেই ঋতব্রত ভাবছিল অসমাপ্ত প্রসঙ্গটার সমাপ্তি করা দরকার। ডাকতে গেল তাকে। দরকার হল না। কমলা নিজেই এল ঘরে। ছুঁড়ে দিলে একটা সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতা।

"এটা কি হচ্ছে?"

"কোন্‌টা? ও! তুমি দেখে ফেলেছ দেখছি।" হাসে ঋতব্রত। তুলে নেয় খাতাখানা। কমলা টাকা নিতে অস্বীকার করায় পরদিন ওর নামে পোস্টাপিসে একখানা মাইনর খাতা খোলে। তিন মাসে ত্রিশটাকা জমা পড়েছিল সেটাতে।

"আপনি কেন আমাকে না জানিতে খাতা খুললেন?"

"অন্যায় করেছি?"

"নিশ্চয়ই! এভাবে অপমান করার কী অধিকার আছে আপনার?"

"মান অপমানের বোধটা খুব তীক্ষ্ণ হয়েছে দেখছি।" হেসেই বললে কথাটা।

হঠাৎ চটে উঠল কমলা, বললে, "আমি গরিব হতে পারি, কিন্তু তাই বলে মান অপমান বোধ থাকবে না এটাই বা আপনি আশা করেন কি করে স্যার?"

'স্যার' কথাটায় এবং কণ্ঠস্বরে বোঝা যায় কমলা ভীষণ চটেছে। এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায় ঋতব্রত ভেবে পায় না। বলে, "কী পাগলামি করছ? মান অপমানের কথা উঠছে কোথায়?"

"উঠছে। আপনাকে তো আমি বলেছি টাকা আমি নেব না। তা সত্ত্বেও....।"

"এ টাকা তো তোমাকে এখনও দিইনি আমি, অত চটছো কেন?" তারপর রসিকতা করে জিনিসটা সরল করবার উদ্দেশ্যে বললে, "তোমার বিয়ের সময় তো একটা যৌতুক দিতে হবে, তাই জমাচ্ছি টাকাটা। ক্রমে ক্রমে না জমালে আমিই বা পারব কি করে?"

হাত বাড়িয়ে খাতাখানা টেনে নেয় কমলা। তারপর হঠাৎ টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে সেখানা। ঋতব্রত তাড়াতাড়ি এসে চেপে ধরলে ওর হাত। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল কমলা। ফিরে এল একটু পরেই।

"আমার মত রিফ্যুজি মেয়েদের যে বিয়ে হয় না, একথা আপনিও জানেন আমিও জানি। এ নিয়ে রসিকতা করার তো কোন দরকার নেই।"

স্তম্ভিত হয়ে গেল ঋতব্রত! এ কি থেকে কী হল?

আঁচলের খুঁট খুলে ক'খানা দশটাকার নোট রেখে দিল কমলা টেবিলে। চাপা দিল একটা পেপার-ওয়েটে। বললে, "এটা তুলে রাখবেন।"

"মানে? ও টাকাটাও নেবে না তুমি?"

"বিয়ের সময় রেখা মিত্তিরকেও তো শাড়ি কিনে দিতে হবে—ক্রমে ক্রমে না জমালে পারবেন কেন আপনি?"

"কমলা, লক্ষ্মীটি!" উঠে আসে ঋতব্রত।

"না না—ও আমি কিছুতেই নেব না—কিছুতেই না।"

দু চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় কমলা।

ঋতব্রতের কাছে সমস্ত আচরণটাই রহস্যময়।

দিন কেটে যায়। কমলা যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে চলে। কাজ করে রতন ; কাজ করে ঋতব্রত। ওর সামনেই আসে না কমলা। আসার উপায়ও নেই হয়তো—ভাবে ঋতব্রত। ব্লাউজটা আরও ছিঁড়ে গেছে। অস্বোয়াস্তিতে ছটফট্ করে ঋতব্রত। এ তো ভারী বিপদে পড়া গেল। কখনও যদি বা কমলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—তার মুখখানা কালবৈশাখীর আকাশের মতো। কথাবার্তা প্রায় বন্ধই। সন্ধির কোনও সূত্রও খুঁজে পেল না বেচারী। হতাশ হয়ে পড়ে ক্রমশ। সমস্যা সমস্যাই রয়ে গেল।

সমাধান যে আসন্ন তা বোঝা যায়নি। অভাবিত ভাবে মূর্তিমান সমাধান এসে হাজির হলেন একদিন সকালে ল্যাণ্ড-রোভারে চড়ে। এসেই হৈচৈ শুরু করে দিলেন। সেটা ছিল রবিবার। কাজ ছিল না ঋতব্রতের। সঞ্জীব চৌধুরী মস্ত একটা রুইমাছ নিয়ে এসেছেন! ডাক পড়ল কমলার।

"মাথাটা দিয়ে মুড়িঘণ্ট হবে। পেটি দিয়ে কালিয়া, গাদা ভাজা। বানাও দেখি জুত করে। পেয়ে গেলাম একটা হাটে। শোন সরলা, বেশ বড় জামবাটিতে করে দেবে আমাকে। চুজ্ ফর মি এ ম্যাগনাম সাইজ জামবাটি! কবজিভর ডুবিয়ে খেতে পারি যেন।"

হেসে ফেলল কমলা। দীর্ঘদিন পরে হাসি দেখা গেল ওর মুখে।

"বড় বড় নৈনিতাল আলু লাগবে। আছে ঘরে? না থাকে তো ওই রসিক না কি যেন আছে পিয়নটা ওকে বাজারে পাঠাও—ও ঠিক পারবে।"

"আজ্ঞে আমার নাম রতন।" এগিয়ে আসে রতন।

"ঠিকই চিনেছি! রতনে বতন চেনে। মাছটা কেটে ফেলতো বাবা।" রতনকে নিয়ে কমলা চলে যায় রান্নাঘরে।

"চলুন আপনার গাড়ি করে আমরা ঘুরে আসি একটু!"

"রাইটও। চল।—হরদয়াল!"

"হরদয়াল এখানে থাক। আপনাকে কয়েকটা কথা বলব গাড়িতে।"

"ইজ ইট?"

দুজনে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে পড়ে স্টেশনমুখো।

গাড়িতে সমস্ত কথা ঋতব্রত খুলে বলল চৌধুরীসাহেবকে। চৌধুরী ধৈর্য ধরে শুনলেন সব।

"কেন ক্ষেপে গেল বুঝলাম না।"

"বুঝলে না? তা বুঝবে কি করে? ওর নাম সরলা বটে—কিন্তু—নামটা তোমার হওয়া উচিত ছিল।"

"ওর নাম সরলা নয় কমলা—ভুল করছেন আপনি।"

"মোটেই ভুল করিনি। তাই তো বলছি আমি—ওর নাম সরলা হওয়া মোটেই উচিত নয়—তুমিই সরল। সিম্পল অ্যাজ্ এ সিম্পল্টন!"

"আপনি বুঝতে পেরেছেন কিছু?"

"সিওর!"

"কী বলুন তো।"

"এখন নয় পরে বলব।"

"তবে ফেরা যাক।"

"নো। আমাকে একবার স্টেশনবাজার ঘুরে যেতে হবে।"

"কী, নৈনিতাল আলু তো?"

"ইয়েস! বেটে তোমার ব্রহ্মতালুতে লেপে দিতে হবে।"

ঋতব্রত চুপ করে যায়। বোঝে চৌধুরী মর্মান্তিক চটেছেন!

গাড়ি স্টেশনবাজারে দাঁড়ায়। বাজার ঘুরে ঘুরে গোটা তিনেক শাড়ি কিনলেন চৌধুরী। দুখানা তাঁতের—একটা সিল্কের। সায়া। ছিটের কাপড়। একটা মাথার তেল। বড় চিরুনি একখানা। ট্যালকম পাউডার এক কৌটো। মাথার কাঁটা, ফিতে, সেন্ট এক শিশি, চটি একজোড়া, ব্লাউজ।

ঋতব্রত একটা কথাও বলেনি এতক্ষণ। এবার ভয়ে ভয়ে বললে, "মাপ না জেনে ব্লাউজ কেনা যাবে?"

অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন শুধু চৌধুরী, কিছু বললেন না। বেছে বেছে খান চার পাঁচ ব্লাউজ কিনলেন তিনি। ঋতব্রত আবার বললেন, "ইয়ে, বলছিলাম কি, মাপটা না জেনে—"

"আমি যদি ইউনিভার্সিটির ইনচার্জ হতাম তা হলে তোমার ডিগ্রি কেড়ে নিতাম।"

"কেন?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে ঋতব্রত, "আমার ডিগ্রির কি অপরাধ হল?"

"একটা মেয়ের সঙ্গে তিন মাস বাস করেও যে তার গায়ের মাপ এস্টিমেট করতে পারেনা—সে ইঞ্জিনিয়ার?"

আবার চুপ করে যায় ঋতব্রত।

এক কাঁড়ি বাজার করে ফিরলেন চৌধুরী। কমলাকে ডেকে বললেন, "এ চশমখোরটা তো তোমাকে পাগলি সাজিয়ে রেখেছে। তা ওর সংসারে তুমি যা কর আমি দেখতে আসি না। কিন্তু ছেঁড়া কাপড় পরে ভাত বেড়ে দিলে আমি কিন্তু তোমার হাতে খাবই না। এরজন্যে এক পয়সাও খরচ হয়নি এই কিপ্‌টেটার। অল কামস্ ফ্রম য়োর সান্‌স্ পকেট।"

কমলা হাসিমুখেই সব উপহার গ্রহণ করল।

"না, শুধু হাত বাড়িয়ে নিলেই চলবে না। এগুলো আমার সামনে পরে আসতে হবে। আই লাইক সি হাউ দীজ্ সুটস্ ইউ। আবার কবে আসি না আসি।"

"তবে তো কিছুতেই পরব না আজ। এটুকু দেখবার জন্যেই আপনাকে আর একদিন আসতে হবে ফের। মায়ের খোঁজই তো নেন না একেবারে।"

"না, সে হবে না। তুমি স্নান সেরে আমার দেওয়া কাপড় জামা পরে না এলে তোমার হাতে খাবই না আমি।"

"তা হলে কথা দিন আসছে রবিবারে আবার আসছেন।"

"নেক্সড্ সানডে? ইম্পসিব্ল! আসছে রবিবার আমি থাকব পাটনায়। তার পরের বুধবার আসব।"

"আচ্ছা তা হলেই চলবে।" খুশি হয়ে কমলা রান্নাঘরে ফিরে যায়।

দুপুরে টেবিলের উপর খবরের কাগজ পেতে খেতে দেওয়া হল ওদের দুজনকে। দুজনে টেবিলে গিয়ে বসলেন। দুহাতে দুখানি থালা নিয়ে এল কমলা। ঋতব্রত মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। সবুজ রঙের ডুরে শাড়িটা জড়িয়ে উঠেছে কমলার তনুদেহ। সদ্য স্নান করে ভিজে চুল খুলে দিয়েছে পিঠের উপর। পাউডারের প্রলেপ লেগে রয়েছে রজনীগন্ধার ডাঁটার মত গ্রীবার পার্শ্বে। কপালের মাঝখানে একটি বড় সিঁদুরের টিপ্। প্রসাধনের একটা স্নিগ্ধ মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। ওদের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে চোখ নিচু করল কমলা। মুখে ফুটে উঠল অনভ্যস্ত সজ্জার সলজ্জ হাসি। টোল পড়ল গালে।

ঋতব্রতের কবি মন বললে, "গালের ঐ টোলটিই হল ষোলো কলার ষোড়শ কলা।"

"এই না হল আমার মা! দ্যাখ্ দ্যাখ্ হতভাগা! এই মাকে আমার কী করে রেখেছিলি তুই!

দ্রুতপায়ে কমলা চলে যায় ঘর ছেড়ে। প্রায় ছুটেই। ঋতব্রত খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে! মনে পড়ে তার কবিতাটা অসমাপ্ত পড়ে আছে। আজ রাত্রেই শেষ করতে হবে সেটা।

আহারান্তে ঋতব্রতের খাটে চিৎ হয়ে পড়লেন চৌধুরীসাহেব। ডেকে পাঠালেন কমলাকে। কমলা এসে বসল। চৌধুরী গল্প শুরু করলেন। তাঁর ছেলেবেলার গল্প। প্রথম বিলেতযাত্রার কাহিনী। গল্প-গুজবে বিকেল গড়িয়ে আসে। বিকেলে চৌধুরী ঝোঁক ধরলেন বেড়াতে যেতে হবে। ভাদ্রমাস হলেও আকাশটা পরিষ্কার ছিল। গাড়িতে স্টোভ তোলা হল। চায়ের সরঞ্জাম। পাকা রাস্তা ধরে অনেক দূর গিয়ে থামলেন তিনি। একটা বড় 'রেনট্রি' গাছের তলায় স্টোভ জ্বেলে চা খাওয়া হল। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে এলেন সবাই।

এবার বিদায় চাইলেন চৌধুরী। কমলা বললে, "এই বুধবারের পরের বুধবার আসছেন তো?"

"সিওর! এখানকার কাজ আমার শেষ হয়ে এল। এবার পাটনায় যেতে হবে আমাকে। তোমার রান্না খেয়ে এত লোভ হয়েছে যে ভাবছি তোমাকে পাটনায় নিয়ে গেলে কেমন হয়?"

"আর এখানে?" প্রশ্ন করে কমলা।

"এখানে কী ব্যবস্থা হবে তাতে আমাদের কি দরকার। রসিকের রান্না পছন্দ না হলে একটা বিয়ে করলেই পারে ও। বউ যখন ইচ্ছে যোগাড় হবে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের—কিন্তু মা তো আমি পথে ঘাটে পাব না?"

ঋতব্রত "বা রে, সে হবে না" জাতীয় কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কমলা বললে, "সত্যি আমাকে নিয়ে যাবেন? পাটনা আমি যাইনি কখনও। ভারি ইচ্ছে করে দেখতে। ক্যাম্পে আর ভালো লাগে না।" ঋতব্রত সামনে নিলে নিজেকে।

"সত্যিই নিয়ে যেতাম—তুমি রাজি থাকলে।"

"আমি রাজি।"

"বেশ, তবে বুধবার তৈরি থেকো।"

গতবারের মত 'দ্যাটস্ সেট্‌লড! বাই বাই!' বললেন না তিনি এবার। চির উৎসাহী চৌধুরীসাহেবও যেন ঠিক উল্লসিত হতে পারলেন না ব্যবস্থাটায়।

চৌধুরী-সাহেবকে এগিয়ে দিতে এল ঋতব্রত। বাড়ি থেকে বার হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি সত্যিই কমলাকে নিয়ে যাবেন এখান থেকে?"

"ইয়েস্।"

এমন গম্ভীরভাবে কথাটা বললেন তিনি—যেন প্রিভি কাউন্সিলের রায়! এরপর আর কোনও কথা ঋতব্রত খুঁজে পেল না। চৌধুরী গিয়ে বসলেন ল্যাণ্ড-রোভারে। হঠাৎ ঋতব্রত প্রশ্ন করলে, "কেন ও আমার উপর রাগ করে আছে বললেন না তো?"

"ইউ নিড্‌নট্ নো। আমি তো নিয়েই যাচ্ছি ওকে।"

ঋতব্রতের কেমন যেন খটকা লাগে। হরদয়াল ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়েছে তখন।

"কী ব্যাপার বলুন তো?" শুধালো সে।

"ডোন্ট ইউ ফলো স্টিল?"

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ঋতব্রত। কী একটা গোপন রহস্যের উপর থেকে যবনিকা যেন সবে আসতে থাকে—মনে পড়ে অনেক দিনের অনেক সামান্যতম ঘটনা—অতি তুচ্ছ—অথচ অতি অমূল্য।

ফার্স্ট গিয়ার টেনেছে হরদয়াল। ঘড়ঘড়ে আওয়াজে ইঞ্জিনটা কি বলতে চায়—অথচ বলতে পারে না! হঠাৎ মুখটা বাড়িয়ে চৌধুরী সাহেব বলেন, "য়ু আর এ রিয়েল সিম্পল্‌টন! এ কূল!"

ঋতব্রতের মাথাটা টেনে এনে কানে কানে বলেন, "ওর মনে আবার নতুন করে আঘাত দিও না। সাবধানে কাটিয়ে দিও কটা দিন।" অবাক বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকায় ঋতব্রত! এ কথার মানে কী?

"শি লাভস্ য়ু—ঈডিয়ট!"

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে রওনা হয়ে গেল ল্যাণ্ড-রোভার। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ওর!

সতর্ক হয়ে গেছে ঋতব্রত। কমলা তাকে ভালবাসে! আশ্রয় দেবার অছিলায় নিয়ে এসে সে তাব সর্বনাশই করেছে শুধু। তাই চৌধুরীসাহেব ওকে নিয়ে যেতে চান দূরে—ঋতব্রতের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করে। সেখানে গিয়ে কমলা ভুলতে চেষ্টা করবে ওকে। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ইঞ্জিনিয়ারের বধূ হবার স্বপ্ন তার মত মেয়ের পক্ষে অন্যায়। পাপ! এমন উচ্চাশা সে কেন করে? জেনে শুনেও যদি তুমি আগুনে হাত দাও তবে আগুন তোমাকে ক্ষমা করবে না। অথচ এই কমলার উপর কবিতা লিখেছে সে! ছিঃ! যাকে বিয়ে করে বধূ হবার যোগ্যতা দিতে পারে না, তাকে নিয়ে কাব্য করার শখ কেন? নিজের উপরেই রাগ ধরে তার, কিন্তু তারই বা দোষ কোথায়? সে তো ইচ্ছে করে কমলার সর্বনাশ করেনি? সে তো জ্ঞাতসারে কোন প্রশ্রয়ও দেয়নি কমলাকে। কমলার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া যে একান্ত অসম্ভব এ কথা তারা দুজনেই জানে। তবে কেন এমন হয়? মনে পড়ে কমলার মাকে কথা দিয়েছিল ভার নেবে। ভার তো সে এখনও নিতে রাজি। দায়িত্ব নেওয়া মানে তো নিজে বিয়ে করা নয়। সে অর্থে প্রতিশ্রুতি দেয়নি ঋতব্রত। না কখনই না। মৃত্যুপথযাত্রীনীও নিশ্চয় সে কল্পনা পোষণ করেননি অন্তরের নিভৃততম কোণেও। আচ্ছা, কমলার বিয়ের খরচ বাবদ যদি কিছু দেয় সে চৌধুরীসাহেবকে? হাসি আসে মনে মনে। টাকা দেবে চৌধুরীসাহেবকে? ওঁর আউট-স্টেশন অ্যালাউন্সটাই হয়তো ঋতব্রতের মাহিনার চেয়ে বেশি। যাক, কমলাতো জলে পড়ছে না। যাক সে চলে।

আবার তখনই খচখচ করে মনের মধ্যে! কলমাবিহীন ক্যাম্পের জীবনটার কথা ভাবাই যায় না আজ। মনে মনে ভাবল—ধরা যাক কমলা চলে গেছে। সে নেই। ও আছে একা এই বাড়িটায় রতনকে নিয়ে। যেমন ছিল এতদিন। আজ যেন তা ভাবাই যায় না। কেন যায় না?

সুট্যকেশের তলা থেকে কমলার উদ্দেশ্যে লেখা অসমাপ্ত কবিতাটা বার করে আবার পড়ে একবার। এ কী লিখেছে সে? এ কবিতা তো শুধুমাত্র সৌন্দর্যের উপাসনা নয়। এর প্রতি ছত্রে ছত্রে যে সে ধরা পড়ে গেছে। কবিতাটা তারস্বরে বলছে, "তুমিও ওকে ভালবেসে ফেলেছ ঋতব্রত। তুমিও ওকে ভুলতে পারবে না।"

ছিঃ! এ সব কি ভাবছে সে? কমলা কে? একটা সাধারণ রিফ্যুজি মেয়ে। সাতঘাটের জল খেয়ে এসে ঠেকেছে ক্যাম্পে। সে নিজে সম্রান্ত ঘরের ছেলে। ক্যাম্প থেকে একটা উদ্বাস্তু ঘরের মেয়ে নিয়ে সে কোন লজ্জায় গিয়ে দাঁড়াবে বাড়িতে—বোস বাড়ির ছোট বউ এনেছি বলে? কী আশ্চর্য? বিয়ে করার কথা উঠছে কোথায়? মানে মানে এই কটা দিন কাটিয়ে দিলেই হল।

এড়িয়ে চলতে লাগল সে কমলাকে। কমলাও এড়িয়ে চলে ওকে। দুজনের কেউই ধবা দিল না অপরের কাছে—অথচ দুজনেই বুঝলে ধরা তারা পড়ে গেছে।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিল ঋতব্রত এই সব কথাই। দশ দিনের মেয়াদ ওদের। একে এক দিনগুলি কেটে যাচ্ছে। প্রতিমুহূর্তেই এগিয়ে নিয়ে আসছে বিচ্ছেদের দিনটিকে। ঋতব্রত ভাবছে তার ক্যাম্প-জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। মনে পড়ে প্রথম আসার দিনটার কথা। ইয়াসিন তাকে নিয়ে এলে জীপে করে। ইয়াসিন। লোকটার শেষ পর্যন্ত কী হল কে জানে? ও বেচারীও উদ্বাস্তু—ও পড়ে আছে এপারে, পবিবার আছে ওপারে। ইয়াসিনের কথায় একটা সম্ভাবনার কথা হঠাৎ মনে পড়ল তার। বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত উঠে বসল ঋতব্রত। উঃ! কী বোকা সে! এই সোজা কথাটা বুঝতে পারেনি এতদিন। তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে ডরম্যান লঙের মোটা বইখানা নিয়ে কী দেখল। স্লাইডরুলটা টেনে নিয়ে বার কয়েক এপাশ ওপাশ টানাটানি করে কী হিসাব করল যেন। উঃ! একটা আইটেমেই অন্তত পাঁচ হাজার টাকা লাভ করবে রামশরণ! উত্তেজায় পায়চারি করতে শুরু করল সে। এক বাণ্ডিল টিন ওজন করলে হয়। কিন্তু তা হলেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। নাঃ। সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে একটা কন্‌ফিডেন্সিয়াল চিঠি দিক দত্তসাহেবকে। কপি দেওয়া যাক চীফকে। কিন্তু ব্যাপারটা যাচাই না করেই লেখাটা উচিত হবে কি? মুখে বলাই ভালো প্রথমে।

উঠে তাড়াতাড়ি সুটকেসটা গুছাতে বসল। রতন এসে জিজ্ঞাসা করে কোথাও যাবে কি না। বললে, "কলকাতা যাব।" কমলা এসে দাঁড়ায়। এগিয়ে দেয়—তোয়ালে, টুথব্রাস, পেস্ট, শেভিং-সেট, জামা-কাপড়। একবারও জিজ্ঞাসা করল না কেন যাচ্ছে—কবে ফিরবে।

রওনা হয়ে পড়ল ঋতব্রত।

ও বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই এক ভদ্রলোক এসে খোঁজ করলেন ঋতব্রত বসুর। রতন তাঁকে বললে, "সাহেব তো কলকাতা গেছেন আজ।"

"ও, কলকাতা গেছে—আচ্ছা ঠিক আছে।"

ভদ্রলোক ফিরে যাবার জন্যে ঘুরলেন।

ঘরের ভিতর থেকে দেখতে পেয়েছিল কমলা। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে ঋতব্রতর। তার সন্দেহ হল। রতনকে দিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করালো।

"কে, আমি? আমি ঋতব্রতের মেজদা। কলকাতা থেকে আসছি।" ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কমলা। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মেজদার ভ্রূকুঞ্চিত হল। বললেন, "আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।"

"আমি আপনার ভাইয়ের বাড়িতে রান্নার কাজ করি। আমার নাম কমলা। আমাকে তুমিই বলবেন।"

"ও, আচ্ছা। ঋতু কি আজই কলকাতা গেছে?"

"হ্যাঁ, ঘণ্টা দুয়েক হল।"

"কবে ফিরবে?"

"তা তো বলে যাননি।"

"আচ্ছা ঠিক আছে।" মেজদা উঠে পড়েন।

"সেকি? আপনি বসুন। এখন তো ট্রেন নেই। দুপুরে ট্রেন—একেবারে খেয়ে দেয়ে যাবেন।"

"না আমাকে এখুনি যেতে হবে।"

কমলাকে আর কোনও কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই সুট্যাকেসটা হাতে নিয়ে রওনা হলেন তিনি। রতন সুট্যকেসটা নিতে যাচ্ছিল। বিরক্তভাবে বাধা দিলেন ভদ্রলোক।

মনটা খারাপ হয়ে গেল কমলার। হয়তো ভদ্রলোকের সত্যিই তাড়া ছিল। তাছাড়া ঋতব্রত নেই—সুতরাং এখানে থাকার কোন মানে হয়তো খুঁজে পাননি তিনি।

আশ্চর্য! এই দিনই দুপুরের ডাকে এল ঋতব্রতের নামে একটা ভারী প্যাকেট রেজিস্ট্রি ডাকে। চিঠিখানা কোথা থেকে আসছে বুঝতে একবিন্দু দেরি হল না কমলার। মুক্তোর মত গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ঋতব্রতের নাম। খামের পেছনে প্রেরকের নাম-ঠিকানাও রয়েছে। সই করে খামখানা নেওয়ার পর থেকে সারাদিনই নাড়াচাড়া করেছে সেখানা। মুখটা আঠা দিয়ে আঁটা, সীল করা নয়। খুলে পড়া যায় অবশ্য চেষ্টা করলে। বুঝতেও পারবে না ঋতব্রত। কিন্তু ছিঃ! পরের চিঠি। আবার ভাবলে চলেই তো যাচ্ছে সে ঋতব্রতকে ছেড়ে আজীবনের মতো। জেনে গেলে ক্ষতি কি তার প্রিয়তম মানুষটির ভাগ্যে কী হল শেষ পর্যন্ত। খামখেয়ালী, আপনভোলা এই মানুষটিকে সে হয়তো জীবনে ভুলতে পারবে না—কিন্তু ও লোকটার জীবনে তো সে কিছু নয়। এই তো তার প্রিয়জনের ডাক এসেছে। দুর্নিবার কৌতূহলের বেগ দমন করা অসম্ভব হয়ে পড়ল কমলার। তাছাড়া চিঠি এত ভারী প্যাকেটে আসবে কেন? কী আছে এর ভিতরে? কত পাতা লিখেছে রেখা মিত্তির? না, প্রেমপত্র লুকিয়ে পড়ায় পাপ নেই—মনকে সে বোঝাল। এটা শুধুই কৌতুক, নিছক কৌতূহল।

সাবধানে খামটা খুলে ফেলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একগাদা পুরনো চিঠি। সব ঋতব্রতের লেখা। ওর মাঝে একখানি ছোট চিঠি রয়েছে মুক্তোর মতো ঝকঝকে হস্তাক্ষরে। এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেল কমলা!

কয়েক লাইন পড়তেই কমলার নিশ্বাস ঘনঘন পড়তে লাগল। থরথর করে কাঁপতে লাগল হাতখানা। অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। মুক্তোর মতো অক্ষরগুলো ইতস্তত নড়ে বেড়াতে লাগল। চিঠিখানা বন্ধ করে অনেকক্ষণ বসে রইল সে। রতনের পদশব্দে চৈতন্য ফিরে এল তার। বাজারের পয়সা নিতে এসেছে সে। আঁচল খুলে পয়সা দিল কমলা।

রতন জিজ্ঞাসা করে, "কি কি আনব?"

"যা হয়।"

রতনও হয়ত আন্দাজ করেছে কিছু। হঠাৎ সাহেব চলে গেলেন কলকাতায়। দিদিমণি বসে আছেন মাথায় হাত দিয়ে। সে বিনা বাক্যব্যয়ে পয়সা নিয়ে চলে গেল।

আস্তে আস্তে ওঠে কমলা। আঠার শিশিটা নিয়ে বন্ধ করল ফের খামখানা। রেখে দিল ডাকের অন্যান্য চিঠিপত্রের সঙ্গে ঋতব্রতের টেবিলে।

ঋতব্রত ফিরে এল। রতন তাকে জানাল ডাকে চিঠি এসেছে, বললে মেজদা এসে ফিরে গেছেন। সে সব কথা খেয়ালই হল না ওর। সে তখন অন্য নেশায় মেতে আছে। একটা 'গেজ-টেস্টার' নিয়ে এসেছে সে কলকাতা থেকে। তখনই সে বেরিয়ে পড়ল আবার। রামশরণ নেই। তার কর্মচারীকে বলে গুদামটা খোলাল। মেপে মেপে দেখল অনেকগুলো টিন। সমস্ত ছাব্বিশ গেজের। তার আশঙ্কা অমূলক নয়! ঠিকই ধরেছে সে। ওখান থেকে সে নিজেই গেল পোস্টাপিসে। দু'খানা টেলিগ্রাম করল। একখানা

দত্তসাহেবকে, অপরখানা চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে। দুজনকেই বলে এসেছিল তার সন্দেহের কথা। ইয়াসিনের কথা। পূর্বসংকেত মতো সে শুধু লিখলে টেলিগ্রামে—"অ্যাজাম্পশনস্ কারেক্ট—অনুমান সত্য।"

ব্যস! এবার ফাঁদে পড়েছেন রামশরণ। মনে পড়ল ওয়ার্ক-সবকারকে দিয়ে রামশরণ বলে পাঠিয়েছিল, "বলবেন আপনার সাহেবকে—নাফা হামি জরুর করবে। সুঁই না চলবে তো কি হইল—হাঁথি হামি জরুর চালিয়ে লিবে।"

হাতি এবার কাদায় পড়েছেন। ইয়াসিন, এ শুভ মুহূর্তে কোথায় তুমি? এসে দেখে যাও তোমার সযত্নরোপিত বিষবৃক্ষে কী ফল ধরেছে!

পরদিন টেলিগ্রামে জবাব এল চীফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে।

"তোমার তার পেলাম। এক্সিকিউটিভ মফঃস্বলে। নিজেই পরিদর্শনে আসছি কাল বেলা তিনটায়।"

টেলিগ্রাম এল পরিদর্শনের দিনই সকালে। নিজে হাতে দুখানা চিঠিতে খবরটা জানিয়ে তৎক্ষণাৎ পিয়ন-বইতে লিখে রতনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল ক্যাম্প অফিস আর ঠিকাদারকে। রামশরণ কাল রাত্রে এসেছে। খবর পাওয়া গেছে।

একটু পরেই রামশরণ এল ওর কাছে। তখন ও দশটা বাজেনি। আর কেউ আসেনি অফিসে। দীর্ঘ-তিন-চার মাস পরে আজ রামশরণের পদধূলি পড়ল অফিস ঘরে। সেই অপমানিত হয়ে ফিরে যাবার পর আর আসেনি। ঋতব্রত বসতে বলল তাকে। সিংজী বিনীত নমস্কার করে আসন গ্রহণ করল।

"সি. ই. কখোন আসবেন স্যার?"

"সে তো চিঠিতে লিখেছি। বেলা তিনটে।"

"আর কৌন আসছেন স্যার?"

"তা জানি না। জানাননি তিনি।"

"আপনি কখোন চিঠি পাইলেন? হামি তো কাল ভরদিন অফিসে ছিলাম। কিচ্ছু শুনলাম না।"

"এইমাত্র টেলিগ্রাম এসেছে।"

"ও! তবে কী কী ইন্‌তাজাম করতে হোবে বোলেন?"

"কিছুই না—যেমন কাজ হচ্ছে হবে।"

"না, হামি বলছিলাম কি, শুধু 'টি' হোবে, না 'টি-ডিনার' দুইই হোবে। কখোন লৌটে যাবেন লিখেন নাই?"

"না। তাছাড়া চা-খাবার খেতে তো আসছেন না। সে সব কিছু করতে হবে না আপনাকে। হয়তো উনি খাবেন না কিছু!"

"হোবে স্যার হোবে। জরুর করতে হোবে। খাবেন উনি। হামি এতো কষ্ট করে বনাবো ঔর উনি খাবেন নাই? আপনি ভি হমার উখানে খাবেন।"

'না, মাপ করবেন। ওঁদের জন্যে কিছু করবেন কিনা তা আমি কিছু বলব না। তবে আমি ওখানে যাব না।"

"স্যার, যা হইয়ে গেল উ তো হইয়ে গেল। আপনি হামার উপর গোঁসা করেন—মারুন হমাকে দু ঘা। লেকিন বহারওয়ালা বড়াসাহেবকে পাস কেন হমরা ঘরের ঝগড়া জানাব?"

"ঝগড়া কিসের? আপনার সঙ্গে আমার তো কোন ঝগড়া নেই? আপনি আমাকে শত্রু ভাবতে পারেন—আমি আপনাকে শত্রু ভাবি না!"

"কী বলেন আপনি। রাম রাম!"

হঠাৎ দু'প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট নিয়ে এসে রতন রেখে যায় টেবিলের উপর। ঋতব্রত কিনতে দিয়েছিল। একটা প্যাকেট খোলে ঋতব্রত। নিজে নেয় একটা, সিংজীকে অফার করে একটা। সিংজী

গ্রহণ করে। ভাব জমাবার গরজ আছে তার। দুজনেই ধরালো দুটো। অপর প্যাকেটটা সিংজীর দিকে এগিয়ে দিয়ে ঋতব্রত বললে, "এটা আপনার, নিন ধরুন।"

"হমার? কৈসে?"

বিস্মিত সিংজীর প্রসারিত করে প্যাকেটটা দিয়ে ঋতব্রত বলে, "এর আগে আপনি শেষ যেদিন এঘরে এসেছিলেন সেদিন আপনি এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে দিয়েছিলেন রতনকে। মনে আছে রতন প্যাকেটটা যখন নিয়ে আসে তখন আপনি চলে গেছেন। সে সময় রাগের মাথায় প্যাকেটটা আমি ফেলে দিই। ওটা অন্যায় হয়েছিল আমার। পয়সা সেবার আপনিই দিয়েছিলেন। ঘৃণার আবেগে সো ফেলে দেওয়া উচিত হয়নি আমার। তাই আজ শোধ দিলাম। আচ্ছা, রাম রাম।"

উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে সে। অর্থাৎ, ভদ্রভাষায় এখন তুমি যেতে পারো। রামশরণ ওঠে কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। ঘরের বাইরে পা দিয়েই ফেলে দিলে ছুঁড়ে সিগারেটে প্যাকেট আর জ্বলন্ত সিগারেটটা। স্পষ্টই দেখা গেল ঘর থেকে। হাসল ঋতব্রত। আচ্ছা দেখা যাবে বেলা এ তেজ থাকে কোথায়!

ব্যাস, এখন আর হাতে কোনও কাজ নেই। হ্যাঁ, ডাকের চিঠিগুলো দেখতে হবে। একি, রে মিত্তিরের চিঠি এসে পড়ে আছে? ক্ষিপ্র হাতে খামখানা খুলে পড়তে শুরু করে। ক্রমে তার মুখে ফুটে উঠল কুঞ্চনরেখা, প্রথম পাঠিকার বেলায় যা হয়েছিল। হাতখানা তারও হয়ে উঠল কম্পমা মুখখানি রক্তলেশশূন্য!

ঋতব্রত জানতেও পারে না তার মুখের প্রতিটি রেখার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করছিল একজ দর্শক—আড়ালে, তার থেকে অনতিদূরেই। খামখানা বন্ধ করে স্যুটকেসে তুলে রাখে ;—অস্থিরভা পায়চারি করতে শুরু করে ঘরময়। এসে বসে আবার টেবিলে। নাঃ, ও কথা আর সে ভাববে ন এবার অফিসের ডাক দেখতে হবে। একে একে খামগুলি খুলে যায়। কোয়ার্টালি ইন্‌সিওরে প্রিমিয়ামের তাগাদা এসেছে। অফিশিয়াল চিঠি। মামুলি করেসপণ্ডেন্স। একখানা আবার পার্সোনা মেজদার হাতের লেখা বোধহয়। ঋতব্রত খাম খুলে চিঠিখানা বার করে। আধখানা পড়তে পড়ে ঋতব্রত উঠে পড়ে। এ কি? কে এই সর্বনাশ করছে তার? একই অভিযোগ আসছে দু' যায়গা থেকে তার ক্যাম্প-জীবনের এত খুঁটিনাটি খবর কে পৌঁছে দিচ্ছে কলকাতায়? তাই সেবার মেজদা মুখভ করে রইলেন। গম্ভীর হয়ে রইলেন বৌদি। তাই কথার মাঝে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন বৌ "ওখানে যে মেয়েটি তোমার রান্না করে দেয় তার নাম কি?"

পদচারণা শুরু করে ঋতব্রত উত্তেজিত হয়ে। এই জন্যেই মেজদা হয়তো নিজে চোখে দেখা এসেছিলেন ব্যাপারখানা। কিন্তু তিনি কী দেখে গেলেন—যার জন্যে বিশ্বাস করলেন এমন ঘৃণ অভিযোগ! কমলা যুবতী, কমলা সুন্দরী, —মানা গেল সেকথা। কিন্তু এই কি যথেষ্ট প্রমাণ? ঋতব্র যে কী ধাতুতে তৈরি তা অন্তত তাঁদের জানা থাকা উচিত। রাগে অভিমানে কান্না আসতে চ ঋতব্রতর। ছি ছি—কি করে বিশ্বাস করেন একথা মেজদারা? রেখা মিত্তির বিশ্বাস করতে পারে। সে স্বাভাবিক। তার যথেষ্ট কারণ আছে। সে একটা ছুতোই খুঁজছিল এতদিন। কিন্তু মেজদা, মেজবৌদি তাঁরা কেমন করে স্থিরসিদ্ধান্ত হলেন?

কিন্তু এক হিসাবে তো মিথ্যা কথা লেখেননি তিনি—"আমার ভাই যে একটি রিফিউজি ক্যাম্পে অনূঢ়া যুবতী মেয়ের জীবন লইয়া এ ভাবে ছিনিমিনি খেলিতে পারে—এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার পর—" সত্যিই কি সে ছিনিমিনি খেলেনি কমলাকে নিয়ে? সত্যিই কি তার জীবন বিষময় করে তোলেনি? আজ যদি সেই বিষের ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে—

'বিষের ধোঁয়া?' শরদিন্দুবাবুর বিখ্যাত উসন্যাসের নায়কের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে ঋতব্রত আত্মপ্রসাদ লাভ করে হয়তো। বিষের ধোঁয়ার নায়কও বেপরোয়া ভাবে অস্বীকার করেছিল

সমাজকে—অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যেও তার জয় হয়েছিল! কিন্তু—হ্যাঁ, একটা মস্ত কিন্তু আছে! বিষের ধোঁয়ার আত্মভোলা অধ্যাপকটি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল সমাজ ব্যবস্থা বিষয়ে। সে জানতো না অবিবাহিত যুবকের সঙ্গে অনাত্মীয়া সুন্দরী যুবতী নারীর একত্র বসবাস সমাজ সহ্য করে না! কিন্তু ঋতব্রত তো সে কথা জানতো! সে তো শুধু বাহাদুরি দেখাতেই, সঞ্জীববাবুর উৎসাহে ভৈরবচন্দ্রের উপর চেষ্টা দেবার উদ্দেশ্যেই কমলাকে এনে তুলেছিল নিজ আবাসে। তাছাড়া বিষের ধোঁয়ার নায়ক ছিল তার আদর্শে অটল—তার সহবাসিনী যুবতী মেয়েটির প্রতি কোনও দুর্বলতা ছিল না তার। আর ঋতব্রত? সে তো মনে মনে--, না হলে কবিতা লেখায় অনুপ্রেরণা সে কোথায় পায়? প্রত্যক্ষ কমলাকে কোনও প্রেমনিবেদন না করলেও কবিতার মাধ্যমে সে তো উন্মুক্ত করে দিয়েছে তার হৃদয়ের দ্বার!

আঃ! আজ যদি সঞ্জীব চৌধুরী থাকতেন! উটে পড়ে ঋতব্রত। অফিশিয়াল ডাক আর দেখা হয় না। হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে যায় কমলার সঙ্গে। কমলা! কমলা কী হয়ে গেছে! তপশ্চারিণী অপর্ণার মতই গোপন সাধনারতা শীর্ণা নারীমূর্তি! বৈরাগিনী মূর্তি তার!

"কোথায় বের হচ্ছেন?"

"কে, আমি? এই একটু কাজে।"

"আপনি নিজেও কিছু খাবেন না—আমাদেরও উপোস করিয়ে রাখবেন?"

"কেন, কেন?"

"কাল রাত্রে কিছু খেলেন না। সকালে খাবার করেছি, না খেয়েই বেরুচ্ছেন।"

"ন না, তা কেন? নিয়ে এসো। খাবো না কেন?"

একথালা লুচি আর তরকারি নিয়ে আসে কমলা। পাশের ঘরে গিয়ে ঋতব্রত আহারে বসে। ধীরে ধীরে সে সব কিছুই খেয়ে নেয়। ক্ষুধাও যে পেয়েছিল সেটা বোঝা গেল এতক্ষণে।

"আপনার কী হয়েছে বলুন তো?"

"আমার? কই না, কিছু হয়নি তো।"

"তবে এমন করে কলকাতায় গেলেন। এসেও স্থির হচ্ছেন না।"

"ও, সে একটা অফিশিয়াল ব্যাপার। হ্যাঁ, ভালো কথা। আজ বিকেলে সি. ই. আসছেন। তাঁকে কিছু চা খাবার খাওয়াতে চাই। কী করা যায় বলত?"

"সি. ই. মানে?"

"সি. ই. মানে চীফ ইঞ্জিনিয়ার।"

"ও! তা কি খাওয়াতে চান বলুন।"

"সেইটেই তো পরামর্শ চাইছি।"

ক্রমে বৈকালিক চায়ের আয়োজনে মেতে ওঠে দুজন। রেখা মিত্তিরের চিঠি পড়ে লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে কমলা প্রথমে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে যেন কেমন একটা মুক্তির আস্বাদ পেল।

কোঁড়া ফেটে গেলে যেমন আরাম লাগে—সেই রকম একটা আরাম বোধ করল কমলা। তার বুকের ধন তাহলে এখনও কেউ কেড়ে নেয়নি। সে নিজে অবশ্য কোনও দিন গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না ঋতব্রতের পাশে। সেকথা স্বপ্নেও ভাবেনি সে। কিন্তু তবু কেমন যেন একটা আরাম পাওয়া গেল রেখার চিঠিখানায়। তাই সে সহজ হতে পারল আজ বহুদিন পরে।

সহজ হওয়াটা আবার সংক্রামক। দীর্ঘদিনের পর সেই পুরনো দিনের মতো কমলা যখন একটা প্লেটে করে মাংসেব একটু পুর নিয়ে এসে বললে, "দেখুন তো চেখে চপের পুরটা ঠিক হল কিনা।" তখন ঋতব্রতও সেটা মুখে দিয়ে অনায়াসে বলতে পারে, "এ রাম! নুনে পুড়ে গেছে! দুবার নুন দিয়ে নাকি?"

"এ্যাঁ! হতভম্ব হয়ে যায় কমলা।

হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে ঋতব্রত। ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে কমলা হেসে ফেলে—"যান! ভারি ইয়ে আপনি!"

অনেকদিন পরে প্রাণখোলা সহজ হাসি হাসলো দুজনে।

সুরেন সেনগুপ্ত আর জীবেন কর আজ সারাদিন বারে বারে আসছে। এটার কি হবে—ওটার কি করা যায়। ঋতব্রত ব্যবস্থা করে যায়। খানকয়েক হাতলওলা চেয়ার আনতে পারলে হত। একটা টেবিল-ক্লথও নেই—কী পেতে দেবে? কিছু ভয় নেই—বিছানার একটা ধোপদুরস্ত চাদর আছে—সেটাই দুভাঁজ করে পেতে দেবে কমলা।

"আপনি বরং দেখুন ফুলের একটা তোড়া বানাতে পারেন কিনা।"

"ফুলের তোড়া কী হবে?"

"ফুলদানিতে রাখব—ঘরটা সুন্দর দেখাবে।"

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় তিনটায় এসে পৌঁছল চীফ ইঞ্জিনিয়ারের কালো বড় প্লিমউথখানা। শুরু হল ইনস্পেক্‌শন। ঘুরে ঘুরে কাজ দেখলেন তিনি। কোনও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। রামশরণ উল্লসিত হয়ে উঠল। ইনস্পেক্‌শন শেষ হলে রামশরণ বললে, "এবার স্যার এদিকে একটু আসতে হোবে মেহেরবানী করে?"

"কোন্‌দিকে?"

"একটু চায়ের ইন্তাজাম করেছিলাম স্যার।"

"তাই নাকি? আচ্ছা সে তো ভালো কথাই। তবে একেবারে সব সেরে এসে বসা যাবে।"

"সব তো সারা হইয়ে গেল স্যার।"

"না, সব সারা হয়েছে কই? আপনার স্টোর দেখব, এস. ডি. ও-র অফিস দেখব।"

আবার ওঁরা এগিয়ে চলেন। রামশরণ ওয়ার্ক-শেডের সামনে একটা শামিয়ানা খাটানো। টেবিলে অয়েলক্লথ পেতে সাজিয়ে রেখেছে নানান ডিশ। দূর থেকে বোঝা গেল না কী রকম ব্যবস্থা করতে পেরেছে সে মাত্র একটি বেলার মধ্যে।

স্টোরে এসে পৌঁছলেন সকলে। গুদামে গাদা দেওয়া আছে অননুমোদিত মাল—শালবল্লা, মুলিবাঁশের দেয়াল, দরমার ঝাঁপ। রামশরণ চীফের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করল। ঋতব্রত জানাল, হ্যাঁ—প্রত্যেকটিই কোন না কোন কারণে রিজেকটেড হয়েছে। আণ্ডার স্পেসিফিকেশন্‌।

"আই সী!—বললেন সি. ই।"

"পাঁচ ইঞ্চি বল্লার মাপে কোয়াটার ইঞ্চি ঘেরে ছোট হলে মাল রিজেক্ট হয়ে যাবে স্যার?"

"সিওর! পেমেন্টের সময় পাঁচ ইঞ্চি মাপের চেকে সইটার উপর কোয়ার্টার ইঞ্চি কালি লেপে দিলে নেবেন আপনি?...আচ্ছা, ওই করোগেটেড টিনগুলো কি 'গেজ? চব্বিশ না ছাব্বিশ?"

ঋতব্রত জবাব দিল না, রামশরণও নীরব। সেনগুপ্ত বললে, "চব্বিশ স্যার?"

"চব্বিশ? ইম্পসিব্‌ল্‌! টোয়েন্টিফোর বি. ডাবলু. জি. টিন দেওয়ার কথা? প্রশ্নটা ঋতব্রতকে। সে জানালে, "হ্যাঁ।"

"তবে ছাব্বিশ গেজি টিন স্ট্যাক্‌ দেওয়া আছে কেন? ওগুলোও কি তাই রিজেক্‌টেড হয়ে পড়ে আছে?"

"হ্যাঁ স্যার!" অকূলে কূল পায় রামশরণ!

"না স্যার। ও টিন আমাদের ডিপার্টমেন্টাল। ওগুলো ঠিকাদার আনেনি। আমরাই দিয়েছি। ওটা রিজেক্‌টেড নয়।" বলে ঋতব্রত।

"না স্যার!" প্রতিবাদ করে রামশরণ, "এগুলো হমার আছে। ইসব টিন ছাব্বিশ গেজি আছে। হমার

ওয়ার্কশেড কি লিয়ে আনিয়েছি হাম্।”

লাল হয়ে উঠেছে রামশরণের মুখখানা উত্তেজনায়।

“কী বলছেন যা তা! এসব সরকারি টিন নয়? আপনার টিন এখানে আসবে কি করে?”

অল্পক্ষণের মধ্যেই কথাটা ফাঁস হয়ে যায়। অনর্গল মিথ্যা বলেও একটি মাত্র সত্যকে ঢেকে রাখতে পারল না রামশরণ ঠিকাদার।

“তবে সরকারি টিন কোথায়?”

“সরকারী টিন এখন স্টোরে নাই স্যার। সব চালে লাগিয়ে দিলম।”

“চালের টিন মাপব তবে।” বেরিয়ে এলেন চীফ।

পাগড়িটা খুলে ফেললে রামশরণ। রুমাল দিয়ে টাকটা একবার মুছে নেয়।

“এখানে গেজ-টেস্টার আছে?” চীফ প্রশ্ন করেন।

“ইখানে উ জিনিস কুথা পাবেন স্যার?”

“আমার কাছে আছে; আনিয়ে দিচ্ছি।” ঋতব্রত বলে।

তৎক্ষণাৎ সে সাইকেলে করে লোক পাঠিয়ে দিল অফিসে। রামশরণের ইচ্ছা করছিল টেনে এক চড় মাসে এস. ডি. ও-কে। শয়তান! কোথা থেকে আসে গেজ-টেস্টার? হতভাগা ছোঁড়া কি বোঝে না এতে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করছিস তুই? দু দুটো বিলে পেমেন্ট হয়ে গেছে। এখন যদি গলদ বের হয়, তা হলে এস. ডি. ও ভি বাঁচবে থোড়াই।

চালে উঠে লোক টিন মাপলো। সব ছাব্বিশ গেজি। অর্থাৎ যে মাল কলকাতা স্টোর থেকে দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে পাতলা ধরনের টিন! সব কাগজপত্র 'সীজ করলেন সি. ই। এম. বি., সাইট অর্ডার বুক, সাইট অ্যাকাউন্ট লেজার, ফাইল, হ্যান্ড রিসিটের অফিস কপি, এমন কি ওয়ার্ক সরকারের নোট বই—যাতে লেখা আছে প্রতি ট্রিপের সময় তারিখ, মালের বিবরণ, লরির নম্বর ও ড্রাইভারের নাম। সব নিয়ে বাণ্ডিল বাঁধল সি. ই -র অর্ডালি পিয়ন। কন্ট্রাক্টরের গুদামে পড়ল সরকারি তালা। চট দিয়ে মুড়ে তালা শীল-মোহর করা হল। সব কাজ বন্ধ রাখবার আদেশ দিলেন সি. ই.। অল ওয়ার্ক সাসপেণ্ডেড আনটিল ফার্দার অর্ডার্স! শুধু অসমাপ্ত ঘরের চালগুলো মাস্টার রোল কুলি দিয়ে শেষ করে নেবে ঋতব্রত। চোখে অন্ধকার দেখে রামশরণ। তার ত্রিশ বৎসরের ঠিকাদারি জীবনে এমন ঘটনা সে কখনও হতে দেখেনি। একবার আমতা আমতা করে বললে, “টিনা বদল গেল কেমন করে হুজুর?”

“শাট আপ স্কাউন্ড্রেল—চীট!” ধমকে উঠেন সি. ই. “—সেকথা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বললেই চলবে!”

গলা কাঠ হয়ে যায় রামশরণের।

ওরা দল বেঁধে চলল ঋতব্রতের বাড়ির দিকে। ঋতব্রতের হাতে তখনও রয়েছে গেজ-টেস্টারটা।

“ওটা আমার হাতে দিন স্যার।” পাশ থেকে কে যেন বললে।

অন্যমনস্কভাবে তার হাতে যন্ত্রটা দিতে গিয়ে ঋতব্রতের নজর হল লোকটা আর কেউ নয়—ইয়াসিন!

একগাল হেসে ইয়াসিন সেলাম করে এস. ডি. ও-কে।

সি. ই. একটু এগিয়ে গেছেন তখন। ঋতব্রত ইয়াসিনের দিকে ঘুরে বললে, “তুইও আয়—চা খেয়ে যাবি আমার ওখানে।

ইয়াসিন মাথা নাড়ে, “আমাকে চা খাওয়াতে হবে না স্যার। বরং লপ্‌সি খাওয়াবার ব্যবস্থাটা পাকা করুন ঐ হারামির! আমার কেস এখনও ঝুলছে;—এবার ম্যাজিস্টরকে বলব 'আমি কবুল খাচ্ছি স্যার—জেল দিন। শুধু জেলারকে বলে দেবেন স্যার, ঐ হারামির সঙ্গে যেন একঘানিতে জুতে দেয় আমাকে।”

কথা কটা উৎসাহেব আতিশয্যে জোরে জোরেই বলে ইয়াসিন। পাশে পাশেই চলেছে রামশরণ। মাথা নিচু করে চলেছে। সে বুঝেছে এতক্ষণে, ষড়যন্ত্রটা কেমন করে পাকিয়েছে!

ঋতব্রত ঘুরে বললে, "হাঁথি কিন্তু গল্‌লনা সিংজী!"

সিংজা একবার আশে পাশে তাকালো, তারপর বললে, "হামি ত মরলম, লেকিন আপনি ভি বাঁচবেন থোড়াই..!"

তড়িৎশিখার মত একটা চিন্তা খেলে গেল ঋতব্রতের মনে। ওর নামে কলঙ্কটা কি রামশরণই ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? একমাত্র রামশরণই চেনে মেজদার বাড়ি। ধূর্ত সন্ধানী হয়তো কোনও সূত্রে যোগাড় করেছে রেখা মিত্তিরের ঠিকানাটাও।

ঋতব্রতের ঘরের সামনে রতন টেবিল চেয়ার পেতে রেখেছে। খান-তিনেক চেয়ার পাতা আছে। সি. ই. একটাতে গিয়ে বসলেন। টেবিলের মাঝখানে একটা ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। সন্ধ্যা হব হব। ঘরের মধ্যে মশা হবে ভয়ে কমলা ব্যবস্থাটা বাইরেই করেছে। মন্দ নয়। গাছতলায় বসে চা খাওয়ার একটা আলাদা চার্ম আছে। সি. ই. কে খাবার টেবিলে বসতে দেখে একে একে সুরেন সেনগুপ্ত, জীবেন কর প্রভৃতি দূরে গিয়ে জটলা পাকাতে শুরু করল। রতন একটা প্লেটে খাবার আর চা নিয়ে ড্রাইভারকে দিয়ে আসতে গেল। গাড়ি কাঁচা রাস্তায় নামেনি কাদার মধ্যে।

সি. ই.-বললেন, "অবশ্য তোমার বিরুদ্ধেও ডিপার্টমেন্টাল অ্যাক্‌শন্স নিতে হবে আমাকে। তবে তোমার হয়েছিল জেনুইন মিস্টেক। অভিজ্ঞতার অভাব। তাছাড়া তুমি নিজেই পয়েন্ট আউট করেছ ভুলটা। সুতরাং ওয়ার্নিঙেই নিশ্চিত শেষ হবে তোমার পালা, কিন্তু তোমার ঠিকাদার ডুবলো অগাধ জলে।"

ঋতব্রতের হঠাৎ মনে পড়ে যে রতন খাবার নিয়ে গেছে ড্রাইভারকে দিতে। ঘরে কমলা একলা। হয়তো চা খাবার তৈরি হয়ে গেছে। আনবার লোক নেই বলে ঠাণ্ডা হচ্ছে সব। খবরটা নিতে সে ভিতরে আসে। ভিতরটা বেশ অন্ধকার। একটা কুপি জ্বলছিল রান্নাঘরে। ঋতব্রতের পদশব্দে হঠাৎ নিভে গেল সেটা। এগিয়ে এল ঋতব্রত। ডাকল কমলার নাম ধরে। কেউ কোথাও সাড়া দিল না। ব্যাপার কি? পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে কাঠি জ্বালল একটা। স্বল্পালোকিত রান্নাঘরের একপ্রান্তে দেখা গেল একটা মোড়ার উপর বসে আছে কমলা—হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে। ঋতব্রত যেন স্থানকালপাত্র ভুলে যায়। এগিয়ে এসে কমলার হাতখানি ধরে আকর্ষণ করে, "কী হয়েছে কমলা?"

কমলার কোন জবাব নেই। উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে তার শরীরটা দুলে দুলে উঠেছে।

"কি হয়েছে বলো! কে তোমাকে কী বলেছে?"

জোর করে ওর অশ্রুসিক্ত মুখটা তুলে ধরে সে। হঠাৎ ঋতব্রতের হাতে ঠেকে একটুকরো কাগজ। কমলার মুঠায় ধরা। জোর করে কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। কমলা দেয় না। ফলে আধখানা কাগজ ছিঁড়ে আসে। আবার একটা দেশলাই কাঠি জ্বালে ঋতব্রত।

কাগজখানা আর কিছুই নয়। ওর অসমাপ্ত কবিতার একটি ভগ্নাংশ। কমলাকে উদ্দেশ করে যা সে লিখেছিল।

"না না ওটা আমার! আমাকে দিয়ে দাও।"

ঝাঁপিয়ে পড়ে কমলা। অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হয়তো পড়ে যেত সে। ঋতব্রত ধরে ফেলে। ওর বুকের উপর ভেঙে পড়ে অশ্রুবিধৌত কমলার কমল আনন।

হঠাৎ একটি তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল অন্ধকার ঘরের মধ্যে। তৎক্ষণাৎ ধ্বনিত হল যেন দৈববাণী: "এক্সকিউস মি বোস। দিস্ ওয়াজ অল্‌সো এ পার্ট অফ্ মাই ইনভেষ্টিগেশন্‌স্। আই হ্যাড ইয়োকাল প্রীভিয়াস্ চার্জেস এগেন্‌স্ট য়ু—ফ্রম আদার কোয়ার্টাস!"—সি. ই. র কণ্ঠস্বর।

ঋতব্রত বুঝতে পারে তার করধৃত তনুদেহটি ছিন্নমূল তরুর মতই লুটিয়ে পড়ছে। সংজ্ঞা হারিয়েছে কমলা। ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল কমলাকে। ক্ষিপ্র হাতে কুপিটা জ্বেলে ফেলে। দেখা যায় রান্নাঘরে সাজানো আছে দু থালা খাবার ; টি-পটে লিকার ঢালা আছে! মগে করে জল নিয়ে ঝাপটা মারে বার দুই কমলার মুখে। ধীরে ধীরে উঠে বসে কমলা।

"আসছি আমি।" বলে বেরিয়ে গেল ঋতব্রত বাইরে। বাহিরেটা তখন জনশূন্য। রতন ছুটে এসে খবর দেয়, সি. ই. চলে গেলেন স্যার।"

নিষ্প্রভাত রাত্রি নাই। সে রাত্রিও পোহালো। খবরটা জানাজানি হতে বাকি থাকবার কথা নয়। সি. ই. যে খাবার টেবিলে বসেও না খেয়ে চলে গেলেন—দূরে দাঁড়িয়ে তা দেখল সবাই। জীবেন কর, সুরেন সেনগুপ্ত, ওয়ার্ক-সরকারেরা। ব্যাপারটা কী, না বুঝলেও জল্পনা-কল্পনার বিরাম রইল না। কারণ তারপরই আবির্ভাব ঘটল অকুস্থলে ডাক্তার সাধুচরণের। পরীক্ষা করে ঔষধ দিয়ে গেলেন তিনি কমলাকে। নার্ভাস শক্ লেগেছে নাকি তার।

সারারাত বিছানায় ছটফট করেছে ঋতব্রত। এক ফোঁটা ঘুম নেই চোখে। এ কি হল? কেন ঘটল এ দুর্ঘটনা! অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল—সে চরিত্রহীন! একটা বাস্তুহারা অসহায় মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাম চরিতার্থ করছে সে, আর বাইরে অপেক্ষা করছেন মহামান্য অতিথি! এবপর বন্ধু মহলে সে মুখ দেখাবে কি করে? মেজদা! মেজবৌদি! উঃ! আর সে পারে না!

পাশের ঘরে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে নিশ্চয়ই আর এক হতভাগিনী। ভারি মায়া হল ঋতব্রতের ওর উপর! তার দোষ কী? অথচ কি জানি কতদূর গড়াবে ব্যাপারটা। মনে পড়ল সংজ্ঞাহীন কমলার দেহটি কেমন করে দুহাতে তুলে শুইয়ে দিয়েছিল সে। কি হাল্কা কমলা! ভারি ইচ্ছে হল পাশের ঘরে গিয়ে কমলার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেয়। সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েইছে।

ধীরে ধীরে পার্টিশন দরজার কাছে এগিয়ে যায়। দরজা ওপাশ থেকে বন্ধ। ঝাঁপের দরজায় কান পাতে। ওপাশ থেকে ভেসে আসছে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ। তোলপাড় করে ওঠে ঋতব্রতের বুকের মধ্যে! না পারবে না,—কমলাকে ছেড়ে যেতে পারবে না সে। এতবড় গভীর ভালবাসাকে উপেক্ষা করে যাওয়া অন্যায়, পাপ! ঋতব্রত সমাজ মানে না, পারিবারিক কৌলিন্যের ঝুটো অভিশাপ সে লাগতে দেবে না তাদের এই অপাপবিদ্ধ অম্লান ভালবাসার গায়ে। অনুচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণের মতো ডাকে সে, "কমলা! কমলা!"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসে ওপাশ থেকে, —'না না না, আমাকে ডেক না।"

ঋতব্রত কি বলতে যায়,—হয়তো কোন সান্ত্বনার কথা, অথবা দ্বার খুলে দেবার অনুরোধ—কিংবা ভালবাসার কথা ; কিন্তু কথাটা তার বলা হয় না। ওপাশের বারান্দা থেকে রতন উঠে আসে।

"—ডাকছিলেন স্যার?"

একটা ঢোক গিলে ঋথব্রত বলে,—"হ্যাঁ, আমার দেশলাইটা জানিস?"

"বালিশের পাশে নেই?"

—"ও, হ্যাঁ রয়েছে।"

সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কাল সকালে যা হয় করা যাবে। কমলাকে খোলাখুলি সব কথা জানাবে সে। হ্যাঁ, কমলাকে সে ভালোবাসে। কবিতায় সে কথা বলেছে—সেটা বাগাড়ম্বর নয়—তার মনের কথাই। কমলাকে সে বিবাহ করবে। সামাজিক মর্যাদা দেবে সে এ ভালবাসার। এ সিদ্ধান্তে এসে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় ঋতব্রত। তন্দ্রার আবেশে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই। একবার মনে হল ঘুমের মধ্যে লোমওয়ালা একটি কুকুর ওর পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। অস্বোয়াস্তিতে পাটা টেনে নেয়। তারপর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙল রতনের গোলমালে। তখন পূবের জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝেয় তির্যকভাবে।

"স্যার!"

"কি রে?"

"দিদিমণি কোথায়?"

"সে কি?"

এঘর ওঘর কোথাও নেই। বাথরুম, ল্যাট্রিন? না কোথাও নয়। এই ভোরবেলা কোথায় গেল সে? একি, তার বালিশের পাশে ট্রাঙ্কের চাবি এল কি করে? সেটাতো থাকতো কমলার আঁচলে? চাবিটা নিতে গিয়েই বালিশটা সরে গেল। তলা থেকে বের হল একখণ্ড চিঠি—

"শ্রীচরণেষু—

তোমার জীবন তো ব্যর্থ করে দিয়ে গেলাম। খেতে পরতে দেবে বলে এনেছিলে অনাথা মেয়েকে, তার দাবি দেখা দিল আকাশস্পর্শী স্পর্ধায়। তোমার আর দোষ কি? আমার জন্য তোমার নির্মল চরিত্রও আজ কলঙ্কলিপ্ত! ঘরে বাইরে তোমার এ লাঞ্ছনা আর আমার সহ্য হচ্ছিল না। রেখা মিত্তিরের চিঠিখানা আমি পড়েছি। তাকে বল, তোমার মতো ছেলের ভালবাসা পাওয়ার মত পুণ্য করেনি হতভাগী কমলা। এ চিঠিখানাই তার প্রমাণ।

সেই কলঙ্কই তোমার হল অথচ আমাকেও দিতে পারলে না এমন কোনও পাথেয়—যা সম্বল করে কাটাতে পারতাম বাকি জীবনের ব্যর্থ দিনগুলি।

অনেক পাপ করেছি। মার্জনা চাইব না। সারাজীবনই তো পড়ে রইল তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে।

চৌধুরীসাহেবকে বল তাঁর স্নেহ ভালবাসা আমি জীবনে ভুলব না। আমি হতভাগী ;—যার কাছে গিয়েছি তাকেই জ্বালিয়েছি। তাঁর সদাহাস্যময় মুখের হাসিটুকু মুছে দিতে—তাঁর পায়ের তলায় গিয়ে পড়তে আর সাহস হয় না।

যাওযার আগে একটা প্রণাম করতে গেলাম। তাও নিলে না তুমি। চিরবিদায় রইল।

হতভাগিনী তোমার কমলা।

পরিশিষ্ট

বকুলতলা ক্যাম্পের কাহিনী শেষ হয়ে গেল। শেষ হল ঋতব্রতের চাকরিজীবনের প্রথম অধ্যায়। এই ঘটনার দিনই সে ক্যাম্প ত্যাগ করে ; আর ফিরে যায়নি সে সেখানে কোনও দিন। বদলি হয়ে যায় অন্যত্র।

আজও অবসব সময়ে ইজিচেয়ারে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসে ঋতব্রত। ভিড় করে এসে দাঁড়ায় লোকগুলি। উদ্বাস্তুদের প্রতি প্রকৃত দরদী তফাদার, অসাধু সাধুচরণ ও কুচক্রী ভৈরবচন্দ্র! সুরেন সেনগুপ্ত, জীবেন কর, শিশির, সতীশ ভিড় করে এসে দাঁড়ায়। আর স্মৃতির পথে সার দিয়ে এসে দাঁড়ায় সেই উদ্বাস্তুর দল। দেখতে পায় : শুভ্রকেশ বৃদ্ধ কুলপুরোহিত বিড়ি পাকাতে

পাকাতে গুণগুণ করে পড়ছেন যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ। সুবলচন্দ্রের বুকে গরম তেল মালিশ করে দেন স্ত্রী লতিকা। পাগলা বসে বসে আপন মনে বিড়বিড় করে।

বিড়ি পাকাতে পাকাতে পাকা ভ্রূদুটো তুলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামনিধি চৌধুরী পাগলকে প্রশ্ন করেন, "—হেইদিন কি কইলা তুমি—ল্যাডিন কথাডার অর্থ কি?"

পাগল মিটি মিটি হাসে। চোখ দুটো পিট্ পিট্ করে খুশীতে।

বলে ঃ— "If an angel out of heaven
Gives you something else to drink,
Thank him for his kind intentions ;
Go and pour them down the sink!"

অর্থ গ্রহণ হয় না রামনিধির, বলেন, "কী কইলা?"

পাগল কথা বলে না। মিটি মিটি হাসতেই থাকে। রামনিধি কিন্তু এতে রাগ করেন না, বলেন, "যাই কও, বুস সাহেব লোক ভালই আছিল, তার কথাই কইৎছিলাম। শুন্‌চি ঘুষ খাইত না। ক্যান্ যে অমন দুর্মতি হইল ছেরাডার।'

পাগলা ফিক্ ফিক্ করে হাসে। ওঁর ডালা থেকে একটা বিড়ি তুলে নিয়ে ধরায়। একরাশ ধোঁয়া ছাড়ে মুখ দিয়ে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। শালের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে পা নাচাতে নাচাতে চোখ বুজে দার্শনিকের মত বলে—

"Beauty provoketh thieves
Sooner than gold!"

মনে পড়ে কুসুমের কথা। জোর করে তার মাথা নেড়া করে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবাদ করেনি। একবারও বলেনি—সে সতী—সে নিরপরাধিনী! রুগ্ন পঙ্গু স্বামীর হাত ধরে নীরবে ক্যাম্প এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল কুসুম। মনে পড়ে বিশ্বনাথের কথা। না, বিশ্বনাথকে সে চেনে না। যে উদ্ধত যুবকটি বলেছিল, "সমাজের চোখে তোমার বাবার ঠাকুর বিকলাঙ্গ পতিত। সমাজের চোখে আমিও ব্রাত্য—জেলফেরত আসামী। আমিও পতিত—তুমিও আমার কলঙ্কিনি রাই।" সেই সব বৃষস্কন্ধ কপাটবক্ষ বিশ্বনাথের দলকে চেনে না ঋতব্রত। সে দেখেছে শুধু যক্ষ্মরোগাক্রান্ত পাঁজর-সর্বস্ব তারাপদ নামধারী প্রেতাত্মাগুলিকেই!

ওই যে কমলা ;—পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি ছাড়া ওর কি অন্য কোনও সংজ্ঞা হতে পারত ক্যাম্পের ভিতর? বড়খোকাদের কাছ থেকে শালীনতা ও সতীত্ব রক্ষা করতেই যাবৎযৌবন, বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতে হত ওকে।

বড়খোকা! কে জানে সেই বা কেন নেমে এল এত নিচে। তার গোটা ইতিহাসটা জানা হয়নি। ঋতব্রতের মনে হয়—কি জানি তারও জীবনে হয়তো আছে এমন অধ্যায় যার জন্যে তার আজকের অধঃপতনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে! ঋতব্রতের সম্বন্ধেও তো সি. ই.-র ভ্রান্ত ধারণা হয়েছিল সন্দেহাতীতরূপে—সে নিজেও পোষণ করত ভ্রান্ত ধারণা কুসুমের প্রতি! আর তাছাড়া—ভাবে ঋতব্রত—এই যে হাজার হাজার বৃন্তচ্যুত উদ্বাস্তুর দল—এরাই কি কেবল দায়ী এদের আপাত অধঃপতনের জন্যে? এরা তো এমন ছিল না! এদের জানানো হয়েছে—এরা স্থায়ী পোষ্য—পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি।

প্রতাপশালী দুর্ধর্ষ জমিদার যখন বৃদ্ধ বয়সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন, তখন এমনি ভাবেই দিন গোণেন তিনি। ওরা সবাই শেষজীবনের সম্রাট শাহজাঁহা। ওদের আছে গৌরবময় অতীত—নিজ পরিবার-সাম্রাজ্যে ছিল তারা সার্বভৌম সম্রাট! আজ পড়ে আছে শুধু পরমুখাপেক্ষী পক্ষাঘাতগ্রস্ত শেষের

দিনগুলি। ওরা জানে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিযেও ওদের ভাগ্যের চূড়ান্ত মীমাংসা করা চলতো—তা করা হয়নি। কিন্তু দারাশেকোর চেয়ে শাহজাঁহার শেষজীবনই কি সুখের? র‍্যাডক্লিফের টানা যমুনার ওপারে সাতপুরুষের তাজমহলের দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে হাজার হাজার শাহ্জাঁহা। সে তাজমহল হয়তো মাটির, হয়তো খড়ের ভাঙা চালা একখানি!

লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে এদের পিছনে সরকারি তহবিল থেকে—যতদিন না মহাকালের হস্তক্ষেপ হয়। মানবিকতার মালগুদামে ওরা আনসার্ভিসেব্‌ল্ মার্কা পেয়েছে। সার্ভে রিপোর্টেড হিউম্যানিটি! মনুষ্যাকৃতি জীবগুলিকে তাই স্ট্যাক দিয়ে রাখা হয়েছে বকুলতলা ক্যাম্পে! ..লাম নোটিস জারি করে লাভ নেই—কোনও "স্ক্র্যাপভালু"ই নেই এদের! প্রতীক্ষা করা হচ্ছে উপর থেকে কবে আসে মহাকালের নোটিস—"রাইট অফ্!

লেজার থেকে নাম-খারিজের আদেশনামা!

কানে বাজে দরদী তফাদারের কণ্ঠস্বর, "দে আর এ ক্লাস অফ পার্পিচ্যুয়াল প্রফেশনাল লিগালাইজড বেগার্স।"

আইন-সম্মত চিরস্থায়ী এক শ্রেনীর ভিক্ষুকজীবী!

বকুলতলা ক্যাম্পের কাহিনী শেষ হল। ঋতব্রতের গল্প কিন্তু শেষ হয়নি এখনও—কারণ সে বকুলতলা ক্যাম্পের লোক নয়। তার গল্পের উপসংহার শুনতে গিয়েছিলাম তাই। পরিচয় হয়ে গেল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ঋতব্রতই পরিচয় করিয়ে দিলে। অবশ্য একমাথা ব্যাকব্রাশ করা প্ল্যাটিনামব্লন্ড চুল—পাইপ্‌মুখো মানুষটির পরিচয় না দিলেও চিনতে অসুবিধা হত না। সঞ্জীব চৌধুরী। ঋতব্রত আমার নামটা জানাল তাঁকে। পরিচয় দিল সাহিত্যিক বলে, কবি বলে।

"ও অলমাইটি! ইউ আর এ পোয়েট? দ্যাটস্ ফানি অ্যান্ড দ্যাটস্ গ্রেট!"

আমি বলি, "ঋতব্রতের ক্যাম্পের গল্প শুনেছি তার মুখে। শেষ অধ্যায়টা আপনি বলুন।"

"কতদূর শুনেছ তুমি?"

বললাম তা।

"তারপর আর বাকি নেই কিছু। হঠাৎ পাটনায় একখানা টেলিগ্রাম পেলাম। তোমার বন্ধু অবিলম্বে আমাকে দেখা করতে বলেছে কলকাতায় একটা হোটেলর ঠিকানায়। অ্যান্ড আই হ্যাড টু ফ্লাই ব্যাক দেন অ্যান্ড দেয়ার। সব কথা খুলে বলল ওরা দুজন।"

"দুজন?"

"হ্যাঁ, সরলাও ছিল সে হোটেলে। ক্যাম্প স্টেশনে অপেক্ষমান সরলাকে ধরে নিয়ে এসেছিল তোমার বন্ধু। আমার কাছে পরামর্শ চাইল—কী করা যায়। দুজনেই কনফেস্ করল আমার কাছে। বুঝলাম—দুজনেই অপরাধী—শাস্তি হওয়া উচিত। বোথ্ শুড বি পানিশ্‌ড্! একসঙ্গে দুজনের হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে চালান দিলাম।"

"কোথায়?" প্রশ্ন করি আমি।

"যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে! তুমি কবি মানুষ—তাই কাব্য করে বলছি,—হ্যান্ডকাফ ওয়াজ ফুলের মালা, প্রিজন্ হাউজ ওয়াজ ম্যারেড লাইফ, জেলর ওয়াজ প্রজাপতি হিমসেল্ফ—অ্যান্ড জাজ দিস পুয়ার ফেলা! রেজিস্ট্রি-ম্যারেজে সাক্ষী ছিলাম আমি। কেমন ভাল করিনি সরলা মা?"

সলজ্জ হেসে ম্যাডাম বসু বললে, "মোটেই না! ওর তো মজাই হয়েছে; মাইনেও দেয় না আজকাল, ব্যাঙ্কে টাকাও জমা দেয় না। আমারই হয়েছে জ্বালা।"

সঞ্জীব চৌধুরী হঠাৎ ঋতব্রতকে প্রশ্ন করেন, "বাই দি ওয়ে—তোমার সে কবিতাটা শেষ হয়েছিল? আমি তো শুনিনি?

ঋতব্রত হেসে বললে, সে আর আপনার শুনে কাজ নেই। আপনি যে কতবড় কাব্যরসিক বিবাহিত জীবনের উপর উপমা শুনেই তা বুঝেছি আমরা।"

নিরুপায়ভাবে শ্রাগ করেন চৌধুরী সাহেব। হতাশাব্যঞ্জক মুখচ্ছবি তাঁর। কাব্যি করাটা মাঠে মারা যাওয়ার নিরাশ হয়েছেন তিনি।

মনে পড়ল ঋতব্রতের বৌভাতে ওদের চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে দেখেছিলাম। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে পংক্তি ভোজনে বসেছিলেন তিনি। বৌভাতে নববধূ সকলের পাতে এক চামচ করে ভাত দেয়—এটাই প্রথা। নববধূর সামাজিক স্বীকৃতি। রেজিস্ট্রি বিয়ে হলেও এ প্রথাটা মেনেছিলেন মেজবৌদি। চীফের পাতে মিসেস বসু যখন ভাত দিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, "খাবারগুলো অনেকদিনের বাসি মনে হচ্ছে।"

"সে কি, সে কি!" ছুটে আসেন বাড়ির সবাই। মেজদা খাবারের থালাটা পালটে দিতে নিজেই ছুটে আসেন। সকলেই স্তম্ভিত!

বাধা দিলেন চীফ নিজেই, বললেন, "একদিন বোস আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল। তাড়াতাড়ি থাকায় আমি খেয়ে আসতে পারিনি। তাই ভাবলাম সেই খাবারগুলোই বুঝি বৌমার হাতে পাঠিয়েছে আজ!"

সি. ই.-র রহস্যপ্রবণতার কথা জানা ছিল সকলের। ঋতব্রতের কঞ্জুস স্বভাবের প্রতি এটি একটি বক্রোক্তি বলেই সকলে মেনে নিল! তখন বুঝিনি, আজ বুঝি, একথায় কেন লাল হয়ে উঠেছিল ঋতব্রতের মুখ। মিসেস বোসের মুখ দেখতে পাইনি—সেটা ছিল ঘোমটার আড়ালে।

ঋতব্রত চৌধুরীসাহেবকে জানায়, "চৌধুরীসাহেব! আমার বন্ধু আমার ক্যাম্প-জীবনের কাহিনী নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখছে।"

"ইজ্ ইট?" উৎসাহিত হলেন সঞ্জীব চৌধুরী।

"কি নাম দিয়েছ বইয়ের?"

"ছিন্নমূল!"

"অফুল!! রিনেম ইট্—নাম দাও 'বৃন্তচ্যুত'।"

"ওতো একই কথা!"

"না, এক কথা নয়! ছিন্নমূল মানে যে গাছের মূল ছিঁড়ে গেছে। নতুন মাটিতে পুঁতে দিলে আর সে বাঁচে না। অথচ বৃন্তচ্যুত ফুলের আরও সম্ভাবনা আছে—সে ফুলে পূজার থালা থেকে বরণের মালা সবই সাজানো যায়!"

"কিন্তু বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নিলে আর কি ফুল বাঁচে?" ঋতব্রত তখনও তর্ক করে।

"ইউ আর নাইদার এ পোয়েট নর্ এ বোটানিস্ট! তাই বোকার মত তর্ক করছ! ফুল কি তোমাব মত ফুল? ফলের সম্ভাবনাকে পিছনে রেখেই সে বৃন্তচ্যুত হয়।"

এবারে আমি প্রশ্ন করি, "আপনি কি মনে করেন তেমনি সম্ভাবনা আজও আছে এই সব পার্মানেন্ট ল্যায়াবিলিটি উদ্বাস্তুর? সুযোগ পেলে ওরা আবার সামাজিক মানুষ হয়ে উঠবে?"

"দি আনসার ইজ সিম্পল!"

"উত্তরটা সরল?"

"সরল নয় 'সরলা'!"

আমরা চুপ করে যাই। চৌধুরীসাহেবই বলে ওঠেন, "সে যাই হোক, ক্যাম্পের কাহিনী যখন লিখেছ তখন আমার কথাও থাকবে নিশ্চয়ই কিছু? দেন আই মাস্ট হ্যাভ এ সাইড পার্ট অ্যাজ ওয়েল?"

"সাইড পার্ট কোথায়? আপনাকেই তো হিরো করে এঁকেছে ও।" বললে ঋতব্রত।

"তাই নাকি? কই দেখি দেখি।"

অগত্যা পাণ্ডুলিপি থেকে খানিকটা পড়ে শোনালাম। যেখানটায় তাঁর কথাগুলি আছে বিশেষ করে।

হা হা করে হাসলেন চৌধুরীসাহেব।

বললেন, "লোকের নাম অবশ্য মাঝে মাঝে আমার গুলিয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে সব সময় গুলোয না। অ্যাটলিস্ট সরলা মায়ের নামটা আমার ভুল হয না কখনও। এটা তুমি বাড়াবাড়ি করেছ নরেন বাবু।"

হাত দিয়ে কমলাকে কোলের কাছে টেনে নেন তিনি। মিসেস বোসও তাঁর ফেনশুভ্র কেশের মাঝে আঙুল বুলাতে থাকেন।

বললাম, "সব সময়ই হয়—আপনি অবশ্য সব সময় টের পান না, এই যা ভরসা। প্রথমত ম্যাডামের নাম সরলা নয়, কমলা—আর দ্বিতীয়ত আমার পৈত্রিক নামটাও নরেন নয়।"

"ইজ ইট? দি সেম ওল্ড ফানি মিস্‌টেক্ এগেন? দেন আই অ্যাম্ রিয়ালি ভেরি সরি।"

হা হা করে হেসে ওঠেন সঞ্জীব চৌধুরী!

বল্মীক

(পঞ্চাশের দশক)

পদ্মা-যমুনা-মেঘনা-আড়িয়েল-খাঁ বিধৌত নদীমাতৃক দেশের মানুষ ওরা।

কোন অতীত ইতিহাসে ওদের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ এসেছিল মধ্য এশিয়া থেকে দলে দলে। সঙ্গে এনেছিল অশ্ব, গৃহপালিত পশু ,—এনেছিল দৃপ্ত সাহস আর উন্নত রক্তের অভিমান। ওরা ছড়িয়ে পড়েছিল অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের কিনারে কিনারে। অনুন্নত অনার্যদের সঙ্গে, মঙ্গোলীয় রক্তের সঙ্গে, আরও হাজার জাতি-উপজাতির শোণিতে ওদের সে অভিমান হয়েছিল দ্রব। তাদেরই একটা শাখা মেনে নিয়েছিল ঐ নদীমেখলা শ্যামল ভূখণ্ডকে মাতৃভূমি বলে। পৃথিবী সে অধিকার স্বীকার করে নেয়। কেটে যায় সহস্রাব্দী।

তারপর কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল। আজও ভাবলে অবাক লাগে হরিপদ মাস্টার মশায়ের—হঠাৎ একদিন নাকি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেল আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা তাঁর সাতপুরুষের ভিটাখানায় তিনি পরবাসী। জিনিসটা ভালো করে বুঝবারও সময় পাওয়া গেল না। মাস্টারি করে তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তাঁর। ভূগোল-ইতিহাস গিলিয়ে গিলিয়ে গাধা পিটিয়ে মানুষ করতে হয়েছে যাঁকে—সেই হরিপদ মাস্টারকেই স্বীকার করে নিতে হল ইতিহাস-ভূগোল-বহির্ভূত এই সিদ্ধান্তটাকে।

হরিপদ চক্রবর্তীকে হঠাৎ একদিন বলা হল যে মতিগঞ্জে তিনি প্রবাসী। মতিগঞ্জ তাঁর দেশ নয়। এখানে তাঁর স্থান নেই।

হরিপদ সামনের কলমের ফজলি গাছটার দিকে চাইলেন , ওটা লাগিয়ে ছিলেন তাঁর কর্তামা। গোয়ালঘরখানির দিকে তাকালেন। দেখলেন গৃহসংলগ্ন দেবায়তনের দিকে,—সেটা তাঁর কর্তাদাদার প্রতিষ্ঠিত। অসহায় উদাস দৃষ্টিতে অনেক কিছুই ধরা পড়ল। পাশাপাশি টিনের চালার ভিড়, ছায়া থমথম্ নারকেল গাছের পাতায় পাতায় কোলাকুলি, মরাইয়ের গায়ে তেল সিঁদূরের রাঙ্গা রেখা, নদীর হাসুলি-বাঁকের জল-চিক্-চিক্ পাড়ে কলমি আর কচুর মিতালি, ধান সিঁড়ির ধাপে ধাপে বীজ ধানের ঘন সবুজাভা। ফুলে ফুলে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়েছে কৃষ্ণচূড়া গাছটা, গোরর গাড়ির চাকা মেরামত হচ্ছে কলিমুদ্দি মিস্ত্রির ছাপরায়—ভেসে আসছে তার ঠকাঠক্। ও পাশের দাওয়ায় পুত্রবধূ কামিনীর আঁচল ধরে ঝুলে পড়েছে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বাবলু। রৌদ্র ঝল্মল মতিগঞ্জ গ্রামের আপাদমস্তক একনজরে দেখে নিয়ে হরিপদ মাস্টার চশমাটা খুলে নিয়ে মুছলেন। তারপর আবার চোখে দিলেন সেটা। জীবনে এই প্রথম ভুল জেনেও অঙ্কটাকে সংশোধন করা হয়ে উঠল না। কোন নির্বোধ ছাত্র যে এতবড় ভুল অঙ্কটা কষলো তা জানতেও পারলেন না তিনি। অন্তত তাকে নাগালের মধ্যে পেলেন না। পেলে কি করতেন জানি না,—কিন্তু ভুল অঙ্কের অশুদ্ধ ফলাফলটাকেই স্বীকার করে নিতে হল। বার হয়ে পড়তে হল স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে।

ওদের মতো অনেকেই চলে এল এ পারে। দলে দলে। সারি সারি মানুষ। কোলে শিশু, বগলে প্যাঁটরা, মাথায় মোট আর বুকে রাজ্যের দুশ্চিন্তা। শেষ ব্যবের মত স্টিমারটা ডেকে উঠল মতিগঞ্জের স্টিমারঘাটে। সিটি তো নয়—সে এক আর্তনাদ। রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন ওঁরা। হরিপদ মাস্টার আর তাঁরই মতো সহস্র হতভাগ্য। নদীর জলে পড়েছে লক্ষ লক্ষ সূর্যকণা ,—ঢেউয়ের মাথায় মাথায় রয়েছে সঙ্কেত—ফিরে যাওয়ার আহ্বান। কোটি কোটি হাতছানি দিয়ে মতিগঞ্জের স্টিমার ঘাটে নদী ওদের ফিরে ডাকছে। স্টিমারের সিটি শুনে দূরে সরে যাচ্ছে ইলিস ধরার নৌকাগুলো। ওদের গলুইয়ে

রাশীকৃত রূপালী ইলিস। মাছরাঙ্গাটা স্থির হয়ে বসে আছে আধ-ডোবা কঞ্চিটার ডালে। ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক শ' নরনারী—তাদের মুখে আতঙ্ক, চোখে জল। আসবে, ওরাও আস্‌বে, দুদিন আগে আর দুদিন পরে—এই যা!

এইবার খুলে দেবে স্টিমারের সিঁড়িটা। মতিগঞ্জের সঙ্গে যে সামান্যতম যোগসূত্রটি অবশিষ্ট রয়েছে—মুহূর্তে ঘুচে যাবে তা। সন্তান ভেসে পড়বে নিজের ভাগ্যান্বেষণে—মায়ের জঠরের নিশ্চিত নিদ্রার অবকাশ আর ফিরে আসবে না জীবনে। হঠাৎ পায়ের কাছে উবুড় হয়ে পড়ে জোবেদালি।

: আমাগো ছাইড়্যা চল্লান দ্যাবতা? আমরায় কি দোষ করলাম?

না! দোষ জোবেদালি করেনি। কোনও দোষ নাই তার। ওর বাপ, ওর ঠাকুর্দা ছিল চক্রবর্তী বাড়ির কৃষাণ। চক্রবর্তী পরিবারের ব্রহ্মোত্তর ভূখণ্ডটুকুতে ওরাই ফলাতো সোণা। ঘরে বয়ে দিয়ে যেত মালিকের প্রাপ্য ধান। আহ্বানমাত্র বেগার দিয়ে গেছে। বেজার হয়নি কখনও। সত্য নারায়ণের প্রসাদ নিয়ে অম্লানবদনে কপালে ছুঁইয়ে খেয়েছে। ঈদের দিনে নিয়ে গেছে বকশিশ—বিজয়ার দিনে মিষ্টান্ন। দাওয়ার উঠে বসবার অধিকার ছিল না বলে খুন্ন হয়নি কখনও—এ কারণে যে ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত—এটা যে মানবিকতারই অপমান সে বোধই ছিল না ওদের। না, জোবেদালির প্রতি কোন অভিযোগ নেই চক্রবর্তীর। তিনি ওর হাত দুটি ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন—একটি কথাও বলতে পারলেন না। ধরা গলায় জোবেদালি বলে : আমাগো কি অইব? দুঃখের দিনে কার কাছে গিয়া দাঁড়াইবাম?

হরিপদ চক্রবর্তীর মনে হল এই জোবেদালির সঙ্গে তাঁর আত্মার আত্মীয়তা আছে। সুখ দুঃখের নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে শতাব্দী অথবা সহস্রাব্দীর নির্দেশে! র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে সে সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে না। দুঃখের রাত্রে জোবেদালির কোনও নিরাপত্তা নেই চক্রবর্তী বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছাড়া। চক্রবর্তী বাড়ির কোন উৎসবও সম্পন্ন হতে পারে না পরিবার-ভুক্ত জোবেদালির উপস্থিতি ভিন্ন। হরিপদ চক্রবর্তী বলেন : মন খাবাপ করিস না আলি। তুই আমার পরিবারের লোক—আমার আত্মীয়। তোকেও আমি নিয়ে যাব কলকাতায়।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে জোবেদালি। যেন বুঝতে পারে না মাস্টার মশায়ের কথা।

: কী ভাবছিস্ রে বোকা? ভয় নেই—তোর বউকেও নিয়ে যাব—ফতিমাকেও ; ওখানে আবার আমি জমি কিনব। তোকেই বন্দোবস্ত দেব। তুই ভাবিস না। আমাকে ছেড়ে তোরও চলবে না—তোকে ছেড়ে আমারও চলবে না রে।

দ্বিতীয়বার সিটি দেয় স্টিমারে। ওরা সিঁড়িটাকে সরাবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে জোবেদালি। ছুঁটে চলে যায় সিঁড়ির দিকে। ওর স্বদেশের সঙ্গে যোগসূত্রও বুঝি এখনই ছিন্ন হয়ে যাবে। যাবার সময় তার ভীত আর্ত কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় ক'টি শব্দ: না কর্তা, কইলকাতায় যাইলে উয়ার আমারে মাইর‍্যা ফ্যালাইবে!

চকিতে স্মরণ হয় হরিপদ মাস্টারের। মতিগঞ্জ যেমন হরিপদর বিমাতৃভূমি—খাস কলকাতাও তেমনি জোবেদালির কাছে বিদেশ। ভুল অঙ্কটার কথা মনে পড়ে তৎক্ষণাৎ!

ওদিকে স্টিমারটা বার কতক পাক খেয়ে তখন ঘুলিয়ে দিয়েছে উত্তর-দক্ষিণ! লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়লেন যেন চক্রবর্তী। স্টিমারের সারেঙ কোনপথে চলেছে—জ্ঞান নেই তাঁর। তবু নির্বিবাদে ছেড়ে দিয়েছেন তার উপর যাত্রার দায়িত্ব। যেমন ছেড়ে দিয়েছেন জীবনতরীর হালখানি ভাগ্যদেবীকে।

দর্শনা থেকে বানপুর। দলে দলে চলেছে মানুষ। মানুষ, মানুষ আর মানুষ। অতীত ইতিহাসের যুগে যেমন করে এসেছিল সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়ে এদের অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ,—খাইবার 'পাস' দিয়ে—আর্যাবর্তে! নরনারী-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মৃতবৎসা-নারী সন্তানক্রোড়ে সদ্য জননী! সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে খাঁচায়-পোষা পাখি, গলায়-চেন কুকুর। ক্যানেস্তারা, পোঁটলা, বাক্স

বিছানা। কাঠিওঠা মাদুব আব কালিওঠা লণ্ঠন। কাঁকালে শিশু, চোখে আতঙ্ক আব হৃদযে সন্ত্রাস। ওদেব পূর্বপুরুষ আর্যাবর্তে এসেছিল নতুন বাজ্য জয কবতে , অনার্যদেব উদ্বাস্তু কবতে। ওবা এল নিজেব দেশ ছেড়ে—উদ্বাস্তু হযে।

এইটুকু হাঁটাপথে আসতে হবে। দুই বাজ্যেব মধ্যে সবাসবি বেলপথ আছে—নেই বেলপথে গমনাগমনে। এটুকু পথ আসতে বেললাইনেব পাথবে ঠোক্কব খেযে চোখ থেকে পড়ে চশ্‌মাটা ভেঙে গেল হবিপদ মাস্টাবেব। ক্ষীণদৃষ্টি মানুষ তিনি ববাববই। চোখে অন্ধকাব দেখলেন। স্ত্রী বিন্দুবাসিনী হাত ধবে ওঁকে নিযে গিযে বসালেন বেললাইনেব ধাবেব এক বিবলছাযা বাব্‌লা গাছতলায। বড়মেযে নমিতা দুর্বাঘাস ছিঁড়ে এনে একটুকবা ন্যাকড়া দিযে বেঁধে দেয পাযেব বুড়ো আঙুলটা। খব মধ্যাহ্নেব দৃপ্ত তেজে ঘণ্টা দুযেক অপেক্ষা কবতে হযেছিল তাঁকে। সেই দু'ঘণ্টা ধবে তাঁব ক্ষীণদৃষ্টি চোখেব সামনে দিযে—বৈশাখী মধ্যাহ্নেব প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা কবে বযে গিযেছিল এক জনপ্রবাহ নিববচ্ছিন্ন গতিতে। মানুষ চলেছে গাযে গাযে লেগে, প্রশস্ত বেলপথেব উপব চাপ ভিড়। ঠেলা-ঠেলি, হুড়াহুড়ি—দীর্ঘ ক'মাইল বিস্তৃত যেন জীবন্ত মানুষেব একটা চলন্ত অজগব। বিনা চশমায একটা মানুষেব থেকে আব একটা মানুষকে তফাৎ কবে দেখতে পাবছিলেন তিনি। যেন প্রতিটি মানুষেব কোন পৃথক সত্তা নেই। ওবা যেন সন্ত্রাসিত পালাযনপব একটি অভীপ্সাব উপাদান। অজগবটা চলেছে, তাব আদিও নেই অন্তও নেই। ওব লেজটা দেখা যায না—কিন্তু কে বুঝি সঙ্গিন দিযে খোঁচা দিযেছে সেই লেজে। ভযত্রস্ত সবীসৃপটা ছুটে চলেছে দর্শনা থেকে বানপুব।

আজও কলোনিব বিবলস্থান কুটিবে মাদুব বিছিযে যখন শুযে থাকেন—চোখেব উপব দিযে ভেসে যায সেই বিচিত্র মিছিল। গাযে গাযে লাগা মানুষেব প্রবাহ।

এ পাবে এসে কে কোথায ছিটকে পড়ল কে জানে। স্টিমাবে, ট্রেনে, কতো লোকেব সঙ্গে আলাপ হল। নতুন কবে জীবিকা অন্বেষণেব যৌথ প্রচেষ্টা কববেন বলে কযেকজনেব নাম পবিচযও লিখে বেখেছিলেন নোট বইতে। কে জানে কোথায গেল লোকগুলো। পড়ে আছে হযতো কোনও পি এল ক্যাম্পে অথবা পেযেছে পুনর্বসতি তাঁবই মতো। না হয হাঙ্গামা চুকেই গেছে একেবাবে।

সাত আট বছব কেটে গেছে এবপব। কত ঝড় ঝঞ্ঝা বযে গেছে এদেব উপব দিযে তাব ইযত্তা নেই। ট্রান্‌সিট ক্যাম্প, পি এল ক্যাম্প, পুনর্বসতি, যাও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বেবাব—ফিবে এসো হাওড়া অথবা শেযালদ' স্টেশনে। পুলিস ভ্যান, কোর্ট, হাজত—ঠিক হ্যায। ন্যাংটাব নেই বাটপাড়েব ভয , কি কববি কব। আবাব পুনর্বসতি? বেশ আবাব চেষ্টা কবে দেখব। তোমাদেব যদি ধৈর্য থাকে তবে আমাদেবও থাকবে।

কেন থাকবে না?—বলেন গোকুল দাস। জমিদাবেব গোমস্তা ছিলেন তিনি। বলেন ও ব্যাটাগো সুজ। কবা কি সহজ মশয? মাইব খাইয্যা খাইয্যা বেটাগো পিঠে কড়া পইড্যা গেছে। আবও মাববা? মাবো। তোমাবই জুতো ছিঁড়বো।

হবিপদ মাস্টাব বলেন ওবা ওবা বলছেন কেন? আমি আপনিও তো ঐ দলেই। আমবাও তো উদ্বাস্তু।

আমবা আব অবা?—বিস্মিত হন গোকুল দাস। জমিদাবেব দুর্ধর্ষ গোমস্তা। বলেন আমবা হইলাম গিযা ভদ্দবলুক, মানে মিডলক্লাস। আব অবা? অগো কোনও দিন চাল আছিল না চুলা? ঘব ভাইঙ্গ্যা দিছি বাববাব। উই পুকাব মতো গড়ছে আবাব।

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-আড়িযেলখাঁ বিধৌত নদীমাতৃক ভূখণ্ডেব মানুষগুলো সে গৌবব দাবী কবতে পাবে। এক হাতে রুখেছে প্রকৃতিকে—অন্য হাতে প্রতিহত কবেছে প্রবলতব শোষণবিলাসী মানুষকে। দু'হাতে সংগ্রাম কবে চলেছে আজীবন। তবু দুর্ভাগ্যকে জয কবতে পাবেনি। শ্রাবণ ভাদ্রেব ভবা নদীতে শোনা গিযেছে সুপ্তোত্থিত অজগবেব গর্জন—নিভৃত বাত্রে। পবদিন সকালে

গিয়ে দেখেছে হয়তো একশ' দেড়শ' হাত এগিয়ে এসেছে নদী! কাল সন্ধ্যায় যে বিরাট অশ্বত্থ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখে গিয়েছিলে গৈরিকবসনা মেয়েটির উদ্দাম উচ্ছ্বাস—আজ সে মহীরুহের চিহ্নমাত্র নেই। রাতারাতি নদীতীর ছেড়ে মানুষ চলে গিয়েছে অভ্যন্তর ভাগে। সেখানে নতুন বন্দোবস্ত দেয় না জমিদার। নদী যদি জমি খেয়ে নেয় তবে কে কি করতে পারে? অসহায় স্ত্রীপুত্র গোরুছাগল নিয়ে মানুষগুলো ঘুরে মরে, বানের মুখে কুটোর মতো। তারপর সংবাদ আসে নদীর ওপারে জেগেছে চর। উর্বর পলিমাটির চাদর মুড়ি দিয়ে দল্‌দলে কাদামাটি হাতছানি দেয় ওদের। চরের জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে তোলে ওরা। মানুষ-খেকো কুমীরে তাড়া করে ধরে নিয়ে যায় বিরলবসতি চরের শিশুকে—বিষাক্ত সাপের করাল দংশনে নীল হয়ে যায় প্রিয়জন। তবু ওরা হার মানে না। চালায় লাঙ্গল, বোনে শস্য, বসায় কলমের গাছ। ধীরে ধীরে মাথা তুলে জেগে ওঠে গ্রাম। প্রকৃতিকে জয় করে ওরা হাসে!

অমনি দেখা দেন আর একজন। এতদিন যিনি খোঁজই রাখেন নি মানুষগুলো কি করছে চরে। তিনি জমিদারের লোক। হুকুম জারি হয়—নতুন বন্দোবস্ত নিতে হবে। কে অনুমতি দিলে ওদের এখানে ঘর করতে?

অনুমতি? অনুমতি আবার কিসের? অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে প্রকৃতি—পৌরুষের দৃপ্ত নির্দেশে। কিন্তু সেকথা শোনে না জমিদারের পেয়াদা। এ যুক্তি ওরা মানে না।....

...দূরের গ্রাম থেকে সকলে মধ্যরাত্রে বেরিয়ে এসে দেখে নদীর বুকে জ্বলে উঠেছে বাড়বানল। বিস্তীর্ণ নদীর এ পাড়ে এসে পৌঁছায় না তার পোড়া ছাই, অথবা হতভাগ্য গৃহদগ্ধ মানুষের অন্তিম আর্তনাদ!

: চরইস্‌মাইলপুরে আগুন লাগ্‌ছে মনে হতিছে?

: লাগবো না! হালার জমিদার।

এ যেন চিরন্তন একটি ব্যবস্থা! প্রতিবাদের প্রয়োজন নেই। গ্রীষ্মকালের খররৌদ্র, বর্ষার ধারাপাত, শীতের তীব্রতা যদি মুখ বুঁজে সহ্য করতে পার তবে এটাই বা পারবে না কেন?

তবু উইপোকার মতোই মানুষগুলো আবার লেগে যায় ঘর বাঁধতে!

সেই পদ্মা-মেঘনা-যমুনার দেশের মানুষগুলি এসে ঘর বেঁধেছে কলোনিতে

কলোনি!

উদয়নগর উদ্বাস্তু কলোনি।

বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মধ্যে জেগে উঠেছে নতুন বসতি। এলোমেলো অগোছালো গ্রাম নয়। দস্তুরমত প্ল্যান করা গ্রামনগরী। প্ল্যানের ব্লুপ্রিন্ট দেখলে মনে হতে পারে ত্রিশ-চল্লিশ-ফুট চওড়া সমান্তরাল সড়কগুলোর দু'ধারে বাড়িগুলি বুঝিবা সাজানো। বাস্তবে কিন্তু বিসর্পিল রেখার অপ্রশস্ত গলির কাদা ভেঙে বাড়িগুলির কাছে পৌঁছানোই কষ্টকর। ঈশ্বর জানেন ত্রুটি কার। যে সরকারি ওভারসিয়ার প্ল্যান দেখে রাস্তার লে-আউট দিয়েছিল তারই যোগ্যতার অভাব—অথবা সরকারি সড়ক গ্রাসে উৎসাহী কলোনিবাসীর যোগ্যতার পরিচয়! পাশাপাশি বাড়ি। তার ছাঁদ আলাদা। কোনটা পাকা, কোনটা কাদার। দরমা, মুলিবাঁশও আছে। পলেস্তারা করা পাকা ইঁটের দেয়ালের উপর কংক্রিটের ছাদ থেকে শুরু করে পাটকাঠির দেয়ালের উপর তাল পাতার ছাউনিও আছে। সরকারি খাতা অনুযায়ী এদের মূল্যমান হওয়া উচিত অভিন্ন। প্রত্যেকটি বাড়ি করার খরচ বাবদ সরকারি খাতায় ঋণের পরিমাণ সাড়ে বাইশ শ' টাকা। একচুল এদিক ওদিক নেই।

এদের মাঝে মাঝে আবার আছে অসমাপ্ত ঘর। কোনটা প্লিন্থ পর্যন্ত গাঁথা, কোনটার লিন্টেল ঢালাই হয়ে থেমে আছে। মাঝে মাঝে উর্ধ্বমুখ পিলার-অহল্যা পাপস্খলনের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। এদের

যারা মালিক তারা নিরুদ্দেশ। জমি আছে—অসমাপ্ত বাড়ি আছে—নেই মালিক। কলোনীর পরিভাষায় ডেজার্টার! দুষ্ট লোকে বলে গৃহনির্মাণ ঋণের টাকা আত্মসাৎ করে এরা নাকি অপর জায়গায় গিয়ে ব্যবস্থা করেছে নতুন ঋণলাভের। উর্ধ্বমুখ পিলারগুলো বোধহয় সেকথা বিশ্বাস করে না। শবরীর প্রতীক্ষায় ওরা দিন গোনে।

এ হেন একটি ডেজার্টারের বাড়ির মাথায় খান কয়েক করগেট চাপিয়ে বর্তমানে বাস করছেন হরিপদ মাস্টারমশাই। সাতবছর আগে ট্রেনে-স্টিমারে যাঁরা হরিপদ মাস্টারের নাম লিখে নিয়েছিলেন তাঁরা আজ তাঁকে দেখলে চিনতে পারবেন না। সাত বছরেই তাঁর বয়স বেড়ে গেছে যেন বিশ বছর। ডান চোখে একেবারেই দেখতে পান না তিনি। বাঁ চোখটায় তীব্র আলোর সামনে বুঝতে পারেন লোকজনের আনাগোনা। মানুষ চিহ্নিত করার মতোও দৃষ্টিশক্তি নেই তাঁর। উমাশশী গার্লস স্কুলের হেডপণ্ডিত এপারে এসে বহু স্কুলেই দরখাস্ত করেছিলেন কিন্তু নতুন চাকরি জোটেনি তাঁর। লেখাপড়ার চর্চা ছিল তাঁদের পরিবারে। বড় ছেলে অনিমেষকে ওকালতি পড়াবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। হল না। নমিতাও মেধাবী ছাত্রী। প্রাইভেটে পড়েই ম্যাট্রিক পাশ করেছিল সে। পড়ালে এতদিনে বি. এ, এম. এ পাশ করত হয়েতো। কিন্তু কিছুই করা হল না।

গৃহনির্মাণ ঋণের টাকা দিয়ে একটা বাড়ি করতে শুরু করেছিলেন। প্রায় শেষও হয়ে এসেছিল। তারপর অর্থাভাবে তিলে তিলে খুলে বিক্রি করেছেন জানলা-দরজা-টিন-ইঁট! নিজের উপার্জন নেই। অনিমেষ একটা রিক্সা চালায়। তাতেই চলে সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন। আজ দু'মাস সেও রোগশয্যায়। বর্তমানে এই ডেজাটার্স কোয়ার্টারে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি সপরিবারে। জীবনের সব আশা আকাঙক্ষাই ঘুচে গেছে। এখন বৃদ্ধের একমাত্র বাসনা ছোট ছেলেটিকে মানুষ করে তোলা। ওকে দিয়েই ফিরিয়ে আনতে হবে এ সংসারের লক্ষ্মীশ্রী।

ঘর একখানিই। তার মাঝামাঝি একটা শাড়ি টাঙ্গিয়ে এপাশে রাত্রি যাপন করেন হরিপদ মাস্টার আর স্ত্রী বিন্দুবাসিনী। নমিতা আর লতু সে দিকেরই ভাগীদার। শাড়ির অপরাংশে, গৌরবে পাশের ঘরে, অনিমেষ আর কামিনী নিম্নস্বরে দাম্পত্য আলাপ করে। গোরা শোয় ওদের কাছেই। অন্ধের কনিষ্ঠ সন্তান এগারো বছরের বাবলু যে কোথায় শোয় তা বোধহয় সে নিজেই জানে না।

কদিন ধরে অনিমেষের জ্বরটা একেবারেই ছাড়ছে না। অবশ্য জ্বরতাপ মাপবার মাপকাঠি এক্ষেত্রে হরিপদ মাস্টারের হস্তস্পর্শই। কিন্তু উদ্বিগ্ন বাপের কম্পিত হস্তে কি ভুল নির্দেশ দিতে পারে না? অনিমেষ মাথা তুলে উঠে বসবার চেষ্টা করে। আজ তার শরীরটা অপেক্ষাকৃত ভালোই বোধ হচ্ছে।

: আবার উঠে বসলে কেন? প্রশ্ন করে কামিনী।

: জ্বরটা ছাড়লো মনে হচ্ছে।

কামিনীর ডান হাতটা এঁটো। গোরাকে খাওয়াতে খাওয়াতে উঠে এসেছে। বাঁ হাত দিয়ে স্বামীর ললাট স্পর্শ করে। জ্বর বেশ আছে বলেই মনে হয়—সেকথা জানাতে মন সরে না ওর। চুপ করে থাকে।

: বউমা, র‍্যাশানের থলেটা দাও।

পর্দার ও পাশ থেকে হরিপদ সাড়া দেন। ত্রস্তপদে কামিনী বেরিয়ে আসে। শ্বশুরের হাতে তুলে দেয় চটের থলিটা। আজ ডোল-ডে। শ্বশুর গিয়ে চাল আনবেন তবে জ্বালা হবে উনান। অন্ধ মানুষ। ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়িতে সহজেই কাবু হয়ে পড়েন। চাল নিয়ে হয়তো ফিরবেন পড়ন্ত বেলায়। তখন রান্না চড়বে। র‍্যাশান-মেয়াদের শেষ কটি দিন কামিনীর প্রায় অভুক্তই কাটে। অনাহারক্লিষ্ট শরীরে সে তখন গিয়ে বসে কাঠের উনানের সামনে। ভিজা কাঠের উনানে ফুঁ দিতে চোখে জল আসে। তাতে দুঃখ নেই কামিনীর। কাঁদবার এ একটা ভালো অছিলা।

বাপমায়ের আদরের মেয়ে ছিল কামিনী। একমাত্র সন্তান—তাই অভিমানী ছিল সে বড়। অনেক

খোঁজ করে বাবামা তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন হরিপদ পণ্ডিতের বড় ছেলের সঙ্গে। উচ্চশিক্ষিত মহোপাধ্যায় বংশ। অনিমেষ ছেলেও ভালো। তখন পড়ত কলেজে। আম-জামের বাগান ঘেরা ওদের বসত বাড়িটা দেখে কন্যাদায়গ্রস্থ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন—অভিমানী মেয়েটার অন্তত খাওয়া-পরার কষ্ট থাকবে না।

কিন্তু কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল!

টিপি টিপি বৃষ্টি নামলো। মাথায় একটা গামছা চাপিয়ে হরিপদ মাস্টার র‍্যাশান আনতে বেরিয়ে গেলেন।

: বাবলু কোথায়? কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করে অনিমেষ। ওর কণ্ঠস্বরে চম্‌কে ওঠে কামিনী। বলে : কি জানি সে তো বেরিয়ে যায়, সেই কাক ডাকা ভোরে।

: আর ফেরে বুঝি সেই প্যাঁচা-ডাকা মাঝরাত্রে?

কামিনী জবাব দেয় না। আপন মনেই বকতে থাকে অনিমেষ : ছেলেমানুষ তো আর নয়। দশ এগারো বছর বয়স হল। সংসারের অবস্থাটা তারও বোঝা উচিত। অন্ধ বাপ বৃষ্টি মাথায় করে র‍্যাশান আনতে যায়—আর নবাবপুত্র কোথায় কোথায় আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছেন।

এত দুঃখেও কামিনীর হাসি আসে। বলে : গাল দিচ্ছ কাকে?

: নবাব খাঞ্জা খাঁর বেটা তোমার আদরের দেওরটিকে। আদর দিয়ে দিয়ে যার মাথা খেয়েছ তাকে।

অনিমেষের কণ্ঠস্বরে একবিন্দু কোমলতা নেই। বাবলু যে তার বৌদির আদরেই উৎসন্নে যেতে বসেছে এটুকু অনিমেষ বর্ণে বর্ণে বোঝে। তাই খোঁচা দিয়েই বক্তব্যটা শেষ করে।

কামিনী রাগ করে না। দেওরের প্রতি তার স্নেহের আতিশয্যটা যে বাড়িশুদ্ধ সকলে মাথা খাওয়ার পর্যায়ে ফেলে এটুকু তার জানা কথা। তাই হাসিমুখেই সে জবাব দেয় : তা যেন বুঝলাম, কিন্তু জ্বর গায়ে ভাইকে গাল দিতে বসে আসলে কাকে গাল দিচ্ছ তা কি ভেবে দেখেছ?

: কাকে?—প্রশ্নটা বোধগম্য হয় না অনিমেষের রোগদুর্বল মস্তিষ্কে।

: তোর বাপকে রে অনু, তোর বাপকে। ঐ যে তুই গরিব ইস্কুল মাস্টারকে নবাব খাঞ্জা খাঁ বললি না, তাই বৌমার মুখে হাসি আর ধরছে না। আসল নবাবের ঘরের মেয়ে কিনা। তাই শ্বশুরের খোয়াবে আনন্দের আর পরিসীমে নেই!

কামিনী ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথার আঁচল তুলে দেয়। বিন্দুবাসিনী। কঠোর সত্যটা অকস্মাৎ মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়েছে। একই ঘরে বাস করে ওরা। শ্বশুর-শাশুড়ী, পুত্র-পুত্রবধু! মাঝের টাঙ্গানো বস্ত্রখণ্ডটি গোরা যে কখন টেনে নামিয়েছে তা খেয়ালই হয়নি কারও। দৃশ্যান্তরের অসময়ে মঞ্চাধিপের অনবধানতায় ড্রপসীন উঠে গেলে—যেমন করে ছুটে পালায় সীন সিফ্‌টারেরা, তেমনি দ্রুতপদেই নিষ্ক্রান্ত হতে চায় কামিনী ঘর থেকে। বাধা পায় সেদিক থেকে নমিতা প্রবেশ করায়। নমিতার হাতে এক বাটি বার্লি। অনিমেষের তক্তাপোশে সেটা নামিয়ে রেখে মায়ের দিকে ফিরে বলে : তুমি আবার ওদের কথার মধ্যে কথা বলতে এসেছ মা? একখানা ঘর—ওরা কি স্বামী-স্ত্রীতে কোন কথাও বল্‌তে পারবে না তোমার জ্বালায়?

: অন্যায় হয়ে গেছে মা, মাপ চাইছি। তবে চোখ-কানের সামনেই এসব হতে দেখলে সব সময় স্থির থাকতে পারি না। কি করব! কপাল আমার!

আপন মনে গজ গজ করতে করতে তিনি চলে যান। নমিতা এবার কামিনীকে বলে : আর তোমাকেও বলি বৌদি। জানো তো একখানি মাত্র ঘর। ওসব কথাগুলো কি চেঁচিয়ে না বললেই নয়?

কামিনী বলে : কপাল আমারও ঠাকুরঝি। শাশুড়ী ননদ যে সব সময় আড়ি পেতে আছেন এটা মনে থাকে না আমারও।

যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়ায় নমিতা। যেন কিছু বলবে সে। তারপর রোগজীর্ণ অনিমেষের দিকে

তাকিয়ে সামলে নেয় নিজেকে। চলে যায় ধীর পদে। কামিনীও অনুসরণ করে।

অনিমেষ চুপ করে শুয়ে থাকে। আজ দু'মাস সে শয্যাগত। তার আগে সেও বেরিয়ে যেত সেই কাকডাকা ভোরে—আর ফিরত সাড়ে দশটার শেষ লোকালের প্যাসেঞ্জার দেখে পেঁচাডাকা মাঝরাত্রেই! অনিমেষ ভাবে কী তাড়াতাড়ি সব বদল হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাদের আর্থিক সচ্ছলতাই নয়, মানুষগুলো পর্যন্ত। উমাশশী গার্লর্স স্কুলের হেডপণ্ডিত হরিপদ চক্রবর্তী তো আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। শুধু দেহে নয় মনেও। সত্যাশ্রয়ী আদর্শবাদী হরিপদ পণ্ডিতের যে প্রেতাত্মা আজ উদয়নগর কলোনির ডোলভুক্ ভিক্ষাজীবী তাকে চেনা যায় না। বদলে গেছেন বিন্দুবাসিনীও। উচ্ছল সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন তিনি। গোয়ালঘরে গোমাতার সেবা থেকে আহারান্তে পণ্ডিতের হাতে খড়কে কাঠিটি এগিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজটুকু তিনি নিজে হাতে করতে চাইতেন। নববধূ কামিনীকে ধীরে ধীরে শিখিয়ে নিতে চেয়েছিলেন এ বাড়ির কুলাচার। নির্বিবাদী মানুষ ছিলেন তিনি। কটুকথা কেউ কখনও শুনতো না তাঁর মুখ থেকে। পুত্রবধূর সঙ্গে মুখোমুখী ঝগড়া করা তো স্বপ্নকথা! বদলেছে নমিতাও। কামিনীর সঙ্গে ওর বয়সের তফাৎ নেই। দুই অন্তরঙ্গ সখীর মতোই ছিল ওরা ওপারে। আজ তাদের সামান্যতম জিনিস নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। দোষ অনিমেষ দেবে কাকে? একটু আগে বকছিল বাবলুকে। কিন্তু বাবলুই কি এ রকম ছিল চিরকাল? ছেলেবেলার বাবলুকে মনে পড়ে। এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। নিটোল স্বাস্থ্য। সবচেয়ে আশ্চর্য ওর চোখ দুটো। ডাগর চোখ দুটির অন্তরালে যেন কোন অতলস্পর্শ গভীরতা আছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দুঃখ কষ্টই পেয়েছে এতদিন। ওপারের জীবনটা তার কাছে গল্পকথা। নিজের বাল্যকালের সঙ্গে ভাইয়ের শৈশব তুলনা করে এতদিন শুধু কষ্টই পেয়েছে। উমাশশী গার্লস স্কুলের হেড পণ্ডিতের বেতন যাই হক সংসারে প্রাচুর্য ছিল যথেষ্টই। অপর্যাপ্ত মাছ, অঢেল আম-জাম-কলা। খাওয়ার কষ্ট কাকে বলে—খিদে পেলে অনুভূতিটা কেমন হয় অনিমেষ জানতে পারেনি এপারে পা দেবার আগে। বাড়ির সামনে ছিল একটা কলা বাগান আর একটা কালোজামের গাছ। নীল হয়ে থাকত গাছের তলাটা পাকা ফলের প্রাচুর্যে। পেড়ে কুড়িয়ে নিঃশেষিত করা যেত না তার অকৃপণ দান। মানুষের পদদলনে নীলাভ হয়ে থাকতো পাকা জামের রসে পথ চল্‌তি সড়ক। আর আজ জাম বিক্রি হয় পয়সায় চারটে। বড় বড় ডাগর চোখে লোলুপতা ফুটে ওঠে বাবলুর। দাদা বলে : জাম খাবি বাবলু? যা এক পয়সার কিনে আন।

: ভারি তো জাম—ঠোঁট উল্টে জবাব দিত বাবলু।

এত বুঝমান ছিল সে। খিদেয় শুকিয়ে গেছে মুখটা—তবু খেতে চায়নি। অতটুকু ছেলেমানুষ বুঝে নিয়েছিল এ সংসারের অসহায়তা। শুধু বড্ড বেশি খিদে পেলে বৌদির কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে সলজ্জে জিজ্ঞেসা করেছে : আজ ফ্যান রাখনি বৌদি?

জবাব দিতে পারে না হয়তো কামিনী। সে কি করে বোঝাবে অতটুকু ছেলেকে—যে ফ্যানটা আলাদা করে রাখলে ভাতের পরিমাণ যায় কমে। সহজে হজম হয়ে অল্প সময়েই খিদে পায়। তাই ভাত থেকে ফ্যানটাকে বিমুক্ত করা আর সম্ভব হচ্ছে না এ সংসারে। বৌদির মুখ দেখেই বুঝে নেয় বাবলু। তাড়াতাড়ি শুকনো ঠোঁটে বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে বলে : "বাঁচিয়েছ বৌদি ; ও ফ্যান সত্যিই গিলতে পারি না আমি। মাগো! মানুষে খায় নাকি শুধু ফ্যান নুন দিয়ে!

ওর হাসি দেখে চোখে জল আসে হয়তো কামিনীর!

সেই বাবলু!

অনিমেষ উত্তপ্ত মস্তিকে বসে বসে তাই ভাবে। সেই বাবলুর এতবড় পরিবর্তন হয় কি করে? শত চেষ্টাতেও ওকে বই নিয়ে বসানো যায় না। বলে, বকে, মেরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন হরিপদ মাস্টার। নমিতাও বোধহয় আশা ত্যাগ করেছে। 'ও গাধাটার কিছু হবে না' বলেছেন পণ্ডিত। অনেক গাধাকে যিনি পিটিয়ে মানুষ করেছেন—এবং বাবলুর মেধা আর অধ্যবসায় নিয়ে যাঁর গর্বের অন্ত ছিল না, এক

সপ্তাহে তার অক্ষর পরিচয় শেষ হয়েছিল বলে যে পণ্ডিতের প্রশংসার ভাষা জোগায়নি—তিনিই শেষ পর্যন্ত এ ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন একদিন। সংসারের কোনও কাজ করবে না। আজকাল কারও সঙ্গে ভালো করে কথাই বলে না। কোন্ ভোরে উঠে বেরিয়ে যায় কেউ টেরই পায় না। দুপুরে ফিরে কোনও দিন খায় কিনা তা ওর বৌদিই জানে। সারাদিন ওর দেখা নেই। রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন ও গুটিগুটি এসে শুয়ে পড়ে ওর নির্দিষ্ট মাদুরে। হয়তো ঘুম ভেঙে যায় নমিতার অথবা বিন্দুবাসিনীর। কিন্তু মধ্যরাত্রে আর কে ছেলে শাসন করতে বসে। সুতরাং লালয়েৎ, তাড়য়েৎ কোনটাই হয়ে ওঠে না। এগারো বছরের এক ফোঁটা বাবলু সংসারের শাসন শৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলেছে।

অনিমেষ কী করতে পারে? বাবলু তো ছেলে, অল্প বয়স। লতুটাকেই কি শাসন করতে পারে? ঐ বোধহয় একমাত্র মেয়ে যার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এপারে আসার সময় কতই বা বয়স ছিল ওর। বছর সাত আটের একটা চঞ্চল ফুটফুটে মেয়ে ছিল। আজ ওর বয়স পনেরর কোঠায়। গড়নটা বাড়ন্ত নয় বলে আজও ফ্রক পড়ে। কিন্তু বয়স তো ছেলেমানুষের নয়। লতু বোধহয় দেহে মনে আজও সেই লতুই আছে। সেই কিশোরী বালিকা। শুধু কিছু বাজে নভেল পড়ে অকালপক্ক হয়েছে ইতিমধ্যে। লেখা পড়ার ধার সেও ধারল না! লতুর জন্যে ভেবে আর কি হবে? সব গুণের অধিকারিণী হওয়া সত্যেও নমিতারই যখন কোনও ব্যবস্থা করা গেল না—তখন লতুর আর কি হতে পারত? কিন্তু বাবলুটার উপর ভরসা ছিল যে! অনিমেষ অবাক হয়ে ভাবে—সংসারের সব কাজে কামিনীর এত বুদ্ধি, এত বিচক্ষণতা, আর এই সোজা কথাটা কেন সে বোঝে না? কামিনী কেন বোঝে না যে ঐ একফোঁটা ছেলেটার দিকে চেয়েই দিন গুনছে এতগুলো লোক। সে মানুষ হবে, লেখাপড়া শিখবে, চাকরি বাকরি করে এই ভেঙে পড়া সংসারটাকে আবার খাড়া করে তুলবে! মহোপাধ্যায় বংশের শেষ সম্মানটুকু হয়তো ওই পারতো উদ্ধার করতে ; অন্ধ হরিপদপণ্ডিতকে এ উঞ্ছবৃত্তি থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারতো অন্তত শেষের কটা দিনের জন্য।

: ওমা, বার্লিটুকু এখনও খাওনি? জুড়িয়ে জল হয়ে গেল যে? কামিনী এসে দাঁড়ায়।

: মা কোথায়?—অনিমেষ প্রতিপ্রশ্ন করে।

: মা জল আনতে গেছেন।

রাস্তার ধারে নলকূপ। এতদিন কামিনী অথবা নমিতাই জল নিয়ে আসত। সম্প্রতি এ দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন বিন্দুবাসিনী। কামিনী অথবা নমিতা প্রতিবাদ করেনি। করবার উপায়ও ছিল না। নতুন একখানা শাড়ি না কেনা পর্যন্ত তাদের দুজনের কারও পক্ষে সম্ভব নয় রাস্তার কল থেকে জল তুলে আনা। বাইরে বের হবার অর্থাৎ জল আনতে যাবার একটি মাত্র এজমালি শাড়ি ছিল—কোনদিন কামিনী কোনদিন নমিতা সেখানি পরেই জল নিয়ে আসতো। সেটিও জীর্ণ হয়ে এসেছে। তাছাড়া টিউব-ওয়েলের ঠিক সামনেই জয়হিন্দ কেবিন। চায়ের দোকান। ডি-ব্লকের সেক্রেটারি বিষ্টুপদ মজুমদারের রেস্তোরাঁ। যত রাজ্যের বেকার বকাটে ছোঁড়ার আড্ডা সেটা। স্বয়ং বিষ্টুপদও কম না। এটা অনুভব করেছেন বলেই বিন্দুবাসিনী স্বেচ্ছায় এ দায়িত্বটা নিয়েছেন। লতু অবশ্য এ কাজটা করে দিতে পারতো সংসারের। করেও মাঝে মাঝে কিন্তু আবার মাঝে মাঝে ভুলেও যায়। এই 'মাঝে মাঝে' ব্যাপারটা এত ঘন ঘন ঘটতে লাগলো যে শেষ পর্যন্ত বিন্দুবাসিনী আর তার উপর ভরসা করতে রাজি নন। পানীয় জলটা মাঝে মাঝে ভুলে গেলে সংসারটাও মাঝে মাঝে অচল হয়ে ওঠে!

এতকথা অনিমেষ জানে না। বলে : মা জল আনতে গেছেন? কেন? জলটুকুও তুলে আনতে পার না তুমি? নমু পারে না, লতু পারে না?

একটু ইতস্তত করে কামিনী। তারপর বলে : লতুর কথা জানি না কিন্তু ঠাকুরঝি বা আমার লজ্জা

করে—ও শাড়িটা—

: ও! তা ইয়ে, বাবলুকেও তো বলতে পার সংসারের এটুকু কাজ করে দিতে। ষাট বছরের বড়িটাকে সেও তো একটু সাহায্য করতে পারে। আমরা তার নাগাল না পেলেও তুমি তো তার দেখা পাও।

: আচ্ছা বলব অখন! কিন্তু বার্লিটা খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি!

: না খাব না। আগে আমার কথার জবাব দাও। সত্যি তুমি কী ভেবেছ মনে? এ ভাবে বাউণ্ডুলে হয়ে যাবে ছেলেটা? লেখাপড়া শিখবে না? মানুষ হবে না?

কামিনী কি যেন ভাবে একটু। তারপর বসে পড়ে ওর চৌকির একপ্রান্তে। ধীরে ধীরে স্বামীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে : কথাটা তোমাকে বলব বলব ভাবছিলাম। দেখলে তো, ওর লেখাপড়া হবে না। বাবা আর ঠাকুরঝি যতই কেন না বকাঝকা করুন ও বই নিয়ে কিছুতেই বসবে না। ও চাইল বিষ্টুর দোকানে কাজ করতে। এক বেলার খোরাকি আর মাসে পাঁচটাকা নগদ! অথচ তোমরা রাজি হলে না। তোমরা মত দাও ওকে আমি ঐ চাকরিই নিতে বলি। যা হোক সংসারের আয় তো হবে!

নমিতা বসেছিল ঘরের প্রায় চৌকাঠের কাছে। উঠে আসে সে। আর সহ্য হয় না তার। বলে : বাবা আর ঠাকুরঝির বকাঝকায় কেন কাজ হয় না তা তো তোমার অজানা নেই বৌদি। বাড়িতে একজন যদি অনবরত আশকারা দিয়ে যায় তবে তাকে শাসন করে কে? বাবলু হবে চায়ের দোকানের বয়? ওর লেখাপড়া হবে না। কেন হবে না? জানো, বাবা বলতেন ওঁর ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় বাবলুর মত মেধাবী ছেলে একটিও দেখেননি। পড়লে ও নিশ্চয়ই বৃত্তি পাবে পরীক্ষায়।

: সে কি আমিই জানি না ঠাকুরঝি? পড়াতে পারলে তুমিও এতদিনে বি. এ. পাশ করে চাকরি করতে—তোমার দাদাও হয়তো ওকালতি করতে পাবতো। কিন্তু তা তো হ'চ্ছে না। ইচ্ছা থাকতেও তোমরা পড়াশুনা চালাতে পারলে না—আর ওকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা পণ্ডিত করে তুলবে?

নমিতা কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে কামিনী তার যুক্তির ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে : তাছাড়া সংসারটাতো চালাতে হ'বে? তোমার দাদা আজ দু'মাস বিছানায় পড়ে। মানুষতো কমগুলি নই আমরা সংসারে?

নমিতা জবাব দিতে পারে না। অনিমেষও কোন উত্তর খুঁজে পায় না। এতদিন সংসারটা চল্‌ছে কি করে সেই এক বিস্ময়। অবস্থা অবশ্য চরম সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে—তবু অচল হয়ে তো পড়েনি। চল্‌ছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অভাগীদের এ সংসারটাও।

: তোমরা বুঝিয়ে বল বাবাকে। ঠাকুরপোকে বিষ্টুর দোকানেই ঢুকতে দাও!

: না! হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে অনিমেষ : জীবনে অনেক নিচে নেমেছি ; কিন্তু আর নামতে পারব না।

কামিনী জবাব দেয় না। সে জানে আসল অভিমানটা কোথায়!

সামাজিক মর্যাদার অভিমান। জাতেব অভিমান। মতিগঞ্জ স্কুলেব হেডপণ্ডিত হরিপদ চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ পুত্র মহোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্র ভিষগ্‌রত্নের পৌত্র—চায়ের দোকানে ছত্রিশ জাতের ভুক্তাবশিষ্ট পরিষ্কার করবে—নিষিদ্ধ মাংসের উচ্ছিষ্ট প্লেট ধুয়ে মুছে তুলবে—এ প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছেন না তাঁরা। অবস্থার ফেরে পণ্ডিতগিন্নি আজ রাস্তার নলকূপে জল আনতে যান—পণ্ডিতমশাই গিয়ে দাঁড়ান ভিক্ষার ঝুলি হাতে ডোল অফিসে—পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠপুত্র—যাকে ওকালতি পড়াবার বাসনা ছিল পণ্ডিতদম্পতীর সে আজ রিকসা চালায় ; কিন্তু ব্যস! ওর নিচে আর নামা যায় না।

: বার্লিটা খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি!

অনিমেষ আর আপত্তি করে না। চটা-ওঠা কলাই করা বাটিটা হাত বারিয়ে গ্রহণ করে।

জলভরা ঘড়াটা সশব্দে উঠানে নামিয়ে হাঁপাতে থাকেন বিন্দুবাসিনী। বয়স হয়েছে, অতবড ঘড়াটা বয়ে আনতে তাঁর সত্যিই কষ্ট হয়।

বাইরে কে যেন ডাকে : পণ্ডিতমশয় রইছেন নাকি ঘরে?

: কে? ভিতরে আসুন। সাড়া দেয় অনিমেষ।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে বিষ্টুপদ। ডি-ব্লকের সেক্রেটারি তথা জয়হিন্দ-কেবিনের মালিক স্বনামধন্য বিষ্টুপদ মজুমদার। কামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ পায় না। দরজার কাছেই বিষ্টুপদ দাঁড়িয়ে আছে। কামিনী মাথায় ঘোমটা তুলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে অনাবৃত হয়ে পড়ে পিঠের আধখানা—ছিন্ন কাপড়ের ফাঁকে। সেটা অনুভব কবে সে। তাড়াতাড়ি সেটুকু ঢাকতে গিয়ে ঘোমটাটা নামিয়ে দিতে হয়। বিষ্টুপদের সঙ্গে চোখাচোখি হয় ফলে। অস্বস্তিকর অবস্থা।

বিষ্টুপদ হাসে : আরে আমাকে দেইখ্যা ফির লজ্জা পাও ক্যারে? আমি তো ঘরেরই লুক।

: আসুন, এখানে এসে বসুন।—অনিমেষ আহ্বান করে ওঁকে চৌকিতে এসে বসতে। বিষ্টুপদ কিন্তু এগিয়ে আসে না, দ্বার ছেড়ে। সেখান থেকেই বলে : বৌমারে এক্‌খান শাড়ি কিন্যা দাও সে অনিমেষ। ঘরের লক্ষ্মীকে এক্কেরে উদামগা কইর‍্যা রাখছ, মা লক্ষ্মীতো বেবাক্ অখুশী অইবই!

আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে অনিমেষের। দাঁতে দাঁতে চেপে বলে : ওকে যেতে দিন। দরজা ছেড়ে বসুন এখানে এসে!

এবার বিষ্টুপদকে এগিয়ে আসতে হয়। কামিনী দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হয় ঘর থেকে। যেন কৌরবসভা ত্যাগ করলেন যাজ্ঞসেনী।

: মাস্টারমশয় কই? বাবলুরে দেখিনা?

: বাবা র‍্যাশান আনতে গেছেন। বাবলু বাড়ি নেই। কি বলছিলেন বলুন।

: কইৎ ছিলাম কি বাবা অন্ধ বুড়াটাবে ক্যান পাঠাও ডোল অফিসে? বউডারে না পাঠাও বুইন দুডার একটারেও তো পাঠাইতে পার?

: কেন পারি না তা তো আপনার জানা উচিত মজুমদারবাবু। দু দুবার ডি-ব্লকে শাড়ি বিলি হল অথচ আমাদের বাড়ি বাদ পড়ল। আপনি সেক্রেটারি, আপনার তো ভুলে যাওয়া উচিত নয়?

: কি করুম কও! পাচখান শাড়ি তো পঞ্চাশ জন পরিবার। কারে দিয়া কারে রাখুম কও?

: যাক্ যা বলতে এসেছেন বলুন।

: বাবলুরে আমারেই দাও। দুকানে একডা ভালো ছুকরা খুঁজতাছিলাম। চাইব হারমজাদরে রাখছি—চারডারেই তাড়াইছি। হালারা সব চোর! বুঝলা না বাবা, পিছন ফিরছি কি মুখে ঢুকাইছে খাওন

বলতে বলতে পানের ডিবা থেকে একখিলি প্যান নিয়ে নিজেও মুখে দেন তিনি। তারপর শুরু করেন : বাবলুডা হাজার হউক চোব অইবনা, পণ্ডিতের পোলা, আর যা শিখুক চুরি বিদ্যাটা শিখে নাই—না কি কও?....আরে ক্যা ও নমু? নমুদিদি! আমারে টুক্ চুন দাও সে নমুদিদি!

: আপনাকে তো আগেই বলেছি মজুরদার মশাই। ওকে আমরা লেখাপড়া শেখাব। চাকরি করতে দেবনা।

: আবে দাদু কও তো ভালই—কিন্তু পাবতেছটা কই? কোনও কাজ কামের মধ্যে চুকায়ে দাও বদমাইসিডা কমব। তাছাড়া দু পয়সা রুজগারও হইব সংসারে। পাচডাটাকা মাস মাস তাই বা আসে কুখিক্যা? ঘরের হাল্‌তো দ্যাখতেছ? বুইনগুলার বিয়া দ্যাওন লাগবো। নমুর দিকে তো চক্ষু তুল্যা চাওন যায় না।....আরে এ্যাইযে চুন আনছ দেহি!

নমিতা চুনের পাত্রটা হাতে প্রবেশ করেছে একটু আগেই। বিষ্টুপদ সেটি গ্রহণ করে না। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে নমিতার দিকে। শুকনো ঠোঁটটা জিব দিয়ে একবার চেটে নেয়। নমিতা চুণের পাত্রটা নামিয়ে রেখে চলে যায়।

: হ্যাঁ কি জান্ কইৎছিলাম? নাকি চাওন যায় না। তারপর ধর গিয়া রুজগারের পথ দেখইলেও যদি না লও তোমরা, তখন তো ফ্রি র‍্যাশন মিলব না! টারভেশান তো সবার জুন্যি নয়!

হাসে অনিমেষ—পাণ্ডুর হাসি। বিষ্টুপদ প্যাঁচ কষছে। কলোনিতে যারা বেকার—কোন রোজগারের ব্যবস্থাই যারা করে উঠতে পারেনি, সেই সব দুঃস্থ পরিবারকে স্টারভেশন ডোল দেবার ব্যবস্থা আছে। র‍্যাশান কার্ড বিলি করেন 'আব ও'-সাহেব। তিনি সরকারি কর্মচারি। তবে কে কার্ড পাবে কে পাবে না এটা স্থির করেন তিনি ব্লক-সেক্রেটারিদের মাধ্যমেই। ব্লক-সেক্রেটারিরা কলোনিরই লোক। কিছুটা স্বায়ত্ব-শাসন দেওয়া হয়েছে আর কি। তাই ব্লক-সেক্রেটারি দরখাস্তগুলি নিয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দেন। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বিচার করা হয় কোনও পরিবার ফ্রি র‍্যাশন পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী কিনা। বিষ্টুপদ ইচ্ছা করলে এঁদের ফ্রি র‍্যাশন পাবার অধিকারটুকু কেড়ে নিতে পারে। সেই ইঙ্গিতই যে সে করছে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না অনিমেষের। নিরুদ্ধ আক্রোশে সে ফুলতে থাকে। সে বুঝে নিয়েছে বিষ্টুপদর কারসাজি। অল্প মাহিনায় বিশ্বস্ত একটি ছোকরা চাকর পাওয়ার লোভে এই প্যাঁচ কষছে।

বিষ্টুপদর উদ্দেশ্য কিন্তু আরও গভীর। সে চায় এই পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে। তার শ্বাপদ চক্ষুর দৃষ্টি ফিরছিল ওপাশের ছেঁচা বেড়ার ঘরখানির আশে পাশে। অসংবৃত বসনে যেখানে ঘরকন্নার কাজ করছে কামিনী। ডি-ব্লকের টিউব-ওয়েলটা জয়হিন্দ কেবিনের ঠিক উল্টো দিকেই। চায়ের দোকানে বসেই বিষ্টুপদ লক্ষ্য করে পাড়ার মেয়েদের জল নেওয়া। কামিনীর সঙ্গে কয়েকবার তার দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে। মেয়েটার যে বয়স হয়েছে তা যেন বোঝাই যায় না। বছর চব্বিশ পঁচিশের কম হবে না। এক ছেলের মা। কিন্তু হলে কি হবে, মেয়েটার একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। পাড়ার অনূঢ়া ষোড়শী অষ্টাদশীদের কাউকে দেখতে তো বাকি নেই তার। ডলি, শেফালী, সরমা, নমিতা,—সবাইকেই তো দেখে ওখানে বসে, কিন্তু এক ছেলের মা এই মেয়েটার পাশে দাঁড়াতে পারে কেউ? রঙটা শ্যামবর্ণ নয়, কালোই। তা হক, স্বাস্থ্য কিন্তু তার অটুট। আজ মাসখানেক মেয়েটা জল নিতে আসছে না টিউবল থেকে। বাবলুটাকে দোকানে ঢোকাতে পারলে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। গরজটা বিষ্টুপদর তাই বড় বালাই হয়ে পড়েছে। বাংলা উপন্যাস যথেষ্ট পড়া আছে বিষ্টুপদর। কণ্ঠস্থ আছে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ রসস্থ অনুচ্ছেদ। পরকীয়া প্রেম অসিদ্ধ—হিঁদুঘরের কেউ এ অনাচার সহ্য করবে না! অন্তত বিষ্টুপদর তাই ধারণা।

অনিমেষ ধীরে ধীরে বলে : ও কথাটা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই বিষ্টুবাবু। এ বাড়িতে কেউ উপার্জনক্ষম নেই বলে আমরা স্টারভেশন ডোল পাই। আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের ওটা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন এটা আমার মনে আছে!

: আরে কী কও! সব কথারই তুমি বাঁকা অর্থ লও দেহি। তোমাগো ভালবাসি তাই না টারভেশন ব্যবস্থা কর্‌য়া দিছি।...আরে এ ছিছি চূণ বেশি লইয়া লিছি দেহি। মুখ এক্কেরে পুড্যা গেছে। আরে অ নমু! কই গেল ত্যারা? বৌমা, অ বৌমা!

অসহায় অনিমেষ বজ্র দৃষ্টি মেখে শুয়ে থাকে। ঘরে এসে ঢোকে লতু। বছর পনের বয়স। বাড়ন্ত চেহারা নয়—আজও ফ্রক পরে। চোখে মুখে কথা ফোটে তার। সংসারের কোন কাজে তাকে পাওয়া যাবে না। এসেই বলে : কি হয়েছে দাদুর? চুণে মুখ পুড়েছে বুঝি!

: হ!

লতু খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

: আরে অই! হাস্‌তেছ ক্যান?

: চুণে কি আপনার মুখ পুড়েছে? পুড়েছে অন্য কিছুতে?

: কী কও?

: কই কি যে চুণেও মুখ পোড়ে না—কালিতেও মুখ পোড়ে না এমন কি চূণ কালি একসঙ্গে মুখে পড়লেও অনেক নির্লজ্জের মুখ কিছুতেই পুড়তে চায় না দাদু।

অনিমেষ ধমক দিয়ে ওঠে : কি হচ্ছে—এই লতু!

: তা তুমি রাগ করলে কি হবে। দাদু আমাদের রসিকতা ঠিকই বোঝে—না দাদু? তা জল দেবো? মুখটা ধুয়ে ফেলবে? এখন জলই চাও—চুণ-কালি যা চাও সব জোগাড় দেব আমি! দিদিও আসবে না—বৌদিও না!

: তুই যা বলছি—যা এখান থেকে! ধম্‌কে ওঠে অনিমেষ।—হাস্‌তে হাস্‌তে লতু চলে যায়।

মুখখানা কালি করে বসে থাকে বিষ্টুপদ। তারপর হঠাৎ হেসে সে লঘু করে ব্যাপারটা : আরে লতুর কথা ধর ক্যান্। ত্যাক্কেরে পোলাপান! তা যাউক! কাল থিকা বাবলুরে দুকানে পাঠাইবা তো?

হরিপদ পণ্ডিত ইতিমধ্যে ফিরে এসেছিলেন। সমস্ত শরীরটা তাঁর ভিজে গেছে। বৃষ্টির জলে না ঘামে তা তিনিই জানেন। উত্তেজনায় পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছিলেন তিনি। বিষ্টুপদর প্রস্তাবটা কানে গিয়েছিল তাঁর। তাই উঠান থেকেই বললেন : না!

: না? না—ক্যান?

: কারণ ব্রাহ্মণের ছেলে কোন জন্মে শূদ্রের দোকানে চাকরের কাজ করে না তাই।

: অ ;—বুঝছি। তা বামুন ঠাকুরের ভিক্ষার অন্ন তো মিষ্ট লাগবই। বামুনের ব্যবসাই যে ভিক্ষা। অখন আমার টাহাডা দিয়া দ্যান আমি চইল্যা যাই।

: টাকা? কিসের টাকা?

বিষ্টুপদ পকেট থেকে একটুকরা কাগজ বার করে মেলে ধরে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। এগারো বছরের বাবলুর আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা, "দশটাকা ধার হিসাবে বুঝিয়া পাইলাম। বাবলু।"

প্রথমটা বাক্যস্ফূর্তি হয়না কারও। অনিমেষ সামলে নেয় নিজেকে। বলে : আপনি ছেলেমানুষ নন বিষ্টুবাবু। এগারো বছরের ছেলের যে হাতচিঠি দিয়ে টাকা ধার করার অধিকার নেই—আর নিলেও যে তার জন্য তার বাবা দাদা দায়ী হয় না—এ সহজে কথাটা আপনার জানা উচিত।

: আপনারা টাহা দিবান না?

: না! একবার নয়—একশ'বার না! অনিমেষ উত্তেজিত। হরিপদ নীরব।

: বেশ অখন আর আমারে দুষবান না। আমি আদায় করবাম!

: আদায় করতে পারেন করবেন। গায়ের জামাকাপড় খুলে নিতে পারেন। ধার সে শোধ দেবে কেমন করে?

হাহা করে হাসে বিষ্টুপদ।

: টাহা আদায়ের ফন্দিও কিছু জানা আছে দাদু! উশুলের কথা না ভাইব্যা টাহা দি' নাই! আচ্ছা চলি!

ভিজা ছাতাটা তুলে নিয়ে বিষ্টুপদ রওনা দেয়। দৃঢ় পদক্ষেপ তার। সে পদক্ষেপে টাকা আদায় সম্বন্ধে কোনও সংশয় আছে বলে মনে হয় না। অনিমেষ বিস্মিত হয়। হরিপদের বোধহয় বিস্মিত হবার মতোও মানসিক অবস্থা নেই। বিন্দুবাসিনী বলেন : বাবলু টাকা ধার করেছে? এক-আধ নয় দশটাকা? আজ আসুক ছেলে ঘরে।

কেউ সে কথার জবাব দেয় না।

বিষ্টুপদ ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রড় রাস্তায় পড়বার আগেই কে তাকে ডাকে পিছন থেকে শুনুন!

অনতিদূরে কামিনী! আশ্চর্য! যে মেয়েটা তাকে দেখলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, ভুলেও মুখ তুলে তাকায় না,—সেই আজ তাকে পিছন থেকে ডাকছে! বিষ্টুপদ ফিরে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। একটু পিছিয়ে দাঁড়ায় কামিনী।

: বাবলুকে কিছু বলবেন না—সে আপনার টাকা ফেরত দেবে।

: কি কও! আজ দেড় মাস হয়্যা গেছে এক পয়সা দেয় না—এ্যারে আর বিশ্বাস কি?

: আমি কথা দিচ্ছি। আমি আপনার টাকা শোধ দেব।

: তুমি? তুমি কই পাইবা?

: সে কথা যাক। আপনি কথা দিন বাবলুকে মারধর করবেন না।

হঠাৎ খুশিতে হাসি উথলে ওঠে বিষ্টুপদর সর্পচক্ষুতে। এ ব্যাপার তো আশা করা যায়নি। এ যে গাছে না উঠতেই এককাঁদি! ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে বিষ্টুপদ : এডা কি কও, তুমি দিবা টাহা আর তাই আমি হাত পাইত্যা নিবাম?

কামিনী সতর্ক হয়ে সরে দাঁড়ায়।

: তুমি ভরসা দিলি আর আমার ভয়ডা কি?

কামিনী এবারও নিরুত্তর।

: জল আনবার যাওনা দেহি—ক্যারে?—বিষ্টুপদ একেবারে বিগলিত। কামিনী একটি কঠিন জবাব দেবার আগেই পিছন থেকে ডাক শোনে : বৌমা!

তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ায় বিষ্টুপদ। বিন্দুবাসিনী এগিয়ে আসেন। দ্রুতপদে বিষ্টুপদ গলিটা পার হয়ে যায়। একবারও পিছন ফিরে তাকায় না।

: অনেক সহ্য করেছি বৌমা—অনেক নিচে নেমে গেছি আমরা! শেষ আঘাতটা বোধহয় তোমার হাতেই পাওনা ছিল! ছিঃ!

কামিনী শিউরে ওঠে! এ কী কথা—আর্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে যায় : এ কি বলছেন আপনি! মা, আমি আমি—কথাটা শেষ করতে পারে না।

: ঠিকই বলছি বৌমা। বলবারও আর কিছু নেই তোমার—বুঝবারও বাকি নেই কিছু আমার। কিন্তু এ নিয়ে আর একটা কথা নয়। দ্বিতীয়বার যেন এ দৃশ্য আমাকে না দেখতে হয়।

দ্রুতপদে বিন্দুবাসিনী ফিরে যান বাড়ির দিকে।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কামিনী। মৃন্ময়ী মূর্তি। কিসের থেকে কি হয়ে গেল—যেন বুঝতেই পারেনা।

কথা হচ্ছিল নিতাই কবিরাজের ডাক্তারখানায়।

যোগেন নায়েক বললে : যে যাই বলুক ঠাকুর্দা, আমার মত আর একবার চেষ্টা করে দেখা।

ঠাকুর্দা অর্থাৎ বৃদ্ধ নিতাই কবিরাজ জবাব দেন না। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে টুলের উপর উবু হয়ে বসে নিমীলিত লোচনে বিড়ি টেনে চলেন। জবাব দেয় প্রমোদ পাল। বলে : কি ভাবে চেষ্টা করতে চাও তুমি?

: সেই সনাতন পদ্ধতিতে। চল সবাই মিলে গিয়ে দরবার করি ডি.এম্. এর সাথে। হয় কাজ দাও, নয় ডোল দাও—নয় ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে শেষ করে দাও আমাদের। তোমারও বাঁচ, আমরাও বাঁচি।

ভূষণ বলে : এ গান তো গাওয়া হয়ে গেছে বাবা। বারবার একটি কেওন কি ভালো লাগবে ওঁদের?

: তা ছাড়া আর কি করা যায় বল? আমরা কি সখ করে এককথা বারবার বলি? সেবার বলেছিলাম, ওঁরা কায়দা করে ফিরিয়ে দিলেন আমাদের। মনে ভাবলাম—বুঝি ব্যবস্থা হয়ে গেল। ফিরে এসে দেখি যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। তাই আবার একই সুরে গাওনা শুরু করতে চাইছি।

বিড়িটাতে একটা অন্তিম টান দিয়ে সেটা বাইরে ফেলে দেন ঠাকুর্দা। গুছিয়ে বসে বলেন : ব্যাপারটা তলিয়ে দেখ যোগেন। সেবার আমরা সবাই এক রা কেটেছিলাম। বুড়ো বাচ্ছা মায় ঘরের বউ পর্যন্ত গলা মিলিয়ে হেঁকে ছিল কাজ দাও বলে। এবার আমাদের দল ভেঙে গেছে! সেবার যারা আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবার তারাই দাঁড়িয়েছে আমাদের বাধা হয়ে। কলোনিরই লোক তারা এবং বেশ ক্ষমতাশালী। তারা আমাদের বিপক্ষে যাবে।

প্রমোদ বলে : ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল! সত্যিই এবার আমরা কিছুতেই এক হতে পারব না।

ঠাকুরদা বলেন · আর তাছাড়া মনে করে দেখ সেবারকার কষ্টটা। এবার অনেকেই যা হক করে খাচ্ছে। তারা কেন সে কষ্ট সহ্য করতে যাবে? কষ্টটাও তো কম নয়? বলি সেবারকার কথা ভুলে গেলে নাকি সব? কি হে যোগেন, মনে পড়ে? ভূষণ?

লোকগুলি জবাব দেয় না। দেবার প্রয়োজনও বোধ করে না। সেদিনের স্মৃতি কি ভুলবার? না কি মুখে স্বীকার না করলেই মুছে যাবে সেদিনের স্মৃতি মন থেকে।

বছর পাঁচেক আগেকার কথা।

কলোনিতে তখন নতুন এসে বসেছে উদ্বাস্তুরা। পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি ক্যাম্পের নরকবাস যখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল তখন এই লোকগুলো স্বপ্ন দেখত পুনর্বাসনের। পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি ক্যাম্পে এদের কোন মানবিক সংজ্ঞা ছিলনা। সেখানে তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল মিলিটারীদের তৈরি বড় বড় গুদাম ঘরে। সেখানে থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এরা। সেখানে ওদের না ছিল কোন সামাজিক বন্ধন, না মানবিক মর্যাদা। শেয়ালদ' হাওড়া স্টেশনের জনপ্রবাহের মধ্যে মাদুরটিকে উঁচু করে ধরে ছেলে কোলে বসে থাকতো ওরা। কখনও রাত কাটতো গাছের তলায়, কখনও দেড় হাত উঁচু তাঁবুর মধ্যে। লরি বোঝাই করে হয়তো নিয়ে গিয়ে তুলতো কোনও পি. এল. ক্যাম্পে। গোলাকৃতি লাহোর সেডের অন্ধকূপে আশ্রয় পেত নতুন করে। সেখানে ওদের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো। মাথার উপর একখানা নিজস্ব চালার জন্য লোকগুলো উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। 'যাবৎ জীবেৎ ডোলং ভক্ষেৎ' এই অপূর্ব ব্যবস্থাটা সকলে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। যারা ওটা মেনে নিতে পারেনি, পারল না তারা মানবজীবনের চরম মোক্ষলাভ করলো সন্দেহ নেই। তারা হয়ে উঠলো দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ। যাকে বলে একেবারে স্থিতপ্রজ্ঞ। রোজগারের ধান্দা নেই, ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, সপ্তাহান্তে ডোলটি নিয়ে এসে বাকি সময় ভগবান অথবা সরকারকে গাল পাড়া। দীর্ঘ পাঁচ সাত বছর যারা এ স্বর্গে বাস করেছে তাদের ইহকাল তো বটেই পরকালটিও বোধকরি ঝরঝরে হয়ে গেল।

কিন্তু ব্যবস্থাটা সকলে মেনে নিতে পারে না। অনেকে বিদ্রোহ করে। তারা চায় পুনর্বাসন। মানুষের মতো বাঁচতে। তারা যখন শুনল যে সরকার পাঁচ কাঠা করে জমি দেবে, বাড়ি করবার জন্য ঋণ দেবে—তখন যেন ওরা হাতে স্বর্গ পেল। মনে হল জীবনে এই একটি মাত্র কাম্য। পায়ের নিচে এক মুঠো নিজস্ব জমি,—যেখানে লাউ-কুমড়ো-শাক-আলু-বিলাতি বেগুন লাগাতে পারবে। মাথার উপর একটা নিজস্ব ছাদ—যেটাকে 'আমার বাড়ি' বলে পরিচয় দেওয়া যাবে। লোকগুলো ছুটে এলো পুনর্বসতির লোভে। বাড়ি তৈরি করার প্রথম ইন্সটলমেণ্ট-ঋণ এলো। কিছুটা খরচ হল অবুঝ পোড়া পেটের চাহিদা মেটাতে—কিছু সত্যিই বাড়ি তৈরি করতে। এমনি ভাবে ক্রমে ক্রমে ওদের প্রায় সকলেই মাথা গোঁজার একটা করে আশ্রয় খাড়া করল। এতদিনে সত্যিই তাহলে হল বাড়ি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা।

এবার দেখা দিল আসল সমস্যা! দশ-পনের-হাজার লোক এসে বসেছে একটি বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে। মাঠ হয়েছে জনপদ—উদয়নগর উদ্বাস্তু কলোনি! কিন্তু রোজগার কই? খাবো কী? বাজারে দোকান দিল কেউ—কিন্তু কিনবে কে? ক্রেতা কই? জংসনের মহাজনের কাছ থেকে ভাড়া খাটবে বলে সাইকেল রিক্সা নিয়ে এলো কেউ—কিন্তু চড়বে কে? সকলেই বলে কাজ দাও ; কাজ নাও বলবার মতো উদ্‌বৃত্ত পয়সা নেই কারও হাতে।

বসে খেলে কুবেরেরও ধন ফুরায়। গৃহ-নির্মাণ ঋণের উদ্‌বৃত্ত অর্থ আর কতটুকু? প্রথমে আবেদন নিবেদন। কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে লাগলেন। পরিকল্পনা করতে সময় লাগবে। 'পরিসংখ্যান' সংগ্রহ করতেই বছর ঘুরে যায়! কিন্তু অভাব, অসুখ আর মৃত্যু তো সময়ের জন্য বসে থাকবে না। মৃত্যু প্রবেশ করল কলোনিতে।

এ ওর মুখের দিকে তাকায়। খাবো কি? রোজগার কই? ধীরে ধীরে গড়া বাড়ি খুলে ফেললে—তিলে তিলে বিক্রিয় হয়ে গেল সব। জানলা দরজা-করোগেটটিন-সিমেন্টেরবোরা-ইঁট।

কর্তৃপক্ষের দাক্ষিণ্যে কতক ফিরে গেল পি এল ক্যাম্পের ভূস্বর্গে। যারা রইল তারা মুখোমুখী দাঁড়ালো অনশন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে। প্রথমে অসুখ। এ বাড়ি ও বাড়ি লোকে জ্বরে পড়লো। যুঝল কিছুদিন কেউ বা—তারপর সরে গেল দুনিয়া থেকে। কাঁদল পরিজনবর্গ অন্নের একজন ভাগীদার কমে যাওয়ার সৌভাগ্য সত্ত্বেও! কর্তৃপক্ষ বিচলিত হলেন। এত অসুখ বিসুখ হচ্ছে কেন? দ্রুতগতিতে এসে পৌঁছাল এক মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট।

ওষুধ দেবে কি? এদের একমাত্র অসুখ অনাহার। পথ্য চাই। ডাক্তার ছিলেন একটু ছিট গ্রস্ত মানুষ। সিবিল সার্জেন জানতে চাইলেন কি কি ওষুধ চাই তার ফর্দ। ডাক্তার জবাব দিলে—সপ্তাহে এক ওয়াগন চাল!

বদলি হয়ে গেল পাগলা ডাক্তার!

সরকারি পরিকল্পনার আগেই মহাকালের স্কীম রূপায়িত হল একের পর এক। এল অভাব, অসুখ, মৃত্যু, মহামারী! গ্রহণের পূর্বে ধূসর বর্ণের ছায়াপাতে যেমন করে ম্লান হয়ে যায় চন্দ্রহাস তেমনি করেই লোকগুলোর নতুন বসতি পাওয়া আনন্দ পূর্ণিমার উপর প্রথমেই হল অনাহার মৃত্যুর কবাল ছায়াপাত। আকাশের বুক থেকে তীক্ষ্ণ চীৎকারে নেমে আসে শকুনের দল। হাতি পোঁতার বিল কলোনির দিকে হাত বাড়ায়। কলোনির কাছে পিঠে নদী নেই। ওটাই শ্মশান!

যে ভগবানের কথা মনে হত দেশে থাকতে দাঙ্গার সময় মধ্যরাত্রে অদূর আকাশ রক্তাভ হয়ে উঠতে দেখলে—যে ভগবানের কথা মনে পড়েছিল পার্টিশানের পর দেশ ছেড়ে রওনা দেবার সময়, যে ভগবানের নাম মনে পড়েছিল শেয়ালদ' স্টেশনে অনাহার মৃত্যুকে মুখোমুখি দেখে—তসেই সাতে-পাঁচে নেই দয়াবতারের কথাই উঠে পড়ে আবার!

: ভগমান! আর কত দূরে তুমি?

: নাই, নাই! ভগমান নাই! থাহক্লেও তুমি কানা—তুমি বোবা!

: ছিঃ! ও কথা কওন নাই বাবা? ভগবান দীনের দয়াল!

: কওন নাই? ক্যান কওন নাই? হাজারবার কইবাম। বারো বিঘা নাবি ধানের জমি আছিল। দু জোড়া গাই! আমার খাওনের অভাব? তোমাগো দীনের দয়াল ক্যান আমার এ দশা করল কও? কী অপরাধ করছিলাম আমি?

ও পক্ষ নির্বাক। সেই শাশ্বত চক্রাবর্তন। সুখের দিনে মনে পড়ে না তাঁকে, মনে পড়ে দুঃখরাত্রে। আর দুর্দশা যখন চরম সীমায় এসে মর্মের মাঝখানে বসিয়ে দেয় তীক্ষ্ণশলাকা তখন জেগে ওঠে মনের কালাপাহাড়—'থাহক্লেও তুমি কানা, তুমি বোবা'।

অসহায় মানুষগুলো জোট বাঁধল। কাজ চাই। অন্ন চাই! সার বেঁধে ওরা চলল সদরে। যুবক-যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা কিশোর-কিশোরী। সন্তানবক্ষা সদ্যজননী—মৃতবৎসা নারী। জেলা সমাহর্তার বাড়ি ঘেরাও করল ওরা।

: কী চাই?

: কী চাই! চাই অন্ন-বস্ত্র-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সংসার-সদ্ধর্ম-আনন্দ। চাই মানুষের মত বাঁচতে। আপাতত চাই কাজ। শ্রমের বিনিময়ে গ্রাসাচ্ছাদন।

একসঙ্গে সবাই চিৎকার করলে কাজ হয় না। দলপতিহীন জনতা তাড়াতাড়ি বেছে নিয়ে পাঠালো পাঁচজনকে ওদের প্রতিনিধি করে। যারা বেশ চালাক-চতুর—দুকথা গুছিয়ে বলতে জানে। গোকুল দাশ, বিষ্টুপদ, নবীন পতিতুণ্ডি—আরও দুজনকে। দীর্ঘ আলোচনা হল। দুদিন, তিন দিন। জনতা বাইরের বাগানে পথের পাশে অপেক্ষা করতে থাকে। শহরের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ বাজাদের দিল দুধ, কেউ জল। স্কুল কলেজের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মুষ্টি ভিক্ষা তুলে এনে দিল। তিন দিন ওরা পড়ে রইল জেলা শাসকের বাড়ির আশে পাশে। সেখানেই একজনের মৃত্যু হল। সে

মৃত্যু মহান। একই কারণে কলোনিতে যারা মরেছে তাদের সঙ্গে সে মৃত্যু যন্ত্রণার বোধকরি কোনও তফাৎ ছিল না ; কিন্তু মৃত্যু দৃশ্যের তফাৎ ছিল। স্থান মাহাত্ম্যে মৃত ব্যক্তি শহীদ হয়ে গেল। জেলা শাসকের ফটকের কাছেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল ভাগ্যবানটি। কেউ বললে অনাহার-জনিত মৃত্যু—কেউ বললে উদরাময়। খবরের কাগজের রিপোর্টারেরা এসে ফটো তুলে নিয়ে গেল। কাগজে বার হল বিস্তারিত বিবরণ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতা এই মৃত্যু সংবাদে ছুটে এলেন। যেন এটি হচ্ছিল না বলেই এতক্ষণ আসরে নামতে পারছিলেন না তাঁরা। ধর্মঘট পরিচালনার দায়িত্ব তাঁরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে চাইলেন। এসে পৌঁছাল কয়েকটি পতাকা আর মাইক। ওরা বলে : অ্যাদ্দিন আছিলেন কই? র'ণ মশয় র'ণ। আমাগো বিচার আমরাই করমু।

এঁরা বললেন : তবে মর বেটারা।

অভিশম্পাত সত্ত্বেও কিন্তু মরল না আর কেউ।

তিনদিন পরে পঞ্চায়েত জানালেন ওদের দাবী সরকার মেনে নিয়েছেন। অবিলম্বে শুরু হবে টেস্ট রিলিফের কাজ। যারা অশক্ত পঙ্গু তাদের ফ্রি স্টারভেশন ডোল দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে।

ওরা বলে : রও রও, ব্যাপারটা বুঝ্যা লই।

এরা বলে : আরে ব্যাপার তো সবই বুঝাইবাম। অখন খাওনের বন্দোবস্ত হৈছে খায়্যা লও।

এরপর আর কথা চলে না। লপ্‌সি প্রস্তুত। চাল ডাল মিশ্রিত খিচুরি। সারি সারি ওরা বসে যায়। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ। ধর্মঘট প্রত্যাহারের শর্তগুলির আলোচনা আপাতত স্থগিত থাকে। অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালগুলোর অনেকেই পরিমাণের অতিরিক্ত আহার করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওরা ফিরে আসে।

শুরু হল টেস্ট-রিলিফের কাজ। মাটি কাটার কাজ। পাঁচটি ব্লকে বিভক্ত করা হল কলোনিকে। এ, বি, সি, ডি, ই। পাঁচজন সেক্রেটারি তার। ওরাই যাদের মনোনয়ন করে পাঠিয়েছিল তারাই। সেই গোকুল-বিষ্টু-নবীন!

ব্লক সেক্রেটারির কাছে দরখাস্ত কর—তিনি রেকমেণ্ড করলে পেতেও পার স্টারভেশন ডোল। ট্রাকে করে বড় বড় ড্রাম এসে পৌঁছাল—গুঁড়ো দুধ ভর্তি তাতে। পীজবোর্ডের গোলাকৃতি আধার। তার গায়ে লেখা আমেরিকার দেশবাসীরা এগুলি উপহার দিচ্ছে ভারতবাসীকে। সে উপহারও কিঞ্চিৎ লাভ করতে পার যদি ব্লক সেক্রেটারিরা অনুগ্রহ করেন। র‍্যাশানের চাল, ধুতি শাড়ি বিতরণ করা হয় এই সেক্রেটারিদের মাধ্যমেই। কিছু লোক কাজ পায় ; কিছু পায় ডোল, ফ্রি র‍্যাশান। গোকুলদাস পায় কয়লার ডিপো খোলার অনুমতি—বিষ্টুর জয়হিন্দ কেবিন মাথা তোলে—নবীন পতিতুন্তি মহাজনী ব্যবসা শুরু করেন। এঁরা মূলধন কোথায় পেলেন সে প্রশ্নটা করবার সাহস হল না কারও।

সেদিনের স্মৃতি কি ভুলবার? নাকি মুখে স্বীকার না করলেই সেদিনের স্মৃতি মুছে যাবে মন থেকে? লোকগুলো নীরবে বসে থাকে।

নিতাই কবিরাজ তাই আবার বলেন : তাই বলছিলাম প্রমোদ, দল বেঁধে যদি দরবার করতে যেতে চাও তবে কী তোমাদের দাবী তা স্পষ্ট করে জানাতে হবে।

: দাবী আর কি? দাবী কাজ। টেস্ট-রিলিফের কাজ তো আজ দু বছর বন্ধ। তা ছাড়া আমরা চাই একটা স্থায়ী ব্যবস্থা। আমরা চেঁচামেচি করব আর ওঁরা দু এক মাসের টেস্ট-রিলিফ করবেন তা চলবে না।

: বুঝলাম। তা স্থায়ী ব্যবস্থাটা কী রকম হবে?

: সেটা আমরা কেন বলব? সরকার বলবে। আমাদের এখানে একটা কারখানা হতে পারে কাপড়ের মিল, চিনির কল, কাগজের কারখানা। কী সম্ভবপর তা সরকারি বিশেষজ্ঞেরা বলুক। তাতেই তিন চার হাজার লোক কাজ পেতে পারে। তাছাড়া ধরুন ঠাকুর্দা, আমাদের মধ্যে ছুতোর আছে—কামার আছে—তাঁতি আছে ; তাদের দিয়ে একটা কোয়াপারেটিভ হতে পারে। আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিক—মজুরী দিক্।

ঠাকুর্দা হাসেন : কিছু মনে করিস না ভূষণ, কিন্তু কোয়াপারেটিভের সেক্রেটারি করবি কাকে? টাকাটা কাকে নাড়াচাড়া করতে দিবি?

: আপনিই বিবেচনা করে বলুন। যাকে সবাই মিলে বিশ্বাস করে দেবে তাকেই। আপনি ভার নিতে চান আপনাকেই দেব। তবে তহবিল তছরূপ হলে আমরা থানা পুলিশ করতে পারব না। স্রেফ মাথা ফাটিয়ে হাতি পোঁতায় পুঁতে দিয়ে আসব।

হাতি পোঁতা কলোনির অদূরবর্তী জলাটা। সেইটাই কলোনীর শ্মশান।

: কিন্তু তোদের হয়ে সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবে কে? সবাই একবাক্যে বলে : তুমি ঠাকুর্দা, তুমি।

নিতাই কবিরাজ আর একটা বিড়ি ধরান : কোন অধিকারে? আমি তো কলোনির পঞ্চায়েতের কেউ নই?

ওরা আবার বলে : আমরা তোমাকে নির্বাচিত করলাম কলোনির পক্ষ থেকে। পঞ্চায়েতকে আমরা মানি না।

ঠাকুর্দা আবার একই প্রশ্ন করেন : কোন অধিকারে?

ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। ঠাকুর্দা বুঝিয়ে বলেন : বাপুহে, গোটা কলোনীর দশ-পনের হাজার লোকের পক্ষ থেকে আমাকে নির্বাচন করার অধিকারটা তোমরা পেলে কোথা থেকে?

ভূষণ রায় অত ঘোরপ্যাঁচ ভালবাসে না। বলে : ওসব বুঝি না ঠাকুর্দা। তাহলে তুমি বল কী করতে হবে?

: আমি বলি, এরকম হঠাৎ কিছু করাটা ঠিক নয়। কথাবার্তা যে বলতে যাবে সে একজন সর্ববাদিসম্মত নেতা হওয়া চাই। সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, যে পাঁচজনকে নিয়ে পঞ্চায়েত গড়া হয়েছে তাদের উপর আমাদের আস্থা নেই।

: আমরাও তো তাই বলছি—তুমি গিয়ে বুঝিয়ে বল'।

: না! আমাকে যদি সবাই পাঠায় তবেই আমি যাব। তোমাদের কথায় নয়। তোমরা বরং প্রত্যেক ব্লকে গিয়ে বলে এস। একটা নির্দিষ্ট দিনে সবাই জমায়েত হক। সেখানে ওদের পাঁচজনকেও নিমন্ত্রণ করব আমরা। আমাদের অভাব অভিযোগ আমরা পেশ করব। ওরা পাঁচজন ইচ্ছা করলে জবাবদিহি করতে পারে। সে সুযোগ দেব আমরা। তারপর সেই সভাতেই আমরা অন্য তিনজনকে মনোনীত করব। তারা তিনজন কর্তৃপক্ষকে গিয়ে জানাবে আমাদের অভাব অভিযোগ। তাহলে আর কারও আপত্তি হতে পারে না।

ভূষণ উৎসাহে ঠাকুরর্দার পায়ের ধুলোই নিয়ে ফেলে, বলে : তবে শুভস্য শীঘ্রং ঠাকুর্দা। আজ বিকালেই সভা হক।

: না, আজ বিষু-দ্-বার, তায় অমাবশ্যা। আজ নয়। রবিবারে, রবিবার বিকাল পাঁচটায়—খেলার মাঠে।

ওরা তাতেই রাজি।

মনে মনে হাসে ভূষণ। ই-ব্লকের ভূষণ রায়। ঠাকুর্দাকে ওরা সবাই মেনে চলে। আর ঠাকুর্দা মেনে চলেন পাঁজির আদেশ, হাঁটি টিক্‌টিকির নির্দেশ! বিংশশতাব্দির জননেতা হবার সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঠাকুর্দা রয়ে গেছেন উনবিংশ শতাব্দির মনোবৃত্তি নিয়ে। ছেলেবেলা থেকেই জেলে জেলে কেটেছে। গঠনমূলক কাজে ছিলেন চিরকাল। মহাত্মাজির একান্ত ভক্ত ছিলেন তিনি। হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, একমাথা রুক্ষ্ম চুল—গায়ে একটা এণ্ডির চাদর, চোখে নিকেলের চশমা। স্কুলে পড়বার সুযোগ পান নি। তবে দীর্ঘদিন রাজবন্দী থাকা অবস্থায় সহবন্দীদের সাহচর্যে পড়াশুনাটা করতে পেরেছিলেন। রাজনীতি-সমাজনীতি! পড়াশুনা করলে কি হবে—পৈত্রিক কবিরাজীতেই তাঁর বিশ্বাস বেশি—অ্যালোপ্যাথির চেয়ে। দশহাজার লোকের নেতৃত্ব দেবার আহ্বান এসে পৌঁচেছে যাঁর কাছে তিনি বিচার

করতে বসেছেন তিথি আব বার! তবু ভূষণ ওঁকেই নেতা বলে মেনে নেয়। মেনে নেয় প্রমোদ, কানাই, যোগেন। ওবা জানে,—পাবলে এই হাঁচি টিকটিকি-অশ্লেষা-মঘা বিড়জিত ঠাকুর্দাই পারবে এই দশ পনের হাজার লোককে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। লোকটাকে সবাই বিশ্বাস করে, ভালবাসে। আর যাই হক মানুষটা খাঁটি। একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি। রাজনীতির ব্যাপারে এমন খাঁটি মানুষ দিয়ে কারবার চালান মুশ্‌কিল। পাকা সোনা দিয়ে যেমন গহনা গড়ানো চলে না—একটু খাদ মেশাতেই হয়—আদ্যন্ত খাঁটি মানুষ দিয়েও তেমনি রাজনীতি চলে না। একটু শঠতার খাদ না মেশালে প্রতিপক্ষকে বাগে আনা যায় না—ভূষণ এটা বিশ্বাস করে। কিন্তু এই দশ পনের হাজার লোকের নেতৃত্ব দেওয়ার মত ক্ষমতাশালী একচ্ছত্র নেতাই বা কোথায় পাওয়া যায়? ভূষণ, কানাই, যোগেন প্রভৃতি নব্যপন্থীরা তাই ঠাকুর্দাব হাতেই তুলে দিতে চায়—সে গুরু দায়িত্ব।

ভোবের আলো সবে ফুটে উঠ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে ভাল করে কিছু দেখা যায় না। অনিমেষ ঘুমাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে গোবাও। সন্তর্পণে দ্বার খুলে বার হয়ে আসে কামিনী। পূব আকাশটা একটু একটু করে ফর্সা হয়ে আসছে। হিম হিম একটা শিরশিরে হাওয়া বইছে। বারান্দার একটা কোণায় কোঁচাব খুঁটে আপাদমস্তক ঢেকে মাদুরের উপর ঘুমাচ্ছে বাবলু। কামিনী লণ্ঠনটা জ্বালে। চলে যায় রান্নাঘরেব দিকে। তালা খুলে ভিতরে ঢোকে। কুলুঙ্গির উপর থেকে একটা টিনের কৌটা বার করে। সেটি বাব করার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় কোন গোপন জিনিস। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। আবার কি মনে করে ফিরে যায়। একটা মুখ ঢাকা হাঁড়ির ভিতর থেকে বার করে গোটা চারেক মোয়া। আঁচলে নিয়ে বেরিয়ে আসে। শিকল তুলে দেয় রান্নাঘরে। তারপর ঠেলে তোলে বাবলুকে।

ঘুমের চোখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বাবলু : দিদিরা উঠেছে?

: না কেউ ওঠেনি। এই নে—টিনের বাক্সটা দেয় ওর হাতে। বাবলু উঠে বসে।

: এগুলোও নিয়ে যা—মোয়াগুলো দেয ওর চাদরে ঢেলে। বলে : একটা সতেরোর লোকাল চলে গেলে খিড়কির দোরে আসিস।

বাবলু হাসে। চুরি করার আনন্দে দুষ্টু ছেলেরা যেভাবে হাসে! এ যেন একটা ভারি মজার খেলা। দুজনে যায় দরজার কাছ পর্যন্ত। খিড়কি খুলে বাব্‌লু বেরিয়ে যায। কামিনী ডাকে : শোন্! চলতি ট্রেনে ওঠানামা করবি না কখনও। আমার মাথার দিব্যি দেওয়া আছে—মানে থাকে যেন। আর শোন, ফেবাব পথে বিষ্টু দোকানীকে গোটাদুই টাকা দিয়ে আসিস্।

বাবলু ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। রাস্তার টিউব-ওয়েলে গিয়ে মুখটা ধুয়ে নেয়। কামিনী ওর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকে।

: বৌদি!

: কে? পিছন ফিরে কামিনী দেখে নমিতা উঠে এসেছে।

: কথা বলছিলে কার সঙ্গে?

বাবলুর মুখ ধোওয়া শেষ হয় না। একছুটে অন্ধকারে মিশিয়ে যায়। কামিনী বলে : কই না তো?

: কই না তো! এই গোটা দুই টাকার কথা কি বলছিলে কাকে! কামিনী ইতস্তত করে বলে তোমরা সবাই দেখি কান শুনতে ধান শোন!

: তা কানই হক আর ধানই হক, কথা বলছিলে তো? কার সঙ্গে? কামিনী ওর কৌতূহল দেখে কৌতুক বোধ করে। বলে : ভূতের সঙ্গে!

গম্ভীর হযে যায় নমিতা।

অচল সংসারটিকে কোন রকমে চালিয়ে নেওয়ার জন্যই এই প্রচেষ্টা কামিনীর। সংসাবেব প্রত্যেকটি লোকেব দৃষ্টি এড়িয়ে গভীর রাত্রে সে চিড়ে ভাজে। চীনাবাদাম মটরভাজা মিশিয়ে পাতলা

টিসু-পেপারে মুড়ে রেখে দেয়। সকালবেলা বাবলু সেগুলি নিয়ে বেরিয়ে যায়। লোকাল ট্রেনের কামরায়-কামরায় ফেরি করে : উদয়নগরের স্পেশাল-ব্র্যাণ্ড সারে-চার-ভাজা। টক্-ঝাল-মিষ্টি-মিষ্টি। এক প্যাকেট এক আনা, তিনটে দু আনা।

কথাটা গোপন থাকে দেবর-বৌদির মধ্যেই। ওরা জানে এটা বাড়ির কেউই অনুমোদন করবে না। কি করে করবে? বাব্‌লু করবে চানাচুর ফেরি? ওর লেখাপড়া হবে না? অসম্ভব। সকালবেলা বাব্‌লু রওনা হয়ে যায়। কামিনী সংসারের কাজে ডুবে যায়। ওর মনটা পিষতে থাকে লোকাল ট্রেনের চাকায়। কর্মব্যস্ত ঘণ্টাগুলোর মধ্যে অবসর পেলেই মনে মনে বলে : ঠাকুর! তুমি ওকে দেখ! ঐটুকু ছেলে! বিপদ আপদে তুমিই রক্ষা কর ঠাকুর।

বেলা বাড়তে থাকে।

বাবলু ওদিকে পৌঁছে যায় তার কর্মস্থলে। ডেলি-প্যাসেঞ্জার ভর্তি লোকাল ট্রেনের কামবা। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে টিসু-পেপারে মোড়া কয়েকটি প্যাকেট হাতে নিয়ে আর অন্য হাতে জানলার গবাদ ধরে ধরে বাবলু চলন্ত কামরার বাইরে দিয়ে এঘর ওঘর করে।

: উদয়নগরের স্পেশাল-ব্র্যাণ্ড সাড়ে-চার-ভাজা। টক্-ঝাল-মিষ্টি-মিষ্টি। বাবলুর এ ব্যবসাও নিরঙ্কুশ নয়। দুরন্ত প্রতিযোগিতা চলে এ ব্যবসায়ে। আরও চার পাঁচ জন হকার ফেরি করে। রোজই তারা বিক্রি করে এই ট্রেনগুলিতে। ওরা বরদাস্ত করতে চায় না এই নবাগত নাবালকটিকে। এরা জানে ডেলি প্যাসেঞ্জারের একটা ক্ষুদ্রতম অংশই কেনে খুচরা পয়সার সওদা চলন্ত ট্রেনের কামরায়। তার জন্যে নতুন ভাগিদার ওরা কিছুতেই মেনে নেবে না।

লোকগুলো কি নির্বিকার! ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিলেও ওদের মনটা দ্রব হয় না। নেড়াদা বক্‌তে থাকে—

. আপনার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। মনে হচ্ছে কে যেন রাগের দুটো পাশ চেপে ধরে আছে। অথবা পেটের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। কিম্বা শরীরের কোন অংশে এমন বেদনা হচ্ছে যে আত্মহত্যা করার ইচ্ছা জাগছে আপনার মনে—এ অবস্থায় আপনি একটি বড়ি জল দিয়ে খেয়ে ফেলুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব শান্ত হয়ে যাবে।

লোকগুলো নির্বিকার ভাবে বসে থাকে। নেড়া থামতেই বাবলু শুরু করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর মাথায় এক প্রচণ্ড চাঁটি মেরে বসে আর একজন হকার। মর্টনের লজেন্স ফিরি করছিল সে। হেঁকে ওঠে : বিখ্যাত মর্টন কোম্পানীর আনারসের লজেন্স!

বাবলু মার খেয়ে হজম করতে চায় না। প্রতিবাদ করে। সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে ওঠে ওপাশ থেকে আরও দুজন হকার। মশলামুড়ি আর হাতকাটা তেল। বাবলু জানে ওরা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধে। তাই যে কামরায় সে ওঠে সেখানেই ভিড় করে ওঠে ওরা কজন। প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাড়াবার মতলব। কত মতলবই আছে ওদের! বাবলুর তো জানতে বাকি নেই কিছু। দুই হকারে মিথ্যা ঝগড়া করে। নিলামের ডাকের মতো ডাকাডাকি করে কমিয়ে দেয় জিনিসের দর। যেন ঝোঁকের মাথায় ভুলে খুব কম দর হেঁকে বসেছে। দুটাকার জিনিস ছয় আনায় বিক্রি হতে দেখলে গ্রাম্য প্যাসেঞ্জার লোভে পড়ে কিনে ফেলে সে মাল। বাবলু নেমে যায় পরের স্টেশনে। ওঠে গিয়ে পাশের কামরাটায়। হাতকাটা-তেল কি একটা ঈঙ্গিত করে মশলা-মুড়িকে। মশলা-মুড়িরও বয়স অল্প। বাবলুর চেয়ে বছর খানেক বড় হবে। কলোনিরই ছেলে। ওরা হাসে দুজনে। তারাও নামে সেই স্টেশনে। ওঠে গিয়ে পাশের কামরায়। বাবলু সেখানে সবে হাঁকতে শুরু করেছিল। থামিয়ে দেয় মর্টন লজেন্স।

বাবলু বলে : বারে! আমি যে কামরায় যাব—তোমরাও সেখানে উঠ্‌বে।

চুপ বে! বেশি চেল্লালে দেব ঠেলে লাইনের তলায়।

সত্যিই ছোট-খাট একটা ধাক্কা দেয় সে। বাবলুর হাত থেকে পড়ে যায় মোয়া কটা।

একজন বৃদ্ধ যাত্রী বাবলুকে সমর্থন করে বলেন : তা বাপু তোমরা ওকে এরকম কেন কর বলত? আমি তো বোজই এই লোকালে কলকাতা যাই, আর পাঁচটা পঞ্চাশে ফিরি—রোজই দেখি ছেলেটিকে তোমরা উত্যক্ত কর।

মর্টন লজেন্স বলে : ওর লাইসেন্স নেই স্যার। টিকিটও নেই। ঐ দেখুন রেল কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়েছে বিনা টিকিটে ভ্রমণ বন্ধ করুন।

বৃদ্ধ ডেলি প্যাসেঞ্জার বলেন : তোমার লাইসেন্স আছে?

: আলবৎ!

: কই দেখি?

: কী আপদ স্যার! এ আবার কী রসিকতা। বললাম লাইসেন্স আছে ; তা নয় ক'ই দেখি! এ রকম তো নিয়ম নয় স্যার। আপনি তো রোজই এই ট্রেনে শ্যালদ' যান আর পাঁচটা পঞ্চান্নে ফেরেন। গেটে রোজই দেখি বুক পকেটে হাত চেপে ধরে.বলেন মান্থলি। গেট-কীপার কোনদিন বলে কি—কই দেখি?

ভদ্রলোক পাশের সহযাত্রীকে বলেন—কথায় এদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠ্‌বেন না মশাই!

বাবলু বিষণ্ণ মুখে নেমে যায়।

গাড়ি থেমেছে পরের স্টেশনে।

এদিকেও বেলা বাড়তে থাকে। নমিতা রান্নাঘরের কাজ করে চলে। মুখ তার গম্ভীর। কামিনী গোরাকে তেল মাখাচ্ছে। নাচতে নাচতে ঢুকলো লতু। হাতে তার একখানা চিঠি। নমিতা ডাকে : লতু এদিকে আয় কোথায় বেরিয়েছিলি সাত সকালে?

: বারে! আমি তো এখানেই ছিলাম!

: এখানেই ছিলি! তখন থেকে যে ডাকছি—মশলাটা বেটে দিতে।

: ও লঙ্কা বাপু আমি বাটতে পারি না। বড় হাত জ্বালা করে।

কামিনী বলে : আমি দিচ্ছি ঠাকুরঝি।

: না থাক্। আমিই করে নিচ্ছি।

নমিতা সরিয়ে দেয় কামিনীকে। ওকে যেন সহ্য করতে পারছে না সে। কামিনী মৃদু আ জানায় : থাক্ কেন ঠাকুরঝি? দিচ্ছি বেটে আমি—

: আর জ্বালিও না বৌদি। ছেলেকে তোয়াজ করছ তাই কর। আমারই হয়েছে যত খোয়াড়। স থেকে পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, জিজ্ঞাসা করলাম—তো বলে এখানেই ছিলাম। সবই ভূতুড়ে ব সবাই ভূতের সঙ্গে কথা বলে এ বাড়িতে।

কামিনী আর কিছু বলে না।

লতু কাছে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে : দিদি?

নমিতা বিরক্ত হয়ে বলে : আঃ কি হচ্ছে?

: তুই কাকে চিঠি লিখেছিলি রে?

: কী?

: কাকে তুই চিঠি লিখেছিলি রে দিদি?

: চিঠি লিখেছিলাম? কাকে? কই না তো?

: কই না তো? আমি যে দেখলাম—চোখে চশমা, দোহারা চেহারা, মাথায় কোঁকড়ানো চুল—তুই তাকে চিঠি লিখছিলি?

নমিতা রেগে ওঠে—কি বক্‌ছিস পাগলের মত? নভেল পড়ে পড়ে কি তোর মাথা একেবারে খাওয়া হয়ে গেছে? শুধু পাড়ায় পাড়ায় বকাটে মেয়েদের সঙ্গে মিশে—

: বেশ কাউকে লিখিসনি তো? এটা তবে কী? কে জবাব দিল? লতু একখানা বন্ধ খাম বার করে দেখায়। পড়ে : শ্রীনমিতা চক্রবর্তী, C/o, শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী, প্লট ১১০৭, ডি-ব্লক, উদয় নগর!

নমিতা উঠে আসে বিস্মিত হয়ে। লতু লুকিয়ে ফেলে চিঠিখানা।

: তুমি ডুবে ডুবে জল খাও বলে—মনে ভাবো আমরা কিছুই বুঝি না?

নমিতা এক ধমক দিয়ে চিঠিখানা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়। কামিনীও কৌতূহলী হয়ে ঘনিয়ে আসে। নমিতা সকলের সামনেই খোলে চিঠিখানা। ইংরাজি টাইপ করা চিঠি। মনে মনে পড়ে যায়। মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওর।

কামিনী প্রশ্ন না করে পারে না : কার চিঠি ঠাকুরঝি?

নমিতা চল্‌তে শুরু করেছিল। হঠাৎ ঘুরে বলে : ভূতের চিঠি নয় বৌদি!

কামিনী দ্বারের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। নমিতা এসে পৌঁছায় অনিমেষের কাছে। রোগজীর্ণ অনিমেষের মাথার কাছে বসে বৃদ্ধ হরিপদ ওর জ্বরতপ্ত কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

নমিতা বলে : বাবা, স্কুল অথরিটি আমাকেই সিলেক্ট করেছে। অবিলম্বে জয়েন করতে বলেছে!

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অন্ধের মুখ। যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করেন তিনি।

রাত দশটা বেজে গেছে। কোরোসিন সাশ্রয়ের জন্য সবাই সন্ধ্যারাত্রেই খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে নিয়ে দোরে খিল দেয়। কলোনি ঘুমাচ্ছে। দূরে দূরে এক আধটা বাতি জ্বলছে এখানে ওখানে। সন্ধ্যা থেকে বর্ষা নেমেছে। চারিদিকেই জমেছে কাদা। টেস্ট-রিলিফের কাজে রাস্তাগুলোয় শুধু মাটি ফেলাই হয়েছিল। জলনিকাশের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। এক এক জায়গায় এক হাঁটু কাদা জমে যায় বর্ষাকালে। টিপ্ টিপ্ করে ইল্‌সেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছেই। ব্যাঙ ডেকে চলেছে একটানা। সভ্য জগতের সঙ্গে এদের সম্পর্ক শুধু রেলগাড়ির যাতায়াত। স্টেশন কলোনি থেকে দূরে নয়। বস্তুত কলোনির একান্ত দিয়ে রেল লাইনটা চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। নিয়মিত গাড়ি এসে দাঁড়ায়—স্টেশনের কল-কোলাহল ভেসে আসে কলোনিতে। ওরা টের পায় সভ্য জগতের সঙ্গে ওদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। ওদের দিনগুলো ঘণ্টার হিসাবে ভাগ করা নয়। ট্রেন-টাইমিং-এ ভাগ করা। লৌহ-শকটগুলোই ওদের ঘড়ি। কেউ জিজ্ঞাসা করে না, কটা বেজেছে? বলে, একটা সতেরো চলে গেছে?

ছ্যাঁচা বেড়ার রান্নাঘরে বসে কামিনী একরাশ চিড়ে ভাজছিল। বাড়িসুদ্ধ সবাই ঘুমাচ্ছে। বাড়ির একটা ছেলে যে এখনও ফেরেনি সে বিষয়ে যেন কারও কোনও দুশ্চিন্তা নেই। থাকবে কেন? নিয়মিত যে ছেলে সন্ধ্যা হতেই বাড়ি ফেরে—রাত হলে তার জন্যই ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক ; আর যে ছেলের গৃহ প্রত্যাগমনের সময়ই হচ্ছে মধ্যরাত্র তার জন্য ভেবে লাভ কি? হোক সে বালক! কামিনী কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না। দায়িত্বটা তারই। সেই ওকে পাঠায় এ দুরূহ কাজে। তাছাড়া এই সময়েই ও চানাচুর ভেজে রাখে।

ঘরে কয়েকটা মাটির পাত্র। খুঁজলে এক আধখানা কলাইয়ের অথবা অ্যালুমিনিয়ামের তৈজসও মিলতে পারে। উনানেরও পাশে কাঠগুলো গাদা দিয়ে সাজানো। উনানের আগুনে যতটা শুকিয়ে যায়। কামিনীর মুখের একপাশ উনানের উত্তাপে রক্তাভ। ফেলে আসা জীবনের কথাই বুঝি ভাবছে বসে ও। বধূ হয়ে যখন সে প্রথম আসে চক্রবর্তীর উচ্ছল সংসারে তখন নববধূটির কী সমাদর! কি আনন্দের ছিল সেই দিনগুলো। লতু তখন ছেলেমানুষ। নমিতা কিন্তু ওর সমবয়সী। নববিবাহিতের গোপন-জীবন সম্বন্ধে তার কত কৌতূহল। নমিতার বিবাহও স্থির হয়েছিল। অনিমেষের বিয়ের সঙ্গে একসঙ্গেই হওয়ার কথা ছিল। বিয়ের তারিখের কিছুদিন আগে ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই অনিমেষের বিয়েটাই হল সেবার। তারপর কিন্তু নমিতার বিয়ে দেওয়া ঘটে উঠল না। কত পাত্রপক্ষ এসে দেখে গেল। কতদূর অগ্রসর হয়েও ভেঙ্গে গেছে সম্বন্ধ। কামিনীর ভারি দুঃখ হত। কেন হয় না নমিতার

বিয়ে? লেখাপড়া জানা সুন্দরী, সদ্বংশজাত কুমারী কন্যা। কেন তার বিয়ে হচ্ছে না? তারপরেই হল বঙ্গ-বিভাগ।

চলে এল ওরা এপারে। পি. এল. ক্যাম্পে থাকার সময় কবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন হরিপদ মাস্টার। তখন দৃষ্টিহীন হয়েছেন তিনি। ক্যাম্পেরই একটি ছেলে রাজি হয় নমিতাকে দেখে। ছেলেটিব না ছিল রূপ না গুণ। বিড়ির দোকান ছিল তার একটা। গলায় একটা সিল্কের রুমাল বেঁধে কোথা থেকে জোগাড় করা মাডগার্ডহীন উল্টো-হাতল একটা রেসিং সাইকেল চড়ে চক্কড় দিয়ে বেড়াতো সারা ক্যাম্পটা। গান গাইত—আধুনিক হিন্দি সিনেমাসঙ্গীত। ব্রাহ্মণের ছেলে বলে মনেই হত না। হরিপদ চুপ করে রইলেন। অনিমেষ নিয়ে এল পাত্রকে। নমিতাকে যাচাই করে নিল সে দেখতে এসে। পছন্দ হয়ে গেল তার। নগদ পাঁচশ টাকা বরপণ পেলে সে রাজি আছে পণ্ডিতকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করতে। হরিপদ অর্থনৈতিক অজুহাত তুলে আপত্তি জানালেন। অনিমেষ কিন্তু উঠে পড়ে লেগেছিল বোনের বিবাহ ব্যাপারে। অনেক ধরাধরি করে সে জোগাড় করলে একটা ম্যারেজ গ্রাণ্ট। অনাথা উদ্বাস্তু মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্য সরকার অর্থ সাহায্য করেন ক্ষেত্র বিশেষে। পাত্র বরপণের টাকাটা আগাম চাইল। রাজি হল না অনিমেষ। মাত্র দু'শ টাকা সে দিল আগাম খরচ বাবদ। ঐ টাকাটা নিয়েই সে পালাল। বিড়ির দোকান সে আগেই বিক্রি করেছিল।

তারপর থেকে হরিপদ আর চেষ্টা করেননি। অনিমেষ চেষ্টা করছিল জানতে পেরে নমিতা এসে প্রতিবাদ করে। বিয়ে সে করবে না। অন্ধ বাপের সেবায় সে কাটিয়ে দেবে জীবন। হরিপদ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেন—বৃদ্ধের জীবনের চেয়ে নমিতার জীবনের বিস্তারটা বড়। বৃদ্ধের অবর্তমানেও নমিতাকে দুনিয়াদারী করতে হবে। নমিতা কিন্তু অটল। বয়স হয়েছে তার। তার কথারও দাম দিতে হয়। সে দৃঢ় আপত্তি জানালো যখন তখন চুপ করে যেতে হল অনিমেষকেও। মনকে সে বোঝাল বোনের বিবাহ তো সে ব্যবস্থা করতে পারতই শুধু—নমিতা রাজি নয় যে।

তাই নমিতার প্রতি একটা গোপন মমতা ছিল কামিনীর। আহা বেচারী জানতেই পারল না কি মধুময় এ জীবন! নমিতা রূঢ় কথা বললেও সহ্য করে যেত কামিনী, যতটা পারে। পুরনো দিনের কথাতেই একেবারে বিভোর হয়ে যায় সে।

খুট করে শব্দ হয় বাইরে। চম্‌কে ওঠে কামিনী।

: বৌদি আমি!

কামিনী তাড়াতাড়ি ঝাঁপটা সরিয়ে দেয়। ঘরে ঢোকে বাবলু। জলে ভিজে হি হি করে কাঁপছে সে শীতে। কামিনী ওকে জড়িয়ে ধরে। ঝাঁপটা টেনে বাবলুকে এনে বসায় উনানের পাড়ে। সযত্নে মুছে নেয় ওব ঝাঁকড়া চুলগুলো আঁচল দিয়ে।

: এত রাত করে? ইস্ একেবারে ভিজে গেছিস যে! ছি ছি; না বাপু আর তোকে পাঠাব না এ কাজে।

: আরে দূর। এটুকু ভিজলে কি হয়? কিন্তু বৌদি, প্যাকেটগুলো বোধ হয় সব নষ্ট হল।

উনুনের উত্তাপে বাবলু একটু সামলে নিয়েছে। হাতের ব্যাগটা উবুড় করে ঢালে মেজেতে। কামিনী গুনে গুনে তুলতে থাকে। হাফপ্যান্টের পকেট থেকে খুচরা পয়সা বার করে দেয় বাবলু। কামিনী প্রশ্ন করে : আজ দুপুরে খেতে এলিয়ে যে বড়?

: সে অনেক কথা।

কামিনীর গোনা শেষ হয়। খুচরা পয়সার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বলে : মাত্র পাঁচ প্যাকেট চানাচুব খেয়ে আছিস সারাদিন? পাঁচ প্যাকেটের দাম কম দেখছি?

: আবে দূর, আমি চানাচুর খাব কোন দুঃখে? ময়রাতে কি সন্দেশ খায়? বন্ধুদের খাইয়েছি। আজ ওদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল যে।

: কাদের সঙ্গে?

: আর যারা ফেরি করে। মর্টন দা, হাতকাটা তেল দা, মসলামুড়ি আর মিঠাবাংলা দা।

· মিঠাবাংলাদা কি রে? তোর বন্ধুর নাম?

: দূর, নাম হবে কেন? আমরা ঐ বলে ডাকি? ওরা আমাকে ডাকে সাড়ে-চার-ভাজা বলে।

: তা ভাল ; কিন্তু তুই যে বড় খেতে এলি না? এমনি করলে কিন্তু কাল থেকে যেতে দেব না।

বাবলু প্রতিবাদ করে : বারে, তুমি যে মোয়া দিলে সঙ্গে?

: তা হোক, রোজ দুপুরে খেতে আসতে হবে।

: তা আসব না হয়, এখন খেতে দাও দিকি। পেটের মধ্যে শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

: দিচ্ছি, দাঁড়া আগে তোর প্যাণ্টটা ছাড়াই।

কামিনী উঠে যায় ওঘর থেকে বাবলুর একটা প্যাণ্ট আনতে। বাবলু উনানের ধারে বসে হাত পা-গুলো সেঁকে নেয়। আজ তার মনে স্ফূর্তির জোয়ার এসেছে। ব্যবসার বাজারে যারা ছিল তার প্রতিযোগী তাদের সঙ্গে সন্ধি হয়ে গেল ; ব্যবসায়ী হিসাবে বাবলুর কাছে আজকের দিনটা স্মরণীয়। একটু পরে কামিনী ফিরে আসে তার একখানা সায়া হাতে কবে , বলে : তোর প্যাণ্ট এখনও শুকায় নি। এখানাই পর।

: দূর! প্রতিবাদ করে বাবলু—ও কি পুরুষ মানুষে পরে নাকি? আমার লজ্জা করে না বুঝি।

কামিনী হাসি লুকিয়ে বলে—নে, আর পাগলামি করিস না। এটাই পরে খেয়ে নে। বাহাদুরী দেখাতে হবে না।

ঝাঁকড়া মাথা নেড়ে বাবলু দৃঢ় স্বরে বলে : না, ও আমি কিছুতেই পরব না।

: বাবলু!!

কামিনীর ঐ একটি আহ্বানে নিখাদে নেমে আসে বাবলুর কণ্ঠস্বর : বা—রে তোমার সব তাতেই ধমক। আজকে কেমন মজা হল তা শুনবে না—সারাদিন পর বাড়ি ফিরলাম,—তা কেবল ধমকই দিচ্ছ।

বলে বটে, তবে হাতটাও বাড়ায়। বৌদির দিকে পিছন ফিরে ভিজে প্যাণ্টটা ছেড়ে শায়াটা পরে। তারপর পিঁড়িতে এসে বসে। কামিনীর সঙ্গে চোখাচোখী হতেই ফিক্ করে হেসে ফেলে কামিনী। ভাতের থালাটা এগিয়ে দিতে দিতে বলে : এই তো লক্ষ্মী মেয়ে,—থুড়ি ছেলে!

লাফ্ দিয়ে উঠে পড়ে বাবলু। কামিনী চট করে ধরে ফেলে তাকে : কি হল?

: দূর, শুধু এই পরে থাকা যায় নাকি!

: কেন? লজ্জা করে?

: করে না?

. শুধু এইটা পরে লজ্জা করছে তা বল্লেই হয় বাপু। তা দিচ্ছি এনে...

: কী?

: আর বাকি সবগুলো, যা চাইছ। শাড়ি, ব্লাউজ, বডিস...

এবার বাবলুকে ধরে রাখা সত্যিই শক্ত হয় কামিনীর পক্ষে। কিন্তু হাতটা সে ছাড়ে না। জোর করে কাছে টেনে নেয়। ওর ডান হাতটা এঁটো, বাঁ হাতে আঁচল দিয়ে ভিজে মাথাটা আর একবার মুছে নিয়ে মিষ্টি করে বলে : আমার কাছে আবার লজ্জা কিরে? তোকে যে এইটুকু বেলা থেকে মানুষ করলাম। গোরা কি আমার কাছে লজ্জা পায়? লক্ষ্মী ভাইটি আমার, রাগ করিস না। আচ্ছা আয়, তোকে খাইয়ে দেই।

বাবলু বোধ হয় একটু নরম হয়। আর প্রতিবাদ করে না। খেতে বসে। ভাতের গরাস পাকিয়ে বাবলুর মুখে তুলে দিয়ে কামিনী ডাকে : বাবলু।

: উঁ?

: আমি ভাবছিলাম, এবার তোর ব্যবসার কথা বাবাকে বলি,—কেমন?

: ওরে বাস্‌রে, অমন কাজও কর না বৌদি। তাহলেই আমাদের ব্যবসার গণেশ উল্টোবে। বাবা কিছুতেই আমাকে বিক্রি করতে দেবে না। তা কি হয়। বাবলু হবে চানাচুরওয়ালা! ওর লেখাপড়া হবে না? ও পণ্ডিত হবে না।

কামিনী ওর নকল করা কণ্ঠস্বরে হেসে ফেলে। তবু বলে : কিন্তু কথাটা তো মিথ্যে নয়। হ্যাঁরে, সত্যিই লেখাপড়া শেখা হবে না তোর?

: ছেলেমানুষের মতো কথা বল না বৌদি। লেখাপড়া শিখে মানুষও হতে কি আমারই অসাধ? কিন্তু কি করবে বল? সংসারটা তো চালাতে হবে? এতগুলো লোককে তুমি কি খেতে দেবে যদি আমরা ব্যবসাটা বন্ধ করে দেই?

: বন্ধ করতে তো বলছি না আমি। কিন্তু সকলকে লুকিয়ে এ কাজটা করা কি ঠিক হচ্ছে?

: কেন নয়? ওরা সবাই সমান। দাদা-দিদি-মা সব সব। জানতে পারলে এখনি সবাই উপদেশ দিতে ছুটে আসবে। বাবলু শুধু লেখাপড়া করবে, আর কিছু নয়!

কথাটা কামিনীরও অজানা নয়। এই জন্যই এতদিন সাহস করে বলতে পারেনি কাউকে। বাবলুর আশঙ্কা মিথ্যা নয় ; কিন্তু তবু সকলকে না জানিয়ে এই যৌথ ব্যবসাটা চালানোর সমস্ত দায়িত্ব সে একা নিতেও চায় না আর। একটু ইতস্ততঃ করে তাই বলে : কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না বাবলু!

: কেন তোমার আবার কী হল?

: তুই এই সংসারের জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছিস্ অথচ ওঁরা মনে করেন—তুই বুঝি আড্ডা মেরে বেড়াস্ সারাদিন। সব সময় সবাই তোকে গালাগালি দেয়। শুনলে আমার কষ্ট হয় না?

ভাতের দলাটা তাড়াতাড়ি গিলে নিয়ে বাবলু হেসে ওঠে : আরে দূর। ওদের ওসব ছেলেমানুষী কথায় কান দিতে গেলে চলে?

হাসে কামিনীও, বলে : তোর ধারণা, তুই ছাড়া এ বাড়িতে সবাই ছেলেমানুষ, না রে?

বাবলু কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। কামিনী প্রসঙ্গটা বদলে নেয়। বলে : তা হ্যাঁরে, আজ তোদের রেলের কামরায় কী হয়েছে বলবি বলছিলি যে তখন। কি হয়েছে আজ?

আজ কি হয়েছে? আজ যা হয়েছে তাতে বাবলু হাতে স্বর্গ পেয়েছে। আর সেই কথাটাই বিস্তারিত করে বলবার জন্য ওর অন্তরাত্মা ছট্‌ফট্ করছিল এতক্ষণ। সবার দৃষ্টির আড়ালে দেবর-বৌদির এই যে যৌথ ব্যবসা এর বিরুদ্ধে বাধা আছে অনেক। বাবলুর মতে বাধা তিনটি, প্রথমত মূলধন, দ্বিতীয়ত : ব্যাপারটার গোপনীয়তা। কিন্তু এ ছাড়াও ব্যবসাটার আর একটা বড় বাধা ছিল। সেটা উৎপাদন ক্ষেত্র নয়—বিক্রয়-কেন্দ্রে। সেটা হচ্ছে সমব্যবসায়ীদের প্রতিকূলতা। এই সুদর্শন বালকটিকে স্টেশনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ওরা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসেছিল প্রথম দিন। মশলামুড়ি, মর্টন আব হাতকাটা তেল। কাকের বাসায় কোকিল শাবককে দেখে যেমন করে এগিয়ে আসে বায়সকুল। তারপর যেই বোঝা গেল আগন্তুক ছেলেটিও ফেরি করতে চায় তখন উপমাটার পুরা তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য হয়ে ওঠে। বায়সঞ্চুর তাড়নায় জর্জরিত বাবলু এ কয়দিন শুধু এ কামরা ও কামরাই করেছে। আজ দুপুরেও তার অবস্থা কাহিল হয়ে উঠেছিল। ভাবলেও বুকটা ঢিপ ঢিপ করে এখনও।

তখনও মেঘলা করেনি। প্রচণ্ড রৌদ্রে স্টেশন প্ল্যাটফর্মটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। মাঠের মধ্যে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে উত্তাপ। ঝিম্ ঝিম্ করছে সারা স্টেশন। ওভার ব্রীজের নিচে লোহার কাঠামোর একটা টি আয়রণের উপর বসেছিল বাবলু বিষণ্ণ হয়ে। সারা সকালে মাত্র এক প্যাকেট বিক্রি হয়েছে তার। করবে কি করে? যখন যেখানে সে গিয়ে দাঁড়ায় তার উদয়নগরের স্পেশাল ব্র্যাণ্ড চানাচুরের বাণ্ডিল নিয়ে, সেখানেই দেখা দেয় ওরা। বাধা দেয় নানাভাবে। উত্যক্ত করে। বাবলু লক্ষ্য করে ওব

দিকে এগিয়ে আসছে মশলামুড়ি, হাতকাটা তেল, তানসেনগুলি আর মর্টন।

মর্টন বলে : কি বে? হকারি করার সখ মিটল?

বাবলু চুপ করে থাকে। জানে, কথা বললেই ওরা আরও পিছনে লাগবে। হাতকাটা তেল বলে : আর কেন বাওয়া! এ লাইনটা ছাড়ো না চাঁদু!

তানসেনগুলি ওর খুতনিটা নেড়ে দিয়ে ফোড়ন কাটে : যা বে বাড়ি যা। মায়ের আঁচলের তলায় বসে লালটুকটুক্ রাজকন্যের গপ্প শোন গে!

হো হো করে হেসে ওঠে সবাই।

আর সহ্য হয় না বাবলুর। উঠে দাঁড়ায়, বলে : কেন তোমরা এমন করছ বলত? আমি কি করেছি তোমাদের?

: কী করেছ? পাকাধানে মই দিতে এসেছ দাদু। শোন্ বে, এ লাইনে আর আমরা হকার বাড়াতে দেব না। এমনিতেই শ্লা যত মক্ষিচুষ ডেলি-প্যাসেঞ্জারের লাইন।

সগর্জনে সবুজ রঙের পাকিস্তান মেল প্রবেশ করে প্ল্যাটফর্মে।

মর্টন বলে : চল্ চল্। বাবলুর দিকে ঘুরে বলে : কি বে খোকাবাবু? তুইও আসবি নাকি? দেবো ঠেলে ফেলে ঐ লাইনের তলায়?

ওরা এগিয়ে যায়। বাবলু সাহস পায় না। ধীরে ধীরে সে চলে যায় ইঞ্জিনের দিকে। ইঞ্জিন! ঐ যন্ত্রটা চিরদিনই আকর্ষণ করে বাবলুকে। কী আছে ওর লৌহকন্দরে? কেমন করে টেনে নিয়ে চলে এতবড় লোক বোঝাই এই বিরাট রেলগাড়িটাকে? ঝক্ঝক করে তামার পাইপগুলো। নীল পোশাক পরা একটা লোক কালো রঙের একটা তেল লাগায়। তারপর একটা হাতুড়ি দিয়ে অহেতুক ভাবে প্রত্যেক গাড়ির চাকায় একবার করে পিটিয়ে চলে যায়। অবাক বিস্ময়ে বাবলু ইঞ্জিনের কলকব্জাগুলি দেখতে থাকে।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার ওকে ডাকে। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসে বাবলু। ড্রাইভার ওর থলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে : কেৎনা করকে? বাবলু ইংরাজি করে জবাব দেয় : ওয়ান অ্যানা স্যার!

: টু পাইস?

: নো স্যার!

কপট ধমক লাগায় ড্রাইভার! বাবলু চমকে পিছিয়ে যায়। ড্রাইভার কৌতুক বোধ করে। বয়লারের ঢালাটা খুলে বলে...দু পয়সায় না দিলে ফেলে দেবে ওর ভিতর।

বাবলু তিন লাফে সড়ে পড়ে!

হা হা করে হাসে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার!

এগিয়ে আসে মশলামুড়ি।

ড্রাইভার তাকেও ডাকে : হাউমাচ্ এ প্যাকেট?

: এক আনা স্যার!

: টু পাইস?

: টু পাইস ফাদার মাদার স্যার, কিন্তু বাপ মা ছাড়াও দুনিয়ায় মানুষ আছে স্যার। তাই অ্যানাদার টু পাইস ফর মাই সুইট হার্ট!

হা হা করে হাসে সাহেব। বয়লারের প্রচণ্ড উত্তাপ আর বাইরের রুক্ষ প্রকৃতির দাবদাহের মধ্যে এমন রসঘন রসিকতায় প্রাণটা সরস হয়ে ওঠে ওর। এক প্যাকেট মশলামুড়ি নিয়ে ফেলে দেয় একটা দোয়ানি : ওয়ান অ্যানা ফর ইয়োর প্যাকেট এ্যাণ্ড এ্যানাদার ফর ইয়োর জোকস্!

মশলামুড়ি সেলাম করে সাহেবকে। দোয়ানিটা কুড়িয়ে নেয়। তারপর বাবলুকে অহেতুক একটা ভেংচি কেটে চলে যায় ফেরি করতে। বাবলু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে! এগারো বছরের বালকটির সঙ্গে

যেন সবাই শত্রুতা করছে।

হুইসিল দিয়ে ট্রেনটা ছাড়লো একটু পরেই। বাবলু তখনও ইঞ্জিনের কাছে প্ল্যাটফর্মের সীমান্তে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ওর নজরে পড়ে মর্টনদা ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে আর অপসৃয়মান গাড়িটার জানলা থেকে মুখ বার করা পাকিস্তানযাত্রী একজনকে বলছে—

: আর দু আনা, আর দু আনা?

লোকটা দু হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাচিয়ে ভেঙচি কাটল মর্টনদাকে। গাড়ির গতিবৃদ্ধি পাওয়ায় যাত্রীটি দেশান্তর যাত্রার আগে শেষ ফাঁকি দেবার সুযোগ পেয়েছে এপারের মানুষকে। মর্টন ছুটে গেল লোকটার দিকে। ফাঁকি বাজি! যাত্রীটির কাছে গিয়ে পৌঁছতেই সে দিলে এক ধাক্কা। মর্টন পড়ে গেল প্ল্যাটফর্মের উপর! অল্পের জন্য চাকার নিচে পড়ল না। লজেন্সের শিশিটা হাত থেকে ছিট্‌কে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। ছড়িয়ে পড়ল সবুজ রঙের লজেন্স সারা প্ল্যাটফর্মে! হা হা করে হেসে উঠ্‌ল লোকটা! অপমানে, আঘাতে আর লোকসানে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল মর্টনের। হাঁটুর কাছটা ছড়ে গেছে তার!

বাবলুর মুখেও ফুটে উঠল একটা অসহায়তার হাহাকার! মুহূর্তে সে মুখে ফিরে এল একটা প্রতিহিংসার কাঠিন্য। লোকটার পৈশাচিক উল্লাসদীপ্ত অট্টহাস্য আর ভূলুণ্ঠিত মর্টনদার অসহায় মূর্তি যেন আগুন ধরিয়ে দিল এগার বছরের বালকটির মাথায়। পর মুহূর্তেই জানলা থেকে বার করা অট্টহাস্যরত মুখখানা এসে গেল বাবলুর নাগালের মধ্যে। প্রাণপণ শক্তিতে বাবলু মেরে বসল ওর দাড়ি-ওয়ালা গালে একটা প্রচণ্ড চড়!

দুই বিপরীত গতির বেগে সেও ঘুরে পড়ল প্লাটফর্মে। হাতটা তার ঝিম্‌ঝিম্ করছে। হেসে উঠ্‌ল প্ল্যাটফর্ম সুদ্ধ লোক। অনেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। তারা খুশি হল। বেশ করেছে ছোকরা। বাহাদুর! মর্টন ভাঙা শিশির দুঃখ ভুলে ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল। চেঁচিয়ে ওঠে : এই মেঠাইওলা! লাও শিগ্‌গির আধসের রসগোল্লা। শ্লা সারাদিন উপোস করে আছে! হাতকাটা-তেল চট করে বাবলুর পাশে বসে টেনে নেয় ওর হাতখানা। বাবলুর হাতটা লাল হয়ে উঠেছে। রক্ত জমে গেছে! নিজের ব্যাগ থেকে একটা ওষুধ বার করে মালিশ করতে লেগে যায়। বলে : বাবলুর যখন এতটা বেজেছে ও শ্লা বোধহয় বাপের নাম ভুলে গেছে মাইরি!

অতি দুঃখেও বন্ধুরা হো হো করে হেসে ওঠে! প্রাণখোলা হাসি। বাবলুও!

এই গল্পটাই বিস্তারিত করে বলতে যাচ্ছিল বাবলু। কিন্তু বাধা পড়ল তাতে।

ওঘর থেকে বিন্দুবাসিনী সাড়া দেন : বৌমা, কথা বলছ কার সঙ্গে রান্নাঘরে?

বাবলু একেবারে চুপ। ছড়ানো চানাচুরের প্যাকেটগুলো কামিনী কুড়িয়ে নেয়। রাখে তুলে একটা মাটির হাঁড়িতে।

: কি হল বৌমা? সাড়া দিচ্ছ না কেন?

ও ঘর থেকেই তাঁকে থামিয়ে দেয় নমিতা : তোমার বৌ আজকাল ভূতের সঙ্গে কথা বলে মা। ওতে কান দিতে নেই!

বিন্দুবাসিনী এগিয়ে আসেন দ্বারপ্রান্তে : ও! দেওরটি ফিরে এসেছেন বুঝি?

জবাব দেয় না কেউ!

: তুই বেষ্টামুদির কাছে দশটাকা ধার করেছিস?

বাবলুর খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। চুপ করে থাকে। কামিনী বলে : এখন কেন মা? আগে ওর খাওয়াটা মিটে যাক্। সারাদিন না খেয়ে আছে ছেলেটা!

: তুমি চুপ কর বৌমা। সারাদিন না খেয়ে থাকবারই ছেলে বটে ও! বাপ-মা না খেয়ে মরছে আর ও বাজারে ধার করছে! এক আধ পয়সা নয়—দশ টাকা! বল হতভাগা!

এগিয়ে আসেন উনি দ্বার ছেড়ে বাবলুর দিকে। বাবলু কি ভাবলে সেই জানে। হঠাৎ পিঁড়ি থেকে লাফিয়ে উঠে সোজা বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। বিন্দুবাসিনী ওকে ধরবার জন্য বাড়িয়ে দেন একটা হাত। যাবার সময় বাধ্য হয়ে বাবলুকে একটা ধাক্কা মেরে যেতে হল। পড়তে পডতে সামলে নেন বিন্দুবাসিনী। কামিনী এগিয়ে আসে। বিন্দুবাসিনী থামিয়ে দেন : থাক্! দুধকলা দিয়ে কী সাপই পুষেছি! দুধের ছেলেটাকে পর্যন্ত মন্ত্র পড়ে বস করেছে ডাইনি!

ক্ষুধার্ত বাবলুর অর্ধভুক্ত থালাখানার দিকে চেয়ে কামিনী বলে : দুধের ছেলেকে বশ করতে হলে মন্ত্রের দরকার হয় না মা। ও একটু স্নেহের কাঙ্গাল। আমার কাছে সেটুকু পায় বলেই ছুটে আসে আমার কাছে!

নমিতাও উঠে এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারপ্রান্তে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে : তা তো বুঝলাম, কিন্তু মার চেয়ে যে ভালবাসে—তাকে কি বলে জান বৌঠান?

: জানি ঠাকুরঝি, বলে ডা'ন! কিন্তু সারাদিন উপোস করে যে মাকে দেখে বাড়া ভাত ফেলে ফেলে ছুটে পালাল তাকে—

: কী! কী বললে তুমি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! ছোটলোকের ঘর থেকে এসেছ বলে মনে কর তোমায় সব ইতরামোই সহ্য করব আমরা! তোমার আশকারাতেই না ও সাহস পেয়েছে বেষ্টামুদির কাছে টাকা ধার করতে? আমি ঠিক জানি—ঐ ডাইনির পরামর্শেই দুধের বাছা টাকা ধার করেছে! কী? অস্বীকার করতে পার একথা?

: অস্বীকার করব কেন মা? টাকা এনে ও আমাকেই দিয়েছে!

নমিতা বলে ওঠে : বাঃ! কী গৌরবের কথা! শ্বশুর জানলো না—স্বামী জানলো না আর বাড়ির বৌ টাকা ধার করলেন বাইরের লোকের কাছে। ধার তো করলে বৌদি, শোধ দেবে কে?

: আমিই শোধ দেব ঠাকুরঝি। তোমার মাইনের টাকায় হাত দেব না!

বিন্দুবাসিনী বিকৃত কণ্ঠে বলে ওঠেন : তা তো দেবেই বাছা! শোধ যে কি করে দেবে তা তো কাল সকালেই দেখেছি! গলির মধ্যে তাই এত ঢলাঢলি!

নমিতা যোগ দেয় : আর শেষরাতে খিড়কিতে দাঁড়িয়ে ভূতের সঙ্গে হাসাহাসি!

কামিনীর সমস্ত শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে যায়! চিৎকার করে ওঠে : ঠাকুরঝি! কী বলছ? এত ইতর মন তোমাদের? তুমি না শিক্ষিত!

নমিতা শ্লেষের সঙ্গে বলে : আমরাই ইতর নয়? আর শিক্ষার কথা তুলছ বৌদি? মুদির সঙ্গে পীরিত করে সংসার চালাবার শিক্ষা তো স্কুলে শেখায় না! ওটা বুঝি তোমার মায়ের কাছে শিখেছ বৌঠান?

· কী বললে?

: তুমি বেষ্টামুদির সঙ্গে পীরিত ক'রে রোজগার করবে আর সেই অন্ন আমরা খাব মনে করেছ?

কামিনী সমস্ত শরীরে যেন জ্বালা ধরে যায়। বাপ-মায়ের আদুরে মেয়ে ছিল সে! মায়ের কথা মনে পড়ে যায়! যাদের জন্যে সে এত করছে তারাই যখন তাকে আঘাত করল, নারীত্বের চরম অবমাননাকর ইঙ্গিত করে তাকে ধূলার সাথে মিশিয়ে দিল—এমনকি তার স্বর্গগতা মায়ের নামেও লেপন করলে চরম কলঙ্কের কালিমা, তখন কামিনীর হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেয়ে গেল! বললে : তাই তো দেখতে পাই ঠাকুরঝি! কী করে সংসারটা চল্‌ছে তা দেখ্‌ছি তোমরা সকলেই জেনে ফেলেছ! কই অন্নজল তো কারও মুখে আটকাচ্ছে না! খেতে দিলে না এক ফোঁটা ছেলেটাকেই!

ডুগরে কেঁদে উঠলেন বিন্দুবাসিনী!

: বৌমা!

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন হরিপদ পণ্ডিত—অন্ধ পদক্ষেপে। তাঁর ওই কণ্ঠস্বর, কোঁচার খুঁট

গায়ে জড়িয়ে ঐ উঠে আসার ভঙ্গিটায় সম্বিত ফিরে পায় কামিনী! মনে পড়ে এতক্ষণ কার সঙ্গে ঝগড়া করছিল। কি নিয়ে ঝগড়া করছিল! সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে ওর।

: তোমার শ্বাশুড়ী আর ননদ সব জেনেই অন্ন গ্রহণ করেছেন—বলছিলে তুমি। বিশ্বাস কর বৌমা—আমি এ কথা জানতাম না। জানলে, তোমার এভাবে রোজগার করা অন্ন হরিপদ পণ্ডিতের গলা দিয়ে নামতো না! কিন্তু যে কথা তুমি নিজমুখে স্বীকার করলে আর তাই নিয়ে বড়াই করলে—সে কথা জানার পরেও যদি তোমার রোজগার করা অন্নে ভাগ বসাই তবে সে অন্ন আমার কাছে গোমাংস। কিন্তু রাত অনেক হয়েছে—এভাবে—

কথাটা শেষ হল না। হরিপদ পণ্ডিতের কথা শেষ হবার আগেই অনশনক্লিষ্ট কামিনীর সংজ্ঞাহারা দেহটা লুটিয়ে পড়ল মেজের উপর।

বাবলুর অভুক্ত অন্নপাত্রটা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল সে। অন্নলক্ষ্মী ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরময়।

ও ঘর থেকে রোগজীর্ণ অনিমেষ শুধু প্রশ্ন করে : কী হল?

কেউ সাড়া দিল না সে ডাকে!

দিন আর কাটে না কামিনীর। কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল। এ কয়টা বছর আঘাত সে কম পায়নি। গোছানো সংসার, ঘর বাড়ি সব ছেড়ে এসেছে। অভাব অনটনের তীব্র কষাঘাতে সংসার যখন জর্জরিত হয়ে পড়েছে তখন দক্ষ নাবিকের মতই সে চালিয়ে এসেছে সংসার তরীটিকে। শ্বাশুড়ী ছিলেন, তাঁর গায়ে অভাব অনটনের উত্তাপ লাগতে দেয়নি। ননদ ছিল কিন্তু অবিবাহিত মেয়েকে সীমন্তিনী মাত্রেই ভাবে নাবালিকা বলে। তাই কামিনীই নিজে থেকে নিয়েছিল গোটা সংসারটাকে চালিয়ে নেওয়ার ভার। জরাগ্রস্ত শ্বশুর, রোগাক্রান্ত স্বামী, নাবালক দেবর, এদের নিয়ে সে যে কী করে চালিয়ে এসেছে এতদিন কেউ তা জানে না। বোধকরি যিনি সব জানতে পারেন একমাত্র তিনিই খবর রাখতেন এই নিরলস বধূটির অতন্দ্র সাধনার। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা সাধ-আহ্লাদের কথা মনেও পড়েনি এতদিন! দিনের শেষে দুটি শাকান্ন রেঁধে দিতে পেরেছে প্রিয়জনকে এইটুকুই ছিল ওর পরম সান্ত্বনা। সেই ছিল ওর একমাত্র সুখ। সে সুখেও বুঝি বঞ্চিত করলেন ওকে ভগবান।

হরিপদ মাস্টার সস্ত্রীক সকন্যা পৃথক হয়ে গেলেন।

হরিশ মিত্রের প্লটের অসমাপ্ত বাড়িটায় উঠে গেছেন ওঁরা। হরিশ মিত্রও ডেজার্টার। ওঁরা ভিন্ন কার্ড করাবার দরখাস্ত করেছেন।

অনিমেষ জানতে চেয়েছিল একবার কারণটা।

হরিপদ বলেছিলেন : তোমার রোজগার নেই—কী করে টানবে আমাদের সবাইকে। তাছাড়া এখানে থাকলে বৌমার স্নেহের আতিশয্যে বাবলুকে মানুষ করতে পারব না আমরা। ওই তো এখন আমাদের একমাত্র ভরসা।

অনিমেষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, বলে : রোজগার তো আমাদের কারও নেই বাবা। যদি না খেয়েই মরতে হয় তবে সবাই মিলে একসঙ্গে মরি না কেন?

: না। উপার্জনের অনেক পন্থা আছে অনিমেষ। পুত্র উপযুক্ত হলে তাকে পৃথক সংসার করতে দিতে হয়। সংসারের এই নিয়ম। তুমি দুঃখ কর না।

অনিমেষ চুপ করে থাকে।

: আর তাছাড়া কারও কোনও উপার্জন নেই এ কথাও তো সত্য নয়। নমিতা স্কুল-মাস্টারির চাকরিটা পেয়েছে। সেও তোমাদের সংসারে মাসিক কিছু করে পাঠাবে।

অনিমেষ বলে : আমরা কি কোন অপরাধ করলাম? তাই কি আমাদের ত্যাগ করে যাচ্ছেন?

ওর মাথায় একখানা হাত রেখে হরিপদ পণ্ডিত বলেন : তোকে এই অসুস্থ শরীরে ফেলে যেতে

হচ্ছে—এ কি আমারই কম দুঃখ? তুই ভালো হয়ে ওঠ!

হু হু করে কেঁদে উঠলেন বিন্দুবাসিনী।

বাইরের উঠানে কয়েকটি বাক্স বিছানা বাঁধা। একখানা গোরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে। মালপত্র উঠ্‌ছে তাতে। লতু আর নমিতা দেখে শুনে মালপত্র ওঠাচ্ছে। বাবলু অনুপস্থিত। দ্বারের কাছে পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে কামিনী। একটা কথাও বলতে পারেনি। সমস্ত জিনিসটা যেন তার কাছে বোধগম্য হচ্ছিল না। অভিমানের বসে রাগের মাথায় সে যদি একটা কথা বলেই ফেলে—তাই ধ্রুব সত্য হয়ে উঠবে? আর সে যে ছেঁচাবেড়ার রান্নাঘরের চতুঃসীমায় তিনে তিলে বছরের পর বছর আত্মদান করে এলো ;—জীবনের সব সুখ সব আহ্লাদ বলি দিয়ে এই সংসারটিকে ভারবাহী বলদের মতো নীরবে চালিয়ে নিয়ে এল তার কোনও মর্যাদা এরা দেবে না? বিন্দুবাসিনীর কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, নমিতা না হয় নতুন চাকরির মোহে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, কিন্তু ওর শ্বশুর? হরিপদ পণ্ডিত মশাই? তিনি কি করে বিশ্বাস করলেন এতবড় ঘৃণিত মিথ্যা অভিযোগ? মা, আর মালক্ষ্মী ছাড়া ডাকেননি কোনদিন—আর আজ এক মুহূর্তে উনি ধরে নিলেন যে, পুত্রবধূর অশুচি উপার্জনের অন্নে চলছে তাঁর সংসার! দুরন্ত অভিমানে কামিনীর অন্তঃকরণ স্ফুটনোন্মুখ আগ্নেয়গিরির মত থরথর করে কাঁপছিল।

হরিপদ বলেন : উঠে এসো বড় বউ। আমাদের যাবার সময় হল।

বিন্দুবাসিনী অশ্রুসিক্ত মুখটা মুছে উঠে বসেন। বলেন : ওকে ওই সর্বনাশীর হাতে ছেড়ে যেতে হবে—ভাবলেও আমার হাত পা হিম হয়ে যাচ্ছে।

অনিমেষ ঊর্ধ্বে চেয়ে থাকে। কামিনী নীরব।

দরজার দিকে পা বাড়াতেই কামিনী প্রণাম করে।

হরিপদ যন্ত্রচালিতের মতো বলেন : কল্যাণমস্তু।

কামিনী আর স্থির থাকতে পারে না, বলে : কেন, কেন আপনি আমাদের ত্যাগ করে যাচ্ছেন? আমি দেব না যেতে। সমস্ত মিথ্যা কথা।

মিথ্যাই হক বৌমা! আমি আর্শীবাদ করছি তোমার সুমতি হক।

: সুমতি হক!

কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে অভিমানিনী মেয়েটির কণ্ঠ! সুমতি হক? অর্থাৎ কাল রাত্রে তার শ্বশুর যা বলেছেন তা তাঁর মুখের কথা নয়, মনের কথা। রাগের মাথায় কথাগুলি বলে ফেলেননি তিনি—এ তাঁর অন্তরের বিশ্বাস? তিনিও ধরে নিয়েছেন অসৎ উপায়ে উপার্জন করছে কামিনী! তবু একবার সে শেষ চেষ্টা করে : আমার সমস্ত কথা শুনবেন না আপনি?

নমিতা বলে ওঠে : যাবার সময় আবার কেন ওসব কথা তুলছ বৌদি। আমাদের যেতে দাও।

ম্লান হাসে কামিনী। দুরন্ত অভিমানে তার অন্তঃকরণ ছাই হয়ে যাচ্ছিল। বলে : বুঝেছি ঠাকুরঝি। এস, তোমরা। যাওয়াটা তোমাদের প্রয়োজন—যুক্তিতে তো তোমরা এখন কান দেবে না?

নমিতা বলে : মানে?

মানে আমরাই এখন তোমাদের বোঝা। তুমিই এখন একমাত্র উপার্জনক্ষম এ বাড়িতে। তাই আলাদা হওয়াটা তোমার প্রয়োজন।

নমিতা বলে : তুমি বলেই একথা ভাবতে পারলে আর মুখে বলতেও আটকালো না ; কিন্তু উপার্জন তো তোমারও আছে বৌদি!

· নমিতা!!—গর্জন করে ওঠেন হরিপদ পণ্ডিত!

চমকে ওঠে নমিতা, কামিনীও। এ কণ্ঠস্বর ওরা চেনে। ওরা বোঝে এ নিয়ে কোনও আলোচনা করতে দেবেন না অন্ধ বৃদ্ধ। যাবেন তিনি নিশ্চয়ই—তবে নীরবেই যেতে চান। কামিনীর দিকে অন্ধ

হতক্ষেপে তিনি শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলেন : সতীত্বের জোরে সাবিত্রী ফিরিয়ে এনেছিলেন সত্যবানকে লক্ষ্মীন্দরকে বেহুলা। তুমি অনিমেষকে সারিয়ে তোল এই আশীর্বাদই করে গেলাম।

ওঁরা চলে যান!

কামিনী চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

সমস্ত দিন অনিমেষ একটা কথাও বলে না। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শূন্যের দিকে। দিন কারও বসে থাকে না। সংসারের নানান দাবী আছে। আছে শিশুপুত্রের আহার—আছে রোগীর পথ্য। কামিনী মনকে শক্ত করে। উনান জ্বালে। দুটি ভাত ফুটিয়ে আর একটা বেগুন সেদ্ধ করে ছেলেকে খাওয়ায়। গোরাও বোধহয় বুঝেছে—কী একটা হয়েছে আজ। অন্যান্য দিনের মত কোনও দুষ্টামি করে না। মায়ের কাছে দুটি খেয়ে নিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়ে বাপের পাশটিতে। কামিনী একবাটি বার্লি গরম করে নিয়ে আসে অনিমেষের কাছে। ওকে খেতে বলে। অনিমেষ পাত্রটা নেয় না। হাত নেড়ে জানায় যে সে খাবে না।

যে স্বামীর কাছে কামিনীর অদেয় কিছুই নেই—যে স্বামী তার হৃদয়ের সমস্ত কথার খবর রাখে—যার কাছে দেহমনের গোপনতম সংবাদ উজার করে ঢেলে দিয়েছে কামিনী—নিঃসঙ্কোচে, সেই স্বামীর কাছেই আজ সে গিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কি জানি ও কি বুঝেছে। কী ভেবেছে! কতটুকু বিশ্বাস করেছে তাই বা কে বলতে পারে। তরঙ্গমুখর নদীবক্ষে নিমজ্জমান লোক যখন সবলে আঁকড়ে ধরে ভেসে যাওয়া কাঠ—তখন চোখ খুলে সে দেখতে চায় না—ওটা ভাসাকাঠ না কুমীর! কামিনীও তার শেষ অবলম্বনটাকে যাচাই করে উঠতে সাহস পায় না। অন্তরের সখী নমিতা বিশ্বাস করেছে, মাতৃসমা শ্বাশুড়ী বিশ্বাস করেছেন, হরিপদ পণ্ডিতের মত দেবতুল্য লোক পর্যন্ত অবিশ্বাস করেন নি এরপর কোন সাহসে কামিনী যাচাই করতে যাবে তার শেষ আশ্রয়স্থলকে! বার্লির বাটিটা নামিয়ে রেখে সে চলে আসে রান্নাঘরে। উনানে জল ঢেলে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

অনিমেষ ওকে ডাকে : শোন।

যন্ত্রচালিতের মত কামিনী এসে দাঁড়ায় ওর শয্যাপার্শ্বে।

: কী হয়েছে বলতো? কী মিথ্যা অভিযোগের কথা বলছিলে তুমি! কালরাত্রে হলই বা কি?

আর স্থির রাখতে পারে না কামিনী নিজেকে। ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর বুকে। ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। অনিমেষ বুঝেছে ওকে এখন খানিকটা কাঁদতে দিতে হবে। তাই চুপ করে থাকে। অনেকটা কেঁদে কামিনী একটু হাল্কা বোধ করে। অনিমেষ আবার বলে : কী হয়েছে বলো? কেন বাবা আমাদের ছেড়ে গেলেন। ওঠ, মুখ তোল।

কামিনী ওর বুকের মধ্যেই মুখ লুকিয়ে বলে : ওঁরা বিশ্বাস করেছেন যে আমি অসৎ উপায়ে উপার্জন করে তোমাদের এ সংসারটা চালাচ্ছিলাম এতদিন—

: অসৎ উপায়? চুরি করে?

: ওগো না, না! আমি আমি—

: বুঝেছি থাক।

কান্নার প্লাবনে বুঝি ভেসে যাবে কামিনী।

অনিমেষ শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলে : ওঠো বউ, আমি বিশ্বাস করিনি। ওঁরা না চিনলেও আমি তো তোমাকে চিনি। ওঠো, আমার বার্লি নিয়ে এস। আমাকে বাঁচতে হবে। আমার রোগ মুক্তিতেই একমাত্র—, আমি মরব না, আমি মরতে পারি না!

কামিনী ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। একটাও কথা বলে না!

নিজেকে কামিনী সামলে নেয়। তার সবকিছু তাহলে ফুরিয়ে যায়নি। তার স্বামী, তার জীবনমরণের সাথী তাকে অবিশ্বাস করেনি। অনিমেষ বেঁচে উঠতে চায়। অনিমেষ বেঁচে উঠবে। ব্রত-উপবাস নয়,

সেবা দিয়ে, পরিচর্যা করে, শুশ্রূষা করে সে মৃতকল্প স্বামীকে সারিয়ে তুলবে। যতবড় সত্যাশ্রয়ীই হন হরিপদ পণ্ডিত, যত শ্রদ্ধাস্পদ-পূজ্য ব্যক্তিই হন তিনি—সে সতীত্বের মহিমময় মর্যাদার সামনে তাঁকেও এসে স্বীকার করতে হবে ত্রুটি। এই ভাঙা সংসার জোড়া দেওয়াই হবে কামিনীর জীবনেব ব্রত।

দ্বিগুণ উৎসাবে জ্বলে ওঠে কামিনী। তাকে লড়াই করে প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু লড়বে যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে—সেই দারিদ্র যে অসীম শক্তিশালী। অনিমেষের অসুখটা কী, তাই জানা যায়নি আজও। একমাসের উপর সে শয্যাশায়ী। কোনও চিকিৎসক এসে দেখেননি তাকে। মোবাইল য়ুনিটেব ডাক্তারখানায় হরিপদ পণ্ডিত গিয়ে রোগীর অবস্থা বর্ণনা করতেন আর মনকে-প্রবোধ-দেওয়া লাল-নীল জল নিয়ে আসতেন। তাই খাওয়ান হতো অনিমেষকে। মায়ের চরণামৃত ছিল এ ছাড়াও।

কামিনী স্থির করল যেমন করে হক ডাক্তার দিয়ে অনিমেষকে দেখাতে হবে। কলোনির বড় ডাক্তার লালুবাবু। তাঁর দর্শনী বেশি। চৌধুরী ডাক্তারও বাড়িতে এসে দেখলে দুটাকা নেন। এক আছেন নিতাই ঠাকুর্দা। অনেক ক্ষেত্রে বিনা দর্শনীতেই রোগী দেখেন তিনি,—কামিনী শুনেছে একথা। কিন্তু নিতাই কবিরাজ থাকেন কলোনির একেবারে অপর প্রান্তে-ই-ব্লকে। কে ডেকে আনবে তাঁকে? তাছাড়া কামিনীর সংসারে চাল ডাল সবই ফুরিয়ে এসেছে। বিষ্টুপদর কাছে যে দশটা টাকা ধার করা আছে তাও শোধ করা হয়নি। অন্তত একখানা শাড়ি তাকে কিনতে হবে এ মাসেই। এখানা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

কামিনী অবাক হয়ে ভাবে কি করে এ ব্যবস্থা অনুমোদন করলেন হরিপদ মাস্টার? ধরে নেওয়া যাক্ তাঁর অনুমান সত্য, তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর পুত্রবধূ চক্রবর্তী পরিবারের সমস্ত সম্মান বিসর্জন দিয়ে বিপথেই পা বাড়িয়েছিল। বেশ কথা। কিন্তু কেন সে গিয়েছিল ও পথে? তাঁদের সংসারের মুখ চেয়েই তো? সে উপার্জনে কি ওঁর পুত্রবধূ গহনা গড়েছে? তবে? তাহলে কেন তিনি তিবস্কার করে ওকে সৎপথে আনবার চেষ্টা করলেন না? স্কুলের কোনও ছেলে দুষ্টুমি করলে কি তিনি তাকে শোধরাবার চেষ্টা করতেন না? বিপথেই যদি যাত্রা শুরু করে থাকে সে, তবে তাকে এভাবে একলা রেখে যাওয়াটা কি সেই পাপপথে যাত্রার ব্যবস্থাটাই সুগম করে দেওয়া নয়? এ কথা কি হরিপদ পণ্ডিত বোঝেন না? আর তা ছাড়া কামিনী যদি বিপথে যায় তাহলে কি অনিমেষকে ত্যাগ করতে হবে? অনিমেষের অপরাধটা কী? তিনি কি বিশ্বাস করেন অনিমেষের অনুমোদন আছে কামিনীব এ ব্যবস্থায়? বোগজীর্ণ পাণ্ডুর ঐ মানুষটার সম্বন্ধে একথা ভাবতে পারলেন তিনি? তাছাড়া কাণ্ডজ্ঞানহীনতার চরম পরিচয় কি রেখে গেলেন না ওঁরা। একজন অসুস্থ মানুষ—একটি শিশু আর একজন যুবতী নারীর পক্ষে বিনা রোজগারে কী করে চলবে সংসার? কে জলটা তুলে আনবে? চালটা নুনটা কিনে আনবে? অন্ততঃ লতুকে কিংবা বাবলুকে এ পরিবারে দিয়ে যাওয়া কি উচিত ছিল না ওঁদের? অভিমানে মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে কামিনীর। আর বাবলুটাই বা কি? ভুলেও একবার আসে না বৌদির কাছে! একবার মনেও পড়ে না দাদা-বৌদির কথা! মনে পড়বে কেন? এখন যে দিদি রোজগাব কবছে। বৌদির ফ্যান ভাতের কথা আর মনে পড়বে কেন। উঃ! কি নেমকহারাম ছেলেটা! দুনিয়াব উপব শ্রদ্ধা হারায় কামিনী। শুধু স্বার্থ! আর কিছু চায় না কেউ! মানুষে মানুষে এত যে মধুর সম্বন্ধ—যা নিয়ে গড়ে উঠেছে এত সাহিত্য এত কাব্য—তা শুধু স্বার্থের খাতিরেই। প্রয়োজনের মানদণ্ডে বিচার হবে অন্তরের সমস্ত কোমলবৃত্তিগুলি!

ওঁরা যেদিন চলে যান সেদিন রাত্রেই একবার এসেছিল বাবলু। তারপর থেকে ভুলেও এ পথ মাড়ায়নি। সেদিন সকালেই ওঁরা চলে গেছেন। রাত্রে অনিমেষ ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর একখানা হাত গোবাব গায়ের উপর। গোরাও ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে ওর বাপকে। ওদেব নিশ্চিন্ত নিদ্রার ছবিখানি বসে বসে দেখছিল কামিনী। হঠাৎ বাইরে কে ডাকল : বৌদি!

জানালা দিয়ে উঁকি মারে বাবলু।

পরক্ষণেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বৌদিকে।

কাদামাখা খালি পা, ছেঁড়া সার্ট আর হাফপ্যান্ট। হাতে জড়ান কামিনীর শায়াটা। কয়লার গুঁড়োতে বাবলুর মাথাটা ভর্তি। সেগুলি ঝাড়তে ঝাড়তে কামিনী বলে : তুই কোত্থেকে রে?

বাবলু প্রতিপ্রশ্ন করে : বাবা মা নাকি চলে গেছেন? কোথায় গেছেন?

: সে কি রে? তুই জানিস না? হরিশ মিত্রের প্লটে। তুই যাসনি সেখানে?

ঝাঁকড়া মাথাটা নেড়ে বাবলু জানায়—না।

: তবে জামা কাপড় পেলি কোথায়? কাল তো পালিয়ে গেলি আমার শায়া পরে।

: এগুলো মশলামুড়ির। আমার সব কথা শুনে একদিনের জন্যে ধার দিয়েছে ও। বৌদি, আমি এখানে থাকব—ও বাড়ি যাব না কিন্তু।

ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কামিনী বলে : ছি বাবলু, ওকথা বলতে নেই। ওঁরা বাপ মা, ওঁরা গুরুজন। ওঁদের কাছেই থাকতে হবে তোমাকে।

: তুমিও তো গুরুজন—দাদাও তো গুরুজন।

: সে তো ঠিক কথাই। তবে বাবা বলেছেন আমাদের ডিউটি ভাগ হয়ে গেছে। তুই বাবা মাকে দেখবি, আমি দেখব তোর দাদা আর গোরাকে। তোর দাদা ভালো হয়ে গেলেই আবার আমরা সব এক হব।

বাবলু বড় বড় চোখে মাতৃসমা বৌদির কথাটা প্রণিধান করবার প্রয়াস পায়।

: কি রে পারবি না?

: কিন্তু দিদিরাই তো দেখতে পারে বাবা মাকে। তাছাড়া সবাই একসঙ্গে থাকলে ক্ষতি কি হত?

: ক্ষতি হত। সব কথা তো তুই বুঝবি না ভাই। কি রে পারবি না বাবা মাকে মানুষ করতে?

বাবলু গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ে। এগারো বছরের বাবলু বাপমাকে মানুষ করার দায়িত্ব নেয়। পকেট থেকে কিছু খুচরা পয়সা বার করে বলে : এটা নাও। আর নতুন কত প্যাকেট বানিয়েছ দাও।

কামিনী পয়সাটা নিতে পারে না। বলে : ও পয়সা তোর কাছেই থাক বাবলু। তোদের সংসারে খরচ করিস। মাকে সব কথা খুলে বলিস। তাঁকেই পয়সাটা দিস্।

: মাকে বললে মা আমাকে চানাচুর বিক্রি করতে দেবে থোড়াই।

: তবে দিদিকে দিস্। আর বলিস সমস্ত কথা খুলে। বুঝেছিস?

: ওরা সবাই সমান। জানতে পারলে রক্ষা রাখবে না কি?

: না রে! কথাটা এখন বলে দেওয়াই দরকার। আমিই বলতে চেয়েছিলাম—কিন্তু বলা হয়নি। তুই বললে হয়তো সব মিটে যাবে। বলবি তো?

: আচ্ছা বলব অখন। তাহলে নতুন প্যাকেটগুলো দাও!

: আর ভাজিনি আমি।

: তবে কালকের সেই ফেরত দেওয়া প্যাকেটগুলোই দাও।

কামিনী চুপ করে থাকে। বাবলু রান্নাঘরের ও কোনা থেকে মাটির হাঁড়ি উবুড় করে বার করে প্যাকেটগুলো।

কামিনীর মনে পড়ে যায়—'তোমার রোজগার করা অন্নে যদি আমি ভাগ বসাই তবে সে অন্ন আমার কাছে গোমাংস!'

: ওগুলো নিস্‌নে বাবলু।

: বারে! তুমি নতুনও ভাজবে না—পুরনোগুলোও দেবে না। তবে আমার বিক্রি বন্ধ থাক্ কালকে।

কামিনী চুপ করে থাকে। কি বলতে পারে সে? কি করেই বা বোঝাবে তাকে—কেন সে আজ আর সাহায্য করতে পারে না এই ক্ষুদে ব্যবসায়ীকে।

: কাল তাহলে এসে নতুন প্যাকেট নিয়ে যাবো। বেশি করে ভেজে বেখ কিন্তু।

কামিনী ধীরে ধীরে বলে : আমি আর চিড়ে ভাজব না বাবলু!

বাবলুর মুখের ভাব বদলে যায়। অস্ফুটে বলে : ভাজবে না? ও ভাজবে না! তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেলে : তবে আমার ব্যবসা উঠে যাক্। আমরা না খেয়ে মরি! তাড়িয়ে দিলে বাড়ি থেকে—কিছু বললাম না। টাকা নিলে না তাও কিছু বললাম না—ভাজা প্যাকেটগুলো চাইলাম তাও দিলে না! এখন বলছ চিড়ে ভেজে দেবে না। আমি কি নিজে ভাজতে পারি? তুমি কি চাও আমরা সবাই না খেয়ে মরি!

কামিনী ওকে বুকে টেনে নেয়। অব্যক্ত যন্ত্রণায় হু হু করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। ভারী গলায় ওকে বলে : আজ তুই অনেক কথাই বুঝবি না বাবলু। বড় হলে যখন এসব কথা মনে পড়বে তখন অন্তত এটুকু বিশ্বাস করিস তোর বৌদি কখনও কোন মন্দ কাজ করেনি। আমাকে আর কাঁদাসনে বাবলু। বাড়ি যা! ঠাকুরঝিকে বলিস চিঁড়ে ভেজে দিতে।

বাবলুর রাগ একতিলও কমে না এ কথায়। দুরন্ত অভিমানে চানাচুরের প্যাকেটগুলো মেজেয় ছড়িয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় সে ঝড়ের মতো।

সেই শেষ।

আর আসেনি বাবলু!

কামিনী অবাক হয়ে যায়। বাবলু নিশ্চয়ই অনুরোধ করেছে নমিতাকে চিড়ে ভেজে দিতে। কথা প্রসঙ্গে সবই জানাজানি হয়ে যাওয়া উচিত। আজ সাত দিন হয়ে গেছে। এতদিনে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন ওঁরা কী ভাবে রোজগার করত ওরা দেবর-বৌদি। তবু এল না নমিতা অথবা লতু বৌদির কাছে ক্ষমা চাইতে। একবার বাবলুকেও পাঠালো না জানতে অনিমেষ কেমন আছে! কারও যেন কোনও দায়িত্ব নেই। এই ছুতো করে বেকার পুত্রকে ফেলে পালিয়েছেন ওঁরা ধার্মিক সেজে! কামিনী গলায় দড়ি দেবে তবু গিয়ে দাঁড়াবে না সেখানে ভিখারীর বেশে! কখনই না!

কলোনির প্রায় কেন্দ্রস্থলে একটা লম্বা টিনের ঘর। দেয়াল, জানলা, দরজা, ছাদ সমস্ত টিনের। এটি মেয়েদের স্কুল। দারুণ গ্রীষ্মে যখন টিনের নিচু-চালার তলায়, ছাত্রীদের ব্লাউজ-ফ্রক ভিজে ওঠে তখনও নিববচ্ছিন্ন ধারায় চলতে থাকে অধ্যয়ন-অধ্যাপন। আবার যখন টিনের চালে পড়ে চড়বড় করে বৃষ্টি তখনও ছাত্রীরা মুখস্থ করতে থাকে—'আফ্রিকার উত্তরে সাহারা মরুভূমি...পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি!' ছাত্রীদের অধ্যয়নই যখন তপশ্চর্যা তখন কঠিন তপস্যাই করছে তারা বলতে হবে। অগ্নিকুণ্ডের উপর উপবেশন করে যদি গাজনের সন্ন্যাসী মোক্ষপথের পাশপোর্ট পায় তবে এই টিনের চালার দাবদাহে অর্ধসিদ্ধ কোমলাঙ্গী মেয়েগুলি নিশ্চয়ই আশা করতে পারে, মা সরস্বতী খুশিমনেই ওদের অন্তত পাশ মার্কটা পাইয়ে দেবেন। দুর্ভাগ্যবশত এ ব্যবস্থাটায় খুশি হতে পারেন নি সুরেখা ঘোষ—মেয়েস্কুলের নবনিযুক্ত হেডমিস্ট্রেস।

এই নিয়েই কথা হচ্ছিল টিচারস্ রুমে। হেডমিস্ট্রেস সুরেখা দেবীর বয়স অল্প ; কিন্তু রাশভারী মহিলা তিনি। শোনা যায় যে বড় ঘরের মেয়ে সখ করে চাকরি করতে এসেছেন। তিনিই বলছিলেন : আপনারা কি বলেন? আমি আজ ছমাস হল এসে চার্জ নিয়েছি, কিন্তু স্কুলের হালচাল দেখে বুঝেছি এর উন্নতি হওয়া দুঃসাধ্য। এক একটা পায়রার খোপের মত ঘরে গাদাগাদি করে বসে ছাত্রীরা। একটা ম্যাপ নেই, ল্যাইব্রারী রেফারেন্স নেই, টিচারদের বসবার চেয়ারের পায়া ভাঙ্গা, নিচু ক্লাসে বেঞ্চি পর্যন্ত নেই। তাছাড়া এই টিনের চালার উত্তাপে মেয়েদের পক্ষে পড়ায় মন দেওয়াও কষ্টকর। আমি ওয়েলফেয়ার অফিসারকে বহুবার বলেছি ; কিন্তু কোনই ব্যবস্থা হয়নি। এ ক্ষেত্রে কি কবণীয? আপনারা কি পরামর্শ দেন?

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। এ ব্লকের শোভনাদিই বয়োজ্যেষ্ঠা। তিনিই উঠে দাঁড়ান , কথা তো

নতুন নয়। আমাগো ইস্কুলের আজ পাঁচ বচ্ছর এই হাল। কর্তৃপক্ষ যখন শুনতাছেন না তখন আর কি করন? এমনিই চলুক।

: এটা তো সহজ যুক্তি। কিন্তু যেটা চলা উচিত নয়—সেটা এতদিন চলেছে বলেই তো তাকে চিরদিন মেনে নেব না আমরা।

: তয় কি ইস্কুল বন্ধ কর‍্যা দিবার কথা কন না কি?

: দরকার হলে তাও করতে হবে।

অল্প আলোচনার পরেই কিন্তু বোঝা গেল প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে অন্যান্য সকলে একমত নন। এই টিনের ঘরখানি আছে বলে মাস গেলে গ্রাসাচ্ছাদনের যা হক একটা ব্যবস্থা হয় এঁদের। মেয়েগুলো তবু কিছু লেখাপড়া শেখে, গৌণ হলেও, সেটাও ত ধরতে হবে। স্কুলকে যদি উনি উন্নত করতে পারেন তো করুন—কিন্তু উন্নত করতে গিয়ে যদি স্কুলটা বন্ধই করে দিতে হয় তাহলে আব উন্নতি কি হল? হেডমিস্ট্রেস স্পষ্টই বিরক্ত হলেন। আলোচনা সেখানেই বন্ধ রেখে রওনা হলেন বাড়ির দিকে। শোভনাদি মৈত্রেয়ীকে জিজ্ঞাসা করেন : ঘর যাইতা না?

: যাইতাম না? এইহানো বইয়া করবামটা কি?

একে একে সকলেই রওনা হয়ে পড়ে। ডি. ব্লকের নমিতা চক্রবর্তী নতুন চাকরি পেয়েছে। প্রথম মাসের মাইনেটাই আগাম নিতে হয়েছে। আজকের আলোচনায় বেচারী দমে গেল। অনেক আশা ভরসা নিয়ে এসেছে সে চাকরি করতে। এই চাকরিটি দিয়েই সে রক্ষা করবে একটা গোটা পরিবারকে। অন্ধ বাপ, বৃদ্ধ মা, ছোট ভাই বোনদের। তাছাড়া মাসিক কিছু সাহায্য করতে হবে দাদাকে, যতদিন না সুস্থ হয়ে ওঠে সে। নিজের জন্য দুঃখ নাই তার। একলা মানুষ হলে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু সমস্ত পরিবারটার কথা ভেবে মনটা ভারি হয়ে উঠল। নিজে সে বিবাহ করবে না—অন্ধ বাপের পরিচর্যার বিকিয়ে দেবে জীবনটা ; কিন্তু লতু? কে বলবে পনের বছরের মেয়ে? না বেড়েছে দেহে, না মনে। এখনও কিশোরী বালিকার মত পাড়ায় পাড়ায় ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

পায়ে পায়ে সে বাড়ির দিকে চলে আসে। হঠাৎ ভীষণ রাগ হয়ে গেল হেড মিস্ট্রেসের উপর। কী দরকার বাপু আপনার একটা গড়া জিনিস ভেঙে দেওয়ার? সখের চাকরি করতে এসেছেন, ভালো না লাগে তাহলে রিজাইন দিয়ে বাড়ি চলে গেলেই পারেন। কিন্তু লতুটাকে এবার শাসনে আনতে হবে। এমন পাগলির মতো পাড়ায় পাড়ায় বেড়াতে দেওয়া উচিত নয়। বাবা মাকে সে কোনও দিনই মানে না—দিদিকেই বরং ভয় করে তবু একটু। লতুর আদর আবদারও সহ্য করতে হয়েছে অনেক নমিতাকে। সব জিনিসেরই কিন্তু সীমা থাকা উচিত। লতুরও বোঝা উচিত সে আর ছেলেমানুষ নেই। এভাবে ছেড়ে দিলে বিপদ হতেই বা কতক্ষণ? অবশ্য লতু খুব চালাক মেয়ে। বাংলা উপন্যাস পড়ে পড়ে অনেক কিছুই বুঝে ফেলেছে সে। তবু সাবধানের মা'র নেই।

: কে, লতু বুঝি?

: না, বাবা আমি।

: ও নমু। লতু কোথায় রে? দুপুর বেলা সেই যে বেরিয়েছে এখনও এল না তো?

নমিতা চুপ করে থাকে। স্নান ঘরে গিয়ে দেখে জলটাও তুলে রেখে যায়নি লতু। এক ফোঁটা জল নেই বালতিতে।

বিন্দুবাসিনী বলেন : ওমা একটুও জল নেই? আমি দেখছি।

: থাক্ আমিই নিয়ে আসছি, দাও।

মায়ের হাত থেকে বালতিটা নিয়ে নমিতা বেরিয়ে যায়। টিউব ওয়েল অনেকটা দূরে। ভীষণ রাগ হল লতুটার উপর। কচি খুকি তো নয়। সারাদিন স্কুলে গরমে সেদ্ধ হয়ে দিদি ফিরবে—অথচ ঘরের একটি কাজও করে রেখে যায়নি। হয় মা, নয় দিদি কেউ করুক! সকালবেলা যে ছেঁড়া কাপড়খানা

কেচে জলচৌকির উপর রেখে গিয়েছিল সেখানাও মেলে দেওয়া হয়নি। ফলে স্কুলের ফর্সা কাপড়টা ছেড়ে রাখবার উপায়ও নেই। আর কেউ না জানুক মা তো জানে ওর বাইরে বেরুবার জন্য এই একখানা মাত্র শাড়ি। এটি কিনতে বাধ্য হয়েছে সে চাকরি পাওয়ার পর। মায়ের নাকছাবিটা হারাতে হয়েছে এজন্যেই। অথচ কেউ সংসারের কথা একটু ভাবে না! অন্যদিন স্কুল থেকে ফিরে সে এখানা খুলে রাখে। সন্তর্পণে ভাঁজ করে রেখে দেয়। পরে ছেঁড়া শাড়িটা। আজ বাধ্য হয়ে এটাই পরে থাকতে হল।

ডি/১১৪১ নম্বর বাড়িখানায় সম্প্রতি উঠে এসেছেন হরিপদ পণ্ডিত। বাড়িটার লিন্টেল লেভেল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছিল। অর্থাৎ দরজা জানলার মাথা পর্যন্ত। দুখানি ঘর। 'ওয়েল-ফেয়ার অফিসারের' অনুগ্রহে এর মাথায় খান কয়েক করোগেটেড টিন চাপাতে পেরেছেন পণ্ডিত। ঘরের ভিতর ঢুকে তাই ভালো করে মাথা খাড়া করে উঠে দাঁড়ানো যায় না। হরিশবাবু ডেজার্টার, বাড়িটা তিনি শেষ করেননি বটে কিন্তু কয়েকটি গাঁদা ফুলের চারা গাছ লাগিয়ে গেছেন। শুকিয়ে রয়েছে সেগুলো। লাগিয়েছিলেন কযেকটা রজনীগন্ধাও। ফুল ধরেনি তাতে। সবুজ সতেজ ডাঁটা বেরিয়ে এসেছে তার ভিতর থেকে। তার মাথায় ঈষৎ লালচে-সবুজ কলির গুচ্ছ। আষাঢ় মাস পড়ে গেছে—তবু ফুল ধরেনি অযত্নের গাছে। সব গাছে যখন ফুল ঝরাবার সময় হয়ে এল তখন ফুল ফোটাতে বোধ হয় লজ্জাই পাচ্ছে ওর চারা গাছ। ভাবে নমিতা—নিজের দিকে চেয়েই।

হাত মুখ ধুয়ে এসে বসে বাপের কাছে।

প্রশ্ন করে : খেয়েছ কিছু?

: এখন আবার খাই না কি আমি?

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। শেষে বৃদ্ধ বলেন : বাগানে যাবি না? চল ডাঁটা গাছগুলোর তলায় আগাছাগুলো তুলে দিই গে।

হরিশ মিত্রই লাগিয়েছিলেন ডাঁটা গাছগুলো।

নমিতা হেসে বলে : সে আমিই তুলব অখন রবিবারে। তুমি যেন তুলতে বস না। তাহলে আগাছা বলে ডাঁটা গাছগুলোই তুলে ফেলবে শেষে।

বৃদ্ধ হাসেন। তারপর আবার বলেন : তুই একটু বুঝিয়ে বলিস লতুকে। কি ধিঙ্গির মত সারাদিন খালি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ভালো লাগে না একটু। আমার কথা শোনে না—তোর মায়ের কথা তো কানেই তোলে না—কলোনির ছেলেদের তো জানিস! অতবড় মেয়ে—বদনাম রটতে কতক্ষণ!

নমিতা প্রশ্ন করে : বাবলু এসেছিল আজ?

: ওই আর এক ছেলে। হতভাগা কোথাকার! আজ দশদিন হয়ে গেল—এল না একবার এ বাড়ি! লতুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাস্তায়। লতুকে বলেছে—সে সুখেই আছে—আসবে না এ বাড়ি।

: এটা বৌদির ভারি অন্যায়। এভাবে বাবলুকে আটকে রাখা।

: কিন্তু সেই বা কি করে? অনু তো বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পারে না। বাড়িতে আর দ্বিতীয় প্রাণী কে আছে যে জলটা তুলে আনে—বাজারটা করে দেয়। থাক্ বাবলু ওখানেই।

বিন্দুবাসিনী যোগ দেন : কিন্তু ওখানে থাকলে তো ও মানুষ হবে না। তুমিই তো আসবার সময় অনুকে বললে বাবলুকে মানুষ করবার জন্য আলাদা হচ্ছি আমরা!

বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন : অসুস্থ মানুষটাকে সত্য কথা বলে এলেই কি খুশি হতে তোমরা?

নমিতা বলে : কিন্তু তাই বলে বাবলুকে কি একবার খোঁজ নিতেও পাঠাতে পারত না এ দশ দিনে?

বৃদ্ধ চুপ করে থাকেন। তারপর আবার প্রশ্ন করেন : টাকাটা পাঠিয়েছিস?

: হ্যাঁ বাবা।

: কবে?

: আজই।

: অনু কেমন আছে?

: তা তো জানি না।

: তা তো জানি না! কে নিয়ে গিয়েছিল টাকাটা। তুই না লতু?

: আমি মনি-অর্ডার করেছি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন বৃদ্ধ : কাজটা ভালো করিসনি নমু। লতুকে পাঠালেই পারতিস। অনুটা কেমন আছে জেনে আসত।

: সেও তো একটা খবর পাঠাতে পারত? তারও তো উচিত ছিল বাবলুকে এ বাড়ি পাঠিযে তোমাকে একটা খবর দেওয়া'

নীরব থাকেন চক্রবর্তী।

বিন্দুবাসিনী যোগ দেন : তার নিজেরই আসা উচিত ছিল বাবলুর হাত ধরে। অভাবের তাড়নায অন্যায় যদি করেই থাকে কিছু—তার কি উচিত ছিল না তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আমাদের ফিরিযে নিয়ে যাওয়া?

নমিতা কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, চুপ করে গেল। একজন অপরিচিত যুবক এগিয়ে আসছে ওদের বাড়ির দিকে। হঠাৎ হাত তুলে নমস্কার করে। নমিতাও প্রতিনমস্কার করে। যুবকটির দেহাবয়ব সুগঠিত। চুলগুলি অযত্নবিন্যস্ত। জামাটার হাতা অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। চোখে চশমা—খালি পা। নমিতা একটা মোড়া এগিয়ে দেয়। বিন্দুবাসিনী উঠে যান ভিতরে। যুবকটি বলে : নমিতা চক্রবর্তী কাব নাম?

উত্তর দেন বৃদ্ধ : কে?

প্রতি প্রশ্ন করে ভূষণ : আপনিই হরিপদ চক্রবর্তী মশাই?

· হ্যাঁ, বসুন। আপনি?

বসেই ছিল যুবকটি। বলে : আমার নাম ভূষণ, ভূষণ রায়। এ ব্লকে ৭২৪নং প্লটে থাকি আমি। তা আপনার ঠিকানা শুনেছিলাম ২০৭?

: হ্যাঁ, আমরা সম্প্রতি উঠে এসেছি।

: ও। দেখুন আমি এসেছিলাম আপনার মেয়ের কাছে। নমিতা দেবীর কাছে। আপনিই আশা কবি।

নমিতা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে।

: কলকাতায় গোলদিঘীর ধারে হকার্স কর্নারে আমার একটা দোকান আছে। রেডিমেট-ফ্রক, ব্লাউস. ইজেরের দোকান। আপনাদের মত মেয়েদের দিয়ে আমরা জামা কাপড় বানিয়ে নিই। বিক্রি কবি সেই দোকানে। অনেক মেয়ে আমাদের সরবরাহ দেয়। যারা সেলাই করতে জানে, সময়ও আছে যথেষ্ট. অথচ নেই মূলধন অথবা বিক্রি করার ব্যবস্থা, তারা এভাবে আমাদের সাহায্য করে। বিনিময়ে আমবাও মজুরি দিয়ে সাহায্য করি তাদের। আমার কাছে কাপড়, আছে দোকান—আপনার আছে সেলাই শিক্ষা. আছে অধ্যবসায় ; আমি—

ওকে থামিয়ে দিয়ে নমিতা বলে : প্রথমত আমি সেলাই করতে জানি একথা জানলেন কার কাছে? আব দ্বিতীযত আমার অখণ্ড অবসর আছে এটাই বা ধরে নিলেন কি করে?

লোকটি একটুও অপ্রতিভ হয় না, বলে : এবার কঠিন প্রশ্ন করেছেন। আপনার এক নম্বর প্রশ্নেব জবাব আমরা জহুরী—ঠিক চিনে নিতে পারি। কদিন আসে সি. ডি. পি. এক্সিবিশনে আপনার কয়েকটি সেলাইয়ের নমুনা দেখি। সেখানেই আপনার ঠিকানা পাই। আর দ্বিতীয়ত অবসর না থাকার কোনও কারণ নেই। সংসারের কাজ ছাড়া দুপুরটা সব গৃহস্থ মেয়ের কাছেই অখণ্ড অবসর।

বৃদ্ধ হরিপদ যোগ দেন : নমিতা স্কুলে পড়ায়।

: নমিতা স্কুলে পড়ায়! টিচার! সর্বনাশ! মাপ করবেন—আমি জানতাম না। আচ্ছা আসি আমি।

সত্যিই উঠে দাঁড়ায় ভদ্রলোক। নমিতা ওর ভাবগতিক দেখে হেসে ফেলে। বলে : তা বলে পালাবার কি আছে?

: আছে নমিতা দেবী, আছে! কিছু মনে করবেন না আপনি—ঐ স্কুলমাস্টার জীবটিকে আমি শৃঙ্গী, দন্তী প্রভৃতির পর্যায়েই ফেলি এবং চাণক্য বাক্য স্মরণ করে শত হস্ত দূর দিয়ে চলি—

স্কুলমাস্টার হরিপদ পণ্ডিত কথাটা বোধ হয় সহ্য করতে পারেন না। সংশোধন করে দেন : চাণক্য পণ্ডিত কিন্তু মাস্টার মশাইদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে সরে যেতে বলেন নি—

: কারণ তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন। আমি মূর্খ মানুষ ; মাস্টার মশাইদের ভয় করি! ছেলেবেলায় বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

: তাই বুঝি আজও টিচার দেখলে দাঁড়িয়ে ওঠেন ?—বলে নমিতা।

বসে পড়ে ভূষণ : নাঃ! আপনি আমাকে আবার বসিয়ে দিলেন দেখছি।

: বসিয়েছি বটে, তবে পথে বসাইনি। যদিও স্কুলে আমার অনেকটা সময় কাটে, তবু রাত্রে আপনার কাজটা করে দিতে পারব। সংসারের অবস্থা তো বুঝতে পারেন—যেটুকু আয় বাড়ানো যায়।

ভূষণ ঘনিয়ে বসে। নিজের পরিচয় দেয়। ভূষণের আদি নিবাস কুষ্ঠিয়া। কলোনিতে এসেছে একেবারে আদি পর্বেই। হাউস-বিল্ডিং লোন দিয়ে গড়ে তুলেছে একখানা বাড়ি। স্মল-ট্রেড লোনের অর্থে শুরু করেছে এই জামা কাপড়ের ব্যবসা। বাড়িতে আছেন বৃদ্ধা পিসী আর মা-হারা দু বছরের মিঠুয়া। একটা হাতকল ছিল। মিঠুয়ার মা সুবালা একা হাতেই ভূষণের দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত মাল সরবরাহ করত। অক্লান্ত পরিশ্রম করত সুবালা। সে মারা যাবার পর পিসীই চালায় কলটা ; কিন্তু আজকাল বৃদ্ধার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না এতটা পরিশ্রম। মা-হারা নাতনিটাকে মানুষ করাই কঠিন হয়ে পড়েছে তাঁর পক্ষে। তাছাড়া চোখে ছানিও পড়েছে। এদিকে ফ্যাসানও পালটাচ্ছে অনবরত। নতুন নমুনা এনে দিলে তার সেলাই খুলে 'কাট' বুঝে নিয়ে নতুন জামা কাটার মতো শিক্ষা নেই পিসীর। অথচ মামুলি জামার চাহিদা গেছে কমে। ফলে ভূষণ বিপদে পড়েছে। দিন কয়েক আগে উদয়নগরের অনতিদূরে সি. ডি. পি. টাউনশিপে একটা প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিল ভূষণ। সেখানে ওর নজরে পড়ে কয়েকটি সেলাইয়ের নমুনা। উদয়নগর কলোনির নমিতা চক্রবর্তীর হাতের কাজ। খোঁজ নিতে নিতে ঠিক এসে পৌঁছেছে সন্ধানী ভূষণ।

নমিতা প্রশ্ন করে : সুবালা দেবী কতদিন মারা গেছেন?

: বছর দুই।

: সে কি? এই যে বললেন মিঠুয়ার বয়সও দু'বছর।

: হ্যাঁ, মিঠুয়া হবার সময় মারা যায় সে।

: তাহলে আবার বিয়ে করেননি কেন এতদিনে?

ভূষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নমিতার দিকে। প্রশ্নটার জবাব দিতে পাবে না। নমিতাই বরং লজ্জিত হয়। এত অল্প পরিচয়ে এ রকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করাটা নিশ্চয়ই অশোভন হয়েছে তার তরফে। তাই শুধ্‌রে নেবার জন্য বলে : মানে, মেয়েটাকে তো মানুষ করতে হবে আপনাকে।

কৈফিয়ৎটা নিজের কাছেও খুব জোরদার মনে হয় না। হরিপদ পণ্ডিতও বোধকরি কথাবার্তার ধবনটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারছিলেন না, উনি বলে বসেন : সে কথা যাক্, এখন সেলাইয়ের কথা কি হচ্ছিল যেন...

নমিতা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আলোচনাটা ভিন্ন পথে মোড় ঘোরায়। তাড়াতাড়ি কাজের কথা পাড়ে। কী জাতীয় জামা চাই। আগে তার নমুনা দেখাতে হবে। মজুরি কত পাওয়া যাবে সে কথাও নিঃসঙ্কোচে জেনে নেয। ব্যবসাই যদি করতে হয় তবে সমস্ত জেনে বুঝে কাজে হাত দেওয়া ভালো।

বৃদ্ধ আবার যোগ দেন আলোচনায় : রান্নাবান্না, ঘরের কাজ, তার উপর স্কুল। এর পরেও কি পারবি ও কাজ।

নমিতা ভূষণকেই প্রশ্ন করে : কি পরিমাণ মাল সরবরাহ চাই আপনার?

: ধরুন সপ্তাহে আধ ডজন ফ্রক, ছটা ব্লাউজ আর ডজন খানেক ইজের বা সায়া।

: মাত্র? এতেই চলবে আপনার দোকান? এ থেকেই সব খরচ মিটিয়ে চলবে আপনার আমার সংসার?

: ভুল করছেন নমিতা দেবী। আমার দোকানে অন্তত শ' চারেক টাকার মাল জমে আছে। সেটা তো খাপাতে হবে। আপনাকে দিয়ে কিছু চটকদার মাল বানিয়ে নেব যাতে তাই দেখে লোক দোকানে ভেড়ে। তারপর যখন দাম শুনে পিছুপাও হবে তখন বার করব আমার ঐ মাল। তাছাড়া আপনার মত অনেক মেয়েই জামা সরবরাহ করে আমাকে।

আবার শুরু হয় গভীর আলোচনা। সেলাই কলটা পৌঁছে দিয়ে যাবে ভূষণ কালকেই—সেই সঙ্গে দিয়ে যাবে কিছু নতুন নমুনাও—আর ছিটের কাপড়।

আলোচনার মাঝখানেই এল লতু। প্রায় নাচতে নাচতেই এল। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিটা লক্ষ্য হয়নি তার। সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে। এসেই বললে : এই দিদি, তোকে একটা লোক খুঁজছিল। ঠিক যেমন বলেছিলাম আমি। চোখে চশমা, কোঁকরা চুল।

হঠাৎ ভূত দেখার মতোই ভূষণকে দেখে একহাত জিব কাটে!

ভূষণ বলে : আপনার বোন বুঝি? দেখি দেখি খুকি—এদিকে এসোতো! এ জামাটা বুঝি আপনারই করা? প্রশ্নটা নমিতাকে।

খুকি।

লতু একটা বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে যায় ভিতরে।

: কি হল?—বিস্ময় ফুটে ওঠে ভূষণের চোখে।

: আপনি ওকে 'খুকি' বলেছেন, তাই। উনি হচ্ছেন শ্রীমতী লতিকা দেবী!

: ও হো হো! বড় ভুল হয়ে গেছে তো! এই দেখুন—লেখা পড়া তো শিখিনি—তাই বিদ্যাসাগর মশায়ের উপদেশটা মনে থাকে না 'কানাকে কানা বলিও না, খুকিকে খুকি বলিও না'।

হরিপদ চক্রবর্তী জাত মাস্টার। ভুল উদ্ধৃতিটা আবার সংশোধন করে দেন তিনি : না না, বিদ্যাসাগর মশাই ঠিক ও কথা বলেননি।

ভূষণও মেনে নেয়, বলে : আজ্ঞে না, তিনি পণ্ডিত মানুষ, কানাকে কানা বলবেন কেন? তিনি কানাকে বলতেন পদ্মপলাশলোচন, খোঁড়াকে বলতেন তেনজিং নোরকে আর খুকিদের বলতেন শ্রীযুক্তেশ্বরী ঠানদিদি মহাশয়া।

সশব্দে হেসে ওঠে বৃদ্ধ পণ্ডিত। নমিতাও মুখ নিচু করে হাসি গোপন করতে। আর পাশের ঘরে ফুলতে থাকে লতু। আচ্ছা এর শোধ সে নেবে।

নমিতার যেন নতুন জীবন সুরু হয়েছে। উদয়াস্ত পরিশ্রম। সকালে, বিকালে, রাত্রে খচখচ খচখচ করে কল চালায়। সুবালার কলটা পৌঁছে দিয়ে গেছে ভূষণ নমিতাদের বাড়ি! প্রথম সপ্তাহের শেষে ভূষণ এসে জামাকাপড়গুলো হাতে নিয়ে কী খুশি। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নমিতার শিল্পকে। বলে,—এ রকম জিনিস দিতে পারলে যত দেবেন ততই নেব আমি। আর কাটতি বাড়লে আমারও লাভ আপনারও লাভ।

: নিশ্চয়ই। পরস্পরের সাহায্যের জন্যই তো এ ব্যবস্থা।

নমিতা একটু ইতস্তত করে। মজুরিটা কবে নাগাদ পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করা দরকার, কিন্তু এ পার্থিব প্রশ্নটা করতে কেমন যেন মন সরছে না। বিমুগ্ধ ভূষণ একটির পর একটি জামা পাট ভেঙে দেখল আর সত্যিকারের শিল্প সমালোচকের মতোই প্রশংসা করল—ঠিক তার পরেই মজুরির কথাটা তোলা কেমন যেন বেমানান লাগে।

বিন্দুবাসিনী এসে দাঁড়ান দ্বারপ্রান্তে।

নমিতা বলে : আমার মা।

ভূষণ পায়ের ধুলো নিয়ে বলে : আজ আসি তবে?

বিন্দুবাসিনী বলেন : এখনি যাবে? তাড়া আছে কোন?

: না তাড়া আর কিসের?

: তবে একটু বসে যাও না বাবা। উনি এখুনি এসে পড়বেন। আমি চায়ের জলটাও বসিয়ে দিই।

ভূষণ বলে : আপনার মেয়ের সেলাইয়ের হাত ভারি সুন্দর। আমার দোকান তো ডুবতে বসেছিল। এ যাত্রা বোধহয় উনিই রক্ষা করলেন।

নমিতা প্রতিবাদ করে : সে কি কথা ভূষণবাবু? আপনি মজুরি দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। দুঃখীর সংসারে আপনিই বরং সাহায্য করছেন। আপনিই বাঁচালেন আমাদের।

লতু দরজার ওপাশ থেকে বলে : তবে বোধহয় দুটি প্রাণই দুজনের জন্য বেঁচে আছে!

ওরা চম্‌কে ওঠে। ভূষণ বলে : কে ঠান্‌দি না?

নমিতা জবাব দিতে পারে না। সেলাইয়ের কাপড়গুলো নিয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে। দেখে লতু বালিশে মুখ গুঁজে হাসছে। নমিতা বলে : একেবারে গোল্লায় গেছিস তুই। কাকে কি বলতে হয় তাও জানিস না!

জবাব দেবার মত অবস্থা নয় লতুর। সে ডুগরে ডুগরে হাসছে খালি। সেলাইগুলো ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে নমিতা বলে : নে, এগুলো বেঁধে দে। আমি চায়ের জলটা বসিয়ে দিই।

লতু বলে : দায় পড়েছে আমার!

নমিতা চলে যায়। লতু কি ভাবে এক মিনিট। তারপর কাগজ কলম টেনে নিয়ে চট করে কি যেন লেখে। কাগজটা ভাঁজ করে রেখে দেয় একটা ব্লাউসের ভিতর। তারপর সবগুলো পাট করে বেঁধে দেয়।

ভূষণ একাই বসে ছিল বাইরে। বিন্দুবাসিনী সন্ধ্যা জ্বালতে উঠে গেছেন। হরিপদ এখনও ফেরেননি। এককাপ চা আর দুটো নারকেলের নাড়ু একটা প্লেটে নিয়ে প্রবেশ করে নমিতা। প্যাকেটটাও এগিয়ে দেয়।

ভূষণ বলে : একটা কথা। ঐ হলুদ রঙের বেবি ফ্রকটার কিন্তু মজুরি পাবেন না।

কেন? আমার অপরাধ?

ওটা মিঠুকে দেবে তার মাসিমা।

: ও, তা বেশ তো। তাহলে কিন্তু একটা শর্ত আছে। মিঠুকে নিয়ে আসতে হবে। তার মাসিমাই নিজে হাতে দেবে জামাটা।

ভূষণ রাজি হয়। পরের দিন মিঠুকে আসবে বলে কথা দেয়। তারপর ভূষণ বলতে থাকে তার সংসারের কথা। সুখ দুঃখের ইতিহাস। ক্রমে ওঠে কলোনির সামগ্রিক ভালমন্দের কথা।

রবিবারে মিটিং করা হচ্ছে। সকলকে ষোলো আনার ডাকে আসবার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। সেখানে ইচ্ছা করলে নমিতাও যেতে পারে।

নমিতা বলে : আমি কেন? আপনারাই ও সব করুন।

ভূষণ মাথা নাড়ে। বাগাড়ম্বর করে বোঝাতে চায়—মেয়েরাও এগিয়ে না এলে কিছুতেই কিছু হবে না।

ক্রমে হরিপদও এসে যোগ দেন আলোচনায়।

লতু কিন্তু আসে না।

ভূষণ চলে গেলে নমিতা বলে—তুই যে লুকিয়ে বসে থাকলি?

: তবে কি নাচব তোমার ঐ ভূষণ্ডীকাকের সামনে গিয়ে?

নমিতা হেসে ফেলে : তাতেই বা দোষ কি? তুই তো ওর কাছে এখনও খুকি!

: ভাল হচ্ছে না কিন্তু দিদি! ওঃ, কী আমার অপন জনরে! মিঠুর জন্যে জামা করে দেবে তাব মাসি! কেন, মাসি কেন? পিসী হতে কি দোষ?

খিলখিল করে হেসে ওঠে নমিতা : ও, তা বুঝি জানিস না? ঐ ভূষণ্ডীকাক যে বলে গেছে মিঠুকে শিখিযে দেবে তোকে 'মা' ডাকতে। তোকে মা ডাকলে তো আমাকে মাসিই ডাকতে হয়।

দুম করে একটা কিল মারে লতু দিদির পিঠে।

খেলার মাঠের ধারে রবিবার বিরাট জনসমাবেশ হল।

ভূষণ অথবা যোগেনের আশার সীমারেখা ছাড়ালো জনসংখ্যা। প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা হতো যথেষ্টই। চায়ের দোকানে, বাজারে, স্টেশনে অপেক্ষমান জনতার মুখে মুখে রোজই ফেরে নানান অভিযোগেব কাহিনী। একপক্ষ অভিযোগ করে, অপর পক্ষ ধৈর্য ধরে সবটা শোনে না—তার আগেই সে পেশ করে বসে তার অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলিত হয়ে গাল পাড়ে তৃতীয়পক্ষকে। সে তৃতীয়পক্ষ কখনও কলোনি পঞ্চায়েতের কর্তা ব্যক্তিরা, কখনও সরকার, কখন বা স্বয়ং ভগবান। তৃতীয় অভিযোক্তার কথা জানি না তবে বাকি কজন সে গালকে গ্রাহ্যও করে না। আজ সভা করে গালপাড়া হবে শুনে ওরা উৎসাহভরে সবাই জমায়েত হল।

প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযোক্তা তৃতীয় অভিযোক্তার মতোই রইলেন অনুপস্থিত। সভায় বক্তারা একে একে অভিযোগ পেশ করতে লাগলেন। কি কি চাই—তার একটা লম্বা ফিরিস্তি করা হল। স্কুলেব পাকাঘর, পাকা-রাস্তা, নতুন টিউবওয়েল, পুরানো নলকূপগুলির সংস্কার।

আর চাই কাজ! কর্মের বিনিময়ে গ্রাসাচ্ছাদন। অশক্তদের ফ্রি ডোল। মতিবিড়ি ফ্যাক্টারির জীবেন চাকি বলে : সবার আগে বাইঙ্গ্যা দিতি অইব অগোর পঞ্চাইৎ।

: বাংতে অইব কি কও? অগো তো বাইঙ্গ্যা দিছিই! ও পঞ্চাইৎরে আমরায় মানি না।

একটা বন্দোবস্ত বোধহয় আগের থেকেই করা ছিল ; পিছন থেকে কে চিৎকার করে ওঠে 'কলোনি পঞ্চায়েৎ—'

অনেকগুলি কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে ওঠে—'ধ্বংস হোক্!'

বারবার তিনবার। ক্রমশ কণ্ঠস্বর বাড়ে।

. পঞ্চাযেতের বিধান—

: মান্‌বনা, মান্‌ব না!

যোগেন নায়েক উঠে দাঁড়ায়। বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলে · ভাইসব! আপনারা সকলে একবাক্যে জানিয়েছেন যে বর্তমান পঞ্চায়েতকে আপনারা মানেন না। কেন মানেন না তা বিস্তারিত বলার দরকাব নেই। এ পঞ্চায়েতের পক্ষপাতিত্বের কথা, আত্মীয় পোষণের প্রচেষ্টা, ঘুষ খাওয়ার কেচ্ছা সবাই জানেন, আমরা আশা করেছিলাম—তাঁদের কেউ কেউ এ সভায় আসবেন। এলে আমরা আমাদেব অভিযোগ পেশ করতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে তাঁরা এখানে অনুপস্থিত।

সভায় একটা গণ্ডগোল হয়। কেউ বলে : আইব কুইথ্যাক্যা? আইলে হালাগো কৈফিয়ৎ দিতি হইব না?

· ঘরের মধ্যই অগো যতো বিক্রম—সভায় আইবার মুখ আছে নাকি?

ভূষণ প্রভৃতি 'চুপ করুন, চুপ করুন,' করে থামিয়ে দেয় গণ্ডগোল। যোগেন শুরু করে · সুতবাং সে সব ন্যক্কারজনক আলোচনা থেকে আমরা বিরত রইলাম। আমরা মেনে নিচ্ছি এ সভার সকলেই বর্তমান পঞ্চায়েতের উপর আস্থা হারিয়েছি। আমরা এ পঞ্চায়েত ভেঙে দিতে চাই।

সভায় সমর্থনসূচক সমবেত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

প্রমোদের পলিটিক্স করার অভ্যাস আছে, চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে : এ সভায় এমন কেউ কি আছেন যিনি বর্তমান পঞ্চায়েৎকেই বহাল রাখতে চান? যদি থাকেন তো হাত তুলুন।

কোন হাতেই ওঠে না।

যোগেন বলে : সভাপতি মশাই তা হলে লিখে নিন—এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

নিতাই কবিরাজ পূর্বেই সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি কি যেন নোট করেন।

যোগেন পুনরায় শুরু করে : তাহলে আমরা আমাদের এ সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষকে জানাব এবং দাবী কবব বর্তমান পঞ্চায়েতকে অবিলম্বে পদচ্যুত করতে। তাহলেই প্রশ্ন দাঁড়াবে নতুন কমিটি গঠনেব। কলোনির অন্তত সাত-আট শো লোক এখানে উপস্থিত আছেন। আপনারাই নির্বাচন করে দিন।

মতিবিড়ি ফ্যাকটারির জীবেন চাকি বলে : অখন তিনজনের একটা কমিটি করেন। পরে ভোট নিয়া পাক্কা কমিটি করবেন।

কানাই পাল বলে : আমারও তাই মত। আপাতত অ্যাডহক্ কমিটিই করা চলতে পারে।

ভূষণ বলে : তিনজনের কমিটি, তার একজন হবেন মুখপাত্র বা চেয়ারম্যান। আমি প্রস্তাব করছি বর্তমান সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নিতাই কবিরাজ মশাই চেয়ারম্যান হন—এবং তিনিই বাকি দুজনের নাম বলুন।

সভা একবাক্যে সমর্থন করে।

পিছন থেকে কে একজন চিৎকার করে ওঠে 'নিতাই ঠাকুর্দা—'

সমবেত কণ্ঠ : জিন্দাবাদ!

এটাও পূর্বপরিকল্পিত বোধহয়।

সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ওদের থামতে বলেন। 'চুপ চুপ' একটা সাড়া পড়ে যায়। নিতাই কবিরাজ বলেন : আপনারা সবাই যদি চান তাহলে যতদিন না নির্বাচন করা জনকল্যাণ কমিটি গঠিত হচ্ছে ততদিন অ্যাডহক কমিটি পরিচালনা করার দায়িত্ব আমি নিতে পারি। কিন্তু ভূষণ ভায়ার দ্বিতীয় প্রস্তাবের সঙ্গে আমি একমত নই। বাকি দুজনকে আমি নমিনেশন দিয়ে স্থির করব না। তাহলে বস্তুত সেটা একজনের কমিটিই হয়ে যাবে। আপনারাই স্থির করে বলুন বাকি দুজনের নাম।

কে একজন বললে : তাহলে একজন আমাদের জীবেন দা। মতিবিড়ি ফ্যাকটারির জীবেন চাকি।

জীবেন তৎক্ষণাৎ উঠে আপত্তি দেয়। তার কারখানার ঝামেলা ছেড়ে সে এ দাযিত্ব নিতে বাজি নয।

. তাহলে ভূষণ রায়। 'এ' ব্লকের ভূষণ বাবু।

সকলেই সমর্থন করে।

আর একজন?

জীবেন প্রস্তাব করে যোগেনের নাম।

সভাপতি বলেন : যোগেন আর ভূষণ দুজনেই এ ব্লকের লোক। এটা ঠিক হবে না। তাছাড়া সম্ভব হলে একজন মহিলাকে আমরা কমিটিতে নিতে চাই। মেয়েদের অনেক অভাব অভিযোগ তিনি জানতে ও জানাতে পারবেন।

হারাণ দের ভাইপো পরাণ দে বলে : আমি প্রস্তাব করতে আছি যে আমাগো মাইয়া ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস্কে কমিটিতে লওয়া হউক।

বিস্ময়ের কথা! সভার সম্মুখে মেয়ে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস বসে ছিলেন। আর কোনও সরকারি পদস্থ কর্মচারিই অবশ্য আসেননি সভাতে। ক্যাশডোল ক্লার্ক মৃণাল আর 'আর ও' সাহেবের ডেসপ্যাচার ক্লার্ক মিহির ছাড়া। হেডমিস্ট্রেস যে সভাতে উপস্থিত আছেন সেটা ভিড়ের অনেকেই এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি।

সুরেখা দেবী উঠে দাঁড়ান। জনতাকে মুখোমুখি করা তাঁর অভ্যাস আছে। কলেজে অনেক স্যোসালে ডিবেটিং সোসাইটিতে বক্তৃতা করতে হয়েছে। পরিষ্কার কণ্ঠে বলেন : আপনাদের একজন আমাকে যে সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, আমি সে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারলে ধন্য হতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার পক্ষে দুটি কারণে তা সম্ভবপর নয়। যদিও কর্মোপলক্ষ্যে আমি এখানকার বাসিন্দা—তবু আমি কলোনির রেজিষ্ট্রিভুক্ত লোক নই। দ্বিতীয়ত আমি সরকারী কাজ করি। আপনাদের এ সংগ্রামে আমার সহানুভূতি থাকলেও প্রত্যক্ষ যোগ রাখা সম্ভব নয়। তবে নিতাই বাবুর প্রস্তাবের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কমিটিতে একজন মহিলা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাই আমি প্রস্তাব করি, আমাদের স্কুলের শ্রীমতী নমিতা চক্রবর্তীকে আপনারা কমিটিভুক্ত করতে পারেন। তিনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।

নমিতা উপস্থিত ছিল সভায়। এ প্রস্তাবে সে একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠল। তবু এটুকু সে বুঝেছে যে এখনই প্রতিবাদ না করতে পারলে আর ভবিষ্যতে পরিত্রাণ পাবে না। উঠে দাঁড়িয়ে সেই কথাই সে বলতে চায়, কিন্তু একগুলি লোকের দৃষ্টির সম্মুখে কোন কথাই বলতে পারে না। হেডমিস্ট্রেসের দিকে চেয়ে যে কটি অসংলগ্ন কথা সে বলে তার কোনও অর্থ হয় না। হেডমিস্ট্রেস জনতার দিকে ফিরে বলেন : নমিতা সম্মত হয়েছে। তাকে এই গৌরবজনক পদ দেওয়ায় সে আমাকে বলছে আপনাদেব ধন্যবাদ জানাতে।

সকলে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে।

নমিতা বসে পড়ে।

সভার শেষে ভূষণ এসে উদ্ধার করে নমিতাকে : আপনাকে আর আমাকে যে এরা এভাবে যুক্ত করে দেবে তা ভাবিনি।

নমিতা জবাব দিতে পারে না।

ভূষণ আবার বলে : কী এত ভাবছেন বলুন তো?

: ভাব্‌ছি আমারও তো চাকরি আছে স্কুলে। আমাকে কমিটিতে নেওয়া কি ঠিক হল?

: সে দায়িত্ব হেডমিস্ট্রেসের। তিনিই আপনার নাম প্রস্তাব করেছেন। সভার বিবরণীতে সেটা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

: তাছাড়া—

: কি করবেন বলুন ; প্রজাপতির নির্বন্ধ!

নমিতা লাল হয়ে ওঠে।

ভূষণ তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে নেয়। নিতাই ঠাকুর্দার কর্মপন্থাটি ওকে বোঝাতে থাকে। পায়ে পায়ে দুজনে বাড়ির দিকে ফিরতে থাকে। মিটিং ভেঙে জনতা চলেছে যে যার বাড়ি। কয়েকজন আঙুল দেখিয়ে ওদের দিকে দেখাল। কি যেন বলাবলি করছে সবাই। নমিতা অস্বোয়াস্তি বোধ করে। ওব পাশাপাশি হেঁটে চলতে কেমন সঙ্কোচ বোধহয়। মনে পড়ে যায়, কেমন অবলীলাক্রমে ভূষণ বললে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'! লোকটা অসভ্য কিন্তু।

ভূষণ কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না জনতাকে। সে এক নাগাড়ে বকতেই থাকে। এতগুলো লোকেব ভালমন্দ এখন নির্ভর করছে তাদের উপর। এরা বাড়িঘর ফেলে এসেছে পিছনে। ছিল পি. এল ক্যাম্পে, সেখান থেকে গিয়েছিল পুনর্বাসনে সুদূর মধ্যপ্রদেশে—আবার ফিরে এসে উঠেছিল শেয়ালদ'

হাওড়া স্টেশানে। তারপর এসে উঠেছে বর্তমানে উদয়নগর কলোনিতে। উইপোকার মত বারবার গড়ে তুলছে ঘরবাড়ি। ভেঙে যাচ্ছে বারবার। তবু ক্ষেদ নেই এদেব। আবার গড়তে চায় এরা নতুন বল্মীক! প্ল্যানকরা কলোনিতে সারি সারি উইঢিপি গড়ে তুলছে এরা। হার মানবে না কিছুতেই!

অনিমেষের জ্বরটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বুকের বেদনাটাও। সুস্থ সবল জোয়ান মানুষটা ক্রমশই মিশে যাচ্ছে চৌকির সঙ্গে। চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে। চোখটা গিয়েছে বসে। সারা মুখে বেরিয়েছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সারাদিনই গোঙ্গায় যতক্ষণ জেগে থাকে। তার উপর ক'দিন ধরে জ্বরটা একেবারেই ছাড়ছে না। কাল রাত্রি থেকে আবার ভুল বকতে শুরু করেছে। কোটরগত চোখ দুটোয় ফুটে উঠছে একটা ঘোলাটে তমসাচ্ছন্নতা। মাঝে মাঝে কামিনীকেও চিনতে পারছে না। কামিনীর রীতিমত ভয় হয়েছে। সে বুঝতে পারছে কোন অনিবার্য পরিণতির দিকেই ছুটে চলেছে রোগী। বুকে তাব পাষাণভার চেপে আছে, কিন্তু কাঁদবার উপায় নেই।

রাত্রি প্রভাত হলে অনিমেষের গায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল : ওগো ক্ষিদে পেয়েছে? খাবে কিছু?

অনিমেষ মাথা নেড়ে জানায়—না।

খেতে চাইলে দেবার মতো অবশ্য কিছু ছিল না ঘরে।

: খুব কষ্ট হচ্ছে কি?

অনিমেষ জবাব দেয় না। আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে। হঠাৎ কামিনীর উদ্বেগনমিত মুখখানা ঠেলে দিয়ে বলে : দূর হ'! কেন ডাকছিস্ আমাকে? আমি যাবো না!

কামিনী চুপ করে বসে থাকে।

বাবলু সেই প্রথম দিনের পর আর আসেনি। বাবা-মা-দিদিদের নিয়ে আনন্দেই আছে সে—বৌদির কথা বোধ হয় মনেই পড়ে না। লতু অথবা নমিতা যে খবর নিতে আসবে না এটা জানা কথা। বাবলুই যখন এল না। নিজেই যাবে কিনা ভাবতে থাকে। কয়েক দিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়।

সেদিন অনিমেষের শরীবটা একটু ভালো ছিল—জ্বরটা কমে গিয়েছিল। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করেছিল : মাঝে ক'দিন আমার হুঁস্ ছিল না, নয়? আচ্ছা লতু কি বাবলু আসেনি ইতিমধ্যে?

কামিনী মাথা নেড়ে জানায়—না!

: আশ্চর্য!

দুজনেই চুপ করে থাকে।

অনিমেষ আবার বলে : দেখ, কাল থেকে মনে হচ্ছে—এযাত্রা বোধ হয় আর বাঁচব না। তোমার কি হবে?

কামিনীর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে। অনিমেষের জ্বরতপ্ত কপোলে। অদ্ভুত সংযমে সে ধীরে ধীরে বলে : বাবাকে খবর দেব?

: কখনও নয়! আমার দিব্যি থাকল বউ—আমার প্রাণ থাকতে তুমি সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে না! সেদিন যাবে শাঁখা ভেঙে সিঁদুর মুছেই যাবে।

স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে কামিনী বলেছিল : ওগো তুমি চুপ কর। অনিমেষও যে নিরুদ্ধ অভিমানে এমনি করে ফুলছিল—এভাবে যে তার বহিঃপ্রকাশ হতে পারে—কামিনীর তা ধারণা ছিল না।

সেই কথাগুলিই মনে পড়ল তার।

সন্ধ্যার দিকে অনিমেষ আর ডাকলে সাড়া দিল না।

কামিনী একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল।

গোরাকে বসিয়ে রেখে বাইরে এল। এখনই কিছু একটা করতে হবে। গলিটা পার হয়েই

পথচারীদের লুব্ধ-দৃষ্টিতে সচেতনতা ফিরে আসে তার। এ কাপড়খানা পরে—আর যাই হক পথে বার হওয়া যায় না। আবার ফিরে আসে। ভিজে গামছাখানা জড়িয়ে নেয় গায়ে। দ্বিতীয়বার পথে বার হতেই দেখা হয় বিষ্টুপদর সঙ্গে। পথ আগলে দাঁড়িয়েছে সে।

: কই যাও?

পথ না পেয়ে কামিনী থেমে যায়। জবাব দেয় না।

: অনিমেষডা ক্যামন আছে?

কামিনী সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করে বলে : ভালো নাই—দেখুন না এসে।

বিষ্টুপদ উদ্বিগ্ন হবার ভাব দেখায়। দুজনে ফিরে আসে বাড়িতে। বিষ্টুপদ অনিমেষের পাশে গিয়ে বসে। শান্ নেই তার। বিষ্টু নিজেকেই ধিক্কার দেয়। কী অপদার্থ সে! এমন একটি পূর্ণযৌবনা বধূ বাস করছে তার বাড়ির একশ হাতের মধ্যে—একেবারে অসহায় অবস্থায়—যার স্বামী ডাকলে সাড়া দেয় না—আর বিষ্টুপদ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি?

রান্নাঘরের কাছে গিয়ে বলে : জ্বর যান্ বাড়তেছে লাগে বউ! এমন হৈছে আমারে একডা খবর দাও নাই ক্যান? কোন ডাক্তার দ্যাখতেছে?

: ডাক্তার? ডাক্তার ডাকব কি করে?

: কও কি? আরে ছি ছি! করছ কি! আমারে কও নাই ক্যান?

কামিনী গায়ের গামছার একটা খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলে : আপনার সেই দশ টাকার এক পয়সাও শোধ দিতে পারিনি, আপনাকে ডাকব কোন মুখে?

বিষ্টুপদ হেসে ওঠে, তারপর হঠাৎ ওর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে বলে : আমারে ডাকবা এই চাঁদমুখেই।

বলেই বেরিয়ে যায়।

কামিনীর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। ইচ্ছা করে উনানের ওপাশ থেকে একখানা চেলাকাঠ তুলে নিয়ে বসিয়ে দেয়। কিন্তু বিষ্টুপদ তার আগেই বেরিয়ে যায়। রাস্তার মোড় থেকে বলে : লালুবাবুরে ডাইক্যা আনতেছি বৌ!

কামিনী কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

বিষ্টুপদ রান্নাঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়ানো বধূটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ডাক্তার ডাকতে যেতে তার মন সরে না। উদাস দৃষ্টি-মেলা সুগঠিত-তনু বধূটির সর্বাঙ্গ লেহন করে ফেরে তার ক্ষুধিত দৃষ্টি। দক্ষিণ বাহুমূল অনাবৃত, হাঁটুর উপরে খানিকটা ফেঁসে গেছে শাড়িটা। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের আবরণীতে যৌবনকে শাসন করতে পারেনি মেয়েটি। বিষ্টুপদ কিছুতেই ফিরে যেতে পারে না। সাহস বেড়ে গেছে তার। ফিরে আসে পায়ে পায়ে। কামিনী টের পায় না—উদাস দৃষ্টিতে চেয়েই থাকে উর্ধ্ব আকাশের দিকে!

: বৌ!

চমকে ওঠে বধূটি!

: ডাক্তারবাবু বাইরের লুক। তোমার এ সজ্জা দেখলি মুনিঋষিরও মন টলে। কাপড়খানা পালটে পর।

কামিনী আর স্থির থাকতে পারে না। সে বোঝে তার অসহায়তাকে নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে ব্যঙ্গ করতেই ফিরে এসেছে লোকটা! সামনের দুটো দাঁত নেই। পানরসসিক্ত জিহ্বাটা দেখা যায় মুখের গহ্বরে। চোখে একটা সরীসৃপসুলভ লুব্ধ দৃষ্টি। এই ক্লেদাক্ত সরীসৃপটা তাকে ধীরে ধীরে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলছে—এটা বুঝতে কামিনীর কষ্ট হয় না। কঠিনস্বরে বলে : আপনিও তো বাইরের লোক। আর শাড়ি থাকলে আপনার সামনেও এ বেশে বের হতাম না নিশ্চয়।

: কি কও! আমি তো ঘরেরই লুক। আমার আর দেখনের বাকি আছে কি। কত দ্যাখলাম, ফিরাবার

কত দ্যাখবাম।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় বিষ্টুপদ।

ওঘর থেকে অনিমেষের আর্তকণ্ঠে ভেসে আসে। রোগ-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে লোকটা। কামিনী ওর পাশে গিয়ে বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সে বুঝতে পেরেছে এই বার তার চরম পরীক্ষা এসে গেছে। সোনা দানা যা ছিল ঘরে অনেকদিনই ফুরিয়েছে তা, ঘটি বাটিও নিঃশেষিত হয়েছে। যেটুকু সম্পদ নিয়ে সে পূণ্যভূমি ভারতবর্ষে এসেছিল তিলে তিলে নিঃশেষিত হয়েছে তা। বাকি আছে হাতের একজোড়া শাঁখা আর সীমন্তে এক ফোঁটা সিঁদুর। ঐ নিঃশেষিত-প্রাণ রোগজীর্ণ মানুষটার বুকের একটু ধক্‌ধুকানি। এই সে ভেবে এসেছিল এতদিন। আজ হঠাৎ বিষ্টুপদর লুব্ধ চোখের আরশিতে দেখেছে আরও এক সম্পদ আছে তার। সে সম্পদ তার নারীত্ব—তার পূর্ণ-যৌবনা দেহখানি। পরীক্ষা, পরীক্ষা! সমস্ত জীবনভর কঠিন পরীক্ষাই দিয়ে চলেছে সে। মাথা উঁচু করে দেবতার সমস্ত অভিশাপই গ্রহণ করেছে। দুঃখরাত্রে সংসার তরীর-হাল ধরে দক্ষ নাবিকের মতোই পাড়ি জমিয়েছে এতদিন। আজ বোধ হয় চরমতম পরীক্ষা দেবার ডাক এসেছে ওর। নিষ্ঠুর পাষাণ-দেবতা যেন এইবার ওকে ডেকে বলছেন 'বেছে নাও, তোমার স্বামী-পুত্র একধারে, আর অন্যধারে তোমার সতীত্ব ধর্ম। কাকে চাও তুমি, বেছে নাও।

ছুটে গিয়ে কামিনী দেওয়াল থেকে টেনে নামায় কালিঘাটের পটখানাকে ; বলে : তুমিও না মেয়েমানুষ! হতে পারো দেবতা—তবু মেয়ে মানুষ তো তুমি? বল, বল রাক্ষুসী—তোমাকে এ পরীক্ষায় ফেললে তুমি কী জবাব দিতে? তোমারও তো স্বামী পুত্র আছে—তুমিও তো মহাসতী!

: মা! আমার ভয় করছে!

মায়ের উন্মাদিনী মূর্তি দেখে ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেছে গোরা। কামিনী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ছেলেকে : ভয় কি মাণিক? এই তো আমি। কোন ভয় নেই। ঘুমাও। ক্ষিদে পেয়েছে?

গোরা নির্জীবের মত শুয়ে মাথা নাড়ে : না!

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে কামিনীর। কাল রাত্রেও গোরা কিছু খায়নি। বিকালে খেয়েছিল আধখানা পেঁপে। আজ এত বেলাতেও ওর ক্ষিদে পায়নি। অতটুকু ছেলে পর্যন্ত বুঝেছে মায়ের অসহায়তা। ঘরে কিছু নাই। মাকে করুণা করে মিথ্যা বলছে সে। আর ঐ বিষ্টুপদ, ঐ নিষ্ঠুর ভগবান—তার অসহায়তা নিয়ে উল্লাস করে, ব্যঙ্গ করে। সে মানে না,—ঈশ্বর নাই! মা-কালী নাই! ফটোখানা সে নামিয়ে রাখে।

ওর মনের মধ্যেও জেগে উঠেছে বুঝি কালাপাহাড়—'থাহ্‌ক্‌লেও তুমি বোবা, তুমি কানা।'

: বৌ!

উঠে বসে কামিনী। বিষ্টুপদ ফিরে এসেছে। বিষ্টুপদ ওকে 'বৌ' বলে ডাকে কেন?

: ডাক্তারবাবু এসেছেন?

: না আয়েন নাই। এখান্ পড়্যা লও!

বিষ্টুপদর হাতে একটা লালপাড় তাঁতের শাড়ি।

কামিনী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

: লও লও! আর মশ্‌করা কর না।

: না!

: না ক্যান? কাপড় পড়বা না?

: না।

জিবের ডগাটা বেরিয়ে আসে বিষ্টুপদর। বলে : ঐ বস্ত্রহরণের গোপনারী সাজ্যাই থাকবা?

মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে কামিনীর। একটা অসহায় আক্রোশে ফুলতে থাকে।

বিষ্টুপদর সাহস বেড়ে যায়। খপ্ করে কামিনীর হাতখানা ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। গুঁজে দেয় শাড়িখানা ওর শাঁখা সর্বস্ব হাতে।

কামিনী আর সহ্য করতে পারে না। ঠাশ্ করে মারে এক চড় বিষ্টুপদর গালে। বিষ্টুপদ এতটা আশঙ্কা করেনি। একটা অসহায় মেয়ে, বিবস্ত্রপ্রায় বধূর এতটা দুঃসাহস হবে তা সে কল্পনাই করতে পারেনি। এগিয়ে আসে একপা। হাত বাড়ায় ঐ নারী-মাংসের দিকে। কামিনী চিৎকার করে উঠ্তে যায়। এক বিন্দু শব্দ বার হয় না তার কণ্ঠনালী দিয়ে। সভয়ে দুহাতে মুখ ঢাকে সে। পরমুহূর্তেই একটা ক্লেদাক্ত জান্তব আলিঙ্গনের আশঙ্কায় সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে!

ঠিক সেই মুহূর্তেই চিৎকার করে ওঠে গোরা '—মা!'

বিষ্টুপদ চম্‌কে ওঠে! অনিমেষের অবশ্য ঘুম ভাঙেনি ; কিন্তু ঐ এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের আওয়াজটায় ঘরটা গম্‌গম্ করতে থাকে। সোজা হয়ে দাঁড়ায় কামিনী। তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে। সে নিঃসহায়া নয়! সে শুধু অসহায়া বধূ নয়—সে জননী! সন্তান সেকথা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে তার মাতৃ-সম্বোধনে। বিষ্টুপদ কামিনীর চোখে দেখতে পায় সেই হিংস্রতা—যেটা ফুটে ওঠে নরহত্যাকারীর চোখে চরম মুহূর্তের পূর্বক্ষণে! বিষ্টুপদ গোরার উপস্থিতিতে আত্মসংবরণ করতে বাধ্য হয়। বলে· থাহ্‌কল তোমার শাড়ি। ডাক্তারের প্রয়োজন বুঝল্যা আমারে খবর দিব্যা ; ন্যাংটো হয়্যা আসবা না। শাড়িখান পইড়্যাই আসবা।

চলে যায় বিষ্টুপদ!

গোরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ওঠে কামিনী।

: আমার ভয় কি! আমার গোরাচাঁদ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কেউ পারবে না তার মায়ের গায়ে হাত দিতে।

জননী আর পুত্রের অশ্রুস্রোত মিশে যায় ডি-ব্লকের একটা জীর্ণ কুটিরের একান্তে!

দুনিয়া সে খবর রাখে না!

নমিতার দিনগুলিতে যেন নতুন সুর লেগেছে। মাঝে মাঝে তার গুন্ গুন্ করে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। মনে পড়ে ঘুরে ফিরে ওই একটা লোকের কথাই। ওর হাতের কাজ যে গিয়ে বিক্রি করছে কলকাতার বাজারে। স্কুল থেকে ফিরে সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত ফর্সা শাড়িটা ছাড়ে না। গামছা দিয়ে রগড়ে মুখটা মোছে। কপালে পরে একটা লাল টিপ। পাউডার মাখা ছেড়ে দিয়েছে অনেক দিন। নতুন করে কিনতে লজ্জা করে—লতু কি ভাববে?

সপ্তাহ কয়েক ঘন ঘন আসছে ভূষণ। এ সপ্তাহান্তেও আবার এল। এসেই বলে : কই আপনার বোন কোথায়। ডাকুন তো তাকে।

একটু ঘাবড়ে যায় নমিতা—কেন কি হয়েছে?

: আরে বাপরে বাপ্! ঠান্‌দিদি বলেছি বলে কি এ রকম রসিকতা করতে হয়? মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি সেদিন।

কথাটা অতিরঞ্জিত নয়। নমিতার তৈরি জামা-ফ্রকগুলো নিয়ে ভূষণ দোকানে রাখে। এ সপ্তাহে বিক্রি ভালোই হয়েছে। একদিন এক ভদ্রমহিলা দোকানে এসে ত্রিশ ইঞ্চি ব্লাউজ খোঁজেন। ভূষণ নমিতার করা ব্লাউসের বাণ্ডিলটা বার করে দেয়। প্রথমটা খুলেই ভদ্রমহিলা একখণ্ড কাগজ আবিষ্কার করেন। সেটি দেখে তাঁর মুখ চোখ বেগুনি হয়ে ওঠে ;—কাগজ খানা দেন তিনি সঙ্গের ভদ্রলোককে। তিনি মারতে আসেন আরকি! খদ্দেরের সঙ্গে রসিকতা! প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। শেষে পাশের দোকানদারেরা রক্ষা করে। ভূষণ হাত জোর করে বলে—দর্জির দোকান থেকে বাণ্ডিল-বাঁধা জামা এনেছে, ভিতরে কি কাগজ আছে সে জানে না। অনেক বকাঝকা করে ওঁরা চলে যান। ভূষণ তখন

কাগজখানা তুলে নিয়ে দেখে তাতে লেখা আছে

ভূষণ্ডী কাকের মত চেহারাটি প্রভু।
আরশি সামনে লয়ে দেখেছেন কভু?

খরিদ্দার ভদ্রলোকের সঙ্গে যে মহিলাটি এসেছিলেন তাঁর তনুদেহখানি ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। গাত্রদাহ হবার এটাই হয়তো কারণ।

লতুকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ভূষণ বলে একদিন আপনাকে নিয়ে যাব আমাদের বাড়ি। পিসীমা আপনাকে দেখতে চান।

বেশ তো, যাব।

অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে ভূষণ। বিন্দুবাসিনী কখন উঠে যান। আজ লতুও বাড়ি নেই। হরিপদ মাস্টারও অনুপস্থিত। দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে যায়। ভূষণ বলে,—কি যে করি, সপ্তাহে দুদিন মাত্র বাড়িতে থাকি। একা একা মিঠুযাটা সারা সপ্তাহ কাঁদে। আমাদের পাড়ার ওর সমবয়সী নেই। পিসীমার সঙ্গে আর কী খেলা করবে? ও মেয়েটাকে মানুষ করাই কঠিন হয়ে উঠেছে।

আপনার বোন-টোন নেই?

এ প্রশ্নের মধ্যে হাসির কি আছে? ভূষণ মিটি মিটি হাসতে থাকে।

নমিতা অস্বস্তি বোধ করে। ভূষণ অবশেষে বলে ছিল, মারা গেছে।

ও! তা হলে আবার একটা বিয়ে করে ফেলুন।

আবার!—হাসে ভূষণ। এবার প্রকাশ্যেই।

হাসি নয়। মেয়েটাকে তো মানুষ করতে হবে।

সতীনের মেয়েকে যত্ন করবে কিনা—বুঝব কি করে? তার চেয়ে এই ভালো। দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

সব মেয়েই কিছু অমানুষ নয়। আপনি আগে থেকেই ওরকম ভাবছেন কেন? বহু জায়গায় তো ঘোরা ফেরা করেন—দেখে পছন্দ করে বিয়ে করুন।

ভূষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে নমিতার দিকে। নমিতা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। ভূষণ ধীরে ধীরে বলে আমি পছন্দ করলেও সে আমাকে পছন্দ করবে কিনা তার স্থিরতা কি? আমার চেহারাটা তো দেখেছেন—উপার্জনও এই সামান্য—লেখাপড়াও খুব কিছু একটা শিখিনি—তার উপর দোজবরে।

নমিতা জবাব দিতে পারে না। জবাব একটা দেওয়া উচিত—প্রতিবাদ করাটাই এক্ষেত্রে ভদ্রতা কিন্তু ভূষণের ঐ স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি আর কাটা কাটা কথায় বেচারী কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারে না কিছু। ভূষণই আবার বলে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?

আমি? আমি কি সাহায্য করব?

কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে নমিতার! বুকের ভিতর দুম্ দুম্ করে কে যেন ঘা মারে। পঁচিশ বছরের কুমারী মেয়েটির মনে লেগেছে ঝড়ের স্পর্শ। এখুনি হয়তো ভেঙে পড়বে একেবারে। মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে যায় অতিক্রান্ত যৌবনের অনাদৃত ইতিহাস। দেশে থাকতে বাবার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল নমিতাকে পাত্রস্থ করবার। অনিমেষের সঙ্গে একই দিনে বিয়ে হওয়ার কথা তার। সে বিয়ে স্থগিত রাখতে হয়েছিল পাত্র অসুস্থ হয়ে পড়ায়। সুস্থ হওয়ার পর পাত্রের পিতা গ্রহণ করতে রাজি হননি নমিতাকে। যার আগমন সম্ভাবনাতেই তাঁর পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে—সে মেয়ের বিষনিঃশ্বাস সহ্য হবে তার পুত্রের তারপর থেকে হরিপদ পণ্ডিত মাঝে মাঝে নিয়ে আসতেন অপরিচিত ভদ্রলোকদের। বিন্দুবাসিনী সাজিয়ে দিতেন মেয়েকে মনের মতো করে। এক রাশ লজ্জা নিয়ে নমিতা গিয়ে বসত

পরিদর্শকদের সম্মুখে। ওঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতেন, নাম জিজ্ঞাসা করতেন, হাতের লেখা দেখতে চাইতেন, হস্তরেখা দেখতেন। ওঁদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অদ্ভুত একটা অনুভূতি জাগতো, মনে হত একটি মাত্র উত্তরের উপর হয়তো নির্ভর করছে তার জীবন, যৌবন—আশা আকাঙ্ক্ষা সব! তারপর ওঁরা চলে যেতেন। মেয়ে পছন্দ হয়নি কথাটা মোলায়েম করে জানিয়ে দিতেন চিঠি লিখে।

সেই বিস্মৃতপ্রায় অনুভূতিটা জেগেছে আবার। নমিতার হৃদপিণ্ডে রক্তের তালে তালে ফিরে এসেছে সেদিনের সেই শিহরণ! নমিতা,—পঁচিশ বছরের অতিক্রান্ত-যৌবনা উদ্বাস্তু মেয়েটি!

ভূষণও একটু ইতস্তত করে বলে : আপনার খোঁজে আছে নাকি ঐ রকম কোনও মেয়ে?

প্রশ্নটা সরল রেখায় সোজা পথে না এসে—একটু তীর্যক গতিতে আসায় নিঃশ্বাস ফেলে নমিতা। একটু সহজ বোধ করে। হেসে বলে : দেখি খোঁজ করে। কিন্তু মিঠুকে আনার কথা ছিল যে আজ আপনার?

: আচ্ছা নিয়ে আসব এর পরের দিন।

নমিতা প্রসঙ্গটা বদলে নিতে চায়। জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর্দার কথা। গণকল্যাণ-সমিতির কথা। ভূষণ অধুনাতম সংবাদটি জ্ঞাপন করে। ভূষণ আর নিতাইপদ ওয়েল-ফেয়ার-অফিসারকে জানিয়েছিলেন ওঁদের সেদিনকার মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত। তিনি সে সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হননি। তখন ওঁরা গিয়েছিলেন কলকাতায় উপরওয়ালার কাছে। সেখানে গিয়ে শুনে এসেছেন কলোনিতে আসছেন একজন নতুন অফিসার—অ্যাডমিনিস্ট্রেটর উদয়নগর কলোনি। তিনি এসে নতুন করে সব ব্যবস্থা করবেন। এ কলোনিতে নাকি অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হবে। সেইজন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এখানেই এসে থাকবেন। এখন এঁরা অপেক্ষা করছেন সে ভদ্রলোকেরই।

নমিতা অধীর আগ্রহে সব শোনে।

পরদিন সকালে আবার অনিমেষের জ্বরটা কমে আসে। স্বাভাবিকভাবে কথা বলে সে। দুর্বল হয়ে পড়েছে বটে আরও।

বলে : আজ বোধহয় জ্বরটা ছাড়ল, নয়?

কামিনীরও মনে হয় জ্বরটা খুব কমে গেছে। শুক্‌নো মুখে হাসি ফুটে ওঠে ওর।

অনিমেষে বলে : আচ্ছা এর মধ্যে কেউ আসেনি?

কামিনী চুপ করে থাকে!

অনিমেষ বলে : আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এ রকমটা হতে পারে। আর সকলের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু বাবলু? সেও এল না একবার?

কামিনী যোগ দেয় : তা ছাড়া বাবলুকেও যে ওঁরা আটকে রাখলেন—এ সংসারটা তাহলে কি করে চল্‌বে সেটা ওঁরা ভেবে দেখলেন না?

অনিমেষ বলে : আর বাবা যে বলে গেলেন নমিতা মাসে মাসে টাকা পাঠাবে—তাও তো পাঠাল না নমিতা।

: ঠাকুরঝি টাকা পাঠিয়েছিল—পনের টাকা।

: পাঠিয়েছিল? নিজে আসেনি? কে এনেছিল লতু না বাবলু?

: না, মনি অর্ডার পিয়ন!

অনিমেষ চুপ করে শুয়ে থাকে। কেউ কোনও কথা বলে না। হঠাৎ অনিমেষই আবার বলে : উঃ! এরপরেও বেঁচে থাকতে হবে। ছোটবোনের এভাবে অবজ্ঞায় ছুঁড়ে ফেলা ভিক্ষা অন্নে জীবন ধারণ করতে হবে! কি করব? আমি অসুস্থ, স্ত্রী-পুত্রকে খেতে দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

কামিনী বলে : সে টাকা আমি নিইনি গো। মনি অর্ডার ফেরত গেছে।

অনিমেষ চমকে ওঠে : নাওনি? তবে সংসার চল্‌ছে কি করে?

কামিনী বলে : কই আর চল্‌ছে বল? কিন্তু তবু টাকাটা নিতে পারিনি আমি। ছোট বোন, ছোট ভাই এদের কারও হাতে পাঠাতে পারত টাকাটা—নিজে না এসেও। মনিঅর্ডার করেছেন! কুপনে কিচ্ছু লেখা নেই! আমি নিতে পারিনি টাকাটা!

অনিমেষ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। টাকাটা ফেরত দেওয়ায় সে খুশি হয়েছে কি দুঃখিত হয়েছে তা বোঝা যায় না।

সে একমনে কি ভাবতে থাকে।

কামিনী বলে : কী ভাবছ অমন করে?

: ওঁরা কত দিন গেছেন বলতো?

: আজ সতের দিন।

: সতের দিন!—আর কোনও কথা বলে না। চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে। কামিনী উঠে যায়। ঘরের কাজকর্ম করতে থাকে। গোরাকে বসিয়ে দেয় বাপের মাথার কাছে। বলে মাথায় হাওয়া করতে। ছোট্ট গোরা একটা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করে অনিমেষকে।

অনিমেষের মস্তিষ্ক খুব ভালো কাজ করছে না। জ্বর ভোগ করে দুর্বল লাগলে নিজেকে। তবু সে ভাবছিল ঐ একটা কথাই। সতের দিন চলে গেছেন ওঁরা? যতদূর মনে পড়ে ওঁরা চলে যাওয়ার সময় সংসারের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়—আর্থিক অবস্থাটা। তারপর সতের দিন চলেছে সংসার? তিনটি প্রাণীর সংসার বিনা উপার্জনে চলতে পারে এতদিন? নমিটা টাকা পাঠিয়েছিল—আর তা প্রত্যাখ্যান করেছে কামিনী? কিসের জোরে সে প্রত্যাখ্যান করে এ অর্থ? অভিমান? যার স্বামী মৃত্যুশয্যায়—শিশুসন্তান অনাহারে শুকিয়ে আসছে তার আবার অভিমান! তবে কি—?

মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে অনিমেষের। বাবা, মা, নমিতা, লতু, বাবলু—এতগুলি লোক একবার খোঁজও নিতে এল না? বিষবৎ পরিত্যাগ করে যায় কেন সবাই? আর সবার কথা ছেড়ে দিলেও, বাবা? তিনি কিসের ভরসায় ছেড়ে গেলেন জ্যেষ্ঠপুত্রকে, একমাত্র বংশধর নাতিকে? যাবার দিনে কেন বলে গেলেন '...উপার্জনের অনেক পন্থা আছে অনু?'

গোরার হাতখানা টেনে নেয় অনিমেষ, বলে : আর হাওয়া করতে হবে না।—পাখাখানা রেখে দেয় গোরা।

: হাঁরে গোরা। আমি যখন ঘুমাই তখন কেউ এ বাড়িতে আসে?

: না তো বাবা।

: কেউ আসেনি? এ কদিনের মধ্যে কেউ আসেনি?

: বিষ্টু দোকানি এসেছিল একদিন।

বিষ্টুপদ! সেই চরিত্রহীন বদমায়েসটা!

: মাকে মারছিল বাবা! আমি কেঁদে ওঠায় ছেড়ে দিল।

মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে অনিমেষের। এটুকুই বোধহয় বাকি ছিল! এর চেয়ে ছোট বোনের ভিক্ষা-অন্নে জীবনধারণ করা কি ভালো ছিল না!

দুপুরে আবার প্রবল জ্বর এল অনিমেষের।

কামিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে।

ক'দিন পরে ভূষণ আবার এল। এবার মিঠুকে নিয়েই। নমিতা দেখলো অবাক হয়ে বাপের সঙ্গে চেহারার মিল নেই। ভূষণ কালো, মেয়েটি ফুট্‌ফুটে। বোধহয় মায়ের রূপ পেয়েছে। অল্পেই নমিতার

সঙ্গে ভাব হযে গেল। নতুন জামা পেযে মিঠু খুব খুশি। লতু আজও পাড়া বেড়াতে বেবিযেছে। হবিপদ পণ্ডিত জানতে চাইলেন গণ কল্যাণ সমিতিব কথা। ভূষণ বলতে থাকে সব কথা বুঝিযে। নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেটব কার্যভাব বুঝে নিযেছেন। কলোনিতে এসে কাজে যোগ দিযেছেন তিনি। নিতাই ঠাকুর্দা আব ভূষণ তাঁব সঙ্গে দেখা কবে সব কথা বলতে গিযেছিলেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটব ধৈর্য ধবে ওঁদেব বক্তব্য বিষয শুনেছেন বটে তবে আশাপ্রদ কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। ঠাকুর্দা বুঝিযে দিযেছিলেন যে, বর্তমান পঞ্চাযেতেব উপব কলোনিবাসীব কোনও আস্থা নেই। ওবা সাধাবণ লোকেব স্বার্থ বলি দিযে নিজেদেব স্বার্থ বজায বাখছে। তাই নযা পঞ্চাযেত গঠন কবতে হবে। নির্বাচন স্থিব কবতে হবে নতুন পঞ্চাযেতেব সভ্য।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটব বাগচি সাহেব বলেছেন আপনি যা বলছেন তাই যে কলোনিবাসী সবাই চায তাব প্রমাণ কি?

নিতাই ঠাকুর্দা মিটিং-এব কথাটা উল্লেখ কবেন। মিটিং-এ যে সব প্রস্তাব পাশ কবানো হযেছিল সেগুলো পেশ কবেন।

বাগচিসাহেব বললেন এ কলোনিতে দশবাবো হাজাব লোক। মাত্র সাত-আট শো লোক একটা সভা কবে যদি কোনও সিদ্ধান্তে আসেন সেটাকে সমস্ত কলোনিবাসীব ইচ্ছা বলে ধবে নেওযা যায না

কিন্তু মিটিং-এ যদি এব চেযে বেশি লোক না আসে তাহলে আমবা কি কবতে পাবি?

আপনাবা কিছু কবতে পাবেন না , কিন্তু এ থেকে প্রমাণিত হয আপনাদেব আহ্বানে মাত্র সাত আটশো লোকই সাড়া দিচ্ছে। ওতে প্রমাণ হয আপনাদেব বিরুদ্ধবাদীদেব সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া এ মিটিং-এ আপনাদেব বর্তমান পঞ্চাযেতব কেউ উপস্থিত ছিল না। তাঁদেব বক্তব্যও শোনেন নি আপনাবা।

ভূষণ বলেছিল আমবা তাদেব ডেকেছিলাম। তাঁবা কেউ আসেননি। সে দোষও আমাদেব নয নিশ্চযই।

নিতাই ঠাকুর্দা বলেছিলেন আপনি যা বল্‌ছেন তাতে আপাত যুক্তি থাকলেও সে যুক্তি অন্তঃসাবশূন্য মিটিং ডেকে বড বড বেজলুশন এতবাব নেওযা হযেছে—যে মিটিঙেব ডাকে এবা আব সাড়া দেয না স্তোকবাক্য আব আশ্বাস ওবা আব শুনতে চায না। সুতবাং মিটিং ডেকে আমবা কলোনিব পাঁচ ছয হাজাব লোককে জোগাড কবতে পাবব না—এটা সবিনযে স্বীকাব কবে নেওযাই ভালো।

বাগচি বলেন তা হলে আপনি মেনে নিচ্ছেন অধিকাংশ লোক আপনাব সঙ্গে একমত নয?

মোটেই তা নয। আমি বলছি, অধিকাংশই আমাদেব পক্ষে। তাই আমি প্রস্তাব কবছি যে আপনি বর্তমান পঞ্চাযেতকে বলুন কলোনিব সামগ্রিক ভালমন্দ বিষযে আলোচনা কবাব জন্য একটা মিটিং ডাকতে। সেখানে আমবাও আসব। আমাদেব অভাব অভিযোগ পেশ কবব। নথি-পত্র-সাক্ষী প্রমাণ সব নিযে আসব আমবা। ওঁবা জবাবদিহি কবে যদি আমাদেব তুষ্ট কবতে পাবেন তাহলে ভালই।

আব ও ' সতীশবাবু বলেন না না সেসব হবে না। তাহলে সে সভাতেই একটা গণ্ডগোল হবে—মাবামাবি বেধে যাবে।

বাগচি বলেন তা কেন হবে? আমবা দবকাব হলে আগেব থেকে পুলিশ এনে বাখব।

'আব ও ' বলেন প্রথমেই এটা কববেন না স্যব।

কেন বলুন তো?

নিতাই ঠাকুর্দা বলেন কেন তা উনি আমাদেব সামনে বলতে পাববেন না। হযতো আমবা চলে গেলেও পাববেন না। তবে কাবণটা যে কী তা উনিও জানেন আমবাও জানি। আপনি সম্ভবত জানবেন দুদিন পবে—যদি জানবাব চেষ্টা কবেন।

ভ্রূকুঞ্চিত হয় বাগচি সাহেবেব।

ঠাকুর্দা একভাবেই বলেন : আপনি রাগ করবেন না স্যার। কথাটা সত্যি। আপনিই বরং একটা মিটিং ডাকুন। সেখানে হাজির করুন আপনার পঞ্চায়েতের মেম্বারদের। আমরাও হাজির করব আমাদের অভিযোগ। নথি পত্র-সাক্ষী-প্রমাণ। আপনি নতুন লোক। সব হয়তো বুঝবেন না, তাই আমরা অনুরোধ করব যে সভায় আর. ও.-সাহেব যেন উপস্থিত থাকেন।

আর. ও. বলে ওঠেন : আমি তো আগেই বলেছি মিটিং হবে না।

ঠাকুর্দা বলেন : আপনার আমলে হয়নি সে তো জানিই, স্যার। এঁর আমলে হবে কিনা তাই জানতে চেয়েছি।

বাগচি বলেন : আচ্ছা আমি দুদিন সময় নিয়ে জানাচ্ছি আপনাদের।

ঠাকুর্দা বলেন : বেশ। তাই দেখুন!

ওঁরা আগ্রহ ভরে এই নবীন পরিবেশের কথা শোনেন ভূষণের কাছ থেকে। হরিপদ পণ্ডিত, বিন্দুবাসিনী আর নমিতা। গণকল্যাণ সমিতির কাজ শুরু হয়ে গেছে। ভূষণ বলে এরপর থেকে নমিতাকেও আসতে হবে। এভাবে পালিয়ে বেড়ালে চলবে না! আলোচনা জমে ওঠে। হঠাৎ একসময় নমিতা লক্ষ্য করে কখন উঠে গেছেন ওর বাবা আর মা। মিঠুও পাশের ঘরে একা একা বসে খেলা করছে।

ভূষণ বলে : সত্যিই আপনার সেলাইয়ের হাতটা ভারী সুন্দর। আপনার কাটগুলো খুব পছন্দ করছে লোকে।

নমিতা বলে : সে কৃতিত্ব আমার নয়। কাটগুলোর আবিষ্কার তো আমি করিনি—কোনও একজন ওই কাট চালু করেছেন। আমি দেখে অনুকরণ করেছি মাত্র।

: ও ভাবে বললে তো সব কিছু সম্বন্ধেই যুক্তি দেখানো যায়। অমুক ভালো গান গায় বললে আমরা ধরে নিই না যে সে নিজে গানটা লিখেছে বা সুর দিয়েছে। কারও দেওয়া সুর নকলই করতে হবে গান গাইতে গেলে।

: আপনি বুঝি গান বাজনা খুব ভালোবাসেন।

: বাসতাম এককালে।

: অর্থাৎ এখন আর বাসেন না।

: এখনও হয়তো বাসি ,—কিন্তু সময় আর সুযোগ তো নেই—তাই ভালোবাসাটা গানবাজনা থেকে অন্য কিছুর উপর এসে পড়েছে।

নমিতা একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে : তা হলে বলব আপনি কোনও দিনই গান বাজনা ভালোবাসতেন না।

: কেন?

: সত্যিকালের ভালোবাসলে কখনও সেটা ফুরিয়ে যেত না।

ভূষণও একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে : আপনি যে কথা বলছেন ওটা মেয়েদের তরফের কথা। পুরুষমানুষ ও কথা কোনও দিন স্বীকার করে না।

নমিতা কি একটা কথা বলতে গিয়েও থেমে যায়।

ভূষণ বলে : আমি জানি আপনি কি ভাবছেন। আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা তো?

নমিতা চম্‌কে ওঠে। আশ্চর্য! ঠিক ঐ কথাই সে ভাবছিল।

ভূষণ হো হো করে হেসে ওঠে।

নমিতা অবাক হয়ে বলে : হাসছেন কেন?

ভূষণ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়, তারপর শূন্যের দিকে চেয়ে বলতে থাকে :

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী যখন মারা যায় তখন ভেবেছিলাম জীবনটা বুঝি ফুরিয়ে গেল! রোজ

সন্ধ্যাবেলায় একটা করে ধূপকাঠি জ্বেলে দিতাম ওর ফটোর পাশে। কবে যে সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে জানি না। এখনও যন্ত্রচালিতের মতো একটি করে ধূপকাঠি জ্বেলে যাই—কিন্তু দিনান্তে একবারও তার কথা মনে পড়ে না। আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কত নিচ, কিন্তু এটাই বোধহয় জীবনের ধর্ম!

নমিতা বলে : না, এ জন্যে আপনাকে দোষ দেব কেন? আমি তো সেদিন নিজেই বললাম আপনার আবার বিয়ে করা উচিত।

ভূষণ যোগ করে : হ্যাঁ আর সেই সঙ্গে বলেছিলেন যে আমার জন্যে পাত্রীর খোঁজ করবেন।

নমিতা হেসে বলে : করছিই তো।

: এখনও খুঁজে পাননি কাউকে।

. কই আর পাচ্ছি বলুন।

: তবে আর খুঁজে কাজ নেই।

: কেন?

ভূষণ বলে,—কেন তাও কি বলে দিতে হবে? আচ্ছা বলছি। খোঁজের দরকার নেই কারণ সে রকম একটি মেয়ের খোঁজ আমি নিজেই পেয়েছি।

নমিতা মুখ তোলে। চোখাচোখি হয় ভূষণের সঙ্গে। ভূষণের ওষ্ঠে হাসির রেখা। মুখ নিচু করে নমিতা।

: শুধু আমার মতো দোজবরে ছেলেকে তার পছন্দ হবে কিনা এটাই জানা হয়নি।

নমিতা চুপ করে থাকে। হঠাৎ খুব নিচু স্বরে ভূষণ প্রশ্ন করে—

: তুমি একটু খোঁজ নিয়ে জানাবে?

নমিতা ধরা গলায় বলে : আমি? বা—রে, আমি কি করে জানব কার কথা বলছেন আপনি?

· আচ্ছা তবে থাক। আমি নিজেই না হয় জিজ্ঞাসা করব। করব?

নমিতার সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ বহে যায়। জবাব দিতে পারে না। ও ঘর থেকে মিঠু চিৎকার করে ওঠে : মাছি আমার ভয় করে।

নমিতা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। তাড়াতাড়ি উঠে যায় ওঘরে। তেলাপোকাটাকে তাড়িয়ে দিয়ে মিঠুকে কোলে তুলে নেয়। দু'হাতের আলিঙ্গনে বুকের মাঝে পিষতে থাকে মিঠুকে।

মিঠু হাঁপিয়ে ওঠে, বলে : ছেলে দাও!

: না দেব না। আগে আমাকে 'মা' বল্।

: বলব না। তুমি তো মাছি!

: না, মা! বল্ শিগ্গির, নইলে—

চুমায় চুমায় অস্থির করে তোলে মিঠুকে।

ওঘর থেকে ভূষণ ডাকে—আয় মিঠু বাড়ি যাই।

মিঠু এঘর থেকে বলে : ছালে না যে।

বিন্দুবাসিনী একবাটি চা দিয়ে আসেন ভূষণকে দিতে। নমিতা নামিয়ে দেয় মিঠুকে। সে ওঘরে ছুটে যায়। নমিতা আর কিছুতেই ওর সামনে যেতে পারে না। রাজ্যের লজ্জা এসে ওর পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে। কিছুক্ষণ পর ভূষণ চলে যায় মিঠুকে নিয়ে।

আজ লতু সমস্তক্ষণই অনুপস্থিত।

লালু ডাক্তারের ডিস্পেন্সারিটা পোস্ট অফিসের উল্টো দিকে। সবাই চেনে সেটা। সকাল থেকেই লালুবাবুর ডিস্পেন্সারিতে রোগীর ভিড়। আর যে কোনও জিনিস দুষ্প্রাপ্য হোক রোগ আর রোগীর

অভাব নেই কলোনিতে। লালু ডাক্তারের দুঃখ এইটুকুই—রোগীদের যদি সেই অনুপাতে 'ফি' দেবার ক্ষমতা থাকতো! দুবেলা মিলিয়ে অন্তত পঞ্চাশটা রোগী দেখেন তিনি। সবাই আসে ওঁর ডিস্পেন্সারিতেই। বুড়ো মানুষ, বয়স হয়েছে। বাড়ি গিয়ে রোগী দেখা ছেড়েই দিয়েছেন আজকাল। রোজগার হয় সত্যিকারের ওষুধ বিক্রি থেকে। ভিজিট দেবার ক্ষমতা আর কটা লোকের আছে? উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন বটে কিন্তু রোজগার কই? কোনও ছোট শহরে যদি গিয়ে বসতেন আর এর চার ভাগের একভাগ পশার হত তাহলেও সচ্ছলভাবে সংসার চলে যেত তাঁর। এক একবার মনে হয়—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাবেন ; কিন্তু হয়ে ওঠে না।

ধর্মভীরু লোক লালু ডাক্তার। কালীসাধক তিনি। অ্যালোপাথ। সাত সকালে স্নানাহ্নিক সেরে গরদখানা পরেই এসে বসেন ডাক্তারখানায়। সাত জাতকে ছুঁতে হয়। গরদ পরে থাকলে সুবিধা আছে। তেষ্টা পেলে গঙ্গাজলটুকু অন্তত খাওয়া চলে। ডাক্তারখানায় একটা ডিস্‌টিল্ড ওয়াটারের বোতলে গঙ্গাজল রাখা আছে আলাদা করে।

ভোরবেলা থেকেই রোগী আসতে শুরু করে। রুগী, রুগী আর রুগী। অবশ্য অপেক্ষা করতে হয় তাদের। লালুবাবু গলায় চাদর দিয়ে যুক্ত করে দেয়ালে প্রলম্বিত পটের ছবিগুলির তলায় মাথা ঠোকেন আর বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। বাইরে রোগীরা কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু উপায় কি? ঘরের ভিতরে দেয়ালের দেবতারাও যে কিউ দিয়ে আছেন। কোন দেবতাকেই চটাবার সাহস নেই ধর্মভীরু লালু ডাক্তারের।

কথাবার্তা হচ্ছিল বাইরের অপেক্ষমান জনতার মধ্যে। নিতাই বৈরাগী জনার্দন যুগীকে জিজ্ঞাসা করে : আজকাল করতাছোডা কি?

: করবাম ফিরাবার কি? বইয়াই আছি!

: ব্যাপারীর ব্যবসাটা?

মাথা নাড়ে জনার্দন। তার মানে হতে পারে ভালো চলছে না। অথবা ছেড়ে দিয়েছে। সকলেরই এই অবস্থা। কর্মসংস্থানের যে কটা পথ ওরা দেখতে পেয়েছিল কলোনিতে এসে তার মধ্যে ব্যাপারীর ব্যবসাটাতেই লোক ঝুঁকেছিল বেশি। কালনা-ঘাট অথবা নবদ্বীপ থেকে চালের বস্তা কিনে সাইকেলের পিছনে বেঁধে নিয়ে এসে এ পারে বিক্রি করা। দু' মনি বস্তা অনায়াসে ভারসাম্য রক্ষা করে নিয়ে আসতো ওরা কেরিয়ারে বেঁধে। জ্যোৎস্না রাত্রে সার দিয়ে চলতো সাইকেলের ক্যারাভান—একদলে ত্রিশ চল্লিশটা সাইকেল। জেলার সীমান্ত-রেখার এপার ওপার। মাইল সাত-আট পথ। পিচঢালা পরিষ্কার পথ। মনকরা চার আনা তো বটেই—ক্ষেত্র বিশেষে আট-দশ আনাও লাভ থাকে। দিনে চার-পাঁচ ক্ষেপ মারতে পারলেই হল। অবশ্য সীমান্তের দু পারেই খরচ আছে। তা থাক্‌---খরচখরচা বাদেও ওতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাটা হয়ে যেত। তারপর দুর্ভাগ্যক্রমে কন্ট্রোলের ব্যবস্থাটা গেল উঠে! ব্যবসাটাও উঠে গেল ফলে।

এ ছাড়া আর একদল করতো তরকারির ব্যবসা। গ্রাম থেকে সস্তা দামে সব্জি কিনে এনে কলোনির বাজারে বেচা। কিন্তু দুটি কারণে এ ব্যবসাটাও উঠে যেতে বসেছে। প্রথমত কলোনিতে ক্রেতার অভাব আর দ্বিতীয়ত বহু লোক ঢুকে পড়লো এ কাজে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় বেশি এ ব্যবসায়ে। নামমাত্র একটা বাজার টিমটিম করছে কলোনিতে। কিছু লোক জনমজুর খাটতে যায় সদর শহরে অথবা জংসনে। ওরা যায় সকাল সাতটার লোকালে। ফেরার ঠিক নেই। যে কোন ট্রেনে ফিরলেই হল। সব ট্রেনই উদয়নগরে থামতে বাধ্য। টাইম-টেবিলে যাই লেখা থাক না কেন—সবাই জানে সব গাড়িকেই দাঁড়াতে হবে উদয়নগরে। সে মেলই হক আর এক্সপ্রেসই হক। কামরায় কামরায় শেকল আছে না? ঝুপঝাপ করে নেমে পড়ে ওরা। প্রথম প্রথম মেলট্রেনের ড্রাইভার অথবা গার্ড অপরাধীকে ধরার চেষ্টা করত—ক্রমশ তারাও এটা মেনে নিয়েছে স্বতঃসিদ্ধভাবে। একদল আছে হকার। হাজারো রকম সওদা

নিয়ে ট্রেনে ট্রেনে ফিরি করে ফেরে। ভিক্ষাজীবীও যথেষ্ট।

সবচেয়ে মুশ্‌কিল হয়েছে শিক্ষিত লোকদের। উদয়নগর মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর কলোনি। শ্রমজীবী সংখ্যালঘিষ্ঠ। শিক্ষিত বেকার যুবকদেরই হয়েছে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা। না পারে তারা গায়ে খাটতে, না পায় চাকরি, না পারে হাত পাততে। চেষ্টার ত্রুটি নেই ওদের। নৈতিক বালাই যাদের অল্প তাদের মধ্যে কিছু লোক একটা ভালো ব্যবসা ফাঁদলো। রাজনীতির ব্যবসা! মিটিং করে, বক্তৃতা করে, ঝাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে প্রসেশন করল তারা। গড়ে উঠ্‌ল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল। এসব দলের দলপতিদের যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লোন পাইয়ে দেবে বলে এরা সাধারণ মানুষের মুরুব্বি সাজে। ট্রেডলোনই বল, ল্যাট্রিন লোনই বল আর ম্যারেজ গ্রাণ্টই বল—কোনরকম সরকারি সাহায্য পেতে হলে নাকি খরচ করতে হয়। এ কথাটা সাধারণ কলোনিবাসি লোকমুখে শুনে শুনে ধ্রুবসত্য বলে বুঝে নিয়েছে। কিন্তু খরচটা কিভাবে করতে হয় অনেকে জানে না। আন্দাজ করে হয়তো, তবে সাহস পায় না অনেক ক্ষেত্রে। তারা তখন মুরুব্বি খোঁজে। এরা সাহায্য চায় এমন লোকের যে গট্‌গট্‌ করে ঢুকে যেতে পারে আর. ও. সাহেবের অফিস ঘরে স্লিপ না দিয়েই ! সরকারি অফিসার হঠাৎ জীপ থামিয়ে যাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলেন : অমলবাবু—আপনাদের ব্লকের সেই টি. বি. রুগীটির একটা বেড পাওয়া গেছে। আপনি একবার দেখা করবেন আমার সঙ্গে অফিসে।

এই জাতীয় অমলবাবু, শিশিরবাবু প্রভৃতি জননেতার স্মরণাপন্ন হয় কলোনিবাসী। যারা এ জাতীয় জননেতা হয়ে উঠতে পারেনি তাদের মধ্যেও অনেক শিক্ষিত যুবক রোজগার করত শুধু দরখাস্ত লিখে দিয়ে। ফুলস্কাপ কাগজে লিখে দিত তারা আবেদন-পত্র। পত্র পিছু মজুরী দু'-আনা!

ঘরের ভিতরে লালুবাবুর সামনে বসেছিলেন জংশনের ডাক্তার সেন। সেন শহরের ডাক্তার। নাম ডাক আছে। ক্লিনিক খুলেছেন একটা। ডাক্তার সেন বলছিলেন . আপনি কিন্তু আমার দিকটা একেবারেই দেখছেন না ডাঃ দত্ত। এ মাসেই অন্তত দুবার কন্‌সালটেশানে ডেকেছি আপনাকে আমি।

ডাক্তার দত্ত এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট ড্রয়ার থেকে বার করে এগিয়ে দেন সেনের দিকে। বলেন ধরান। আমিই কি তা অস্বীকার করছি মশাই! কিন্তু কী করব বলুন। সে রকম কেস আমি পাই কই?

: এটা কি বিশ্বাস করতে বলেন? কলোনিতে এত রুগী—আপনার চেম্বারে এত ভিড়—আর ক্লিনিকাল কেস পান না আপনি? কলোনিতে টি. বি. কেসও হয় না?

: আরে হবে না কেন? প্রতি তিনখানা বাড়ি অন্তর একটা লোক ধুঁকছে। ক্লিনিকাল কেস অন্তত দশ পাঠাতে পারি আমি আজই। সকলেরই পরীক্ষা করানো দরকার। কিন্তু কেটে ফেললেও এক বেটার কাছ থেকে সিকিটা আদায় করতে পারবেন না। নামেই রাজরোগ, হয় যত বেটা হাড়-হাভাতের! লোন পাবার জন্য টাকা খরচ করছিস—কার্ডের লোকসংখ্যা বাড়াবার জন্যে খরচ করছিস—আর শুধু ডাক্তারকে ফি দেবার সময়ই 'বড় গরিব স্যার, মাফ করন লাগবো?'

ডাক্তার সেন চুপ করে থাকেন। কি বলবেন তিনি?

শেষে বলেন : আচ্ছা, আজ আসি?

লালুবাবু বলেন : আরে বসুন, বসুন, চা আনতে দিয়েছি।

ডাক্তার সেন একটা সিগারেট ধরান। লালুবাবুর দেওয়া কাঁচি নয়—রেড অ্যাণ্ড হোয়াইড। নিজের পকেট থেকেই বার করে ধরান। একরাশ ধোঁয়া ছাড়েন মুখ দিয়ে।

বাইরে থেকে নকুল নিবেদন করে : ওদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না স্যার।

: আচ্ছা একে একে পাঠাও স্লিপ দিয়ে।

ডাক্তার সেন হাসেন : বেশ আছেন মশাই আপনি। কিউ দিয়ে রুগী দাঁড়িয়েছে। আধুলি করে দিলেও তো টাকা দশেক হয়ে যাবে এ বেলাতেই।

ডাক্তার দত্ত বলেন : দুঃখ তো তাই। ডবল পয়সা হিসাবেও দেবে না বেটারা ; আধুলি তো দূরের কথা। উল্টে ওষুধ চেয়ে বসে ধারে। আর এখানে আমার প্রেস্কৃপশান শুধু ধারেই কাটে—মানে আমার গলা পর্যন্ত!

একে একে রুগী প্রবেশ করে। নকুল, ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার তথা সহকারী। রোগীর নাম ধাম রেজিস্ট্রিতে তুলে স্লিপ দিয়ে ভিতরে যাবার ছাড়পত্র দেয়। পরীক্ষা চলে। ওষুধ লেখা হয়। ওদিকের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায় ওরা।

বাইরে একটা গণ্ডগোল ওঠে।

লালুবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন : কি হচ্ছে কি ওখানে, নকুল? এত গণ্ডগোল কিসের?

: এই দেখুন না স্যার। স্লিপ না নিয়েই জোর করে ঢুকতে চায়। সত্যিই জোর করে ঢুকে পড়ে কামিনী, ডাক্তারের ঘরে। লালুবাবু একটা প্রচণ্ড ধমক দিতে গিয়ে থেমে যান। রুক্ষকেশা, স্খলিতবাসা, ঢাকাই বেনারশী পরা মেয়েটিকে দেখে সামনে নেন নিজেকে। নকুলকে বলেন : তুমি বাইরে যাও।

: ও স্যার স্লিপ নেয়নি।

: সে তো শুনলাম। এখন তুমি বাইরে যাও।

হতাশ নকুল হাত দুটো উল্টে দেয়। অর্থাৎ কর্তার মর্জি বোঝা ভার। বাইরে যেতে হয় তাকে। লালুবাবু চায়ের পাথর বাটিতে একটা চুমুক দিয়ে মেয়েটিকে অপাঙ্গে একবার দেখে নেন আপাদমস্তক।

: এখানে জোর করে ঢুকলে কেন তুমি?

কামিনী একেবারে মরিয়া হয়েই এসেছিল। আবেদন, অনুনয়, ভিক্ষা তো অনেক হল। এবার সে দাবী জানাতে এসেছে। পথের মধ্যে একটা মানুষ আছাড় খেয়ে পড়লে আর পাঁচজনে তাকে ধরে তোলে। পথচলতি মানুষের এ একটা অলিখিত ধর্ম। জীবনের পথেই বা এ আইনটা প্রযোজ্য নয় কেন? মানব সভ্যতা প্রতিবেশির কাছে এটুকু দাবী করতে পারে। সভ্যজগত এ দাবী মেনে নিতে বাধ্য। বলে : আমার স্বামী অত্যন্ত অসুস্থ। বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। আপনি চিকিৎসক, তাই আপনাকে জানাতে এসেছি।

ডাক্তারবাবুর উত্তর দিতে একটু দেবি হয়। তিনি একদৃষ্টে দেখছিলেন ওকে। মেয়েটির মস্তিষ্কবিকৃতি নেই তো? চোখদুটো টক্‌টকে লাল, মাথার চুলগুলো রুক্ষ—হয় বহুদিন তেল মেখে স্নান করে না অথবা সাবান দিয়ে মাথা ঘষেছে। পরিধানে একখানা ঢাকাই বেনারশী। মাঝে মাঝে ফেঁসে গেছে। ড্রেস করে পরেনি কিন্তু। সাধারণ করেই পরেছে।

লালুবাবু বলেন : এটা দাতব্য চিকিৎসালয় নয়। ডাক্তারবাবুর প্রাপ্য না দিয়ে তুমি জোর করে ঢুকলে কেন তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

: আপনার প্রাপ্য দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

: কিন্তু আমি তো দানছত্র খুলিনি। এটাই আমার জীবিকা। তোমরা যদি আমাকে আমার প্রাপ্য না দাও—

: দেব না কে বলল? দেব। তবে এখন আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

ডাক্তারবাবু একটু অবাক হন। মেয়েটির কণ্ঠস্বরে করুণা ভিক্ষার কোনও আভাস নেই। যেন বিনা পারিশ্রমিকে রুগী দেখাই লালু ডাক্তারের কর্তব্য—সে কথাটাই সে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তাঁকে।

: ধারে কারবার করি না আমি। তুমি যেতে পার।

হঠাৎ কামিনীর সব উৎসাহ ফুরিয়ে যায়। মুখরার মতো এতক্ষণ এতগুলো কথা এক নিশ্বাসে বলতে পেরেছে এটাই আশ্চর্য ওর মত ঘরের বধূর পক্ষে। ঐ একটি মাত্র কথায় বেচারী একেবারে নিভে যায়। বেদনার্ত হয়ে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর। অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে : ডাক্তারবাবু, আমরা বড় গরিব।

এটা চেনাসুর লালু ডাক্তারের কাছে। এতক্ষণে বাঁধাগতে ফিরে এসেছে কথোপকথন—ভাবেন লালু ডাক্তার।

: আমি আপনার কেনা হয়ে থাকব। আপনি আমার স্বামীকে ভালো করে দিন। আমি আপনার বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে শোধ দেব।

লালুবাবু বলেন : রোজ বিশ-পঁচিশটা মুমূর্ষু রোগী দেখি আমি। তারা সবাই গরিব। তারা সকলেই বলে ঝিয়ের কাজ করে শোধ দেব আপনার ঋণ! ত্রিশটা ঝি তো লাগবে না আমার বাড়িতে।

কামিনী বসে পড়ে ওঁর পায়ের কাছে। লজ্জাশরম ত্যাগ করে হাত বাড়ায় ওঁর ফিতে বাঁধা জুতোর দিকে।

: আহ্! এ মেয়েটাতো জ্বালালে দেখছি! লাফ দিয়ে সরে যান ডাক্তারবাবু।

হঠাৎ আত্মসম্মান ফিরে আসে কামিনীর। তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়ায় সে!

ডাক্তার সেন হেসে বলেন : অবনক্সাস্! হাউ ডেয়ার সি এক্সিবিট হারসেল্ফ ইন সচ্ এ ট্রান্সপারেন্ট ট্রেসিং ক্লথ? শায়াও নেই হায়াও নেই!

কামিনী বুঝতে পারে না ওঁর ইংরাজি রসিকতা ; কিন্তু শেষ কথাটায় আন্দাজ করতে পারে অশ্লীল ইঙ্গিতটা। জ্বলে ওঠে ওর চোখ। বলে : কী! কী বললেন?

জবাব দেন লালুবাবুই : কি করবে বল? কৌরব সভায় দ্রৌপদী নারায়ণকেই স্মরণ করেছিলেন। ডাকো, ভগবানকে ডাকো। পারলে তিনিই ভালো করে দেবেন তোমার স্বামীকে। না হয় নিয়ে এস তাকে, একটা অষুধ দেব অখন দেখে শুনে। এবার যাও দেখি!

: যাচ্ছি, যাচ্ছি, নারায়ণকেই ডাকব আমি! মনে ভাববেন না আমার সে ডাক ব্যর্থ হবে। ভগবান না করুন বিনা চিকিৎসায় যদি আমার স্বামীর কিছু হয় তখন দেখবেন এ দ্রৌপদীর অভিশাপও ফলবে। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করেন আপনারা! ভুলে যাবেন না কৌরবকুল নির্বংশ হয়েছিল ঐ দ্রৌপদীর অপমানেই!

এক ফোঁটা জল নেই আর কামিনীর চোখে। কাঁপতে কাঁপতে সে বেরিয়ে আসে। লাল বেনারসী শাড়ি পরা নববধূর সজ্জায় সেজেছে সে। মনে হচ্ছে ওর সারা দেহে যেন আগুন ধরে গেছে। সে আগুনের শিখায় জ্বলে উঠেছে ওর দেহ-মন-অন্তরাত্মা!

বাড়িতে ফিরে এসে দেখে অনিমেষ তখনও আচ্ছন্নের মত পড়ে। গোরা বসে আছে ওর বাপের মাথার কাছে! বেলা বেশ বেড়ে উঠেছে। রৌদ্র কড়া হয়েছে। কামিনী ঘরে ঢুকে গোরাকে প্রশ্ন করে· হাঁরে, তোর বাবা উঠেছিল এর মধ্যে?

: হাঁ মা, একবার আমাকে বললে 'কোথা থেকে টাকা পাচ্ছিস'? আমি তো মা টাকার কথা জানি না কিছু।

: ও কিছু নয় বাবা!

: বড় ক্ষিদে পেয়েছে মা—পেঁপে আর আছে?

কামিনী ইতস্তত করে। ঘরে গিয়ে এটা ওটা নাড়াচাড়া করে। বিক্রয় করার মত, বাঁধা দেওয়ার মত কিছুই নজরে পড়ে না। তাছাড়া সে ব্যবস্থাই বা করবে কে? তারপর হঠাৎ মনে পড়ে বেনারশী শাড়ির জরিও বিক্রয় হয়। হোক পুরনো শাড়ি—তবু ওর জরিগুলোর কিছু একটা দাম হবেই। কাপড়টা ছেড়ে—শাড়িখানা হাতে নিয়ে ইতস্তত করে। পুরনো কাপড়খানাই আবার পরেছে। এটা পরে, আর যাই হক পথে বার হওয়া যায় না।

: হাঁরে গোরা, তুই মেয়েস্কুলের হেডমিস্ট্রেসের বাড়ি চিনিস?

গোরা জানায় সে চেনে।

কামিনী হাঁফ ছেড়ে বাঁচে : এরবার যা তো তাঁর কাছে।

শাড়িখানা একটা কাগজে জড়িয়ে দেয়। গোরার হাতে দিয়ে বলে—এখানা নিয়ে যা। একখানা চিঠি লিখে দেয় সে হেডমিস্ট্রেস্ সুরেখা দেবীকে। লেখে তার স্বামীর অবস্থার কথা, অর্থহীনতার কথা। পরিশেষে লেখে 'এখানা আমার বিয়ের বেনারসী। পুরনো হয়ে এসেছে যদিও, তবু জরির দাম একটা কিছু হবেই। এটা রেখে আপনি যদি গোটা পাঁচেক টাকা ছেলেটির হাতে পাঠান তাহলে ওকে কিছু কিনে খেতে দিতে পারি।'

গোরা বলে : কিছু নেই? একটা কিছু খেয়ে গেলে হত?

কামিনী ওর মাথায় গালে হাত বুলিয়ে বলে : এই চিঠিখানা নিয়ে হেডমিস্ট্রেসের কাছে গেলে উনি পাঁচটা টাকা দেবেন। তখন ফেরার পথে বরং চার আনার সন্দেশ কিনে খাস্। দেখিস্, হারাস না যেন টাকাটা।

ছোট্ট গোরা ঘাড় নাড়ে। হারাবে কেন? ঐ তো হেডমিস্ট্রেসের বাড়ি—ফুটবল খেলার মাঠের পাশে। আর খাবারের দোকান তো গলির মুখেই। ঠিক পারবে সে।

গোরা চলে গেলে কামিনী স্বামীর মাথার কাছে গিয়ে বসে।

: কোথায় গিয়েছিলে সাত সকালে?

কামিনী চম্‌কে ওঠে। অনিমেষ যে জেগে আছে বুঝতে পাবেনি সে। বলে : ডাক্তারবাবুর কাছে?

: সত্যি বলছ?

: মিথ্যে বলব কেন?—অবাক হয় কামিনী।

গম্ভীর হয়ে যায় অনিমেষ। চোখ দুটি বুজে আসে।

দরজার কড়াটা নড়ে ওঠে।

কামিনী এসে খুলে দেয়।

লালু ডাক্তার!

: তোমার স্বামীকে একবার দেখতে এলাম। কোথায় সে?

কামিনী বিস্মিত হওয়াও ভুলে গেছে। যন্ত্রচালিতের মত অনিমেষকে দেখিয়ে দেয়। লালুবাবু এসে অনিমেষের নাড়ি দেখেন। চোখ বুঁজে আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে সে। স্টেথো দিয়ে বুক দেখেন। পবীক্ষা শেষ করে জানতে চান কতদিনের অসুখ—অন্যান্য বিবরণ। মোহগ্রস্তের মতো জবাব দিয়ে যায় কামিনী। ডাক্তারবাবু জানতে চান—বাড়িতে আর কে আছে। কামিনী জানায় সে একাকী।

: কি বুঝলেন আমায় বলুন। অনেক সহ্য করেছি ডাক্তারবাবু—সব খুলে বলুন—আমি সহ্য করতে পারব। লুকোবেন না কিছু।

লালুবাবু খস্‌খস্ করে একটা প্রেসকৃপসান লিখে দেন : দিনে তিনবার খাবে এটা।

: কি হয়েছে ওঁর?

: হয়েছে অনেক কিছুই। রোগীর অবস্থা ভালো নয়। তবে যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করালে না বেঁচে ওঠার কোনও কারণ নেই।

: ডাক্তারবাবু আমি আপনার কেনা হয়ে থাকব—

ডাক্তারবাবু যন্ত্রপাতিগুলি গুছিয়ে তোলেন নীরবে।

: প্রেসকৃপশান লিখে দিলেন—কিনব কি করে আমি? আমার হাতে কি একটা পয়সা আছে?

: তার আমি কি করতে পারি বল? আমি চিকিৎসক—পরামর্শই দিতে পারি শুধু।

কামিনী চটে যায় : ওষুধ কেনার ক্ষমতা যে আমার নেই একথা তো জানতেন আপনি। তা হলে এলেন কেন?

লালুবাবু বলেন : এক শিশি ওষুধ খাওয়ালেই তো চিকিৎসা শেষ হবে না। তা যদি হত না হয় নিজেব পকেট থেকেই ওষুধের খরচটা দিতাম আমি। এ রোগীর সমস্ত চিকিৎসার ভার তো আমি

নিতে পারব না।

: তবে কি বিনা চিকিৎসায় লোকটা শেষ হয়ে যাবে?—তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করে কামিনী।

লালুবাবু চুপ করে থাকেন। কী বলতে পারেন তিনি। ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চোখ মেলে তাকায় অনিমেষ। ঘোলাটে-লাল দুটো চোখ। কেউ খেয়াল করে না।

কামিনী কি যে করবে ভেবে পায় না। তারপর যেন সমস্ত বিশ্ব-জগতের উপর তার নিরুদ্ধ আক্রোশ ভেঙে পড়ে লালুবাবুর উপর।

: চিকিৎসা করলে লোকটা বাঁচতে পারে—তবু তাকে দেখবে না কেউ? বাপ-মা দেখবে না—ভাই-বোন দেখবে না! তারা সবাই টাকা চিনেছে! লোকটা বেকার! আপনিও ওকে বাঁচিয়ে তুলবেন না! ও যে বেকার আজ! বেশ মরুক তবে ও ! কিন্তু দেখবেন আপনি—এতে কখনও ভালো হবে না আপনাদের!—কেঁদে ফেলে সে।

লালুবাবু যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন : তুমি অভিশাপ দিও না মা।

: দেব না? কেন দেব না?—উন্মাদিনীর মত চীৎকার করে ওঠে কামিনী!

ধীরকণ্ঠে লালুবাবু বলেন : বেশ দাও! আর আমার ভয় নেই। একটা কথা বলি মা—কিছু মনে কর না। আমি তোমার বাপের বয়সী! এখন যে শাড়িখানা পরে আছ তাতে তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছি না। আমার ডাক্তারখানায় গিয়েছিলে দেখলাম পাতলা একখানা ঢাকাই বেনারসী পরে—চৌকির নিচে ধুলোয় লোটাচ্ছে দেখছি একখানা পাট-না-ভাঙা আন্‌কোরা নতুন তাঁতের শাড়ি! অথচ তোমার হাতে ওষুধ কেনার টাকা নেই বলছ; এ থেকে যদি কেউ...থাক্ মা! ঘরে অচৈতন্য স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই—মনে হচ্ছে ভদ্রঘরের বধূ ছিলে একদিন। এভাবে কি বাঁচিয়ে তুলতে পারবে তোমার স্বামীকে?

কামিনীর দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এতক্ষণে সচেতন হয় সে নিজে দেহসজ্জার দিকে। সঙ্কোচে মরমে মরে যায়। বলে : বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু—

লালুবাবু হাত দুটি জোড় করে বলেন : থাক্ মা ও কথা। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি আমি। মনে ভেবেছিলাম—হয়তো ঘরে দ্বিতীয় বস্ত্র নেই—ভদ্রঘরের কোন সতী মেয়ের অভিশাপ লাগবে আমার। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি আমি। সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। সারা গা ঢাকার মত নতুন শাড়ি মেজেতে লুটাচ্ছে তবু যে মেয়ে—যাক্ ও কথা! ডাক্তারবাবুর কর্তব্য আমি করে গেলাম। আর আমাকে ডাকতে যেও না যেন।

কোনদিকে না তাকিয়ে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে যান ডাক্তার লালমোহন দত্ত। কামিনী মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়ে। হু হু করে কেঁদে ওঠে। এত লোক এতবার তাকে অপমান করেছে—রূঢ় ভাষায়, সে প্রতিবাদ করে এসেছে এতদিন। এবার ধীর স্থির কণ্ঠে যে লজ্জাকর কথাগুলি বলে গেলেন ডাক্তারবাবু তার প্রতিবাদ করার ভাষা জোগালো না ওর মুখে। কোনও জবাব দিতে পারল না। মনে হল সবই বুঝি ফুরিয়ে গেল। স্বামীকেও বাঁচাতে পারলো না—সতীত্বের অভিমানও হল ভূলুণ্ঠিত। হঠাৎ খাটের নিচে থেকে নতুন তাঁতের শাড়িটা টেনে বার করল। এটাকে এখনই পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শাড়িটা এ বাড়িতে এখনও রয়েছে বলেই অপদেবতার স্পর্শ লেগে রয়েছে এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ওই শাড়িটা দিয়েছিল একটা নারীমাংসলোলুপ কামুক জানোয়ার। দাদন দিয়েছিল সে—একটা নারীদেহের প্রতি অগ্রিম দাবী জানিয়ে। এটার সমাপ্তি করতে হবে এখনই।

হঠাৎ ওর হাত চেপে ধরে অনিমেষ। উন্মাদের মতো চেহারা হয়েছে তার। কামিনী এতক্ষণ খেয়াল করেনি—অনিমেষ কতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছে ওকে। কঠোর কণ্ঠে অনিমেষ বলে : এ শাড়ি কোত্থেকে এল?

কামিনী ভয় পেয়ে যায়, বলে,—ছাড়ো।

: ছাড়বো? কক্ষণও ছাড়ব না। বল্ হারামজাদি—এ শাড়ি কোথায় পেলি তুই?

কাঠের পুতুলের মত কামিনী বসে থাকে। একটা কথাও বলতে পারে না। ঠাস করে একটা চড় মেরে বসে অনিমেষ।

: লজ্জা করে না তোর! এতদূর অধঃপতন হয়েছে! আমি মরতে বসেছি—আর তুই...? ওঃ!

আবার শুয়ে পড়ে অনিমেষ। চোখ দুটো বুঁজে যায়। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে। কামিনীর সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে গেছে। কোনও উৎসাহ নেই তার। আর সে বাঁচতে চায় না। বাঁচাতে চায় না অনিমেষকে! ওর শেষ সম্বলটুকুও যখন রইল না তখন কি হবে আর যুদ্ধ করে। অনিমেষের মুখে চোখে বোধ হয় এখন ওর জলের ঝাঁপটা দেওয়া উচিত! দেখবে চেষ্টা করে জ্ঞান ফেরানো যায় কিনা? কী লাভ? জ্ঞান ফিরে এলেই ব্যভিচারিণী স্ত্রীর কথাটা মনে পড়ে যাবে। নিরুদ্ধ আক্রোশে আরও কষ্ট পাবে বেচারী। প্রাণেই যখন বাঁচবে না তখন যে কটা মুহূর্ত বেঁচে আছে থাক্ না অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে উঠে আসে কামিনী। জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণই যেন নেই আর। চুপ করে বসে থাকে। দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছায় পথের উপর। বেলা অনেক হয়েছে। গুমট গরম। একটা ধুলোর ঝড় উঠল। দমকা বাতাসে ধুলোর একটা ঘূর্ণি উঠে গেল আকাশের দিকে। আগুন-ঝরা আকাশে উঁচুতে—বহু উঁচুতে ভেসে চলেছে দুটো চিল। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল একটা। কামিনী বসে বসে তাই দেখছিল। হাতে তার কোনও কাজ নেই। কাজ আছে অনেক, কিন্তু কাজ করবার মতো মনের অবস্থা নেই। উৎসাহ নেই। সে বুঝি ফুরিয়ে গেছে। জলে ডোবা মানুষ নাকি এক মুহূর্তে জীবনের আদি-অন্তটা একসঙ্গে দেখতে পায়। কামিনীর মনে হল ফেলে আসা দীর্ঘজীবনের দৃশ্যগুলো মনের পটে তেমনি একসঙ্গে ভেসে উঠল বুঝিবা। ছেলেবেলায় বাপের খুব আদুরে মেয়ে ছিল। অল্পকিছু হলেই অভিমানে ঠোঁট দুটি তার ফুলে উঠত। মা বলতেন—মেয়েমানুষের অত আদিখ্যেতা ভাল নয়। বাবা হাসতেন। আদুরে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন—পাগলি! আজকের এ ঘটনার সঙ্গে সে দৃশ্যের কোনও সামঞ্জস্য নেই। তবু ওর মনে পড়ে গেল সেই ছেলেবেলার কথা। কৈশোরে ছুটাছুটি করেছে যেসব বান্ধবীদের সঙ্গে তাদের যেন স্পষ্ট দেখতে পেল কামিনী এই অকাজের দুপুর বেলায়। তারপর ওর বিয়ের সম্বন্ধ হল। নিজের সংসার! বর! সেসব স্বপ্নের কথা আজ কেন মনে পড়ছে ওর? মানুষ আত্মহত্যা করবার আগে কি এমনিভাবে ফেলে আসা দিনগুলোর পাতা উল্টে নেয়? কামিনী কি আত্মহত্যা করবে? এ বিড়ম্বিত জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ আর নেই তার—সে কথা সত্য। কিন্তু তাই বলে সরে দাঁড়াবে সে? লোকে বল্‌বে—পাপের এই পরিণাম! সে পরাজয়—সে গ্লানি কেন নিয়ে যাবে সে মাথায় করে। মৃত্যু নাকি মহান! কিন্তু এ মৃত্যুতে যে মহিমার কণামাত্রও নেই। তাছাড়া গোরা! সেই অনশনক্লিষ্ট এক ফোঁটা ছেলেটা? সে কি অপরাধ করল? তাকে কেন ছেড়ে রেখে যাবে এই দুনিয়ার অরণ্যে একেবারে নিঃসহায় করে?

: বাড়িতে কে আছেন?

উঠে দাঁড়ায় কামিনী। অপরিচিত কণ্ঠস্বর। নিজ দেহের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায় দ্বারের ওপাশে। আড়াল থেকে বলে : ভিতরে আসুন।

দ্বার খুলে ভিতরে আসেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা। খালি গায়ে মলিন একখানা এণ্ডির চাদর। তলা দিয়ে উপবীতটা দেখা যায়। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অনেকদিন কামানো হয়নি। খালি পা। ঘরের এদিক ওদিক দেখে বৃদ্ধ বসে পড়েন অনিমেষের মাথার কাছে। জ্বরতাপ দেখেন। নাড়ি পরীক্ষা করেন। তারপর বলেন : কামিনী কার নাম?

আড়াল থেকে কামিনী বলে : আমি। বলুন কি বলছেন?

: আমি তোমার স্বামীকে দেখতে এসেছি। আমাকে লজ্জা কর না দিদি। বাইরে এস! অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। এস এদিকে।

তবু বার হতে পারে না কামিনী। লালু ডাক্তারের কথাগুলো মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। বলে : আপনি ওখান থেকেই বলুন। আমি শুনতে পাচ্ছি।

: কিন্তু তা তো হবে না দিদি। আমি নিতাই ঠাকুর্দা। আমার সঙ্গে কলোনির সব মেয়েরই ঠাকুর্দা নাতনি সুবাদ। কলোনির সব মেয়েই আমার সামনে বের হয়। এস তুমি এ ঘরে।

ভদ্রলোক নিজেই এগিয়ে আসেন। নিতাই কবিরাজ! ঠাকুর্দা! কোথা থেকে এলেন উনি? কামিনী জানতো উনি কলোনিতে নেই। গণ-কল্যাণ সমিতির কাজে দরবার করছেন অকল্যাণে। কবে ফিরে এসেছেন তিনি? তার স্বামীর সংবাদই বা পেলেন কি করে? নিতাই কবিরাজ কি সত্যই অন্তর্যামী?

দ্বারের কাছ পর্যন্ত এসে ভিতরে উঁকি দিয়েই উনি ফিরে যান : ও! তা বলতে হয়। ঠাকুর্দার কাছে আবার লজ্জা কিরে, পাগলি? নে এটা গায়ে জড়িয়ে আয় এ ঘরে।

গায়ের এণ্ডির চাদরটা ছুঁড়ে দেন তিনি কামিনীব উদ্দেশ্যে। সেটা গায়ে জড়িয়ে কামিনী এঘরে আসে। ভক্তিভরে প্রণাম করে নিতাই কবিরাজকে। তৈলবিহীন রুক্ষ্ম চুলের গোছায় ঢেকে যায় ঠাকুর্দাব ধূলিমলিন চরণ যুগল।

ঠাকুর্দা বলেন : তোমার চিঠি নিয়ে একটি ছোট ছেলে যখন হেডমিস্ট্রেসের বাড়ি গেল—আমি তখন সেখানে। সুরেখা বাড়ি ছিলেন। চিঠিখানা আমাকে তিনি দেখতে দিলেন। আমি তাই নিজেই চলে এলাম।

: গোরা কই?

: গোরা কে?

: ওই ছোট ছেলেটি?

: তোমার ছেলে বুঝি? গোরা! তাকে সুরেখা বসিয়ে খাওয়াচ্ছে।

কামিনীর বুকের পাষাণভার নেমে যায়।

ঠাকুর্দা বলেন : এর তো রীতিমত চিকিৎসার দরকার। বাড়িতে আর কে আছে?

কামিনী জানায় আর কেউ নেই।

: তবে তোমাকেই খুলে বলি। রোগ কঠিন। রীতিমত যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করালে ভালো হবাব যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তোমার এখানে থেকে তো তা হবে না। আমি এখনি একে হাসপাতালে নিযে যেতে চাই। জংসনের হাসপাতালে। তুমি যদি সঙ্গে যেতে চাও—তবে যা হক দুটি ভাতে ভাত খেযে নাও।

: হাসপাতাল! সেখানে শুনেছি—

: ভুল শুনেছ। পাড়াগেঁয়ে ভূত! বাঁচলে ঐ হাসপাতালেই বাঁচবে—তোমার আঁচলের তলায় নয।

: না, আমি শুনেছিলাম সেখানে সীট পাওয়া যায় না। বিশেষত কলোনির রোগী হলে--

: ঠিকই শুনেছ তুমি—যেত না! কিন্তু তার পরেকার খবরটা তুমি শোননি। এখন থেকে পাওযা যাবে। অন্তত নিতাই কবিরাজ যে কেস নিয়ে যাবে তার একটা ব্যবস্থা হবেই। তুমি বোধহয় জানো না তোমাদের ঠাকুর্দা একটা কেষ্ট বিষ্টু হয়ে উঠেছেন সম্প্রতি এ অঞ্চলটায়। তুমি তৈরি হয়ে নাও!

: আমি তৈরিই।

: খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে?

: আপনি রওনা দেবার ব্যবস্থা করুন।

ঠাকুর্দা একবার ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে উঠে যান। রান্নাঘরের শিকল খুলে একবাব ভিতরে উঁকি মারেন। ফিরে এসে হাতখানা রাখেন কামিনীর পিঠে : কতদিন জ্বালিস না উনান? হ্যাঁরে?

কামিনী জবাব দেয় না।

ঠাকুর্দা বেরিয়ে যান। ফিরে আসেন একটু পরেই। তাঁর হাতে এক ঠোঙা খাবার। ওর হাতে দিয়ে বলেন : খা! খেয়ে জল খেয়ে নে। আমি একটা রিকশা ডাকি। একটা চল্লিশের ট্রেনটা ধরতে পারব বোধহয়। গোরা ও বাড়িতেই থাক। যাবার সময় সুরেখাকে বলে যাব অখন।

কামিনী বলে : খেতে আমি পারবনা ঠাকুর্দা। আপনি রিকশা ডাকুন।

ঠাকুর্দা রওনা দিয়েছিলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। ঘুরে দাঁড়ান। বলেন : দ্যাখ, একটা কথা তোকে বলে রাখি। আমার কথা বিনা প্রতিবাদে যে শোনে না তার সঙ্গে আমার কোন সুবাদ নেই। আজ একাদশী। এভাবে নিরম্বু উপোস করে মরণাপন্ন স্বামী নিয়ে হাসপাতাল যেতে আমি দেব না তোকে। রিকশা ডেকে আনছি আমি। কিন্তু এলে যদি দেখি একটা টুকরোও পড়ে আছে পাতে তাহলে ওই রিকশা চেপেই একা ফিরে যাবো আমি। মনে থাকে যেন!

ঠাকুর্দা বেরিয়ে যান। চোখ ছাপিয়ে জল আসে কামিনীর। এত স্নেহের কথা কেউ বলে না তাকে। বাবার কথা মনে পড়ে গেল। তিনিও এমনি করে স্নেহের ধমক দিতেন। এ কী ঈশ্বরদত্ত আশীর্বাদ পেল সে? কামিনী এক গ্লাস জল গড়িযে নিয়ে বসে পড়ে। খাবারের ঠোঙাটা টেনে নেয়।

হঠাৎ নজরে পড়ে খাটের নিচে উবুড় হয়ে পড়ে আছে একখানা বাঁধান ছবি। আজ অনেকদিন হয়ে গেল—ওটা ওভাবেই রয়েছে। কামিনী হাতটা ধুয়ে ফটোখানা তুলে নেয়। আঁচল দিয়ে কাঁচের ধুলোটা মোছে। টাঙ্গিয়ে দেয় সেটাকে স্বস্থানে। তারপর ছবির নিচে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলে!

ঠাকুর্দার বাড়ি থেকে ফিরছিল ভূষণ আর নমিতা। কথা ছিল গণ-কল্যাণ সমিতির কয়েকটা বিষয়ে জরুরী আলোচনা হবে ঠাকুর্দার ঘরে বিকালে। সমিতির এখনও তিনজনই মাত্র সভ্য। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচি সাহেব ওদের জানিয়েছেন যে সেদিনকার দাবী তিনি মেনে নিয়েছেন। নতুন পঞ্চায়েত গঠন করা হবে। এতে পাঁচটা ব্লকের পাঁচজন সভ্য নির্বাচিত করতে হবে। রীতিমত গণ-ভোট! অবশ্য ভোটের অধিকার থাকবে শুধু পরিবার পিছু একজনেরই। যাঁর নামে প্লট। একদল আপত্তি করেছিল। তাদের মতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরই ভোট থাকা উচিত। যোগেন, ভূষণ প্রভৃতি নব্যপন্থীরাও এই মতের স্বপক্ষে ছিল। ঠাকুর্দা কিন্তু এটা মেনে নেননি। তিনি বলেন—জিনিসটা অতবেশি ব্যাপক করলে গণ্ডগোল বাড়বে। চোরাই ভোট দেবার চেষ্টা হবে। হিসাবও বড় হয়ে পড়বে। প্লট হোল্ডারের সংখ্যা জানা আছে—তাদের পাকা লিস্ট আছে। অন্তত এবারের মতো তাদের ভোট নিয়েই পঞ্চায়েত গঠন করা হক। সাহেব ঠাকুর্দার মতই মেনে নিয়েছেন। যোগেন, কানাই অথবা ভূষণও আর আপত্তি করেনি।

সেই ভোটার-তালিকা প্রণয়ন করছেন অফিসের তরফ থেকে বাগচি সাহেব। এই সংক্রান্ত ব্যাপারে ঠাকুর্দা সকলের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করবেন বলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কোন্ ব্লকে কাকে প্রতিনিধি হিসাবে গণ-কল্যাণ সমিতি নমিনেশান দেবে। শুধু নমিতা আর ভূষণ নয়—এজন্য কানাই, যোগেন, জীবেন প্রভৃতি আরও সাত আটজনকেও তিনি ডেকেছিলেন। ওরা এসে বসে রইল। অথচ ঠাকুর্দাই অনুপস্থিত। শেষে কে একজন এসে বললে ঠাকুর্দাকে দুপুরের ট্রেনে কলকাতাগামী একটা গাড়িতে উঠতে দেখেছে। আর একজন বললে একটি অসুস্থ লোকও নাকি ছিল তাঁর সঙ্গে। ব্যাপারটা বোঝা গেল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ওরা ফিরে এল।

যোগেন স্পষ্টই বিরক্ত হয়েছে। বলে : ভূষণদা, এসব কাজ ও বুড়ো মানুষ দিয়ে হবে না। আপনি আসুন। আমরা সবাই মিলে আপনাকে সভাপতি করি।

দেখা গেল আরও কয়েকজনের সমর্থন আছে এ প্রস্তাবে।

ভূষণ বলে: কিন্তু ঐ বুড়ো মানুষটাকে মেনে চলে সবাই। আমার কথাও হয়তো সবাই শুনবে—কিন্তু সেটা ভয়ে। ওঁর কথা শুনবে ভালোবেসে, শ্রদ্ধায়।

: কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন। ঠাকুর্দার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এতগুলো লোককে নিমন্ত্রণ করেছেন

জরুরী মিটিং এ। নমিনেশন মিটিঙ। আর নিজেই চলে গেছেন কলকাতায়।

নমিতা বলে : কিন্তু ঐ অসুস্থ লোকটাকে হয়তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। হঠাৎ কঠিন অসুখের কোনও রোগী দেখতে গিয়ে এটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে বোধ হয়।

ভূষণ প্রতিবাদ করে : হতে পারে। সেটা অন্য কারও উপর ভার দিতে পারতেন। কাউকে বলতে পারতেন একে হাসপাতালে পৌঁছে দাও। উনি যে কাজটা করতে গেছেন সেটা দলপতির কাজ নয়—যে-কোন স্বেচ্ছাসেবকের কাজ। আর যে কাজটা না করে চলে গেছেন সেটা একমাত্র দলপতিরই কাজ।

নমিতা জবাব দেয় না।

ধীরে ধীরে ওরা বেরিয়ে আসে। যে যার বাড়ির দিকে পলা বাড়ায়।

যোগেনও আসছিল ওদের দুজনের সঙ্গে। বললে : অনেক ঘাটের জল তো খাওয়া হল ভূষণদা—এবার পাকাপাকি ভাবে যাতে এখানে মানুষের মতো বাঁচতে পারি সে চেষ্টা দেখুন। সব কটি শক্তিকে এক ঝাণ্ডার তলায় না আনতে পারলে চলবে না। এর মধ্যে রাজনীতিকে আমরা আনতে দেব না। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই আমরা সম্পর্ক রাখব না। বাইরের নেতৃত্ব চাই না আমরা। আমাদের দাবী সুষ্ঠু পুনর্বাসন। কাজ করে মানুষের মতো বাঁচতে চাওয়ার দাবী। এটাকে সফল করতেই হবে।

ভূষণের বললে : বাগচি সাহেব লোক ভালোই মনে হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর্দাকে দিয়ে কি চলবে এ কাজ?

: আমিও তো তাই বলছি। ওঁর রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বুড়ো হয়ে গেছেন। তাছাড়া দলপতি হবার যোগ্যতা বোধ হয় ওঁর কোনও দিনই ছিল না। অত ভালো মানুষ হলে পলিটিক্স হয়? একদিকে পাঁজি-পুঁথি তিথি নক্ষত্র—আর অন্যদিকে সব মানুষের দেহেই নারায়ণ আছেন এই থিয়োরি! যতীশবাবু প্যাঁচ কষছেন তিনিও নারায়ণ আর বেষ্টা হারামজাদা বদমাইসি করে বেড়াচ্ছেন তিনিও নারায়ণ!

নমিতা বলে : কিন্তু ঐ বুড়ো-হাবড়া মাঝখানে আছেন বলেই আপনাদের মধ্যে এখনও দলাদলি বাধেনি। উনি সরে গেলে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য নেতা দেখা দেবে কলোনিতে—এও দেখে নেবেন!

ভূষণের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। বলে : রাজা মারা গেলেও রাজ্য চলে নমিতা দেবী।

: অরাজকতাও চলে অনেক সময়ে। আমি বলছিলাম গণকল্যাণ সমিতির হাতে এখন লক্ষ কাজ। কত বিষয় চিন্তা করবার আছে, কাজ করবার আছে। আপনারা কিন্তু দেখছি একটি মাত্র চিন্তাতেই বিভোর—কি করে দলপতিকে গদিচ্যুত করা যায়।

যোগেন রাগ করে বলে : আপনি ভুল করছেন নমিতাদি।

: ভুল বলেই যেন বুঝতে পারি ভাই এটাকে। আমিই তাহলে খুশি হব সবচেয়ে বেশি। সত্যিই আমি ভাবতে পারছি না যেন—সমিতি ভালো ভাবে গড়ে ওঠার আগেই তার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে গবেষণা করতে বসে যাবে দারা-সুজা-ঔরঙ্গজেব আর মুরাদ!

যোগেন হেসে বলে : এটা আপনার হিস্টি টীচারের মত কথা হল নমিতাদি!

নমিতাও হেসে বলে : আমি তো টিচারই। দুঃখতো সেখানেই যোগেন ভাই! ইতিহাস আমরা পড়ি আর পড়াই। সাল তারিখ মুখস্থ করি। ইতিহাসের শিক্ষা কি আমরা গ্রহণ করি জীবনে? তাজমহল না গড়ে উঠতেই বুড়ো সাজাহানটাকে আগ্রা ফোর্টে বন্দী করবার মতলবে আছি আমরা।

ভূষণ একটা কথাও বলে না। সে অবাক হয়ে যায় নমিতার পরিবর্তন দেখে। দশটা দিন আগে মেয়েটা চোখ তুলে কথা বলতে পারতো না। মিটিঙে ওর নাম প্রস্তাব করলেন হেডমিস্ট্রেস—উঠে দাঁড়িয়ে কি বলতে গেল—কথা ফুটল না তার মুখে। সেই মূক মেয়েটি এ কয়দিনেই কেমন মুখর হয়ে উঠেছে। যোগেন নায়েকের বয়স বছর কুড়ি বাইশ হবে। অনায়াসে তার দিদি হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের

শিক্ষা দিচ্ছে! ভূষণ বুঝতে পারে যোগেনকে বললেও আসলে নমিতা আঘাত করতে চাইছে ভূষণকেই। নমিতা বোধ হয় ভাবে নিতাইপদর আসনের প্রতি মোহ আছে ভূষণের। কলোনির অবিসংবাদিত নেতা হওয়াটা গৌরবের সন্দেহ নেই—কিন্তু মোহের বশে ভূষণ তা পেতে চাইছে না। সে নিজে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হতে চায় না। সে চায় একজন দৃঢ়চেতা জননায়ক! সমস্ত কলোনির ভালোমন্দ দেখবার ক্ষমতা যে রাখে। লোকগুলো স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত ভেসে ভেসে বেড়িয়েছে আজ ছয় সাত বছর। ট্রানসিট ক্যাম্প, পি. এল ক্যাম্প, শেয়ালদা স্টেশান, হাওড়া ময়দান, স্ট্রাণ্ড রোড, এমন কি বিহার মধ্যপ্রদেশের অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছে ওরা। যেখানে গিয়েছে উইপোকার মত ছোট ছোট ঢিপি গড়ে তুলেছে। মাথার উপর এক টুকরা ছাদ! ভেঙে দিয়েছে কে যেন! আবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে ওরা। এতদিনে এসে পৌঁচেছে এই উদয়নগর কলোনিতে। এইবারই বোধ হয় ওদের শেষ চেষ্টা। এখানে যদি মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার পায় তবেই লোকগুলো আবার সামাজিক জীব হয়ে উঠবে—না হলে আর আশা নেই। এই দশ পনের হাজার লোকের আশা আকাঙক্ষাকে রূপ দেবার মত ক্ষমতাশালী নেতা নন নিতাইপদ এটা বিশ্বাস করে ভূষণ। কিন্তু তাঁর বদলে দ্বিতীয় কোনও নেতার সন্ধান সে পায়নি আজও। কলোনির দাবী দৃঢ়কণ্ঠে জানাতে হবে কর্তৃপক্ষের কাছে—সে দাবীর পিছনে শুধু যুক্তি আর জোর থাকলেই চলবে না—থাকা চাই খানিকটা ঔদ্ধত্য! অনশন ধর্মঘটের হুমকি দিতে হবে। প্রসেশন করে বিধানসভায় গিয়ে পিকেটিং করবার ভয় দেখাতে হবে—না হলে ওদের দাবী মেনে নেবে না কেউ। সে সব কাজ ঠাকুর্দাকে দিয়ে হবে না!

ভূষণ কিন্তু কোনও কথা বলে না!

নমিতাও বলে না কোন কথা।

সেও ভাবছিল ঐ একই কথা—তবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। নিতাইপদকে সে ইতিমধ্যে ভালোবেসে ফেলেছে। ঐ নগ্নগাত্র শুভ্রকেশ অমায়িক বৃদ্ধটির মধ্যে সে দেখেছে একজন সত্যিকারের দরদী মানুষকে। সে বুঝেছে যে এই লোকটিকে নেতৃত্বপদে রাখতে পারলে সামগ্রিক উন্নতি হতে পারে কলোনির। নিতাইপদ সত্যই দেখছেন তাজমহলের স্বপ্ন—সে স্বপ্নও প্রেমের মন্দির। মানব-প্রেমের। এ কলোনির সাম্রাজ্যের মাঝখানে ঐ একক বৃদ্ধকে মনে মনে এরা কেউ চাইছে না। নমিতা আজকাল বড় বড় কথা ভাবতে শিখেছে।

পায়ে পায়ে ওরা যখন বাড়িতে এসে পৌঁছায় তখন নমিতা লক্ষ্য করে কখন অলক্ষ্যে যোগেন চলে গেছে নিজের পথে। নমিতা আর ভূষণ বাড়ি ঢুকতেই লতু এসে ভূষণকে বলে: আপনি তো বেশ লোক, মিঠুকে কানাইদার বাড়িতে একলা রেখে দিয়ে কোথায় কোথায় আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছেন।

ভূষণ হেসে বলে: একলা রেখে যাব কেন? ঠান্‌দির চার্জে রেখে গেলুম তো ওখানে।

: ও! ঠান্‌দি আপনার মাইনে-করা বাঁদী কিনা। দায় পড়েছে আমার।

লতুর কোলে ঘুমন্ত মিঠুয়া।

নমিতা রীতিমত বিস্মিত হয়। ভূষণকে বলে: লতুর সঙ্গে তো বেশ ভাব হয়ে গেছে দেখছি আপনার।

ভূষণও বিস্মিত হয়: কেন আপনি জানতেন না? ঠান্‌দি তো প্রায়ই যায় আমাদের বাড়ি। মিঠু ওকে ছেড়ে থাকতেই চায় না! পিসীমার সঙ্গেও লতুর খুব ভাব হয়ে গেছে। আপনিই যান না বলে অনুযোগ করছিলেন তিনি। কই আপনি তো একদিনও গেলেন না।

নমিতা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। লতু ভূষণবাবুদের বাড়ি প্রায়ই যায়। পিসীমার সঙ্গেও লতুর আলাপ হয়ে গেছে? কই এসব কথা তো ঘূণাক্ষরেও জানায়নি লতু? কেন জানায়নি? এটা গোপন করবার কারণটা কী হতে পারে?

ভূষণ লতুর দিকে ফিরে বলে: ঠান্‌দি, তোমার অর্ডারি জিনিস এসে গেছে—দেওয়া হয়ে

ওঠেনি—তুমি কাল যাওনি বলে।

ভূষণ পকেটের ভিতর হাত চালায়।

লতু তাড়াতাড়ি বলে : আচ্ছা সে হবে অখন।

চলে যায় সে পাশের ঘরে—মিঠুকে কোলে নিয়ে।

লতু লক্ষ্য করেছে নমিতার ভাবান্তর। ও যে ভূষণবাবুদের বাড়ি গিয়ে আলাপ করে এসেছে এটা না জানানোতে দিদি অবশ্য রাগ করতেই পারে। দুই বোনের মধ্যে লুকোচুরির স্থান নেই। কিন্তু কি জানি কেন এ সত্যটা স্বীকার করতে লতু সঙ্কোচ বোধ করেছে প্রতিবারই। অনেকবার বলতে চেয়েছে—কিন্তু দিদি হাসবে মনে হওয়ায় বলা হয়ে ওঠেনি। এখন দিদির চুপ করে বসে থাকার ভঙ্গিটায় সেজন্য অনুশোচনা হয়। লতু মনে মনে স্থির করল ভূষণদা চলে গেলেই দিদির গলাটা জড়িয়ে ধরে বলবে দিদি রাগ করেছিস

দিদি বলবে : রাগ করব কেন? রাগ করিনি।

: নিশ্চয়ই করেছিস্। তোকে না বলে ভূষণদাদের বাড়ি গেছি বলে?

: গেছিস তো বেশ করেছিস।

: ওটাই তো রাগের কথা। রাগ করিসনি তো হাস্ দিকিন।

দিদি হেসে ফেলবে তখনই। এটুকু বিশ্বাস লতুর আজও আছে—দিদির উপর। দ্বারের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে ভূষণের প্রস্থানের অপেক্ষায়।

ভূষণ এক জোড়া প্লাস্টিকের চুড়ি বার করে পকেট থেকে। রেখে দেয় টেবিলের উপর। নমিতা এতক্ষণে কথা বলে : এটা কিন্তু আপনার অন্যায়।

: কোনটা?

: এভাবে ওকে উপহার দেওয়া!

: কি বল্‌ছ নমিতা! লতু এখনও ছেলেমানুষ।

. ছেলেমানুষ যে নয়—সেটা আমিও বুঝি, আপনারও না বুঝবার কোনও কারণ নেই।

ভূষণ একটু অবাক হয়ে যায়। এ কথার মানে? একটু অপমানিতও বোধ করে নিজেকে। তবু হেসে জিনিসটা লঘু করে। বলে : একবার যখন দিয়ে ফেলেছি তখন আর আপত্তি নাই করলে। তাছাড়া ওর সঙ্গে দুদিন পরেই তো একটা নিকট এবং মধুর সম্বন্ধ হতে যাচ্ছে—সুতরাং এটা এমন কিছু অপরাধ নয় নিশ্চয়ই।

নমিতা উঠে দাঁড়ায়। যাবার সময় বলে যায় : আপনি ভুল করছেন ভূষণবাবু। যে নিকট এবং মধুর সম্পর্কের ইঙ্গিত করছেন আপনি তা হবার নয়। আমি রাজি নই! তবে যে উপহার ও নিজমুখে চেয়েছে—আর যা আপনি, মনে করে কিনে এনে বাড়ি বয়ে দিয়ে গেলেন তা ফেরত নিয়ে যেতেও বলছি না আমি।

নমিতা দ্রুতপদে চলে যায় ওঘরে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে মূক হয়ে বসে থাকে ভূষণ। মুখটা ম্লান হয়ে আসে ওর। সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢোকে লতু। দুম করে নামিয়ে দেয় মিঠুকে। আর টেবিল থেকে প্লাস্টিকের চুড়ি দুটো তুলে দুহাতেব চাপে ভেঙে ফেলল সেটা। কোন কথাই না বলে বের হয়ে গেল ফের।

ভূষণ মিঠুয়াকে কোলে নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

সি-ব্লকে সুরেখা দেবীর বাড়িটাই বোধহয কলোনির সব চেয়ে সুসজ্জিত বাড়ি। দামী আসবাবে তার আভিজাত্য নয়। সুরুচিব পবিচয়েই সেটি সুশোভিত। দরজা জানালায় পর্দা টাঙানো। কয়েলড স্প্রিংযেব সঙ্গে লাগানো কুঁচি দেওয়া হালকা নীল পর্দা। শয়নকক্ষ একটি মাত্র। বসার ঘরও এটাই।

তার একদিকে একটি চৌকি পাতা। সাদা ধবধবে একটা পাটভাঙা চাদর টানটান করে বিছানো। ঘরেব এককোণে একটি মাটির কলসি। আর কাঁচের গ্লাস। কয়েকটি শান্তিনিকেতনী মোড়া। সূচের কাজ কবা নক্সা কাটা ঢাক্‌নি। এক কোণে আপাদমস্তক নীল কাপড়ে ঢাকা একটা সেতার। টেবিলের উপর ফুলদানিতে কয়েকগুচ্ছ রজনীগন্ধা। ফুল সুরেখা দেবীর বাগানেই হয়। ফুলদানির পাশে ফ্রেমেবাঁধানো একখানা ফটো। বছর বাইশেক বয়সের একজন যুবক।

যে ঘরে সুরেখা দেবীর প্রাকবিবাহ জীবনের বেশির ভাগ কেটেছে তার তুলনায় যদিও এ গৃহশয্যা অকিঞ্চিৎকর—তবু কলোনির ছন্নছাড়া জীবনে এটাকেই হঠাৎ মরুভূমির মাঝখানে মরুদ্যানের মতো মনে হয়। কঞ্চির বেড়া দিয়ে বাড়ির চারদিক ঘেরা। সন্ধ্যামালতী আর অপরাজিতার গাছ লাগানো হয়েছে—যদিও বাড়তে পায়নি সেগুলি যথেষ্ট। আগামী বর্ষার পর হয়তো ছেয়ে ফেলবে ওবা কঞ্চিব বেড়াকে। সুরেখা দেবী শুধু সম্পন্ন ঘরের মেয়ে নন—রীতিমত ধনীর কন্যা। বিবাহও হয়েছিল ধনীব দুলালের সঙ্গে। ভাগ্যবিপর্যয়ে তিনি পিতৃগৃহ-স্বামীগৃহ দুইই ত্যাগ করে এসে কর্মসংস্থান করছেন উদয়নগর কলোনিতে। যারা বলে তাঁর সখের চাকরি—তাঁরা ওর জীবনের সব কথা জানে না বলেই ওই ভুল কথাটা বলে।

জানলা দিয়ে হেডমিস্ট্রেস দেখতে পেলেন—নমিতা কঞ্চির গেট খুলে ভিতরে আসছে। নমিতা মেয়েটিকে তিনি স্নেহ করেন। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীর এ নিয়ে একটা গোপন অভিযোগ ছিল। আর সেটা অজানাও ছিল না তাঁর।

: এসো নমিতা—কী খবর?

: আপনি আমাকে এ কী ফ্যাসাদে ফেললেন বলুন দেখি। রোজ সকাল সন্ধ্যায় কলোনির মেয়েরা আমার কাছে আসতে শুরু করেছে। কারও ফ্রি র‍্যাশন বন্ধ হয়েছে—তাতে আপত্তি। কেউ পি. এল ক্যাম্পে যেতে চায় তার আর্জি, কেউ চায় কাজ। যত বুঝিয়ে বলি এসব বিষয়ে কোনও ক্ষমতা নেই আমার—ওরা বোঝে না।

ওর ছেলেমানুষি আর আবদার করার ভঙ্গিতে সুরেখা দেবী কৌতুক বোধ করেন। বয়সে বোধ হয় দুজনে প্রায় সমবয়সী। কিন্তু শিক্ষা ও পদমর্যাদায় তিনি অনেক উঁচু মঞ্চ থেকে বড়বোনের মতই ওকে উপদেশ দিলেন—প্রথম প্রথম এ সব অসুবিধা একটু হবেই। ওদের অভিযোগগুলো আপাতত শুনে যাও। নোট বইতে লিখে রাখ। নিতাইবাবুর গণকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে কলোনিতে শীঘ্রই নানারকম কাজ শুরু হবে। তুমি তখন সত্যিই পারবে এদের নানাভাবে সাহায্য করতে।

নমিতা বলে : ও, আপনি জানেন না বুঝি। আমাদের গণকল্যাণ সমিতি কর্তৃপক্ষের 'অ্যাপ্রুভাল' পেয়েছে। প্রত্যেক ব্লকের প্রতিনিধি গণভোট নিয়ে নির্বাচন করা হবে। তাদের দিয়েই নতুন পঞ্চায়েত গড়া হবে। আগের পঞ্চায়েত বাতিল হয়ে গেছে।

সুরেখা দেবী বলেন : গেছে নয় বল যাবে। নতুন কমিটি কার্যভার নিলে পুবনো পঞ্চায়েত তখনই বাতিল হবে।

: না! ওটা বাতিল হয়েই গেছে। এখন আমাদের অ্যাডহক্ কমিটিই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

: অর্থাৎ তুমি আর ভূষণবাবু?

: আর নিতাই ঠাকুর্দা।

: তিনি তো বুড়ো মানুষ। তোমাদের দুজনকেই সামলাতে পারছেন না—সারা কলোনির এতগুলি লোককে তিনি ঠেকাবেন কি করে?

· মানে?—বিস্মিত হয় নমিতা।

সুরেখা দেবী মিটি মিটি হাসেন।

যাক। তা কি বলতে এসেছ বল?

নমিতা একটু ইতস্তত করে তারপর বলে : আমি কিন্তু এ কমিটিতে থাকব না। আপনি অন্য কাউকে এ ভার দিন।

: সেকি, কেন বলত?

: ওই যে বললাম—সারাদিন আমায় বিরক্ত করে।

: জনকল্যাণের কাজ করবে—আর তোমার কাছে কেউ কিছু বলতে এলে বিরক্ত বোধ করবে, এতো হয় না নমিতা। হবেও বা —আমিই হয়তো ভুল করেছি। সত্যিই যদি বিরক্ত বোধ করে থাক তবে পদত্যাগ করাই উচিত তোমার। তবে সে কথা আমাকে বলতে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। নিতাইবাবুকে বল।

: বা—রে! আপনিই তো আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন।

: ভুল করেছিলাম নমিতা। আমি তোমাকে অন্য জাতের মানুষ ভেবেছিলাম!

দুজনেই চুপ। সুরেখা দেবী জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছেন। নমিতা নখ দিয়ে টেবিলক্লথটা খুঁটতে খুঁটতে বলে : আপনি রাগ করেছেন।

. রাগ ঠিক করিনি। তবে দুঃখ পেয়েছি। মানে, আমি সত্যি ঠিক আশা করিনি এটা। তোমার আসল আপত্তিটা কী বলত?

নমিতা তখনও ইতস্তত করে। তারপর হঠাৎ বলে ফেলে : এ কমিটির সঙ্গে আমার কাজ করা পোষাবে না।

: কেন বলত? তোমাদের নিতাই ঠাকুর্দা শুনেছি খুবই ভালোমানুষ। ভূষণবাবুর সঙ্গেও তো তোমাব যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা।

: অন্তরঙ্গতা? মানে?

: ও এতক্ষণে বুঝেছি! মান অভিমানের পালা চল্‌ছে বুঝি?

নমিতা রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়ে : না, না! মানে এসব কী বলছেন আপনি?

সুরেখা দেবী কৌতুক বোধ করেন, স্মিতহাস্যে বলেন : কিছু কিছু আমি অবশ্য শুনেছিলাম—শোভনা দেবীর কাছে। স্কুলের সামনে কয়েকদিন ভদ্রলোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আমার সন্দেহ হয়—তারপর জানতে পারি উনি তোমার খোঁজেই আসেন। কী একটা যৌথ ব্যবসা নাকি চালাচ্ছ তোমরা। তখনও এতটা বুঝিনি।

নমিতা চুপ করে থাকে। প্রতিবাদ করাটা উচিত মনে হয়; কিন্তু কি ভাবে প্রতিবাদ করলে জিনিসটা অস্বীকার করা যায় বুঝে উঠতে পারে না।

হেডমিস্ট্রেসই বলেন : উনি তোমাদের কমিটিতে থাকাই কি তোমার আপত্তির কারণ?

: সেও একটা কারণ বটে; তাছাড়াও মানে—

: অর্থাৎ তা ছাড়া কোন কারণ উদ্ভাবন কবতে পার তুমি। আচ্ছা তা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু প্রথম কারণটাই বিস্তারিত শুনি আগে।

নমিতা মরিয়া হয়ে বলে ফেলে : ভূষণবাবুর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি। সেলাইয়ের কারবারও বন্ধ করে দিচ্ছি। অন্য সূত্রেও কোন যোগাযোগ রাখতে চাই না।

সুরেখা দেবী গম্ভীর হয়ে বলেন : এতদূর? যদি আপত্তি না থাকে তবে গভীরতর কারণটা ব্যক্ত করতে পার। অবশ্য তোমাকে বলতে বাধ্য করছি না আমি। ব্যবসাটা বন্ধ করার কারণ অর্থনৈতিক নাকি?

না না, টাকা পয়সার ব্যপারে উনি খুব পার্টিকুলাব।

· ভূষণবাবু চরিত্রবান সৎ প্রকৃতিব লোক বলেই মনে হয়েছে আমার—

: আমিই কি তা অস্বীকার করছি?

: তবে কারণটা অর্থনৈতিক নয় আধিভৌতিকও নয়—সুতরাং ধরে নিতে পারি কারণটা হৃদয়ঘটিত।

নমিতা রীতিমত লাল হয়ে ওঠে : এভাবে জেরা করলে আমি জবাবই দেব না।

প্রাণ খুলে হাসেন সুরেখা দেবী : ক্ষেপেছ! আমার কি এটুকুও রসবোধ নেই। হৃদয়ঘটিত ব্যাপার শোনার পরেও জেরা করব আমি? কিন্তু ওসব হচ্ছে শরতের মেঘ! ওর জন্যে 'মেজর' কোনও 'ডিসিশন্' নিতে নেই।

নমিতা তবু তর্ক করে : কিন্তু আপনিই তো এখুনি বলছিলেন ওঁকে আমার পিছনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আপনারই সন্দেহ হয়েছিল—এবং খবর নিয়ে জেনেছেন যে একটা অর্থনৈতিক কারণেই আমরা মেলামেশা করি। সাধারণ লোকে তো এটাকে অন্য চোখেও দেখতে পারে। আমার একটা বদনামও হয়ে যেতে পারে।

: অন্য লোক কেন আমিই তো ওটা অন্য চোখে দেখেছি। কে বললে আমি বিশ্বাস করেছি তোমাদের মেলামেশাটার আসল কারণ ব্যবসা ঘটিত?

নমিতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

: বোকার মত দেখছ কি? বেশ তো, বদনাম যদি খুব বেশি হয়েই পড়ে তখন একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভূষণবাবুকে বললেই সে এক ফোঁটা সিঁদুর দিয়ে সকলের মুখ বন্ধ করে দেবে। তা সে পারবে। তুমিই বলে দেখো না।

ঐ এক ফোঁটা সিঁদুরই বুঝি ছড়িয়ে পড়ে নমিতার সারা মুখে।

আর কিছু বলতে পারে না।

নমিতা বাড়ি ফিরে এল হাল্‌কা মন নিয়ে। অনেকদিন পরে আবার গুন্‌গুন্ করে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। সুরেখাদি লোকটি কিন্তু ভারী অসভ্য। এমন মিটি মিটি হেসে কথা বলেন যে, প্রতিবাদ করবারও অবস্থা থাকে না। বাড়ি এসে পৌঁছাতে লতু ওকে একগাদা ছিট এনে দিল। বললে : একটি ছোট ছেলে এগুলো দিয়ে গেছে। বলেছে এই মাপে জামাগুলো বানিয়ে রাখতে। পরের সপ্তাহে এসে নিয়ে যাবে।

: ছোট ছেলে? কে রে?

: কি জানি, চিনি না।

নমিতা হতাশ হয়। সে ভেবেছিল অন্তত সপ্তাহান্তে ভূষণ একবার আসবে। আজ শনিবার। ভূষণের আসার কথা। এ কয় সপ্তাহ অবশ্য সে সপ্তাহের মাঝেও এসেছে। আজ শনিবারে জামা দেবার অছিলায় ভূষণ একবার এ বাড়ি আসবে এটা অনুমান করেছিল নমিতা। মনে মনে ওর আগমনের যে প্রতীক্ষা করছিল সেটা টের পেল আশাভঙ্গের পর। তবে ভূষণকেও দোষ দেওয়া যায় না। সেদিন ওকে যে রকম কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে তাতে ওর অভিমান হওয়াই স্বাভাবিক। কেমন যেন লজ্জা বোধ করে নমিতা। সেদিন হঠাৎ ওরকম রূঢ় ব্যবহার করার সত্যিই কি কোনও কারণ ছিল? ভূষণ তো কোনও অন্যায় করেনি। লতুই বা অন্যায়টা করল কোথায়? লতু যদি কিছু বুঝতে পেরে থাকে? কিন্তু বুঝবারই বা কি আছে এতে? নিজেকেই নমিতা ধমক দেয়। লতুর সঙ্গে ভূষণের যদি ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়ে থাকে, অথবা ভূষণ যদি লতুর জন্যে মনে করে একজোড়া প্লাস্টিকের চুড়ি কিনে আনে তাতে নমিতার রুষ্ট হবার তো কোনও কারণ নেই! লতুকে এ নিয়ে হিংসা বা ঈর্ষা করবে কেন নমিতা? ঈর্ষা! কথাটা মনে হতেই ঠাশ করে একটা চড় মারে নমিতা মনের গালে! কী পাগলের মতো ভাবছে সে? লতুকে ডাকে : লতু শোন।

লতু এসে চুপটি করে দাঁড়ায়।

: হ্যাঁরে, সেদিন বকেছিলাম বলে রাগ করেছিস্? তুই কেন বলিসনি আমাকে যে ভূষণকাকের সঙ্গে তোর ভাব হয়ে গেছে? কেন বললি না যে, ওদের বাড়িতে তুই যাতায়াত করিস?

লতু জবাব দেয় না।

: কী? এখনও অভিমান গেল না? তুই কী রে? নিজে দোষ করলি আর আমার উপর রাগ করছিস? আমি কি বারণ করেছি ওদের বাড়ি যেতে?

লতু গম্ভীর হয়ে বলে : ও কথা যাক দিদি! আমি তো আর যাই না।

: কেন? যাস্ না কেন? আমি বারণ করেছি? তোর যদি ভালো লাগে যাস্ যত খুশী ভূষণ্ডীকাকের বাসায়।

: থাক্ দিদি। ও রসিকতা আমার ভাল লাগে না।

লতু ধীরে ধীরে চলে যায়। নমিতা ভেবেছিল লতুকে পাঠিয়ে ভূষণকে ডেকে পাঠাবে। সেলাইয়ের 'কাট' সংক্রান্ত কথাবার্তা শুরু করে সেদিনের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবে। কিন্তু লতুর ভাবগতিক দেখে ও একটু অবাক হয়। লতুর একটা গম্ভীর ভাব তো স্বাভাবিক নয়। ব্যাপার কি! সেদিন বাইরের লোকের সামনে ও কথা বলায় বোধ হয় অপমানিত বোধ করেছে খুব। দুঃখ হয় নমিতার। আবার ডাকে : লতু শোন!

আবার এসে দাঁড়ায় লতু।

: তোব কি হয়েছে বলতো? কথাই বলছিস না ভাল করে?

লতু একবার তাকায় দিদির দিকে। চোখাচোখি হয়। তৎক্ষণাৎ সে চোখ নিচু করে। অস্ফুটে বলে . কিছু হয়নি। আর কিছু হয়ে থাকলে তা তুমিও জানো, আমিও জানি।

বলেই বেরিয়ে যায়।

নমিতা রীতিমত অবাক হয়ে যায়। আর কিছু বলে না।

বাত্রে আহারাদির পর নমিতা সেলাই নিয়ে বসেছিল। আজই কয়েকটা জামা কেটে রাখতে হবে। লতু ঘুমিয়েছে পাশেই। নমিতা আর লতু এক বিছানাতেই শোয়। বিন্দুবাসিনী এসে বললেন : নমু, তোর বাবা একবার ডাকছে তোকে।

হাতের কাজটা গুছিয়ে রেখে নমিতা এসে বসে বাপের পাশে।

বৃদ্ধ একটু ইতস্তত করে বলেন : হ্যাঁরে অনুর কোনও খবর পেয়েছিস?

: না বাবা।

: খবর নেবার চেষ্টা করেছিলি?

: না। মনি-অর্ডার ফেরত আসার পর আমি আর চেষ্টা করিনি।

বৃদ্ধ মাথা নাড়েন : মনি-অর্ডার যে ফেরত আসবে এটা আমি জানতাম। সে বড় অভিমানিনীরে।

বিন্দুবাসিনী ঝাঁজের সঙ্গে বলেন : তুমি আর আধিক্যেতা করনা। টাকা ফেরত দেওয়া হল। বাবলুকে আটকে রাখা হল। তিনি হলেন অভিমানিনী! আমার রোগা ছেলেটা কেমন আছে বাবলুকে পাঠিয়ে তা একটা খবরও দিতে পারল না এতদিনে? আর সে ছেলেটাই বা কেমন? মা-বাপের কথা মনেও পড়ে না?

নমিতা বলে : সে নিশ্চয়ই আসতে চায়—বৌদি আসতে দেয় না।

হরিপদ বলেন : সে যাই হোক্। তোমাকে আর একটা কথা বলব বলে ডেকেছি। ভূষণের কথা!

নমিতা বুঝতে পারে প্রশ্নটা কি। হেডমিস্ট্রেস যেটা অত সহজেই বুঝতে পেরেছেন—সেটা যে বাবা-মাব চোখ এড়াবে না এটা বোঝা সহজ। হঠাৎ এ প্রশ্নটায় সে লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়ে। বাপের স্নেহমাখা কণ্ঠস্বরে নমিতার শরীর অবশ হয়ে আসে। মনে পড়ে যায় তার অতীত যৌবনের ইতিহাস। ওকে পাত্রস্থ করার কী প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল বৃদ্ধের। তাঁর নমিতা মায়ের কদর কেউ বুঝল না—এ

অভিযোগ তাঁর বরাবরই ছিল দুনিয়াব উপর। শেষ দিকে নমিতা যখন জানিয়েছিল যে সে বিয়ে করবে না তারপর থেকে বৃদ্ধ কখনও এ প্রসঙ্গ তোলেননি। আজ দীর্ঘদিন পরে উঠে পড়েছে সেই আলোচনা। পঁচিশ বছরের উদ্বাস্তু মেয়েটি ইতস্তত করে। কি করে সে স্বীকার করবে যে ঐ মাহারা মেয়েটির বাপকে সে ভালবেসে ফেলেছে। তার আজীবন কুমারী থাকার প্রতিজ্ঞাটা ভাসিয়ে দিয়েছে ঐ বলিষ্ঠ গঠন যুবকটি এক নিমেষে! অনিবার্য প্রশ্নটার প্রত্যাশায় উদ্বেল-হৃদয়ে প্রতীক্ষা করে নমিতা।

বৃদ্ধ বলেন : ভূষণ কি বিবাহেব কোনও প্রস্তাব এনেছিল?

নমিতা চুপ করে থাকে।

রুক্ষস্বরে বৃদ্ধ বলেন : আর তুই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিস্?

নমিতা এবারও নীরব। বাপের রক্ষ স্বরে প্রথমটা সে চম্‌কে উঠেছিল বটে কিন্তু পরমুহূর্তেই তার অন্তর্নিহিত কারণটা মনে পড়ে যাওয়ায় আর রাগ থাকে না ; রাগ বাব-মা করতে পারেন বটে। মেয়েকে সৎপাত্র দান করতে কে না চায়—তাছাড়া তাকে পাত্রস্থ করতে কী অপরিসীম চেষ্টা করেছেন বৃদ্ধ পণ্ডিত। সেই বাঞ্ছিত অতিথিটি আজ নিজে থেকে দ্বারা এসে উপস্থিত আর নমিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ কথা জানবার পর রাগ করতে পারেন বটে ওঁরা। কিন্তু নমিতা কি করে বলবে যে ক্ষণিক মনোবিকলনে সে হঠাৎ প্রত্যাখ্যান ক'রে বসেছে বটে তবু ওর সমস্ত অন্তঃকরণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে বসে আছে তার ফিরে ডাকার প্রতীক্ষায়? কবে এসে সে তাকে বলবে—'তোমার প্রত্যাখ্যান আমি মানি না। তুমি আমার। আমি জোর করে—তোমাকে নিয়ে যাবো আমার বাড়ি! আমার ভালবাসাকে আমি ব্যর্থ হতে দেব না তোমার খামখেয়ালির জন্যে।'

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলেন : এটা তুমি ভালো করনি নমিতা!

নমিতা একটু চম্‌কে ওঠে ওঁর কণ্ঠস্বরে। হঠাৎ 'তুমি' সম্বোধন এবং 'নমিতা' ডাকটা কানে বাজে ওর। বলে : কেন বাবা?

: তোমার উচিত ছিল আমাকে জিজ্ঞাসা করা। তোমার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করা।

নমিতা জবাব দেয় না। বৃদ্ধ বাপের অভিমানের একটা অর্থ খুঁজে পায় সে। ও হাসে মনে মনে। মনে পড়ে সুরেখা দেবীর কথাগুলি : ও সব হচ্ছে শরতের মেঘ।

: নিজের সম্বন্ধে তুমি যা ইচ্ছে করতে পার। তোমার উপার্জনে বেঁচে আমি আমরা। তুমি নিজে বিয়ে করতে চাওনি—আমি বাধা দিইনি। কিন্তু লতুর বিবাহ সম্বন্ধে কোনও অভিমত জানানোর আগে তোমার উচিত ছিল বাপের সঙ্গে পরামর্শ করা—তা হক সে বাপ অন্ধ, পঙ্গু!

: কী বলছ বাবা?

: ঠিকই বল্‌ছি নমিতা! আজ সন্ধ্যাবেলা ভূষণের পিসীমা এসেছিলেন তোমার মায়ের কাছে। তিনি বললেন ভূষণ নাকি লতুর সঙ্গে বিবাহের একটা প্রস্তাব এনেছিল—আর তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছ। কারণটা তিনি জানতে এসেছিলেন তোমার মায়ের কাছে।

নমিতা আশ্চর্য হয়ে বললে : ভূষণবাবু লতুর সঙ্গে বিয়ের একটা প্রস্তাব এনেছিলেন?—আর আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি? একথা বললেন তাঁর পিসীমা।

: তাই তো বললেন।

: তিনি তা জানলেন কি করে?

বিন্দুবাসিনী এতক্ষণে কথা বলেন : আমি তা জানতে চাইনি। সম্ভবত ভাইপো নিজেই জানিয়েছে তাঁকে। আমি বলেছি আমাদের আমলে ছেলেমেয়ের বাপ-মায়েই কথাবার্তা চালিয়ে এসেছে। আপনার ছেলে যখন বাপমার বদলে পাত্রীর দিদির কাছেই প্রস্তাব তুলেছে—তখন সেই দিদির কাছ থেকেই জবাবটা শুনবেন। আমরা উপার্জনক্ষম ছেলেমেয়ের গলগ্রহ বই তো নই?

নমিতা বলে : কি করে এ কথা রটেছে জানি না। রাগ অভিমান তোমরা করছ কর , বারবার উপার্জনক্ষম বলে আঘাত দিচ্ছ দাও-—তবে একটা কথা জেনে রাগ কর। ভূষণবাবু ওরকম কোন প্রস্তাব আমার কাছে করেননি, আর আমিও তা প্রত্যাখ্যান করিনি তোমাদের না জানিয়ে। গালাগাল দিচ্ছ দাও,

তবে পরের মুখে মিথ্যা কথা শুনে না দিয়ে—নিজের কানে সত্যি কথাটা শুনে তারপর গাল দাও।

: আর নিজের কানে যদি মিথ্যা শুনি দিদি?

চম্‌কে ঘুরে দাঁড়ায় নমিতা।

লতু উঠে এসেছে শয্যা ছেড়ে। দাঁড়িয়ে আছে দ্বারের পাশে। নমিতার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে? বলে : কী? কি বললি?

: বলছি যে নিজে কানের যদি মিথ্যা শুনি তখনও কি চুপ করে থাক্‌ব? আমি যে নিজের কানে শুনেছি দিদি! উনি বললেন—লতুর সঙ্গে তো আমার একটা নিকট আর মধুর সম্পর্ক হতে চলেছে আর তুমি ঈর্ষায় জ্বলে উঠে বললে—'সে নিকট সম্পর্ক হবার নয়—আপনি ভুল করছেন ভূষণবাবু—আমি রাজি নই!'

রূঢ়স্বরে হরিপদ পণ্ডিত গর্জন করে ওঠেন : নমিতা! কোনটা সত্যি? একথা তুমি বলেছিলে?

হরিপদ পণ্ডিতের এ কণ্ঠস্বরকে চিরকাল শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে চক্রবর্তী পরিবার! শুধু নমিতা নয়, পরিবারের প্রত্যেকটি লোকই। কামিনীকে ত্যাগ করে আসার দিনও নমিতা উপার্জন-সম্বন্ধে কি একটা বাঁকা ইঙ্গিত করায় অমনি গর্জন করে উঠেছিলেন পণ্ডিত। সেদিন সে কণ্ঠস্বরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছিল নমিতা। আজ কিন্তু নমিতা একটুও বিচলিত হল না ও স্বরে। সেটা লক্ষ্য করেছিলেন বিন্দুবাসিনী। এই দৃঢ় কণ্ঠস্বরের পরিণাম তিনি অন্তত ভাল করেই জানেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে এ স্বর তিনি শুনেছেন মাত্র কয়েকবারই। সে কয়বারই লক্ষ্য করেছেন তিনি জীবনে এসেছে একটা বড় রকমের পরিবর্তন। আজ নমিতা এ কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠ্‌ল না দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন বিন্দুবাসিনী। নমিতা কি এতদূর বদলে গেছে? রোজগার করছে বলে? চাকরি পেয়েছে বলে? গণকল্যাণ না কি একটা সমিতির নেতা হয়েছে বলে? নইলে কেন সে এ আহ্বানে মাটির সাথে মিশিয়ে গেল না?

আসল কারণটা তিনি আন্দাজই করতে পারেননি। নমিতার কানে গর্জনটা প্রবেশই করেনি। লতুর একটা ছোট্ট কথা তপ্ত লৌহ শলাকার মতো তার কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করে মর্মস্থল পর্যন্ত দগ্ধ করে দিয়েছিল। আর কিছু সে শুনতে পায়নি।

আর্তস্বরে নমিতা লতুকেই প্রশ্ন করল : কি বললি? ঈর্ষায়?

: না তো কি? ছোট বোনের বিয়ের সম্বন্ধ আসছে, অথচ বড়—

: ব্যস্ চুপ!—গর্জন করে ওঠে নমিতা!

লতুর নিচ অন্তঃকরণের ক্লেদাক্ত পরিচয় পেয়ে শিউরে উঠেছে সে। একটাও কথা বলবার স্পৃহা হয় না তার। কী লজ্জা! লতুর মনে এই ছিল? মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে সে শুয়ে পড়ে নিজের বিছানায়।

একটু দূরেই শুয়ে আছে লতু। প্রাণ খুলে সে কাঁদতেও পারে না। কি জানি যদি সবাই ভাবে এ কান্নাও উপেক্ষিতা, অনাদৃতা, বিগত-যৌবনা নারীর! এ কান্না যে কতবড় দুঃখের কান্না তা তো কেউ জানতেও পারবে না।

বৃদ্ধ হরিপদও যেন ফুরিয়ে গেছেন। তাঁর ঐ রূঢ় গর্জনের সামনে চক্রবর্তী পরিবার চিরদিনই মাথা নত করে এসেছে। এটি ছিল তার ব্রহ্মাস্ত্র। আজ তাও ব্যর্থ হয়ে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে তাঁর শেষ অস্ত্র! এখন কী করবেন তিনি? বঙ্গবিভাগটা আগাগোড়া ভুল জেনেও যেমন নীরবে মেনে নিয়েছিলেন—তেমনি করেই কি মেনে নেবেন যে, এ পরিবারের অভিভাবকের গদি থেকে চ্যুত হয়েছেন তিনি? আর্তকণ্ঠে তিনি ডেকে ওঠেন : নমু, লতু!

কেউ সারা দিল না।

বিন্দুবাসিনী বৃদ্ধকে শুইয়ে দিলেন।

ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তিনি।

ওদিকে সারারাত ছটফট করছে নমিতা। ঘুম হয়নি তার একরত্তি। এ কী কাণ্ড! লতু ধরে নিয়েছে ভূষণ তার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব এনেছিল—আর তার দিদি ঈর্ষান্বিতা হয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন সে প্রস্তাব? যে লতুর জন্যে তার ভালবাসার অন্ত নেই, চিন্তার বিরাম নেই,—যার সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে সে এতদিন তার কাছ থেকেই কৃতঘ্নের মতো এই অভিযোগ আসায় ওর বেদনার পরিসীমা ছিল না! লতু, ছোট্ট লতু—প্রায় মায়ের মতো মানুষ করেছে যাকে? ওর চেয়ে দশবছরের ছোট ছিল লতু। ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়—লতুর পক্ষেও ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিশোরী মেয়েটির পক্ষেও ভূষণের আচরণ সম্বন্ধে ভুল ধারণা করা অসম্ভব নয়। নাটক-নভেল পড়ে পড়ে, আর পাড়ার যত অকালপক্ক বকাটে মেয়েদের সঙ্গে মিশে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই তার ধারণা হয়েছে ভূষণ তার আকর্ষণেই আসে এ বাড়ি। সব মেনে নেওয়া যায়—কিন্তু লতু কি করে ভাবতে পারল যে, নমিতা ঈর্ষান্বিতা হয়ে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছে? দিদিকে এত ছোট করে ভাবল কি করে সে? আর সে কথা বাবা-মার সামনে প্রকাশ্যে বলতেও সঙ্কোচ হল না তার? রাগে দুঃখে অভিমানে সারারাত শুধু এপাশ ওপাশ করল। এক ফোঁটা ঘুম এল না।

মাঝে মাঝে অনুভব করল যে পাশেই লতু জেগে রয়েছে। কাঁদছে সেও। বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। বাইরে তার প্রকাশ নেই ; কিন্তু ঠিক পাশে যে শুয়ে আছে সেও কি তা বুঝতে পারবে না? নমিতা সবই টের পায় কিন্তু কী করতে পারে সে? লতু বিছানায় শুয়ে কাঁদছে জেনেও তাকে সান্ত্বনার কথা বলতে পারল না। জীবনে এই বোধহয় প্রথম। অনেক দুঃখ রজনীই অতিক্রম করেছে ওরা বিনিদ্র নয়নে। পাশাপাশি শয্যায়। লতুর কান্না দেখলে সে কোনদিনই স্থির থাকতে পারে না। নিজের চোখ মুছে গিয়ে বসে ওর মাথার কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে মিষ্টি কথা বলে শান্ত করে এই দুরন্ত বোনটিকে।

আজ কিন্তু একতিল উৎসাহও অবশিষ্ট ছিল না!

কী লজ্জা! নমিতা ভাবে, একই পুরুষকে ভালবেসেছে ওরা। আজ থেকে ওরা আর সহোদরা নয়—একই পুরুষের প্রণয়াকাঙক্ষী প্রতিদ্বন্দ্বী নারী!

কথাটা মনে হতেই একটা ছিছিকারে ভরে যায় সারা মন!

পরদিন সকালে উঠতে নমিতার বেশ দেরি হল। সারারাত্রি জেগে—ভোর রাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠে দেখে বেশ বেলা হয়ে গেছে। আজ রবিবার—স্কুলে যাবার তাগাদা নেই। রবিবারটা ভালোই লাগে ওর। সপ্তাহান্তে একটি দিন ছুটি। তাছাড়া এই দিন প্রায়ই ভূষণও আসে সপ্তাহান্তের হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দিতে। আজ কিন্তু রবিবার হওয়ায় বিব্রতই বোধ করল সে। স্কুলে বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। সারাদিন বাড়িতেই থাকতে হবে সবার চোখের সামনে। লতু কখন উঠে বেরিয়ে গেছে। মা উনুনে আগুন দিয়েছেন।

নমিতা দৈনন্দিন কাজে আত্মনিয়োগ করে। মশারিটা টেনে নামায়। সেদ্ধ করে কাচবে সেটা আজ। প্রয়োজন ছিল না। অর্থাৎ প্রয়োজনটা মশারির ছিল না, ছিল নমিতার। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে দিনটা কাটিয়ে দিতে চায়। হরিপদ বসেছিলেন বাইরের দাওয়ায়। বিন্দুবাসিনী বালতিটা তুলে নিয়ে জল আনতে বেরিয়ে যান।

বৃদ্ধ ডাকেন : নমু, এদিকে শোন।

নমিতা হাতের কাজ রেখে এসে দাঁড়ায়।

লতু কোথায় রে?

জানি না বাবা। সকালেই কোথায় বেরিয়েছে।

আর তোর মা?

জল আনতে গেছেন।

: ও। তুই বস এখানে। তোর সঙ্গে কথা আছে।

আবার সেই কালকের গ্লানিকর আলোচনা হবে। বিবক্ত বোধ করে নমিতা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

: কই এখানে এসে বস্। রাগ করে আছিস্ নাকি রে আমার উপর?

নমিতা ধীরে ধীরে বাপের পাশে এসে বসে।

: রাগ করিস না মা। তুই রাগ করলে আমি দাঁড়াই কোথা? অন্ধ বুড়ো মানুষ না হয় রাগের মাথায় দুটো কড়া কথাই বলে ফেলেছি।

নমিতা কথা বলে না। উদগত অশ্রু গোপন করে নতমুখে বসে থাকে। বৃদ্ধ বলতে থাকেন : কাল তুই রাগ করলি কেন বলত? আমি তো অন্যায় কিছু বলিনি। যখন দেশে ঘরে ছিলাম তোকে পাত্রস্থ করবার কম চেষ্টা করিনি। ওরা মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত আর আমি ভগবানকে অভিশাপ দিতাম। এখন মনে হয়—ভগবান বোধহয় ভালোর জন্যেই এ ব্যবস্থা করেছিলেন। যদি সে সময়ে তোর বিয়ে হয়ে যেত—তাহলে আজ আমাদের না খেয়ে মরতে হত। বৌমার অতকাণ্ডের পর—

: জানি বাবা।

: তুই তো সবই জানিস মা! আমি অন্ধ হয়ে পড়ার পরেও যশোরের রায় বাড়ি থেকে তোর সম্বন্ধ আসে—তখন তুই বলেছিলি 'বাবা আমি বিয়ে করব না—আমি শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে তোমাকে কে দেখবে?' তখন রাগ করেছিলাম।

নমিতা বুঝতে পারে ভুল বলছেন হরিপদ পণ্ডিত। সে সময় ওর বাবাও অন্ধ হননি—সেও আপত্তি জানায়নি। কিন্তু প্রতিবাদ করে না। হয়তো ঘুলিয়ে ফেলেছেন বুড়ো মানুষ—না হয়তো মনকে ঐ রকমই একটা প্রবোধ দিতে দিতে সেটাই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন তিনি। বৃদ্ধ বলেই চলেন—

: পরে ভেবে দেখেছি—মা তো আমার ঠিক কথাই বলেছে। সে যদি বিয়ে না করতে চায় নাই করল। কত মেয়েই তো লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি করছে। তারপর থেকে আর ও কথা আমি বলিনি। কিন্তু লতুর কথা তো অন্য রকম। ওটাকে পার করতে পারলে তো তোর দায়িত্বই হাল্কা হয়। ভূষণ যখন নিজে থেকে ওকে বিয়ে করতে চায়—

: ভুল করছ বাবা, ভূষণবাবু লতুকে বিয়ে করতে চাননি।

: কিন্তু ঐ যে লতু বলল কাল রাত্রে?

: আমি মিছে কথা বলি না বাবা।

বৃদ্ধ চুপ করে যান। ঘটনার সূত্র বোধহয় হারিয়ে যায় বৃদ্ধের কাছে। কোথায় কি যেন একটা ভুল হচ্ছে। নমিতা জেনে শুনে মিথ্যা কথা বলবে না। অন্তত তার বাপের কাছে নয়। এদিকে লতু স্পষ্টই মুখের উপর বলে গেল যে সে নিজের কানে শুনেছে। ভূষণের পিসীমাও শুনেছেন ভূষণের কাছে। তাহলে ব্যাপারটা কি? হরিপদ পণ্ডিত অন্যদিক থেকে শুরু করেন : আচ্ছা বেশ, তোর কথাই মেনে নিলাম। ভূষণ প্রস্তাব করেনি এখনও। কিন্তু সে যে লতুকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক এটা তো মিছে কথা নয়? ওদের দুজনের মধ্যে যখন একটা অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে তখন প্রস্তাবটা আমরাও তুলতে পারি।

: ওদের দুজনের মধ্যে যে অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে এটা তুমি জানলে কি করে? প্রস্তাব করলে ভূষণবাবুই যে পিছিয়ে যাবেন না তাই বা তুমি ধরে নিচ্ছ কেন?

: আমি অন্ধ হলেও কিছু কিছু বুঝতে পারি মা। কাল দুপুরে যখন ভূষণ এল তখন তোর মা ঘুমুচ্ছে। আমিও চুপ করে শুয়ে আছি। তুই তখনও ইস্কুল থেকে ফিরিসনি। লতুর সঙ্গে ও ঘরে ভূষণ অনেকক্ষণ ধরে ফিস্ ফিস্ করে আলাপ করল। মাঝে মাঝে ওদের চাপা হাসিও কানে এল আমার। ওরা ম করেছে আমিও বুঝি ঘুমাচ্ছি।

নমিতা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে : কাল ভূষণবাবু এসেছিলেন? ঠিক জানো তুমি?

জানি না? আমি শুনলাম ভূষণ লতুকে বললে 'তোমার দিদিকে বল একটা ছোট ছেলে এসে জামা কাপড়গুলো দিয়ে গেছে। আমি এসেছিলাম তা বলবে না কিন্তু।' লতু জবাবে বলল 'অতই বোকা কিনা আমি।'

নমিতার ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে গিয়ে ধরে আনে ভূষণকে। চিৎকার করে তাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছিল— কেন সে এভাবে খেলা করছে ওদের দুজনকে নিয়ে। কী সে চায়? ওদের সুখের সংসারে এভাবে ভাঙন ধরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যটা কী? মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছে বলে কি এভাবে পুতুল খেলা করবে তাদের নিয়ে ভূষণ? বাপ আজ মেয়েকে বিশ্বাস করে না—বোন দিদির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

বৃদ্ধ আর্তকণ্ঠে ডাকেন : নমু?

আমারই হয়তো ভুল হয়েছিল বাবা। বেশ তো লতুর বিয়ের জোগাড় দেখ। আমি এতসব কথা জানতাম না।

. সে তো আমি জানিই। তুই ইস্কুলে বেরিয়ে যাবার পর লতুও বেরিয়ে যায় ওদের বাড়ি। কখনও ভূষণ আসে এ বাড়ি।

নমিতা চুপ করে থাকে।

: তাহলে আজ ও বেলা তোর মাকে নিয়ে ভূষণদের বাড়ি যাস। ওর পিসীমার সঙ্গে কথা বলে আসিস্। আর ঐ সঙ্গে অনুর ওখানেও একবার যাস্। ওরা ওদের কর্তব্য না করলেও আমাদের তো খোঁজ নেওয়া উচিত। বোনের বিয়ে। অনুকে তো এ সময় আলাদা সরিয়ে রাখতে পারি না।

নমিতা কোন কথাই বলে না। তাই সে করবে। যৌবনসীমান্তবর্তিনী মেয়েটির ক্ষোভ নেই আর। শুধু একবার ভূষণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে : —এই যদি তোমার মনে ছিল তা হলে আমাকে নিয়ে ও নিষ্ঠুর খেলা কেন খেললে তুমি? মিথ্যা স্বপ্নজাল কেন বোনালে আমাকে দিয়ে?

নিতাই কবিরাজ সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছেন ওঁদের দাবী। পুরানো পঞ্চায়েতের বদলে নতুন অ্যাড-হক কমিটির তত্ত্বাবধানে নির্বাচন ব্যবস্থা চলছে। বিষ্টুপদ, গোকুল, নবীন পতিতুণ্ডি প্রভৃতি পুরানো পঞ্চায়েতের যারা সভ্য তারা প্রতিবাদ করতে আসেনি। কালের গতি-কে মেনে নিয়েছে তারা। আসলে ওরা প্রতিবাদ করবার ভরসা পায়নি। পুরনো কাশুন্দি যে তাদের ঘাঁটতে হল না এটাই যথেষ্ট। অভিযোগের ফিরিস্তিটা তারাও জেনেছিল। সেগুলোর যে জবাবদিহি করতে হলনা এই নগদ লাভ। জনসেবা করার মোহও ঘুচে এসেছিল ওদের। ডোলের ব্যবস্থা থাকলেও ডামাডোলের বাজার আর নেই। লোকগুলোও সচেতন হয়েছে। আর নতুন সব অফিসার যাঁরা আসতে শুরু করেছেন তাঁরা এক একটি চীজ্! কোথা থেকে যে এইসব অপোগণ্ডগুলোকে আমদানি করা হচ্ছে ওরা ভেবে পায় না। নয়া অ্যাডিমিনিস্ট্রেটর বাগচিই একটি উদাহরণ। ইনি সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পুরনো ইতিহাসগুলি খুঁটিয়ে দেখছেন। কী যে উদ্দেশ্য তা তিনিই জানেন। দলিল পত্র থেকে কতটা কি উদ্ধার করেছেন বুঝবার উপায় নেই। তবে পুরনো দিনের অনেক ইতিহাসই যে ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছেন এটা বোঝা যায়। ফলে ইদানীং সামলে চলতে শুরু করেছে বিষ্টু, গোকুলেরাও।

যতীশবাবু অফিসের একজন পুরনো ঘাঘী। বিষ্টুপদকে ডেকে আড়ালে একদিন বললেন : আপনারা তো বাঁচলেন মশায়। জ্বালা হয়েছে আমাদের! ঐ হারামজাদা নিতাই ঠাকুর্দা হয়েছে ওঁর পরামর্শদাতা। সর্বদাই গুজ্ গুজ্ ফুস্‌ফুস্ লেগেই আছে।

বিষ্টু বলে : আরে রয়েন। পেরথম্ ক'দিন ফোঁস ফোঁস করবই। তারপর ঠিক পোষ মানব। বাধেকিষ্টো বুলি পড়ব। কত দাখলাম, কত দ্যাখবাম্।

যতীশবাবু বলেন : আরে না মশাই সে জাতের লোক নয়। অতি বদমায়েস। ও কোনকালেই পোষ

মানবে না।

নামোল্লেখ না করলেও দুজনেই বোঝেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচি সাহেবের কথাই আলোচনা হচ্ছে।

বিষ্টুপদ বলে : অ্যাদ্দিন আছিল কোই? ডেপ্‌টি?

: ছাই! ডেপুটি হতে হলে লেখাপড়া করতে হয়। এঁর কোয়ালিফিকেশন জেল খেটেছেন! আরে বাবা খদ্দরের টুপি পড়লেই যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেসন চালান যেত তাহলে ভাবনা ছিল না।

বিষ্টুপদ বলে : তা তো বটেই!

: কাল আমায় ডেকে কি বললে জানেন? বললে—'ই ব্লকের শ্রীনিবাসকে কুমিরের ছানা করে আর কতদিন রাখবেন যতীশবাবু? ওটাকে এবার সত্যিই পি. এল. ক্যাম্পে পাঠান।

বিষ্টুপদর চোখ বড় হয়ে যায়; বলে : হেই কথাডা কইলেন! কুমিরের পোলা? আপনে কি কইলেন?

: আমি আর কি বলব? চুপ করে রইলাম। কতটা জানে আর কতটা জানে না—তাই কি বুঝতে পারি? আমি স্রেফ চেপে গেলাম।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার ই-ব্লকের শ্রীনিবাসের রোজগারটা ছিল একটু বিচিত্র ধরনের। অভিনয় করেই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়ে যেত তার। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় নয়, জীবন-নাট্যমঞ্চেই তাকে নিখুঁত অভিনয় করে যেতে হত বিভিন্ন ভূমিকা। ডিরেক্‌টার বার কয়েক রিহার্সাল দিইয়ে নিতেন আড়ালে। হুবহু নকল করত সে। মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে যাওয়া হত কর্তৃপক্ষের সামনে। কখনও কলকাতায়, কখনও কলোনির অফিসেই। দাঁড়াতে হত তাকে সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসারের সামনে যুক্তকরে। বিকলাঙ্গ তার দেহ। দুটো চোখই অন্ধ। ডান হাতখানা কনুই থেকে কাটা। মুখের একটা দিকে পুড়ে বীভৎস হয়ে গেছে। মিলে কাজ করত সে নারায়ণগঞ্জে না ঢাকায়। কারখানাতেই পা ফসকে যায়—অগ্নিগর্ভ বয়লারটার আঁচে ঝলসে যায় চোখমুখ। হাতটাও পরে কেটে বাদ দিতে হয়েছিল পচনক্রিয়া শুরু হয়েছিল ঘা শুকাবার সময়। করুণার পাত্র শ্রীনিবাস। মেক আপের দরকার হত না তার। পরিদর্শনকারী উপরওয়ালা অফিসার প্রশ্ন করেন : তোমার নাম হরেকৃষ্ণ দেবনাথ?

শ্রীনিবাস নন্দী বলে : আইজ্ঞা হাঁ হুজুর।

: পরিবারে আর কে আছে?

: কেউ নাই হুজুর! বউবেটী কেউ নাই। অখন হুজুর না দেখলি মরুম্। নিচ্চই মরুম্।

কেঁদে নুলো হাত বাড়িয়ে হুজুরের ফিতে বাঁধা জুতোটা জড়িয়ে ধরে। বিব্রত হন কলকাতার অফিসর ভদ্রলোক। কৃপা হয়। হওয়াই স্বাভাবিক। বলেন : ওঠ, ওঠ আচ্ছা স্টারভেশান ডোল পাবে তুমি। ফ্রি র‍্যাশানের কার্ড দেওয়া হবে তোমার নামে। সপ্তাহে সপ্তাহে ক্যাস ডোল আর চাল-ডাল নিয়ে যাবে অফিস থেকে। বুঝেছ?

ঘাড় নেড়ে শ্রীনিবাস জানায় বুঝেছে। চোখ মুছতে মুছতে উঠে যায়। ওকে হাত ধরে ই-ব্লকে পৌঁছে দিয়ে আসে যতীশবাবুর কর্মচারী। বাড়ি পৌঁছানোর পর তার হাতে গুঁজে দেয় একটা দুটাকার নোট। তাই দিয়ে সংসার চালায় শ্রীনিবাস। এছাড়া স্টেশনে ভিক্ষাও করে। সেটাই তার প্রধান উপজীবিকা। অভিনেতা হিসাবে যেটা পায় সেটা উপরি রোজগার। একা মানুষ। চলে যায় ভালোই। আবার একদিন হয়তো ডাক পড়ে। আবার এসে দাঁড়ায় ক্যাম্প অফিসে। অপর একজন অফিসর প্রশ্ন করেন : তোমার নাম জীবন পর্বত?

হুহু করে কেঁদে ওঠে শ্রীনিবাস : আইজ্ঞা না হুজুর। জীবন আমার নাম লয়!

চম্‌কে ওঠেন যতীশবাবু! বেটা আজ বলে কি? এত রিহার্সাল ব্যর্থ হয়ে গেল?

শ্রীনিবাস কিন্তু ভুল করেনি। ডিরেক্‌টারের উপর টেক্কা দিয়ে একহাত মৌলিক অভিনয় দেখিয়ে নেয়। সংলাপও তার নিজস্ব : জীবন আমার নাম লয় হুজুর! আমার নাম মরণ; মরণ! বাপে নাম দিছিল

জীবন! জীবন মইর‍্যা গ্যাছে গা! তখন আমি মবণ। হায় ঠাকুর, মরণও হয না আমাব!

মেজের উপর বিকৃত মুখখানা ঠুক্‌তে থাকে ও।

অফিসর যতীশবাবুর দিকে ফিবে বলেন : ইট্‌স্ এ পিটি দ্যাট য়ু ডিড্‌নট রেকমেণ্ড হিস্ কেস আর্লিয়ার। পি. এল. ক্যাম্পে গেলে দেখি যত জোয়ান মর্দ বসে বসে পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি হয়ে ডোল খাচ্ছে—আর এদিকে সত্যিকারের সাফারার পড়ে আছে কলোনেতে। আপনাদের ইনেফিসিয়েন্সির জন্য গোটা ডিপার্টমেন্টের বদনাম হয়।

যতীশবাবু মুখটা কাচুমাচু করেন। এ কেসটা ইতিপূর্বে কেন পাঠান হয়নি তার কারণ দেখাতে বলেন : ও স্যার নতুন এসেছে কলোনিতে।

: আইসী! কতদিন হল এসেছো তুমি এখানে?

শ্রীনিবাস চুপ করে থাকে। সে নিজে এসেছে বছর পাঁচেক ; কিন্তু এখন সে জীবন পর্বত। জীবনেব নাম কবে থেকে কলোনীভুক্ত করা হয়েছে জানা নেই তার। বলে : খেয়াল নাই হুজুর।

যতীশবাবু বলেন : মাস দুই হবে? চতুর শ্রীনিবাস সামলে নেয় : হ কর্তা। তা হইব। ইটা তো অগ্রাণ?

পূজার সময় আইছি আজ্ঞা।

: আচ্ছা যাও তুমি। ফ্রি ডোলের বন্দোবস্ত হবে তোমার।

ফিরে যায় শ্রীনিবাস। জীবন পর্বতের অভিনয় করে কাঁদতে কাঁদতে সে বাড়ি ফেবে।

সেই শ্রীনিবাস!

বাগচি সাহেব একেই বলেছেন 'কুমিরের ছানা'। যতীশবাবুর ঘাবড়ে যাওয়া অকারণ নয়।

এমনি কত তুচ্ছ ইতিহাস!

বাগচি সাহেবের অল্প বয়স। অকৃতদার। সারাদিন অফিস করে যখন বাড়ি যান তখন একগাদা ফাইলপত্র সঙ্গে নিয়ে যায় আর্দালি। পুরনো দলিল। সব উল্টেপাল্টে দেখছেন তিনি। যতীশবাবুর দল শঙ্কিত হয়। খাতাপত্র অবশ্য ঠিকই আছে। তবে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে কোথায় সাপ বেরিয়ে পড়ে তার ঠিক কি? সন্ধ্যার পর বাগচি সাহেব নিজেই টাইপ করতে বসেন। সকাল বেলা অফিসে এসে ডাকেন ডেস্‌প্যাচ ক্লার্ক মিহিরকে।

: ইসু রেজিস্ট্রারখানা নিয়ে আসুন তো।

ইসু রেজিস্ট্রারে পাঁচ-সাতখানা নেমো নম্বার নিজের হাতেই বসান। 'সবজেক্ট'-এর ঘরে লিখে দেন 'কন্‌ফিডেন্সিয়াল!' পিয়ন শীল মোহর করে ওঁরই সামনে। খামগুলোব উপর ডেসপ্যাচ ক্লার্ক কম্পিত হস্তে টিকিট আঁটে।

যতীশবাবু নিম্নকণ্ঠে বলেন : যাচ্ছে কোথায়? মিহির?

তাকল্যাণ্ড।

· সব কখানাই?

. হ্যাঁ!

শালা!

এ জাতীয় কথোপকথন প্রায়ই আজকাল হয় অফিসে। কাঁটা হয়ে আছে সবাই। মাঝে মাঝে আসতে শুরু করল বদলির অর্ডার। পুরনো অনেকেই চলে গেল। এল অচেনা ছেলের দল। এরা ডেপুটেশান দেয়। ফল হয় না।

মিহির বলে : ব্যাপাব কি যতীশদা? খোল-নল্‌চে সবই কি বদলে যাবে নাকি।

বদলাবে না? না হলে নিজেদের ভাইপো ভাগ্নেগুলো চাকরি পাবে কি করে? নিজেই বুঝবেন। সব পুরনো স্টাফ চলে গেলে 'ওল্ড আন্‌ডিসাইডেড' কেসগুলো কি করে মেটান আমিও দেখব।

: কেন সে তো আপনিই আছেন?

: আমি? আমি কি বলব? কে কোথায় কি করে রেখে গেছে তার সব জবাবদিহি করব আমি? দায় পড়েছে আমার।

: তা দায় আপনার বইকি। আপনিই তো অফিসের ওভার-অল ইনচার্জে ছিলেন।

যতীশবাবু চীৎকার করে ওঠেন : তাই বলে কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি? এই যে উনি আজ দিন সাতেক ধরে সি. আই. সীটের ফাইলটা আটকে রেখেছেন বাড়িতে—রেজিস্ট্রারখানাও নিয়ে গেছেন—আমি কি বুঝি না কি করছেন তিনি? যখন বললাম শীতলকে বদলি করবেন না—তখন তো শুনলেন না—সে থাকলে সেই ঝক্কি পোয়াত। ধর যদি হিসাবে এখন কম-বেশি হয় কোথাও তবে কে জবাব দিহি করবে?

মৃণাল বলে : বেশি হলে আমাকে দায়ী করবেন দাদা! কম্ হলে অবশ্য মুশ্‌কিল। কি বলিস মিহির?

দৃষ্টি বিনিময় হয় মৃণাল আর মিহিরের। বন্ধু ওরা দুজন। পাপের কারবারে ছিল না কোনদিন। শীতল ছিল স্টোরের চার্জে। যতীশবাবুর প্রিয়পাত্র। বদলি হয়ে গেছে সে। নতুন যে ছোকরা এসেছে—সে প্রভিশনালি চার্জ নিয়েছে। চাবি আছে যতীশবাবুর কাছে। মাল গুন্‌তি করে সে দায়িত্ব নেবে।

মিহির বলে : শীতল বদলি হয়ে যাওয়াতে দাদার বড় অসুবিধা হয়ে গেল, না দাদা?

যতীশবাবু চটে ওঠেন : মেলা বক্‌বক্ কর না দিকিনি। যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বল না। যা করছ তাই কর। তোমার আর কি? বসে বসে খামের উপর টিকিট সাঁটো! বউকে চিঠি লিখতে গিয়ে যদি সার্ভিস-স্ট্যাম্প কিছু সরিয়ে থাক তাহলে সেই হিসাবটা মিলিয়ে রাখ বরং।

মৃণাল বলে : দাদা ভীষণ চটেছেন মনে হচ্ছে?

গুম্ মেরে বসে থাকেন যতীশবাবু।

মিহির বলে : টিকিটের হিসাব ঠিক মিলিয়ে দেব দাদা। কিছু ভাববেন না আপনি। করোগেড টিনের হিসাবটাও যদি না মেলে তবে আপনার ঘাবড়াবার কি আছে? কেউ তো বলতে পারবেনা ব্যারাকপুরের বাড়িখানা আপনি এই টিন দিয়ে তুলেছেন—অথবা টিন বিক্রি করে কিছু নগদ কারবার করেছেন আপনি।

লাফিয়ে ওঠেন যতীশবাবু : বলি কাজ কর্ম করতে দেবে—না ভ্যানর ভ্যানরই করবে সারাদিন? অফিসটা আড্ডাখানা নয় বুঝলে? এখানে মুখটি বুঁজে কাজ করতে হয়।

বলে মুখব্যাদান করে এক গোছা পান পুরে দেন গালে! ঘস্‌ঘস্ করে কলম টানেন তিনি নোট শীটে আবার দৃষ্টি বিনিময় হয় মৃণাল আর মিহিরের। কৌতুকদীপ্ত সহাস্য-দৃষ্টি।

জংশনের হাসপাতালে আজকাল একাই আসতে পারে কামিনী। নিতাই ঠাকুর্দা ভর্তি করে দিয়ে যাবার দিন সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে আসেন অবশ্য তিনি। খোঁজ খবর নিয়ে যান নিতাই ঠাকুর্দার বন্দোবস্তে একটা ফ্রি রেশনের ব্যবস্থাও হয়েছে। নিতাইপদর স্বেচ্ছাসেবকের দলের কয়েকটি ছেলে মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিয়ে যায়। গোরাকে নিয়ে কামিনীর দিন কেটে যায় কোন রকমে। ঘরে রোগী নেই। অর্ধেক কাজ কমে গেছে। ক্রমশ সেরে উঠছে অনিমেষ। দু তিন দিন বাদে গোরাকে নিয়ে কামিনী দেখা করতে যায়। কখনও যোগেন নায়েক, কখনও অন্য কোন ছেলে থাকে সঙ্গে।

বিষ্টুপদ কামিনী-কাঞ্চনের লোভ একেবারেই ত্যাগ করেছে। অনিমেষ হাসপাতালে যাওয়ার খবরটা সে জানতো না। অনেকদিনই অপেক্ষা করেছিল সে—তার দেওয়া শাড়িখানিতে তনুদেহ ঢেকে কামিনী এসে দাঁড়াবে তার দোকানে। সে এল না। কৌতূহল হল বিষ্টুপদর! ব্যাপারটা কী? অনিমেষ কি ভালো হয়ে উঠল। কিন্তু ওদের সংসারটা চলে কি করে? উপযাচক হয়ে যাওয়া ভালো হবে কিন' বুঝে উঠতে পারে না। তারপর একদিন লক্ষ্য করল ছোট ছেলেটির হাত ধরে কামিনী তার দোকানের সামনে দিয়ে

দিব্যি গটগট করে চলে গেল। সঙ্গে রয়েছে বাচ্চু পাল। ঠাকুর্দার এক চ্যালাচামুণ্ডা। বিষ্টুপদ তাই আর দোকান থেকে নেমে এল না ; কিন্তু অবাক হয়ে সে দেখলো মেয়েটার পরনে একখানা নতুন শাড়ি। তার দেওয়াখানা নয়—অন্য একটা। মুখ-চোখ দেখে অনশনক্লিষ্টা বলেও মনে হল না। অবাক হল বিষ্টুপদ। তার অবর্তমানে তাহলে বাচ্চু পাল এসে অধিকার করেছে মেয়েটাকে? বাচ্চু পাল? ছেলেটাকে তো সে ভালো বলেই জানতো। আর মেয়েটাই বা কি? অসুস্থ স্বামীকে বাড়িতে একলা ফেলে পরপুরুষের সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে! অনুতাপ হয় বিষ্টুপদর।

দুদিন পর বিষ্টুপদ আবার দেখল মেয়েটি বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছে—ছেলের হাত ধরে। এবার সঙ্গী বাচ্চু পাল নয়—যোগেন নায়েক। বিষ্টুপদ নিজের মনেই বলে : বা। এ তো দেখি একেবারে পঞ্চপাণ্ডবকেই গেঁথে ফেলেছে!

আর অপেক্ষা করা সম্ভব হয় না বিষ্টুপদর পক্ষে। পবদিন সন্ধ্যায় সে ঘুরঘুর করছিল কামিনীব বাড়ির আশেপাশে। ঘরের ঝাঁপ ভিতর থেকে বন্ধ। ধাক্কা দিতে সাহস হল না ওর—কি জানি কোন পাণ্ডব আছেন ভিতরে কে জানে? ওপাশে সরে গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি দেবার চেষ্টা করল। চেষ্টা ফলবান হয় না। হঠাৎ ঘাড়ের উপর পড়ল একখানা লৌহকঠিন হাত। বিষ্টুপদ ঘুরে দেখে স্বয়ং মধ্যম পাণ্ডব যোগেন নায়েক। ঠাকুর্দার স্বেচ্ছাসেবক দলের একটা গুণ্ডা।

যোগেন বলে : এ বাড়িতে একজন মহিলা একা থাকেন।

: হ জানি। কামিনী। তা হইছেডী কি?

: হয়েছে এই যে তিনি আপনার রক্ষিতাও নন, অরক্ষিতাও নন। ফের যদি কোনদিন এই জানলা দিয়ে মুণ্ডু গলাতে দেখি তবে মুণ্ডুখানা রেখে সেদিন বাড়ি যেতে হবে। বুঝেছেন?—যান্!

: কী কও! এত বড় আস্পর্ধা! জান আমি লোকডা কে? আমি বিষ্টুপদ মজুমদার!

: জানি আপনি বিষ্টুপদ হারামজাদ! কলোনিতে আপনাকে না চেনে কে? কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না সেই স্বনামধন্য বিষ্টুপদ হারামজাদের মুণ্ডুখানি এককিলে চেপ্টে দেবার জন্যে কলোনির শতখানেক ছেলের হাতের মুঠো নিস্‌পিস্ করছে—শুধু ঠাকুর্দার হুকুম পাইনি বলে পারছি না। আর কি বলার আছে বলুন?

বিষ্টুপদ জোয়ান যোগেন নায়েকের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। জনশূন্য পথটার দিকে একবার দেখল। ওর কথাটা যে মিথ্যা নয় এটা আর যেই জানুক না জানুক স্বয়ং বিষ্টুপদ হাড়ে হাড়ে জানে। এসব ছেলের অসাধ্য কাজ নেই। মিনমিনে গলায় বলে : আমারে অপমান কর তুমি?

. অপমান? অপমান করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই আমার। আমার ইচ্ছা কীচক বধ কবার। কিন্তু কী কবব বলুন—ঠাকুর্দার হুকুম পাইনি। তবে আর একটি কথা বললে বিনা হুকুমেই কীচকবধ খতম করব। বিশ্বাস না হয় তবে আর একটা কথা বলে দেখুন।

বিষ্টুপদ সম্ভবত বিশ্বাস করে। মধ্যম পাণ্ডবের পক্ষে কীচকবধটা আর অসম্ভব কি? দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে সরে পড়ে। প্রাণখুলে হাসতে থাকে যোগেন নায়েক।

কামিনী এতকথা জানতো না। সে শুধু দেখেছে বিষ্টুপদ আর তার ছায়া মাড়ায় না। স্বেচ্ছাসেবক দলের অনেকগুলি ছেলেই আসে ওর কাছে। রাখাল, কানাই, যোগেন, বাচ্চু। কলোনিরই সব ছেলে। ছোট ভাইয়ের মত এসে আবদার করে। গল্প করে। কোনদিন হয়তো একগাদা কাঁচা চিনে বাদাম এনে বলে : বৌদি, ভেজে রেখে দেবেন। আমরা মাঝে মাঝে এসে খাব।

কখনও লাউটা বেগুনটা এনে দেয়। বলে : ওবেলা এসে একটু তরকারি খেয়ে যাব বৌদি।

হয়তো আসে। হয়তো আসে না।

ওদের ভালবাসার দান গ্রহণ করতে বাধে না কামিনীর। সপ্তাহান্তে র‍্যাশানটাও ওরাই দিয়ে যায়। ঠাকুর্দা একখানা শাড়িও পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজের টাকায় নয়। সরকারী সাহায্যই এসে পৌঁছায় ওর

ঘরে। এরা শুধু চিনির বলদ। কামিনী ভাবে এদেরও তো অভাব অনটনের সংসার। এরা তো চুরি করে না আগের ওদের মত? আবার শ্রদ্ধা বাড়ে মানুষের উপর। মানুষ মাত্রেই তাহলে পশু নয়। স্বার্থই সবার মূলমন্ত্র নয় তা হলে। ভালো খারাপের মেশানো এ দুনিয়া। ভাবে কামিনী। এখানে বিষ্টুপদও থাকে যোগেন নায়েকও থাকে, এখানে লালু ডাক্তারও প্র্যাক্‌টিশ করে, নিতাই কবিরাজও রোগী দেখেন, এ দুনিয়ায় যতীশবাবুরাও সরকারি কাজ করেন, বাগচি সাহেবের মত সরকারি অফিসারও আছেন।

নমিতাকে একলাই আসতে হয় ভূষণের বাড়ি। লতুর বিয়ের সম্বন্ধ করতে। বাড়ি থেকে অবশ্য বিন্দুবাসিনীকে নিয়েই বেরিয়েছিল; কিন্তু তিনি ফিরে গেলেন মাঝপথ থেকে। বস্তুত তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে একাই এল নমিতা।

বিন্দুবাসিনীকে ফিরতে হল অবশ্য অন্য কারণে।

ওঁরা ভূষণের বাড়ি যাবেন বলেই বেরিয়েছিলেন। পথে তিনি প্রস্তাব করলেন অনুকে দেখে যাবেন। নমিতা প্রথমে রাজি হয়নি। কিন্তু বিন্দুবাসিনী অনেকদিন পর পথে বেরিয়ে মনটা বদলে ফেলেছেন। লতুর বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছেন। দুদিন পরেই হবে লতুর বিয়ে। বড় ছেলেকে তো তখন সরিয়ে রাখতে পারবেন না। খবরটা নিয়ে যাওয়াই ভালো। তাছাড়া অনিমেষের দোষটা কি? বাবলুকে পাঠিয়ে খবরটা দেয়নি বলে কিছু ত্যাজ্যপুত্র করতে হবে না তাকে। নমিতা কিন্তু আগে থেকে বলে রাখে—সে বাড়ির ভিতরে যাবে না। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। বিন্দুবাসিনী প্রতিবাদ করেননি। তিনিও স্থির করেছিলেন কামিনীর সঙ্গে কথাও বলবেন না। অনিমেষকে দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে চলে আসবেন। বউকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার সম্পর্কটা শুধু পুত্রবধূর সঙ্গেই ছিন্ন হয়ে গেছে। পুত্রের সঙ্গে নয়।

গলির মোড়টা ঘুরেই ওঁদের থেমে পড়তে হল।

কামিনী সদর দরজায় তালা লাগিয়ে গোরার হাত ধরে কোথায় চলেছে। ওর সঙ্গে রয়েছে একটি ছেলে। বছর বিশেক বয়স। সুন্দর সুগঠিত চেহারা। নমিতা অনেকবার দেখেছে ওকে ঠাকুর্দার থানে—নামটা জানা নেই। কলোনিরই ছেলে। কামিনীর মুখচোখ পরিষ্কার। একটু প্রসাধন করেছে বলে মনে হয়। পরিধানে একটা আনকোরা নতুন শাড়ি। খালি পা—আলতা পরেছে। কপালে একটা সিঁদুরের টিপ। ড্রেস করে কাপড় পরেনি যদিও—কিন্তু বাইরে যাবার জন্য কুঁচি দিয়েই সাধারণ করে পরেছে শাড়িখানা। ব্লাউসটাও নতুন—নইলে নমিতা চিনতে পারত।

কামিনী গোরার এক হাত ধরেছে—ছেলেটি ধরেছে আর এক হাত। তার ও হাতে একটা গাঁদা ফুলের তোড়া। গায়ে টুইলের হাফসার্ট—পরিষ্কার ধুতি—পায়ে স্যাণ্ডেল।

নমিতারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কামিনী দেখতে পায়নি ওদের। বেশ সপ্রতিভ ভাবে নমিতার নাম-না-জানা যুবকটির সঙ্গে গল্প করতে করতে ওরা এগিয়ে গেল। নমিতা হঠাৎ লক্ষ্য করল ছেলেটি গোরাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল পানের দোকানের দিকে। দু খিলি পান কিনে এনে একটা নিজের মুখে পুরে দিল—আর একটা দিল কামিনীকে। কি একটা কথা বলল সে। অনেক দূর থেকে বলে শোনা গেল না। দুজনেই হেসে উঠল কথাটায়। এটা বোঝা গেল।

ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। ব্যাপার কি?

নমিতা বলে: বাড়িতে তালা দিয়েও কোথায় গেল? দাদা তাহলে কোথায়?

বিন্দুবাসিনী জবাব দিলেন না। নিঃসন্দেহে অনিমেষ ভালো হয়ে গেছে। আলতা-পরা সিঁদুর-মাখা পুত্রবধূ যখন বাড়িতে তালা মেরে বৈকালিক ভ্রমণে বার হচ্ছেন তখন অনিমেষ যে ভাল হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে এটা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু কামিনীর এতদূর অধঃপতন হবে? ছেলের হাত ধরে প্রকাশ্য দিবালোকে সান্ধ্যভ্রমণে বের হচ্ছে সে পরপুরুষের সঙ্গে?

: আরে নমু যে! কই যাও?

এগিয়ে আসে বিষ্টুপদ।

: দাদা বৌদিরা কোথায়?

: তোমাগো বউদি? এই তো বাহির হইয়া গেল গা। দেখ নাই?

: হাঁ, দেখলাম। সঙ্গে ওটি কে বলুন তো?

: অরে চিন না? রাখাল। রাখাল্ দেবনাথ। মহা হারামজাদ ছুক্‌রা!

: কোথায় গেল বলুনতো ওরা।

হাসে বিষ্টুপদ। ফোঁগলা দাঁতের মধ্য থেকে জিবটা বার হয়ে আসে। বলে : তোমারে আর কি কমু, কও নমু। নিত্যি নতুন ছুক্‌রা আসতেছে! সব কথা তো কওন যায় না। তোমাগো ভালবাসি—তাই না কই।

বিন্দুবাসিনী বিষ্টুপদর সঙ্গে কথা বলতেন না। এ সময়ে কিন্তু তিনি আর সঙ্কোচ না করে প্রশ্ন করে বসলেন : কিন্তু অনু কোথায়? ঘরে তালা মারা কেন?

বিষ্টুপদও লক্ষ্য করে ঝাঁপের দরজায় তার দিয়ে একটা রিং বানিয়ে তাতে তালা লাগানো আছে। অনিমেষ কোথায় আছে, কেমন আছে বিষ্টুপদ জানতো না। অনেকদিন এ পথ মাড়াইনি সে। নিজের মতো দোকানে এসে কাজকর্ম করে গেছে। এখন সে মনগড়া একটা জবাব দেয়।

: কই গেছে গা। অনিমেষডার যদি লক্ষ্য থাকতো তাহলে কি বৌডার এ দশা হয়।

বিন্দুবাসিনী আর আলোচনা বাড়তে দেননি। নমিতাকে বলছিলেন : চল্ বাড়ি চল্।

: সে কি ; ওখানে যাবে না?

: না আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। আজ থাক্।

নমিতা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছিল বিন্দুবাসিনীকে। ব্যাপারটায় বিন্দুবাসিনী যতটা আহত হয়েছিলেন নমিতা ততটা হয়নি। বরং এর চেয়ে অনেক বেশি আঘাত পেয়েছিল যেদিন সে ভোররাত্রে খিড়কির দরজায় কামিনীকে কার সঙ্গে টাকাকড়ি সম্বন্ধে কি যেন কথা বলতে শোনে। এ তো তার জানা দৃশ্য। এ দৃশ্য তার চর্মচক্ষে এতদিন পড়েনি কারণ সে এ পথে আসে না। মনশ্চক্ষে এ দৃশ্য তার অজানা নয়। মা বোধ হয় মনে মনে বিশ্বাস করতে পারেন নি। রাগারাগি করে জেদের বশে পৃথক হতে চেয়েছিলেন। আজ হঠাৎ এ সংবাদে তাই বেশি কাতর হয়ে পড়েছেন।

নমিতা বলেছিল : তুমি তাহলে বাড়িতে থাক। আমি একই যাই?

বিন্দুবাসিনী বলেন : আজ থাক্ না নমু। যাত্রাটা আজ শুভ নয়।

: তুমিও যে ঠাকুর্দার মতো শুরু করলে! না, আমি একাই যাই। অন্তত প্রাথমিক কথাটা পেড়ে আসি। ভুল বোঝাবুঝি যখন হয়েছে তখন যতশীঘ্র সম্ভব সেটা মিটিয়ে ফেলা দরকার। নাহলে পিসীমা অন্যত্র অগ্রসর হতে পারেন।

কথাটা ঠিক। বিন্দুবাসিনী রাজি হয়ে যান।

নমিতার অন্য গরজ ছিল আসলে। তার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল জানতে কি করে পিসীমা জানতে পারলেন ভূষণ প্রস্তাব করেছিল নমিতার কাছে।

ভূষণ বাস করে এ ব্লকে ৭২৪ নং প্লটে। কলোনির আর পাঁচখানা বাড়ির সঙ্গে এ বাড়ির এমন কিছু প্রভেদ নেই। টিনের চালা। দরমার বেড়া। ঝাঁপের জানলা-দরজা। বাড়ি তৈরির লোনের অনেক টাকাই ভূষণ বিনিয়োগ করেছে তার ব্যবসায়ে। তাই পাকা দেওয়াল তোলা সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে। সে হিসাবে কলোনির সাধারণ বাড়ির অনুপাতে ভূষণের বাড়িটা কিছু নিকৃষ্টই। তবু এ বাড়িতে ঢুকবার সময় নমিতার মনে হয়—এই সেই গৃহ যেটাতে বধূবেশে আসবার স্বপ্ন দেখেছে সে এতদিন। এটা তার কল্পলোকের শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু না, ও চিন্তা আর নয়। মনকে সে শাসন করে।

ঘরে ঢুকে লক্ষ্য করে চারদিক। সাধারণ গৃহস্থ বাড়ি। দেয়ালে খানকয় ছবি। ক্যালেণ্ডারের প্রাচুর্য। অনেকগুলি গতবৎসরের। এক কোণে বিছানাটা গোটান রয়েছে। গোটা দুই তোরঙ্গ। একপাশে একটা

ভাঙা হারমনিয়াম—হয়তো এককালে ভূষণ বাজাতো কিংবা তার স্ত্রী। ও কোণে একটা ছোট জলচৌকি। দেয়ালের গায়ে লাগানো। তার উপর লক্ষ্মীর আসন পাতা। পটের ঠাকুর। সিঁদুরের প্রলেপে মুখখানা ঢাকা পড়েছে। পা দুটিও চন্দন মাখানো ফুলে ঢাকা। একটা ছোট পিতলের গেলাসে জল আর একটা রেকাবিতে বাতাসা। কালো ডেঁয়ে পিঁপড়েয় ছেঁকে ধরেছে বাতাসাটাকে। ঘরে লোক নেই।

ঘর পার হয়ে ভিতরের বারন্দায় আসতেই দেখা হয়ে গেল এক প্রৌঢ়া বিধবার সঙ্গে। প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছিলেন তিনি। নমিতা এসে প্রণাম করে : আপনি তো পিসীমা? আমি নমিতা।

: ও, তাই বল। মুখখানা দেখেই চেনা চেনা লাগছে। তোমাদের দুই বোনের চেহারায় বেশ মিল আছে। এস মা বস।

একটা আসন এগিয়ে দেন তিনি। নমিতা সেটা সরিয়ে দেয়—মাটিতেই বসে পড়ে। বলে : মিঠুকে দেখছি না। গেল কোথায়?

: ও মা, মিঠুকে এই মাত্র এসে নিয়ে গেল যে লতু।

: লতু এসেছিল বুঝি বিকালে?

: হ্যাঁ ওতো মিঠুকে না দেখে একদিনও থাকতে পারে না। রোজ আসে। এত ভালবাসে মিঠুকে। আর মেয়েটাও ওকে পেলে যেন আর কিছু চায় না। কখন লতুমাসী আসবে তাই খালি জিজ্ঞাসা করে।

নমিতা বলে : হ্যাঁ, ছেলেপিলে বরাবরই খুব ভালোবাসে লতু।

একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে আসেন পিসীমা : তাই দেখলাম। সেই জন্যই সেদিন গিয়েছিলাম আমি তোমার মায়ের কাছে। তুমি তখন বাড়ি ছিলে না। তা দাও না তোমার বোনকে ঐ মা-মরা মেয়েটাকে মানুষ করার বার।

নমিতা হাতদুটি চেপে ধরেন পিসীমা। নমিতা ব্যস্ত হয়ে বলে : সে তো আমাদের সৌভাগ্য পিসীমা। আমরাই কন্যাপক্ষ, কোথায় আমরাই খোশামোদ করব আপনাকে—

: না, তাই বলছিলাম। শুনলাম তুমি নাকি আপত্তি করেছ, তাই ভাবলাম—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে নমিতা বলে : আচ্ছা এই কথাটা রটলো কি করে বলুন তো? মাও তাই বলছিলেন সেদিন। আমি তো আপত্তি করিনি। আমি শুধু ভাবছিলাম ওদের বয়সের তফাৎটা।

: তা হক। ওরা দুজনেই যখন দুজনকে পছন্দ করেছে......

: তা হলে তো কোন কথা নেই। কিছু মনে করবেন না, আমার ভয় ছিল লতুকেই। দ্বিতীয়পক্ষের বর যদি ওর মনে না ধরে—

পিসীমা যেন আকাশ থেকে পড়েন।—দ্বিতীয় পক্ষ! কী বলছ তুমি? কে দোজবরে?

: কেন, ভূষণবাবু?

হাসেন এবার পিসীমা : কে বললো তোমায়? বাজে কথা।

: বাজে কথা! মিঠুয়া তবে কে?

: আমার নাতনি—

: আর সুবালা?

: আমার ভাই ঝি। মিঠুয়া হতে গিয়েই সুবালা মারা যায়। মিঠুয়ার বাবা আবার বিয়ে করেছে। তা করবে না কেন বল? মিঠুয়া আমার হাতেই মানুষ হচ্ছে ; কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ আর সামলাতে পারি না। ভূষণকে বলি একটা বিয়ে করে বউ আনতে—তা ছেলে কানেই তোলে না—

নমিতার কানেই যাচ্ছিল না কথাগুলো। সে ভাবছিল কেন তবে মিথ্যা কথা বললো ভূষণ? সত্যকথা বলা কি ওর ধাতে নেই? প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে শুধু প্রতারণা করাই তার পেশা?

পিসীমা তখন এক নাগাড়ে বলেই চলেছেন নিজের কথা।

লতু মেয়েটির যাতায়াত বরাবরই ছিল এ বাড়ি। ভূষণের সঙ্গে প্রথমটা খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া হত

লতুর ছেলেমানুষি নিয়ে ভূষণ তাকে ক্ষ্যাপাতো। ডাকতো 'ঠানদি' বলে। লতুও ছেড়ে কথা বলতো না। এসে নালিশ করতো পিসীমার কাছে : তোমার ঐ ভূষণ্ডীকাক ভাইপোকে বারণ করে দিও পিসীমা—যেন আমার পিছনে না লাগে।

পিসীমা শুধু হাসতেন।

তারপর তিনি লক্ষ্য করলেন মা-হারা মিঠুয়া ঐ মেয়েটার একান্ত বাধ্য হয়ে উঠেছে। লতুও মিঠুকে নিজের বুকের পাঁজরের মতো ভালবাসতে শুরু করেছে। একদিন মিঠুয়াকে না দেখতে পেলে সে অস্থির হয়—মিঠুয়াও কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। তখন পিসীমার মনে হল ঐ মেয়েটাকেই যদি ভার দেওয়া যায় মিঠুয়াকে মানুষ করার। সুবালা যখন মারা যায় তখন মিঠুয়া এতটুকু। পিসীমা ভূষণকে বিয়ে করতে বলেছিলেন ; কিন্তু ভূষণ হিসাবী লোক। ব্যবসাটা ভালো ভাবে না চলতে শুরু করলে সে সংসারে ভাগীদার বাড়াতে চায় না। বলে বলে হার মেনেছেন পিসীমা। ইতিমধ্যে তিনি আরও অশক্ত হয়ে পড়েছেন। ওপারের ডাক এসে পড়েছে তাঁর। ভূষণকে তিনি সংসারি দেখে যেতে চান। তাছাড়া মিঠুয়ার একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা না করে গেলে ওপারে গিয়ে ভাই-বৌয়ের কাছে কৈফিয়ৎ দেবেন কি? এদিকে দুরন্ত মিঠুয়াকে সামলানোও দায় হয়ে উঠেছে আজকাল। এমন সময়ে দৈবপ্রেরিত ত্রাণকর্ত্রীর মতো এল লতু। পিসীমা রোজই ভাবেন ভূষণের কাছে কথাটা পাড়বেন, রোজই ইতস্তত করেন।

এত আকাঙ্ক্ষার জিনিসটা যদি প্রত্যাখ্যাত হয় সেই ভয়েই বলা হয়ে ওঠে না। একদিন লতু বলে : পিসীমা, মিঠুয়াকে নিয়ে যাই আমাদের বাড়ি?

: ওমা এখন যে ও স্নান-খাওয়া করবে।

: দিদি স্কুলে চলে গেছে। আমিই স্নান করিয়ে খাইয়ে দেব। তারপর দিদি ফিরে আসবার আগেই আবার দিয়ে যাবো ওকে।

পিসীমা হেসে বলেন : এতই যদি দরদ মিঠুয়ার ওপর—তবে নে না মেয়েটাকে একেবারে। তুইই মানুষ করবি ওকে।

লতু চোখ তুলে তাকায় পিসীমার দিকে। তারপর চোখ নামিয়ে নেয়।

. আসবি আমার ঘরে? নিবি মিঠুয়াকে তুই?

আনত নয়নে লতু বলে : সে হবার নয় পিসীমা।

: হবার নয়? কেন?

লতু চুপ করে থাকে। পিসীমা কিন্তু চুপ করে থাকার পাত্রী নন। লতুকে বসিয়ে জেরার পর জেরা করতে থাকেন তিনি। প্রথমটা গোপন করবার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত সব কথাই লতুকে স্বীকার করতে হয়। লতু জানায় যে সে নিজের কানে শুনেছে দিদি বলেছে 'লতুর সঙ্গে কোন নিকট এবং মধুর সম্পর্কের যে প্রস্তাব আপনি করেছেন তাতে আমি রাজি নই।' লতু আরও বলেছিল—সে যে এ বাড়ি আসে তা দিদি জানে না। সে লুকিয়ে আসে।

খবরটা শুনে দুঃখিত হওয়া দূরে থাক পিসীমা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। তা হলে তো আসল বাধাটাই কেটে গেছে। ভূষণ নিজে থেকেই প্রস্তাব করেছে। ভূষণ রাজি! ব্যাস্ আর ভাবনা নেই। নমিতা বা তার বাপ মাকে রাজি করানোর দায়িত্ব তিনি নিজেই নিতে পারবেন। ভূষণ আর লতু দুজনে যদি পরস্পরকে বরণ করতে চায়—তবে কে ঠেকাবে সেই মিলন? সেইদিনই তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে।

সমস্ত ঘটনা শুনে গেল নমিতা স্তম্ভিত হৃদয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বললে : আমার আর কোন আপত্তি ছিল না। আমি ভাবছিলাম লতুর কথাই। ও নেহাৎ ছেলেমানুষ তো। ভূষণবাবুর সঙ্গে বয়সের তফাৎটা একটু—

: তা হক। আমার মা চোদ্দ বছরের ছোট ছিলেন বাবার চেয়ে। কই অসুখী তো হননি তাঁরা।

: তা হলেই হল। ভূষণবাবু রাজি থাকলে আর আপত্তি কি?

: ভূষণ তো রাজি আছেই। বিয়ের কথাটা পেড়েছিলাম তার কাছেও। দেখলাম সেও রাজি আছে লজ্জায় মুখ ফুটে স্বীকার করলে না অবশ্য। বললে একটু ঘুরিয়ে—বেশ তো একা হাতে তোমার যা কষ্ট হয় একটা ব্যবস্থা করতে হবে বইকি।

নমিতা সুতরাং রাজি হয়ে যায়। ভূষণবাবু যখন পিসীমাকে কষ্ট দিতে চান না তখন সে কেন বাঃ দেয়। পিসীমা আরও বলেন : তুমি শুনলাম বিয়ে করবে না বলেছ। আর করবেই বা কি করে? বুড়ো অন্ধ বাপকে তাহলে দেখবে কে? ভাই টাই তো নেই—

নমিতাত প্রতিবাদ করে : ভাই নেই কে বললে? বড় ভাই আছে একটি ছোট ভাইও আছে।

: সে কি, ভূষণকে জিজ্ঞাসা করতে ও যে বললে—তোমার আর ভাই নেই বলে—তুমি নাকি স্থি করেছ বিয়ে করবে না। বাপের সেবা করেই কাটিয়ে দেবে জীবন?

: উনি ঠিক জানেন না। দাদা আছেন. বৌদি আছেন তাঁর একটি ছেলেও আছে। ওঁরা সবাই আসবে বিয়েতে। এখানে আমাদের বাড়িতে নেই বলে আপনারা ভুল খবর পেয়েছেন।

: তা হবে।

: আচ্ছা আজ তা হলে আসি পিসীমা।

: ওমা সে কি হয়? একটু মিষ্টিমুখ করে যাও। এমন শুভ সম্বন্ধ হল আজ।

: না পিসীমা, আজ থাক। আপনি বরং আমার মায়ের সঙ্গেই পাকা কথা বলতে যাবেন। আমি আ উঠি।

পিসীমা জোর করে বসিয়ে দেন ওকে : সে তো বলবই। কিন্তু সেদিনের কথাতেই বুঝেছি তোম বাবা মার অমত হবে না। আর কারও আপত্তি শুনব নাকি আমি? আমি হলাম গিয়ে বরের ঘরের পিসী আমার কথার দাম আছে না? তোমাকে একটু মিষ্টিমুখ করে যেতেই হবে। পিসীমা ও ঘর থেকে রেকাবি সাজিয়ে মিষ্টি আনতে যান। নমিতা তখন উঠে পড়তে পারলে বাঁচে। ওর ইচ্ছা করছি কোথাও পালিয়ে গিয়ে প্রাণ ভরে খানিক কেঁদে নিয়ে মনটা হাল্কা করে নেয়। সে সুযোগটা সে কোথা পাচ্ছে না। আজ দুদিন ধরে কান্নাটা আটকে আছে বুকের মাঝখানে।

লাফাতে লাফাতে ঢোকে লতু মিঠুয়াকে কোলে নিয়ে। ওর চলার ঢঙই ঐ রকম। আশপাশে তাক না। দিদিকে দেখতে পাই নি। চিৎকার করতে থাকে : ও পিসী পিসী. তোমার নাতনিকে নাও। দুষ্টু ঘুমিয়ে পড়েছে—

তারপর হঠাৎ ভূত দেখার মতো দাঁড়িয়ে পড়ে। নমিতা ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বি বলে না।

মিষ্টির থালাটা নমিতার সামনে নামিয়ে দিয়ে পিসীমা এগিয়ে যান লতুর দিকে। ওর কোল থে ঘুমন্ত মিঠুয়াকে নিয়ে নমিতার দিকে ফিরে বলেন : তুমি বাপু অমন করে তাকিও না আমার বৌম দিকে। বাড়ি গিয়েও বকতে পারবে না।

নমিতা ধীরকণ্ঠে বলে : বকব কেন পিসীমা? লতু বুঝি বলে আমি শুধু বকাবকিই করি সারাদি

: না। তা অবশ্য বলে না। দিদিকে ও খুবই ভুক্ত করে। নে লতু পেন্নাম কর তোর দিদিকে। তে বিয়ের সম্বন্ধ করে গেল যে আজ তোর দিদি।

লতু বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে শুধু দুজনের দিকে একবার তাকায়। তারপর হেঁট হয়ে প্রণাম ক দিদিকে।

নমিতা রুক্ষস্বরে বলে : ওকি লতু? ওঁকেও প্রণাম কর।

লতু লজ্জিত চরণে ভুল শুধরে নেয়। পিসীমাকেও প্রণাম করে।

মিষ্টিগুলো নমিতার গলা দিয়ে নামতে চায় না। মনে হয় একটা ষড়যন্ত্র করে তাকে বঞ্চনা করছে সবাই। শুধু ভূষণকে নয়, শুধু মিঠুয়াকে নয়, লতুকেও এরা কেড়ে নিল তার কাছ থেকে—পর করে দিল। আজ ভূষণের পিসীমা তাকে অনায়াসে বলতে পারলেন : তুমি বাপু অমনি করে তাকিও না আমার বৌমার দিকে!

বিয়ে না হতেই লতু আজ এঁদের বৌমা হয়ে গেছে। দিদির বকাবকির কথা, অত্যাচারের কথাই বলেছেন শুধু এ বাড়িতে এসে!

লতু! যে লতুর বিয়ে দেবে বলে কত কল্পনা ছিল নমিতার। একমাত্র বোন তার। কত আদরের লতু। নমিতা নিজে বিয়ে করবে না। বাপকে নিয়ে থাকবে সে আজীবন কুমারী। বাপের সেবাতেই কাটিয়ে দেবে জীবন। সংসার-স্বামী-পুত্র কিছু সে চায়নি। সে চেয়েছিল শুধু বাপের যষ্ঠি হয়ে জীবনটাকে বিকিয়ে দিতে। কিন্তু সত্যই কি তাই চেয়েছিল সে অন্তর থেকে? তাহলে আজ একটু ছোঁয়া পাওয়া ভূষণকে ছেড়ে দিতে এত ব্যথা জাগছে কেন বুকে? যে জিনিসের স্বাদ পাইনি সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা সহজ। মদ যে জীবনে খায়নি তার পক্ষে মাতাল না হওয়াটা কোনও কৃতিত্বের নয় ; কিন্তু মাদক রসে ভরা ডুব দিয়ে হঠাৎ একদিন নিজেকে সুরারস থেকে বঞ্চিত করার সঙ্কল্প করা শক্ত। যে নমিতা পুরুষের সান্নিধ্য থেকে চিরকাল দূরে থাকবে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে নমিতা আজ কোথায়? সে কি জানত প্রেমাস্পদকে অপরের হাতে তুলে দিতে যাওয়ার দুঃখটা এতখানি? কিন্তু সে যাই হোক, নিজের বিয়ের কথাটা সম্প্রতি ভাবতে শুরু করেছিল বটে তবু লতুর বিয়ের কথা সে ভেবেছে অনেক অনেক দিন আগে থেকে। বোনের বিয়ে দিতে হবে একটি ফুট্‌ফুটে লাজুক মুখচোরা ছেলের সঙ্গে। লতুর বর এসে ডাকবে ওকে দিদি বলে। সম্বন্ধ করে এসে লতুর সামনে ধরবে একখানা ফটো। বাইশ তিরিশ বছরের একটি সুন্দর যুবকের ফটো। বড় বড় চোখ, উল্টানো চুল, চোখে সোনালী চশমা, গোঁফের দুকোণ সরু করে কাটা। বলবে : দ্যাখরে লতু, পছন্দ হয়?

দুহাতে মুখ ঢেকে লতু বলবে—'ধ্যাৎ'!

নমিতা ছোট বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলবে : ধ্যাৎ নয় রে। সত্যিই দেবদূতের মতো চেহারা। কলেজে পড়েছে। বাপ বেশ বড়লোক। সুখেই থাকবি তুই। আশীর্বাদ করছি আমি—ওকে নিয়ে সুখী হবি নিশ্চয়ই। আজ আমি আর দাদা এই ছেলেটির সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করে এলাম।

সলজ্জ লতু মাথা হেঁট করে প্রণাম করবে দিদিকে। ছোট বোনকে ও বুকে টেনে নেবে। কপালে ওঁকে দেবে চুম্বনচিহ্ন। বলবে : বর পেয়ে দিদিকে ভুলে যাবিনে তো রে?

দিদির বুকের মুখ গুঁজে লতু বলবে : কক্ষণও নয়। তুমি দেখে নিও।

এই ছিল নমিতার স্বপ্ন। লতুর বিয়ের পরিকল্পনা। আজকের নয়। অনেক দিনকার। সে সব কিছুই হল না। ভালবেসে 'লভ-ম্যারেজ' করল লতু। বাপ-মা, দাদা-দিদি কেউ জানতে পারল না—সে জয় করে নিল একজনের হৃদয়। সে একজনও এমন একজন যাকে কেন্দ্র করে নমিতার নিজের হৃদয়ের মধ্যেও গুঞ্জন চলছে আজ কয়েক সপ্তাহ! কী লজ্জা! নমিতা ধরে নিয়েছিল ভূষণের ভালবাসা সে পেয়েছে। বলিষ্ঠ গঠন ঐ লোকটি তার সঙ্গে যে ভাবে মিশেছে তাতে মনেও হয়নি সে এ ভাবে ধরা দিতে পারে একফোঁটা লতুর বাহুবন্ধনে। কী বিচিত্র এই সংসার! কোথা থেকে কি করে ব্যবস্থা হয়ে গেল লতুর বিবাহের। চেষ্টা করতে হয়নি নমিতাকে কিছুই। ওরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে রেখেছে। আজ পিসীমা তাকে দিলেন কিছু উপদেশ—'বাড়ি গিয়েও বকতে পারবে না কিন্তু'। আর দিলেন একথালা মিষ্টান্ন। ওর রাজি হওয়ার জন্য উৎকোচ। পারমিট-পাওয়া বাবুরা যেমন যাওয়ার সময় অফিসারের বেয়ারাকে দিয়ে যায় দু-চার আনা বকশিস, খুশি হয়েই।

চোখ ফেটে জল এল নমিতার। এ জল চোখেই শুকিয়ে মারতে হবে। শুভকার্য! লতুর বিয়ে।

কাঁদবে কেন নমিতা?

নিতাই কবিরাজের ডাক্তারখানায় বসেছে নতুন কমিটির প্রথম সভা। 'গণকল্যাণ সমিতি' নামই টিকে গেছে। প্রতি ব্লকে নির্বাচন করে প্রতিনিধি স্থির করা হয়েছে। প্রতি ব্লকে দুজন করে মেম্বার। সবসুদ্ধ দশজনের কমিটি। এতবড় বিরাট কমিটি নিয়ে কাজ করা যায় না। তাই তিনজনের একটা ওয়ার্কিং কমিটি করা হয়েছে। প্রমোদ পাল গালভারি নাম পছন্দ করে—সে এই কার্যকরী কমিটির নাম দিয়েছে 'স্টিয়ারিং কমিটি'। কানাই, যোগেন, জীবেন, নমিতা, ভূষণ প্রভৃতি সকলেই সভ্য নির্বাচিত হয়েছে তিনজনের কার্যকরী কমিটিতে আছে আগেকার অ্যাডহক কমিটিই। অর্থাৎ ভূষণ, নমিতা আর ঠাকুর্দা। আজ নির্বাচনের পর প্রথম সকলে মিলিত হয়েছেন বিস্তারিত আলোচনা করে কর্মপন্থা স্থির করবেন বলে। পরিবেশটা ঠিক সভাকক্ষের মতো নয়। নিতাই ঠাকুর্দার ডাক্তারখানাতেই বাড়তি একখানা বেঞ্চি ঢোকানো হয়েছে। সভ্যরা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। নিতাই ঠাকুর্দা যথারীতি একটা বিড়ি ধরিয়ে উবু হয়ে বসে আছেন।

যোগেন নায়েক সি-ব্লকের নির্বাচিত সভ্য। বললে : এবার সভার কাজ শুরু হক ঠাকুর্দা?

ঠাকুর্দা বলেন : সবাই এসেছে? কই নমিতাকে দেখছি না?

ও কোণ থেকে নমিতা সাড়া দেয় : আমিও এসেছি ঠাকুর্দা।

: ব্যস্ তবে তো শুরু করা যেতে পারে।

ঠাকুর্দা সকলকে নির্বাচিত হবার জন্য মামুলী অভিনন্দন জানালেন। তারপর বুঝিয়ে বলতে শুরু করলেন—কী উদ্দেশ্য এই গণ-কল্যাণ-সমিতিব। আর কিভাবেই বা তা কার্যে পরিণত করা যাবে ঠাকুর্দা বলেন : সমস্যাটা কী? আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে কর্মসংস্থান। আমরা যখন এদেশে প্রথম এসেছিলাম তখন আমাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল রিসেপশন সেন্টারে, ট্রানসিট ক্যাম্পে অথবা পি এল. ক্যাম্পে। সেখান থেকে আমরা, অর্থাৎ সুস্থ সবল মানুষেরা পুনর্বসতি পেয়ে চলে এলাম এখানে। জমি পেলাম, বাড়ি করার ঋণ পেলাম। ভালো কথা। জমি হল, বাড়ি হল। তারপর?

এসব কাহিনী ওরা জানে। এ ওদের মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা বিবরণ। দশ-বিশ হাজার লোক এক জায়গায় জমায়েত হলেই সেটা শহর হয়ে পড়ে না। হয়ে পড়তো যদি অন্তত কিছু লোকের হাতেও থাকতো কোনও উদ্‌বৃত্ত অর্থ। তা ছিল না। কোন শিল্প, বাণিজ্য, বস্তুত গঠনমূলক কোনও প্রয়াসই হল না। অনশন মৃত্যু শুরু হল। মাঝে মাঝে টেষ্ট রিলিফের কাজ হয়েছে। এই পর্যন্ত। সবাই বললে কাজ দাও, কাজ দাও। কাজ নাও—এ কথা কেউ বললে না। না কোন স্থানীয় লোক, না এদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা কোনও কোয়পারেটিভ, না স্বয়ং সরকার।

ঠাকুর্দা বুঝিয়ে বলেন : ফলে, কলোনি ছেড়ে পি. এল. ক্যাম্পে ফিরে যাবার জন্য দরখাস্ত আসতে লাগলো গাদা গাদা। ক্যাশডোল, স্টারভেশান ডোলের আবেদন-সংখ্যা বাড়লো। তাতে একদল লোকের সুবিধাই হল। এই সুবিধাবাদী লোকের দলটি ছিল আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা। সে সমস্যা আর নেই। আমাদের নতুন কমিটি কার্যভার নিয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক সমস্যা রয়েই গেছে তা সত্ত্বেও। সেই মূল সমস্যার সমাধান করতে নাকি সরকার বিরাট পরিকল্পনা করছেন।

যোগেন বলে : আবার পরিকল্পনা! সে জরীপের লোক এসে বনবাদাড় ভেঙে চেন-টানাটানি করবে—আর ঘরে ঘরে গিয়ে পরিসংখ্যান না কি যেন সংগ্রহ করে বেড়াবে?

কানাই যোগ দেয় : ঐ পরিকল্পনা কথাটা শুনলেই আমাদের আতঙ্ক হয় ঠাকুর্দা।

ঠিক এইসময়ে দরজার সামনে এসে থামে একখানা জীপ। তার থেকে নামেন দুজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলা। ওঁরা সসম্ভ্রমে আমন্ত্রণ জানান।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচি, হেডমিস্ট্রেস্ সুরেখা দেবী আর একজন অপরিচিত সুগঠিততনু যুবক।

াকি প্যান্ট আর বুশ কোট পরা। চোখে সানগ্লাস, পায়ে গামবুট। বাগচি সাহেব বলেন : আমরা নিমন্ত্রিতই এসেছি। যদি আপনাদের অসুবিধা হয় তাহলে আর বসব না। একটা কথা বলেই চলে যাব।

ওরা বলে : বিলক্ষণ! আপনারাই তো এ মন্ত্রের হোতা। আসুন আসুন।

বাগচি-সাহেব জমাটি লোক। সকলের সাথেই মিশতে চান নিজে থেকে। অফিসার ও সাধারণ ানুষের মধ্যে যে অদৃশ্য ব্যবধান ছিল সেটা ভেঙে ফেলতেই বোধকরি ওঁর এ প্রচেষ্টা। সুরেখা দেবীকে অবশ্য ওরা আপনার লোক বলেই ভাবে চিরদিন।

ঠাকুর্দা বলেন : আমরাই অন্যায় করেছি। এটা দক্ষরাজার শিবহীন যজ্ঞ হচ্ছিল। কিন্তু কিছু মনে করবেন না বাগচি সাহেব। দোষ শুধু এক তরফাই নয়। ইতিপূর্বে আমাদের এইসব ঘরোয়া মিটিঙে ডাকলেও আপনারা আসতেন না। আপনি নন—আপনার পূর্ববর্তীরা। কাজেই ভুলটা আমাদের হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক নয়।

সুরেখা দেবী বলেন : যাক্, সৌজন্য তো হল। এবার কাজের কথা হক।

ঠাকুর্দা বলেন : হ্যাঁ, কাজের কথা। এঁরা বলছিলেন আমাদের উদয় নগর কলোনির লোকদের কর্মসংস্থানের যে পরিকল্পনা হয়েছে তার স্বরূপটা কি।

বাগচি বলেন : ভালো কথা। তবে আপনাদেব এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। দেবেন আমার সঙ্গের এই ভদ্রলোক। এঁর নাম বীরেন্দ্র মৈত্র। ইনি এসেছেন ঐ সরকারি পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে। সিবিল ইঞ্জিনিয়ার উনি। সরকারি অফিসার, তার উপর শুনেছি উনি লেখকও। সুতরাং বেশ গুছিয়েই বলতে পারবেন উনি নিশ্চয়।

বীরেনবাবু উঠে দাঁড়ান। ফর্সা রঙ। উন্নত নাশা, বলিষ্ঠ গঠন। লম্বা চওড়া চেহারা। মাথার চুলগুলি উল্টো করে ফেরানো। কথা বলবার সময় হাত নেড়ে ঝোঁক দিয়ে কথা বলেন। একটু বক্তৃতার ঢঙ এসে পড়ে। উনি বুঝিয়ে দেন পরিকল্পনাটা।

উদয় নগরের পূর্বদিকে ডি-ব্লক থেকে শুরু করে ই-ব্লক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মাঠটায় কোনও প্লট নেই। ফাঁকা মাঠ। প্লটে ভাগ হয়নি ওটা। এখানে একটা কারখানা হবে। তাঁত কল, লেদ-মেশিন, কাঠ চেরাইয়ের কল, ট্যানারী, পটারী সেকশন, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ—নানান ব্যবস্থা থাকবে এখানে। প্রায় দশবারো রকমের ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া হবে। বছর দুই ধরে শিক্ষার্থীরা কাজ শিখবে এটাতে। মাসে মাসে বিশটাকা করে ভাতা পাবে। ওদের তৈরি জিনিসপত্র বিক্রয় হলে লভ্যাংশও পাবে। এর নাম হবে উদয়-নগর-ট্রেনিং কাম-প্রডাকশন-সেন্টার।

কানাই প্রশ্ন করে : কত ছেলে শিখবে এখানে?

: ধরুন আড়াই শো।

: সে তো প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। এখানে বেকার সংখ্যা মাত্র আড়াই শ' নয়।

: মানলাম। আমার বক্তব্য কিন্তু শেষ করিনি আমি।

: আচ্ছা বেশ বলুন।

বীরেনবাবু বলতে থাকেন পরিকল্পনার অন্যান্য দিক। এই শিক্ষাকেন্দ্রের আপাত উদ্দেশ্য হবে আড়াই শ' ছেলের কর্মসংস্থান করা—গভীরতর উদ্দেশ্য হল ওদের এবং ওদের উপর নির্ভরশীল পরিবারগুলির চিরকালের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তার ওপাশে অনেকটা জমি অ্যাকোযার করা হচ্ছে। সেখানে একটা কাগজের মিল তৈরি করছেন সরকার। এর অর্ধেকের কিছু মূলধন থাকবে সরকারের—বাকি অর্ধেকের জন্য শেয়ার বিক্রয় করা হবে। এ অঞ্চলে একরকম ঘাস জন্মায় যা থেকে কাগজ তৈরি হতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। কাগজের কারখানা তৈরি হতেও বছর দেড়েক লাগবে। সেই সময়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে ঐ ঘাসের চাষের ব্যবস্থা করতে

হবে। এখানে অন্তত হাজার দুই মেহনতি মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

পরিকল্পনার তৃতীয় দিক হল—কবোনির আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন। পাকা রাস্তা, নলকূপ, প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়, বাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি।

যোগেন প্রশ্ন করে : এসব সত্যি সত্যি হবে স্যার?

: নিশ্চয়ই। আমি এসেছি এগুলো আপনাদের দিয়ে করিয়ে নিতে।

ঠাকুর্দা বলেন : আপনি যা বললেন সে তো খুবই আশার কথা—কিন্তু কিছু মনে করবেন না আপনি। আমরা হচ্ছি ঘরপোড়া গোরু। দেখেছি তো আপনাদের ব্যাপার! প্ল্যান তৈরি হয় তো এস্টিমেট হয় না, এস্টিমেট হয় তো স্যাংশন নেই, স্যাংশন হল তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রুভাল হয় না, সব যখন মিটল তখন দেখা গেল এ বছর অ্যালিটমেন্ট পাওয়া যায়নি বলে কাজ হল না! এমনি অনেক সুন্দর শিশু পরিকল্পনাকে আপনাদের অফিসে লালফিতের উদ্‌বন্ধনে ঝুলতে দেখেছি কিনা—

বাগচি হেসে বলেন : নিতাইবাবু, আপনার শিবহীন দক্ষযজ্ঞের উপমাটির অর্থ বুঝিনি তখন। এখন বুঝেছি। অনিমন্ত্রিত শিবানী পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করেছিলেন। আমাকে অন্তত সভাত্যাগ করতে হয়।

নমিতা বলে : সরকার কি আপনার স্বামী?

: নিশ্চয়ই। সেই অন্নদাতার সেবাদাসীই তো আমি।

সবাই হেসে ওঠে।

কানাই বলে : কিন্তু ঠাকুর্দা যা বললেন তা কি সত্য নয়? কেন স্বীকার করবেন না আপনি?

: শিব ছাই মেখে থাকেন, ভাঙ খান, তাঁর গলায় সাপ, ন্যাংটো তিনি—এগুলো কি মিথ্যা কথা? কিন্তু তাই বলে শিবানী কি সেগুলো মেনে নিয়েছিলেন?

বীরেনবাবু মিটিমিটি হাসছিলেন। বাগচি সাহেব কি রকম কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন তা দেখে একটা কৌতুক বোধ করছিলেন তিনি।

ঠাকুর্দা বলেন . আচ্ছা তা যেন হল। কিন্তু আপনার ফ্যাকটারি আর প্রডাকসন সেন্টার হতে তো বছব দুই লাগবে। ইতিমধ্যে লোকগুলো করবে কি? খাবে কি?

বীরেন বাবু বলেন : ফ্যাকটারি, রাস্তা, ড্রেন প্রভৃতি যা কিছু এখানে করা হবে তা আপনারাই করবেন। বাইরের কোনও ঠিকাদার আসবে না। এখানকার মিস্ত্রি, মজুরেরা সব কাজ করবে আমাব তত্ত্বাবধানে। আপনারা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে যাবেন। প্রতি গ্রুপে থাকবে দুজন মিস্ত্রি আর আট দশজন মেহনতি মানুষ। আমরা কাজ দেখে নেব।

যোগেন প্রশ্ন করে : মজুর, রাজ, ছুতার এদের রোজ কত করে হবে?

: রোজ কারও থাকবে না। এক একজন গ্রুপ-লীডার যেন একজন ঠিকাদার। মাপ হিসাবে যা পাওনা হবে তাই গ্রুপলীডাবের মাধ্যমে পাবে সকলে। সব কাজ ফুরনে হবে। প্রতি আইটেমের রেট থাকবে। সপ্তাহান্তে গ্রুপ যে কাজ করেছে তাকে তার মূল্য দেওয়া হবে। মজুরেরা যত পাবে তার দেড়া পাবে রাজ ও ছুতার। গ্রুপ-লীডার পাবে ডবল। বেশি কাজ করলে বেশি পাবে—কম করলে কম পাবে। গ্রুপ-লীডারদের কিছু আগাম টাকা দেব আমরা প্রথম অবস্থায়—মালমশলাও কিনে দেবো।

পরিকল্পনার নানান দিক আলোচনা হতে লাগলো। খুঁটিনাটি সব। কি ভাবে গ্রুপলীডার বেছে নেওয়া হবে। তারা মূলধন পাবে কোথায়। যন্ত্রপাতি, মালমশলা যদি তারা নিজেরা কিনতে চায়? বীরেনবাবু একে একে সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে যান। সকলেই আলোচনায় যোগ দেয়। একমাত্র ভূষণ রায় ছাড়া। আজ এতবড় জরুরী মিটিঙে সে একবারও কথা বলেনি। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে শুধু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল নমিতাকে। আশ্চর্য! মেয়েটার কোনও পরিবর্তন হয়নি!

সব আলোচনা শেষ করে, সবার প্রশ্নের জবাব দিয়ে বীরেন মৈত্র বললেন : আশা করি সকলের সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছি আমি। আর কারও কোনও প্রশ্ন আছে?

নমিতা বলে আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে। কলোনির কর্মহীনা মেয়েদের সম্বন্ধে আপনাদের পরিকল্পনা কি বলছে?

বীরেনবাবু তাড়াতাড়ি বলেন ও ইয়েস্। ও কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম আমি।

হেডমিস্ট্রেস বলেন সেইটেই তো আমাদের ভয় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। আমাদের দিকটা প্রায়ই ভুলে যান আপনারা। এ অভিযোগ আছে আমাদের—

বাগচি সাহেব পাদপূরণ করেন চিরন্তনী নারীর পক্ষ থেকে শাশ্বত পুরুষের বিরুদ্ধে।

আবার হেসে ওঠে সবাই।

বীরেনবাবু বলেন আমিই বলতে ভুলেছি। আমাদের পরিকল্পনাকার ভোলেননি। মেয়েদের জন্যেও প্রডাকশন সেন্টারে কয়েকটি বিভাগ থাকবে। সূচীশিল্প, আচার তৈরি করা, পুতুল বানানো প্রভৃতি।

যোগেন বলে এ পরিকল্পনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি প্র্যাকটিকাল মানুষ, ঠাকুর্দার ভাষায় ঘরপোড়া গোরু। পরিকল্পনাটা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া পর্যন্ত তাই আমি অভিনন্দনটা মুলতুবী রাখছি।

বীরেন মৈত্র বলেন ধন্যবাদ বা অভিনন্দন নিতে আমি আসিনি এখানে। কাজকে আমিও ভালবাসি কথার চেয়ে। সুতরাং কাজের মাধ্যমে সক্রিয় সহযোগিতা পেলেই আমি বেশি খুশি হব।

বাগচি বলেন আমি কিন্তু ধন্যবাদটা মুলতুবী রাখব না। যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে আপনারা আজ আলোচনা করলেন তাতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। অতীত ত্রুটি বিচ্যুতির রোমন্থন না করে আপনারা যে গোড়া থেকেই গঠনমূলক চিন্তা করছেন এজন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি নতুন কমিটিকে। সভাপতি অনুমতি করলে এবার আমরা উঠতে পারি।

ঠাকুর্দা সবার শেষে বলেন আমিও বাগচি সাহেবের সঙ্গে একমত। অভিনন্দনটা মুলতুবী রাখতে চাই না। তবে আমি মৈত্র সাহেবের মত প্র্যাকটিকাল মানুষও—তাই মৌখিক অভিনন্দন না জানিয়ে সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই। আপনারা কিছু মিষ্টিমুখ করে যান।

সবাই হেসে ওঠে আবার।

ব্যবস্থা করাই ছিল। কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবক চা-খাবারের প্লেট নিয়ে ঢোকে।

হেডমিস্ট্রেস সুরেখা দেবীও লোক পরম্পরায় শুনলেন কথাটা। প্রথমটা বিশ্বাস করেননি। এতবড় ভুল হবে তাঁর? তিনি যে স্পষ্ট দেখেছেন নমিতার মুখে প্রথম প্রেমে পড়া লাজুক চাহনি। ভূষণের বিষয়ে যে অনেক কথা হয়েছে নমিতার সঙ্গে তাঁর। সেই নমিতা নিজের ছোট বোনের সঙ্গে ভূষণের বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে? স্বয়ং গিয়ে ভূষণের মাসি না পিসীর সঙ্গে কথা বলে এসেছে? খবরটা অবিশ্বাস্য। মানব চরিত্র সম্বন্ধে এতবড় ভুল হতে পারে তাঁর?

তারপর হঠাৎ টেবিলের উপর ফ্রেমে বাঁধানো একটা ফটোর দিকে নজর পড়তেই ম্লান হাসি হাসেন সুরেখা দেবী। মানব চরিত্র সম্বন্ধে তিনি কি অথরিটি? প্রেমে পড়া লোক দেখলেই চিনতে পারার ক্ষমতা আর যারই থাক সুরেখা দেবীর নেই নিশ্চয়ই। এ বিষয়ে ভুল তো তাঁর আজকে প্রথম হচ্ছে না। আরও একবার বিরাট ভুল হয়ে গেছে তাঁর। সেবারও একজন লোককে দেখে মনে হয়েছিল লোকটা প্রথম-প্রেমের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে বুঝি। নিমজ্জমান লোকটি উঠে গেল কূপের উপরে। তিনি পড়ে রইলেন অন্ধরূপে। সেই ভুলেরই মাশুল দিয়ে চলেছেন তার পর থেকে।

মিটিং ভেঙে গেলে ওরা বেরিয়ে আসে। যে যার বাসার দিকে পা বাড়ায়। জীপে করে সরকারি অফিসার দুজন চলে যান। নমিতাও অগ্রসর হয় বাড়ির দিকে। মিটিঙে ভূষণ এসেছিল। নমিতা ওর দিকে একবারও তাকায়নি। সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে যেন তাকে। সেই ছেলেটিও এসেছিল, রাখাল।

কামিনীর সঙ্গে সেদিন যে ছেলেটিকে সান্ধ্য ভ্রমণে যেতে দেখেছিল। ভূষণের পাশেই বসে ছিল। নমিতা সেদিকে দেখেও নি মুখ তুলে। দ্রুতপদে সে বাড়ি ফিরছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিকালে একপশলা বৃষ্টি হয়েছে। এখন আকাশ পরিষ্কার। শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠেছে। দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী হবে। গোধূলির আলো মুছে যেতেই এক ঝলক চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। সদ্য ধোওয়া করোগেটেড টিনের ছাদে জ্যোৎস্না পড়ে চিক্‌চিক্ করছে। জল জমে আছে এখানে সেখানে। বড়রাস্তা ধরে ফিরছিল সে। বাঁক ঘুরতেই নজরে পড়ল বড় মাঠটা। লরিতে করে মাল আসতে শুরু করেছে। ইঁট নামছে লরি থেকে। থাক দিয়ে রাখছে। এখন লোকজনের ছুটি হয়ে গেছে অবশ্য। এখানেই তৈরি হবে কারখানাটা। কলোনিবাসীর অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে এখানে। অন্তত সেই রকম কথাই শোনা গেল আজ। নমিতা মনশ্চক্ষে দেখতে পেল মাঠ জুড়ে উঠেছে প্রডাকশান্ সেন্টারের বাড়ি। লম্বা লম্বা শেড। সেখানে কাজ শিখছে আগামীদিনের কারিগরেরা। কত ব্যবসা শিখছে তারা। উদবাস্তু পরিশ্রম করছে। করবে না? তাদের মুখ চেয়ে রয়েছে যে কত বাপ মা-স্ত্রী-পুত্র।

হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকে : শুনুন।

নমিতা দাঁড়িয়ে পড়ে। যে ডেকেছিল এগিয়ে আসে সে। ভূষণ।

: আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।

নমিতা নির্বিকার ভাবে বলে : বলুন?

: এখানে? অনেক কথা বলার ছিল। কোথাও বসলে হয় না?

চারিদিকে তাকিয়ে নমিতা দেখল বসবার মতো কোনও স্থান নেই। সদ্য বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় সব জায়গাই ভিজা।

: আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসবেন?

: না, আমি নিরিবিলি বলতে চাই। চলুন না—স্টেশনের বেঞ্চিতে গিয়ে বসি?

: স্টেশন? সে যে অনেকখানি।

: আপনার তাড়া আছে?

: না তাড়া নেই কিছু। আচ্ছা চলুন।

পাশাপাশি দুজন হেঁটে চলেছে। কোনও কথাবার্তা নেই। ভূষণ আজ দিন পনের পর এসেছে। এতদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। পনের দিন অবশ্য সময় বেশি কিছু নয় কিন্তু দুজনেই যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

নমিতাই প্রথমে কথা বলে : এবার মনে হচ্ছে কলোনিতে উন্নয়নের কাজ কিছু হবে।

ভূষণ অন্যমনস্কের মতো বলে : হুঁ।

: আপনার কি মনে হয় কলোনিতে সত্যিকারের কাজ কিছু হবে?

: দেখা যাক্।

: আমার তো ভরসা হয় না। এঁদের ব্যাপার তো জানা আছে। আঠারো মাসে বছর।

ভূষণ জবাব দেয় না। নমিতা ইচ্ছা করেই বেশি কথা বলে। সে যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছে; তার মনে যে ঝড়ের স্পর্শ লাগেনি এটা প্রতিপন্ন করতে চায় সে।

ভূষণ চুপ করে থাকায় আবার বলে : আপনি জবাব দিলেন না যে?

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ভূষণ : এখন এইসব কথা ভাবতে পারছেন আপনি?

: কেন এখন কি হয়েছে?

: আমার মনে এখন এসব চিন্তা নেই।

: ও।

আবার দুজনে চলতে শুরু করে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে জনমানব নেই। ওরা দুজনে গিয়ে বসে একটা খালি বেঞ্চিতে। মাথার উপরে দোচালা থাকায় ভেজেনি সেটা। বেঞ্চির তলায় শুয়ে ছিল একটা কুকুর। উঠে যায় সেটা। ভূষণ একটা বিড়ি ধবায়। দুজনেই চুপচাপ।

সদ্য ধরান বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ভূষণ, বলে : দেখুন, যতই কেন না ভাব দেখান যে আপনি আমার বক্তব্য বুঝতে পারছেন না—আমি জানি, আপনি আমার প্রশ্নের কথা জানেন। তাই প্রশ্নটা আমি কবব না। আপনি কি জবাব দেবেন?

আঁচলের চাবির রিঙ থেকে একটা চাবি অকারণে খুলতে খুলতে নমিতা বলে : বারে, প্রশ্নটা আপনি বলবেন না—উত্তর দেব আমি?

: হ্যাঁ দেবেন। কেন আপনি গিয়ে আমার পিসীমাকে ঐ অদ্ভুত প্রস্তাবটা কবে এসেছেন?

: অদ্ভুত? অদ্ভুত কেন? ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করেছেন। ওর মনে অনুরাগ সঞ্চারিত করেছেন, আপনার পিসীমা থেকে শুরু করে পাড়াসুদ্ধ সকলে ধারণা করেছে আপনাদের বিবাহে এ মেলামেশার স্বাভাবিক পবিণতি হবে—আর এখন আপনার কাছে এটা অদ্ভুত লাগছে?

ভূষণ একটু কাছে সরে এসে বলে : দেখুন, আর কেউ একথা বললে আমাকে জবাবদিহি করতে হত। কিন্তু আপনার কাছে তো সে জবাবদিহির প্রয়োজন নেই। লতুকে আমি কি চোখে দেখেছি—আর কেউ না জানুক আপনার তো তা অজানা নেই।

: আমি? না, আমি তা জানব কোত্থেকে? আমি তো সর্বজ্ঞ নই। আমি দুপুরে পড়াতে যাই স্কুলে। আপনি তখন লতুকে এসে কি চোখে দেখেন সে তো আমার জানার কথা নয় ভূষণবাবু। তাছাড়া আপনি নিজেই আসেন, না কোন ছোট ছেলেকে দিয়ে জামা কাপড়গুলো পাঠিয়ে দেন তাই কি জানা সম্ভব আমার পক্ষে?

ভূষণ চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে বসে : আপনাকে কয়েকটা কথা বুঝিয়ে বলার দরকার।

নমিতা রুক্ষস্বরে বলে : কিন্তু হয়তো শোনার প্রয়োজন নেই আমার। কী দরকার? কেনই বা আমাকে দোজবরে বলে মিথ্যে পরিচয় দিলেন, কেনই বা লতুর সঙ্গে গোপনে দেখা কবে তাকে মিথ্যে বলতে শেখালেন—তা শুনে আমার কী লাভ?

দুজনেই কিছুটা চুপচাপ। তারপর ভূষণ ধীরে ধীরে বলে : আশ্চর্য মানুষের মন। এ নিয়ে আপনি পর্যন্ত যে আমাকে ভুল বুঝবেন তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

: কিন্তু ভুল বোঝার তো কিছু নেই ভূষণবাবু।

: জানি না আপনি সত্যিই ভুল বুঝেছেন—না ভুল বোঝার অভিনয় করে সরে যেতে চাইছেন। আমাব মানসিক অবস্থা আপনি বুঝতে পারেননি এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।

একটু থেমে আবার বলে : আপনি পরিষ্কার ভাষায় আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু কি জানি কেন আমার মনে হয়েছিল সেটা আপনার অন্তরের কথা নয়। তাই আমি বার বার আসতাম আপনাদের বাড়িতে। লুকিয়ে দেখতাম আপনাকে। সামনে আসতে সাহস হত না। সঙ্কোচও হত। তাবপব ভাবলাম, কেন আপনি হঠাৎ আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন তার কারণটা জানতে হবে। তাই লতুর সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতাম। জানতে চেষ্টা করতাম আপনি কী করেন, কী বলেন। আমি গোপনে যে আপনাকে অনুসরণ করে চলেছি এটা আপনাকে জানতে দেব না বলেই লতুকে বারণ করতাম আপনাকে জানাতে—আমার আসা-যাওয়ার কথা। আমার সঙ্গে লতুর বয়সের তফাত দেখেও অন্তত আপনার বোঝা উচিত ছিল ওকে আমি ছোটবোনের মতোই ভালবাসি। আপনি কি করে এতবড় ভুলটা করলেন।

নমিতার জবাব দিতে দেরি হয়, বলে · কিন্তু আমিই তো দুনিযার একমাত্র লোক নই। সমাজ আছে, সংসাব আছে। তাবা যদি ভুল বোঝে—

ভূষণ প্রায় চিৎকাব করে ওঠে : আমি স্বীকাব করি না। তুমি তো জানতে নমিতা সমাজ সংসাব আমাব

কাছে বড় কথা ছিল না। আমার চোখে তুমিই ছিলে সেদিন সংসারের একমাত্র লোক। আজও আছ।

নমিতা বলে : কিন্তু আপনিই তো আমাকে বলেছিলেন আপনার জন্যে একটি পাত্রী দেখে দিতে।

: কী প্রসঙ্গে বলেছিলাম, কেন বলেছিলাম তা তো তোমার মনে থাকার কথা নমিতা। আমি চেয়েছিলাম তোমার দক্ষ হাতে আত্মসমর্পণ করতে। তোমার অন্ধ বাপের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলাম আমি—বিনিময়ে দিতে চেয়েছিলাম আমার মা-মরা বোনঝিটাকে মানুষ করার ভার। তুমি তা নিলে না। আমার ভালবাসাকে অবহেলা করলে তুমি ; কিন্তু তা নিয়ে ব্যঙ্গও যে করতে পার তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

নমিতা চুপ করে থাকে। কী বলতে পারে সে? এখন যে সে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। লতু কী ভাববে? পিসীমা, বাবা! না, এখন আর সম্ভবপর নয়। যাক্ ভূষণ তাহলে জানতে পারেনি নমিতার মনেও জেগেছিল গভীর অনুরাগ। ভূষণ যতখানি উদ্‌গ্রীব ছিল নমিতাকে পাওয়ার জন্য ততখানি আগ্রহ নিয়েই যে নমিতা এতদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে এ খবরটা তাহলে ভূষণ জানে না। মনে মনে আশ্বস্ত হয় সে। জানলে আরও লজ্জায় পড়তে হত। ছোটবোনের সঙ্গে যার বিয়ে দিতে হবে সে যদি জানতে পারে তার প্রতি গোপন অনুরাগ আছে নমিতার তাহলে লজ্জা রাখার স্থান থাকবে না।

ভূষণ হঠাৎ বলে : আমার একটা কথার সত্যি জবাব দেবে?

: বলুন?

: আমাকে সেই সন্ধ্যায় কেন প্রত্যাখ্যান করেছিলে তুমি?

: এটা নেহাৎ ব্যক্তিগত কথা।

: হোক। তবু জানতে চাই আমি।

: কী আশ্চর্য। এ বিষয়েও জবাবদিহি করতে হবে?

: জবাবদিহি! আচ্ছা থাক তবে।

নমিতা বুঝতে পারে ভূষণকে যা হক একটা কিছু বোঝানো দরকার। না হলে লতুকে সে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারবে না। আবার পরমুহূর্তেই মনে হয় লতু ছেলেমানুষ। ভূষণের প্রতি তার অনুরাগ থাকতে পারে না। ওটা তার নেহাৎই ছেলেমানুষি। নভেলি ভালবাসার ব্যর্থ অনুকরণ! জলের দাগ মুছে যাবেই। লতুর সম্মুখে পড়ে আছে যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলি। কত ভ্রমর আসবে সে বসন্তের মৌবনে। নতুন করে সত্যিকারের ভালবাসতে শিখবে সে। আর নমিতা? যৌবনের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে কেউ তাকে এসে ডাকেনি। অনাহুত, অনাদৃত কেটে গেছে শতাব্দির চতুর্থাংশ। ভূষণ এসে ওর হাত ধরতে চাইছে। ওর অন্ধ পঙ্গু বাপের দায়িত্ব নিতে চাইছে। এ সময়ে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও অধিকার নেই নমিতার। জীবনকে অস্বীকার করা পাপ। আজ যে ভালবাসাকে সে জোর করে অস্বীকার করছে—সে প্রেম মরে যাবে না। শিশু মহীরুহের মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই একদিন। তখন সব জানাজানি হয়ে যাবে। হয়তো অনাদর করবে ভূষণ লতুকে! সংসার ছারখার হয়ে যাবে।

: তুমি কি আমাকে তোমার যোগ্য মনে কর না?

নমিতা মন স্থির করে ফেলে। মিথ্যা কথাই বলবে সে। লতুর দিকে ওর মনটা ফিরিয়ে দিতে হবে। লতুর সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব নিজে করে আসার পর আর তার পক্ষে সম্ভব নয় বধূ বেশে ভূষণের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। তাছাড়া দাদা-বৌদির কাছে কোনদিনই ফিরে যাবেন না হরিপদ পণ্ডিত। অন্তত সেদিন যে দৃশ্য সে দেখেছে তাতে সে আশঙ্কাই দৃঢ় হয়েছে তার। বাপের দায়িত্ব তাকেই তুলে নিতে হবে। ভূষণকে সে ভুলতে পারবে না? কেন পারবে না। দুদিন আগে তো সে চিনত না তাকে। বলে : আমার সঙ্গে অন্য একজনের বিয়ে আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে।

ভূষণ চমকে ওঠে। বলে : অন্য একজন? কে সে? কবে থেকে?

: আপনি চিনবেন না। ছেলেবেলা থেকে।

: মিথ্যাকথা।

: মিথ্যা কথা?

ভূষণ জোর দিয়ে বলে : নিশ্চয়ই। যেদিন প্রথম তোমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম হাত—সেদিন তুমি আমার হাত ধরবার জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিলে। তোমার চোখের কম্পনে, তোমার মুখের সলজ্জ রক্তিমাভায় তুমি ধরা পড়ে গিয়েছিলে। অত সহজে এড়ানো যায় না নমিতা। আমি স্থির জানি সেদিন তুমি আমার বাহুবন্ধনে ধরা দেবার জন্যে উন্মুখ ছিলে। আজ কেন তা নেই তাই শুধু জানতে চেয়েছিলাম আমি।

নমিতার পক্ষে আর কথোপকথন চালান শক্ত হয়ে পড়ে। তবু ভেঙে পড়লে চলবে না। একবার ধরা পড়লেই আর ফেরা যাবে না। তাই মনে মনে শক্ত হবার চেষ্টা করে বলে : আপনি ভুল বুঝেছিলেন। কোনদিনই আমি ওভাবে দেখিনি আপনাকে।

ভূষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে : কোনদিন নয়? মুহূর্তের জন্যও নয়? যখন মিঠুয়াকে আমার মেয়ে বলে ভুল করে বুকে চেপে ধরে বলছিল 'আমাকে মা বল'—তখনও নয়! নমিতা, কী নিষ্ঠুর তুমি!

দুহাতে মুখ ঢাকে নমিতা। বলে : ওগো, আর নয়, চুপ কর তুমি।

কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। ভূষণ ওকে টেনে নেয় নিজের দিকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। নমিতার সমস্ত সংযম ভেঙে পড়ে। আর প্রতিবাদ করা যে নিষ্ফল একথা বোঝে।

অনেকক্ষণ পরে ভূষণ বলে : এই যদি তোমার মনের কথা তাহলে লতুর বিয়ের কথা কেন বলতে গেলে তুমি? কেন প্রত্যাখ্যান করলে আমাকে?

নমিতা বলে : এখন আর ফিরবার পথ নেই। লতু জানে তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। বাবা, পিসীমা সবাই বিয়ের আয়োজন করছেন। তোমার পিসীমা পরশু এসে মায়ের সঙ্গে পাকা কথাও বলে গেছেন। এখন আর অমত কর না তুমি।

ভূষণ বলে: সে অসম্ভব। লতু ছেলেমানুষ—সহজেই সৎপাত্রে তার বিয়ে দিতে পারব আমরা। তুমি তো বুঝতে পার এ বিয়ে হলে তুমি আমি কেউই সুখী হতে পারব না। লতুও সুখী হতে পারে না—আমাকে পেয়ে।

: কিন্তু এখন আর উপায় কি বল। না না, ছি ছি, সে আমি কিছুতেই পারব না।

: তোমাকে পারতেই হবে। আমি পিসীমাকে বলব—তোমার বাবাকে বলব।

: আর লতু? না গো—সে হয় না! ওই কারা আসছে এদিকে। ওঠ, চল যাই।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজে। আটটা সাতেরোর লোকাল আসছে। টিকিটঘর খোলা হল। একে একে লোক জমছে স্টেশনে। ওটা উঠে পড়ে। ধীরে ধীরে দুজনে চলে যায় দুদিকে।

কাজে নেমে অবস্থার গুরুত্বটা অনুধাবন করতে পারেন ইঞ্জিনিয়ার বীরেন মৈত্র। বস্তুত এ জাতীয় পরীক্ষা কখনও কোথাও হয়েছে কিনা জানা নেই তাঁর। কলকাতায় চীফ-ইঞ্জিনিয়ার এবং উপদেষ্টার কাছে যখন কাগজে কলমে এই স্কীমটি দেখেন তখন উল্লসিত হয়েছিলেন তিনি। মনে হয়েছিল এভাবেই হয়তো গড়ে তোলা যাবে নতুন এক সমাজ। সরকারি কাজের ঠিকাদারী করে মুষ্টিমেয় কতকগুলি ঠিকাদার স্ফীত হয় বছর বছর। যদি ঠিকাদার নিযুক্ত না করে ডিপার্টমেন্ট থেকে সরাসরি এইসব উদ্বাস্তু মানুষদের কাজে লাগানো যায়—এবং ঠিকাদারের মোটা মুনাফা লভ্যাংশ হিসাবে তাদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া যায় তা হলে ভালই কাজ করা যাবে এদের দিয়ে। কর্মহীন এই কলোনির লোকগুলি শিখে নেবে নানান কাজ। ক্রমশ দক্ষ হয়ে কলোনির বাইরে গিয়েও কাজ যোগাড় করতে পারবে।

যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে কাজ চালু কবলেন মৈত্র সাহেব। প্রথম কাজের সূচনা করতে এলেন কলকাতা থেকে কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। সকলে জমায়েত হলেন ইস্কুলের মাঠটায়। ঐখান থেকেই রাস্তার কাজ শুরু হবে। সর্বপ্রথমেই চীফ ইঞ্জিনিয়ার সকলকে ডেকে বললেন—

: আজকে আমরা যা এখানে চালু করছি তার একটা বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। আপনাদের এবং আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায়, সকলের সততায় এবং আন্তরিকতায় তা অদ্ভুত সাফল্য লাভ করতে পারে—আবার আপনারা যদি ব্যক্তিগত স্বার্থটাই বড় করে দেখেন তা হলে এ পরিকল্পনা অঙ্কুরেই শুকিয়ে যেতে পারে। স্থির হয়েছে—এ কলোনিতে যা কাজ হবে তা আপনারাই করবেন। বাইরের কোনও ঠিকাদার আসবে না। মিস্ত্রি, মজুর, ছুতোর সমস্ত লাগানো হবে কলোনি থেকেই। এ কাজে হয়তো সবাই অভ্যস্থ নন। তাই তাড়াতাড়ি ভালো কাজ আমি মোটেই আশা করছি না—আমি বরং আশা করছি সততার সঙ্গে আপনাদের ঐকান্তিক চেষ্টা। যাঁরা ভালো কাজ শিখতে পারবেন তাঁদের এ কলোনির বাইরে নিয়ে গিয়েও ছোটখাট কাজ দেব আমি। একটা কথা আপনারা স্মরণে রাখবেন, টেন্ডার ডেকে বাইরের ঠিকাদার লাগালে এ কাজগুলি আরও সস্তায় করা যেত। আমরা সেটা করছি না শুধু আপনাদের নানান কাজে শিখিয়ে তুলব বলে। এই সুযোগে কাজগুলো শিখে নিন আপনারা। ফাঁকি দিতে গেলে নিজেরাই ফাঁকে পড়বেন। আপনাদের সন্তানেরাই ভবিষ্যতে বলবে—বাবা কাকারা দুটো পয়সার লোভে সর্বনাশ করে গেছে আমাদের।

পুনর্বাসন বিভাগের আর একজন বড় অফিসর বললেন : আমাদের ইচ্ছা আছে এইখানে আপনাদের দিয়ে ইঁট পোড়াব—টালি বানাব। আজও আমাদের এ রাজ্যে ইঁট-প্রস্তুতি-শিল্পে বাইরে থেকে পাতেরা মিস্ত্রি আনতে হয়। আপনাদের এ সব ব্যবসায় নেমে পড়ায় দেশটা উপকৃত হবে।

ঠাকুর্দা অভ্যাগতদের স্বাগত জানান।

মেয়েরা শাঁখ বাজায়।

চীফ-ইঞ্জিনিয়র এগিয়ে আসেন উদ্বোধন করতে।

যতীশবাবু একটি ছোট রূপার কর্নিক এগিয়ে দেন তাঁর দিকে। এটি যোগাড় করে রাখা হয়েছিল আজকের জন্যে।

চীফ ওঁর হাতখানা সরিয়ে দেন। তারপর সামনের একজন শ্রমিকের হাত থেকে লোহার কোদালটা টেনে নিয়ে মাটিতে মারেন প্রথম কোপ।

দিন সাতেক কেটে গেছে তারপর।

এই সাত দিনেই বীরেন মৈত্র হাঁপিয়ে উঠেছেন। প্রথম সমস্যাই হল গ্রুপলীডার নির্বাচন। বেছে নিতে হবে সেইসব লোক যারা বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের—যারা পরিচালিত করবে সাধারণ কর্মীদের। যাদের লভ্যাংশ হবে সাধারণ কর্মীদের প্রায় দ্বিগুণ এবং যারা সৎ!

প্রায় দু'শ আবেদনপত্র এল গ্রুপলীডার হবার। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব প্রমাদ গুনলেন। বাগচি বলেন বেশ তো মশাই—আপনি বলুন না ক'জন গ্রুপলীডার চাই আপনার?

বীরেনবাবু বলেন : তার আগে আপনি বলুন কলোনিতে কাজ করতে নামবে কত লোক?

বাগচি বলেন : আপাতত ধরুন হাজার।

নিতাইপদ বলেন : আমার মনে হয় প্রথমে শ'তিনেকের বেশি লোক পাবেন না। উদয়-নগর হচ্ছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের কলোনি। এরা মেহনতী মানুষ নয়। একে অনভ্যাস তায় চক্ষুলজ্জা। শ'তিনেক লোক পেতে পারেন প্রথমে।

বাগচি বলেন : বেশ, প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা যাক তিনশো।

বীরেন বলেন : গ্রুপে পনের জন করে লোক কাজ করলে গোটা কুড়ি গ্রুপ হবে সর্বসমেত।

যতীশবাবু বলেন : দুশ আবেদনপত্র থেকে মাত্র কুড়িটি লোক বেছে নিলে তো বিরাট দলাদলি মারামারি বেধে যাবে।

বাগচি দৃঢ়ভাবে বলেন : দলাদলি মারামারি যাতে না বাধে তা আমাদের দেখতে হবে। আপনি কুড়ি জনকেই কাজ দিন। নিতাইবাবু দরখাস্ত দেখে বলুন কোন কুড়ি জনকে প্রথম কাজ দেওয়া যায়।

ওঁরা সকলে মিলে বেছে বেছে বার করলেন কুড়িটি আবেদনপত্র। সবচেয়ে যারা দুঃস্থ তারাই পেল অগ্রাধিকার।

এদের নিয়েই কাজ শুরু হল।

কাজে নেমে মৈত্রসাহেব অনুভব করলেন অসুবিধাটা। এসব বাধা বিঘ্নগুলি লক্ষ্য হয়নি এতদিন। নিঃস্ব বেকারের পক্ষেই গ্রুপলীডারশীল পাওয়ার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল কিছু মূলধন না থাকলে ঠিকাদারী করা চলে না। দিনের শেষে সাধারণ মেহনতী মানুষ দৈনিক খোরাকি দাবী করে। কয়েকজন গ্রুপলীডার চড়া সুদে টাকা ধার করল ;—জড়িয়ে পড়ল ঋণজালে। কয়েকজন গোপনে বিক্রি করে দিল গ্রুপলীডারশীপ—যেমন করে সিমেন্ট আর টিনের পারমিট বিক্রি হয়। বেনামিতে চলল সে গ্রুপের কাজ। কেউ বা নিজে থেকেই এসে শরণাপন্ন হল বীরেনবাবুর। দরকার নেই ঠিকাদারীতে। চাকরি যদি দিতে পারেন কিছু তাই দিন।

বাগচি বলেন : কাজ চালাবার জন্যে গ্রুপলীডারদের কিছু আগাম দেওয়া যায় না?

বীরেনবাবু হতাশ হয়ে মাথা নাড়েন। বিনা জামানতে আগাম দেওয়ার ব্যবস্থা নেই সরকারি আইনে।

: দৈনিক মাপ ওঠানো যায় কি?

: সেও এক রকম অসম্ভব।

সারাদিন মৈত্র কাজ দেখেন ঘুরে ঘুরে। শুধু রাস্তার কিছু কাজ বিতরণ করেছেন। অন্যান্য বড কাজগুলি শুরু হয়নি। একজন ওভারসিয়ারও জয়েন করেছে কাজে। ছোট একটি ঘর ভাড়া করে অফিস খুলেছেন। চেয়ার বেঞ্চি খাতাপত্র কিছুই আসেনি এখনও। ধারে চলেছে কারবার। প্রায় শ' চারেক লোক কাজ শুরু করেছিল। দৈনিক খোরাকির টাকা না পেয়ে কিছু লোক কাজ বন্ধ রেখেছে। এখন শ'দুই লোক খাটছে বিভিন্ন রাস্তায়। কোথাও 'বরোপিট' থেকে মাটি কেটে এনে রাস্তা উঁচু করছে, কোথাও নয় ইঞ্চি গভীর 'বক্সকাটিং' চলছে। কোথাও সোলিং বিছান শুরু হয়ে গেছে। লক্ষ্য করলেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব—যারা কাজ করছে তারা প্রায় সবাই ভদ্রসন্তান। ওপারে ছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, চাকুরে, শিক্ষক অথবা জমিদারী সেরেস্তার বিভিন্ন কাজে লিপ্ত। ঘোষ, বোস, মল্লিক, নন্দী তো আছেই—তাছাড়া রায়, চাটুজ্জে, গাঙ্গুলী, ভট্টাচার্যিও আছে।

বাগচি উৎসাহিত হয়ে বলেন : এই সব ভদ্রলোকের ছেলে যে মাটি কাটার কাজে এগিয়ে আসবে তা কিন্তু ভাবাই যায়নি।

মৈত্র বলেন : আপনি এতে খুশি হয়েছেন?

: নিশ্চয়ই। জানেন কাল রাত্রে কি হয়েছে?

গল্পটা শোনান বাগচি সাহেব। গতকাল কলোনির কাজ সেরে সন্ধ্যা সাতটার লোকালে জংশনে ফিরছিলেন উনি। কলোনিতে এখনও ওঁর কোয়ার্টার্স হয়নি। তাই রোজ যাতায়াত করেন। হঠাৎ বাগচির নজরে পড়ে রাস্তার মধ্যে লণ্ঠন জ্বেলে জনা পাঁচ-ছয় লোক কী করছে। ইঁট চুরি করছে না তো? উনি এগিয়ে আসেন। লোকগুলি উঠে দাঁড়াল। জনা কয়েক পুরুষ। তিনটি রমণী। দুটি বধূ একটি অনূঢ়া যুবতী।

একজনকে বাগচি চিনতে পারেন—শোভনাদেবী। স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী।

: কি করছিলেন এখানে?

ওরা জবাব দেয় না।

যুবতী মেয়েটির দু হাতে দুখানি থান ইঁট।

: ইঁট নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়?

শোভনাদি হেসে বলেন : চুরি করি নাই। আমরায় ইঁট সাজাইতাছিলাম।

বস্তুত রাস্তায় সোলিং বিছিয়ে দিচ্ছিলেন ওঁরা। শোভনাদি, তাঁর ছোট বোন, মা আর বাবা। প্রকাশ্য দিবালোকে কাজ করা সম্ভব নয় বলে রাত্রে লণ্ঠন জ্বেলে কাজটা এগিয়ে রাখছিলেন। শোভনাদির বাপ নগেনবাবু একজন গ্রুপলীডার!

বাগচি বলেন : বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এ সঙ্কোচ আর ক'দিন? সকলেই যদি চক্ষুলজ্জার ভয়ে রাত্রে লণ্ঠন জ্বেলে কাজ করে তবে রাত্রেই সবার দেখা সাক্ষাৎ হবে। সকলেরই চক্ষুলজ্জা ভাঙবে।

মৈত্র বলেন : তা না হয় মানলাম। কিন্তু ঐ ভদ্রপরিবারটিকে শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত করায় কেন এত আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন আপনি? ওঁদের পক্ষে সত্যিকারের মেহনতি মানুষ হওয়া কি সম্ভব? আর সম্ভব হলেও কি সেটা বাঞ্ছনীয়?

বাগচি বলেন : তাও ভালো মশাই, তাও ভালো। বিশ্বাস না হয় ওদেরই জিজ্ঞাসা করে দেখুন। ভদ্রলোক সেজে কী লাভ হয়েছে ওদের? কতকগুলো বাড়তি চক্ষুলজ্জা ছাড়া কী দিয়েছে ওদের—সমাজ? শ্রমের মর্যাদাটা বিকৃত করার নজির বোধহয় একমাত্র ভারতবর্ষেই আছে। আপনাদের ভদ্রলোক ছোটলোকের বিচার নিয়ে আপনারা থাকুন। এরা গায়ে খেটে দু পয়সা রোজগার করুক।

তারপর উনি বলতে থাকেন ওঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা। এর আগে উনি কিছুদিন ছিলেন বকুলতলা পি. এল ক্যাম্পের চার্জে। সেখানকার ইতিহাস বলে যান উনি।

: জোয়ান মর্দগুলো মশাই বসে বসে ডোল খেত। নড়ে বসবে না। তার চেয়ে এই ভালো নয়? তাছাড়া ঐ শোভনাদেবী অথবা তাঁর বাবা—ওঁরা আজ এভাবে দু'পয়সা বাড়তি রোজগার করছেন বইতো নয়। আপনার এখানে আজ যারা কাজ করছে তাদের অনেকে দু'পয়সা জমিয়ে আবার ফিরে আসবে মধ্যবিত্ত সমাজে। শুরু করবে অন্য ব্যবসা।

: আর মধ্যবিত্ত সমাজ যদি তাদের অপাংক্তেয় করে?

: তাতে বয়েই গেল। আপনাদের সো-কল্ড ভদ্রলোকের চেয়ে মেহনতী মানুষদের অবস্থা আর বেশি খারাপ নাকি?

আর একটি সমস্যার দিকে নজর পড়েছিল মৈত্রসাহেবের। সেটাও আলোচনা করেন। ওঁদের উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে গ্রুপলীডার বেছে নেবেন। তারা কাজ শিখে ভবিষ্যতে হবে ঠিকাদার। নিজে হাতে কাজ করা না শিখলেও চলবে—তাদের জানতে হব ঠিকাদারি বিদ্যা। হিসাব রাখা, মালপত্র জোগাড় করা, লোক খাটানোর কাজ। আর নিম্ন শ্রেণীর লোক শিখবে মিস্ত্রির কাজ, মজুরের কাজ প্রভৃতি। কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল এ কলোনিতে প্লট হোল্ডার সকলেই মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর ভদ্রলোক। উচ্চ মধ্যবিত্ত থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত। মৈত্র তাই বাগচির দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করেন। বাগচি বলেন : আমরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলকেই গ্রুপলীডার করব।

: তা তো সম্ভব নয়। যে গ্রুপলীডার হবে তাকে শিখতে হবে ঠিকাদারি বিদ্যা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকেই যদি ঐ বিদ্যা শেখাতে যাই তা হলে আসলে কেউই কিছু শিখবে না। তাছাড়া কলোনির সবকটি লোকই ভবিষ্যতে ঠিকাদার হক—এও নিশ্চয়ই চাই না আমরা। ওদিকে যারা গাঁথনির কাজ শিখবে, মজুরের কাজ শিখবে—তাদেরও লেগে থাকা চাই নিজ নিজ লাইনে।

: অর্থাৎ আবার সেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের সমাজ ব্যবস্থা? ক্ষত্রিয় বেদপাঠ করতে পারবে না—মজুর গ্রুপলীডার হতে পারবে না? ক্লাসলেস-স্যোসাইটি থেকে যাবে স্বপ্ন কথা?

বীরেনবাবু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন : ক্লাসলেস স্যোসাইটি বলতে আপনি যদি মনে করেন যে প্রতিটি মানুষ রাস্তা ঝাঁট দেওয়া থেকে অ্যাসেম্ব্লির স্পীকার হওয়া পর্যন্ত সব কাজ একসঙ্গে করবে—তাহলে সেটা স্বপ্ন কথাই থাকবে বটে।

: আমি কিন্তু তা বলিনি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। আমি বলছি যে লোক আজ সত্যিই ঝাঁটা হাতে রাস্তা

সাফা কবছে কাল সে উপযুক্ত হলে কেন তাকে বসাবেন না এ্যাসেস্নিব স্পীকাব কবে? আজ যে মজুব কাল সে ঠিকাদাব হতে পাববে না কেন—বিশেষত সবাই যখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েব লোক।

বীবেনবাবু উত্তেজিত হযে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বাগচি আবাব বলেন যাক কাজেব এই প্রথম অবস্থাতেই অত কথা আমাদেব না ভাবলেও চলবে।

মৈত্র দৃঢভাবে মাথা নাডেন না বাগ্চি সাহেব। এখানেও আমি আপনাব সঙ্গে একমত নই। ভাবতে হলে এখনই এসব কথা ভেবে নিন। এবপব আব ভাববাব সময পাবেন না। কাজেব তাডায এগিয়ে যাব আমবা একমুখো। কাজ অনেকটা কবে যখন অগ্রগতি বিষযে আস্ফালন কবতে বসব তখন হযতো দেখা যাবে অগ্রগতি হযেছে বটে তবে আমাদের মুখটা ছিল লক্ষ্যেব বিপবীত দিকে। একটা কথা আমাদেব ভুললে চলবে না যে, আমবা এখানে যে এক্সপেবিমেন্ট কবছি সেটা আগে কোথাও পবখ কবা হযনি। এই লোকগুলোই শুধু নয—এদেব ভবিষ্যৎ বংশধবদেব ভাগ্যও নিব্দপণ কবছি আমবা। আমাদেব একটা ভুলে হযতো ভুগতে হবে এদেব তিনপুরুষ ধবে।

বাগচি-সাহেব বীবেন মৈত্রেব পিঠে একখানা হাত বেখে বলেন জানি মিস্টাব মৈত্র, জানি। কলোনিব এই লোকগুলোকে দিযে আমবা পত্তন কবছি এক নতুন সমাজ। এখানে সৃষ্ট হচ্ছে এক ক্ষুদে পৃথিবী। এবা সবাই এখন নবম কাদাব তাল। শিব গডা অথবা বাঁদব গডা নির্ভব কবছে আমাব আপনাব উপবেই।

বীবেন মৈত্র জবাব দেন না। দুজনে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেন অফিসেব দিকে। পথেব দুধাবে কর্মব্যস্ত মানুষ। ইঁট আসছে লবী কবে। মাটি কাটছে উদ্বাস্তবা—সোলিং বসাচ্ছে বাস্তায। খোযা ফেলছে। বোলাব এখনও এসে পৌঁছাযনি। বেল লাইনেব ওপাশে ইঁটখোলায 'কিলন' কাটা হচ্ছে। সেখানেও মাটি কাটছে উদ্‌বাস্তু শ্রমিক। মাস্টার-বোল-লেবাব। নীববেই পথটা অতিক্রম কবেন দুজনে। মৈত্রসাহেব ভাবছিলেন কি কবে এইসব পুঁজিহীন নিঃস্বদেব দিযে এই বিবাট পবিকল্পনাকে ব্দপাযিত কবা যায।

মনে আছে কলকাতায ইঞ্জিনিযাব বন্ধুরা হেসেছিল পবিকল্পনা শুনে। সবকাবেব ঠিকাদাবী বিভাগ! যতসব বোগাস! সহপাঠী ঋতব্রত বলেছিল মাযেব কাছে আর মাসিব গল্প কব না ভাই। আমাব জানা আছে সব। সদাশয সবকাব বাহাদুবেব এইসব পোষ্যপুত্রেবা চেনে শুধু দুটি জিনিস 'লোন' আব 'ডোল'। খেটে খাওযা! মাপ কবন লাগবো!

সবাই হো হো কবে হেসে উঠেছিল ওব বচনভঙ্গিতে।

মৈত্র প্রতিবাদ কবেন নি। উদ্বাস্তুদেব মধ্যে ইতিপূর্বে কাজ কবেননি তিনি। এখন তাব মনে হচ্ছে বাঙলাব এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তে তিনি যে পবীক্ষা কবে চলেছেন আজ, তাব সংবাদ জানে না বৃহত্তব পৃথিবী , হযতো জানবেও না কোনদিন যদি তাঁব প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ না কবে। যদি স্বার্থসন্ধানী উদ্বাস্তু দলনেতা আব উৎকোচ-লোভী সবকাবি কর্মচাবীদেব ষডযন্ত্রে এ পবিকল্পনা অঙ্কুবেই বিনষ্ট হযে যায। কিছু ক্ষমতা অবশ্য দিতেই হবে স্থানীয কর্মচারীদের। গ্রুপলীডাবেব সংখ্যা যত বাডবে- অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থা ততই সাম্যেব ব্দপ নেবে। অথচ বেশি গ্রুপলীডাব হলে উৎকোচলোভী কর্মচাবীব সুযোগ যাবে বেডে। বামেব মাপ শ্যামেব খাতায উঠল কিনা তখন আব ধবা যাবে না। দ্বিতীযত যে কোন সাধাবণ ঠিকাদাবেব যেটুকু ক্ষমতা আছে তাঁর তা নেই। একজন সৎ ওভাবসিযাবকে তিনি পাঁচ টাকা মাহিনা বাডিযে দিতে পাবেন না—অসৎ জেনেও আর একজনেব 'পে-বিল' আটক কবতে পাবেন না। যাবা সততাব সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে নিবলস পরিশ্রমে তাঁর 'কন্ট্রাক্ট ডিভিশনকে' লাভবান কববে তাদেব কোন বোনাস—কোন পুবস্কাব দেবাব ক্ষমতা তাঁব নেই ,—শুধু তাঁব কেন স্বযং চীফ ইঞ্জিনিযাবেব পর্যন্ত নেই। আবাব আইনেব ফাঁক দিযে হাতে-নাতে ধবা না পডে কেউ পুকুবচুবি কবলেও কিছু কবণীয নেই—হাত কামডানো ছাডা। তাহলে কি কবে ভালো কাজ কবা যাবে?

আচ্ছা, এদের সমস্যা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলে কেমন হয়? পড়বে না কেউ সে বই? বিশ্বাস করবে না পড়ে? চিন্তা করবে না এর সমাধানের? যারা পারে তাঁর সমস্যাকে সরল করতে তারা এগিয়ে আসবে না? কে জানে! নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে ইতিপূর্বে একটি কাহিনী রচনা করেছিলেন মনে আছে। আর এও মনে আছে একটি বিখ্যাত প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকায় তাঁর পরিচয় হয়েছিল কল্পনাবিলাসী বলে। সমালোচনায় সমালোচক বলেছিলেন 'অমুক চরিত্রটা অবাস্তব!' হাসি পায়, যখন তাঁর মনে পড়ে চরিত্রটা তাঁর কলমের মুখে জন্মায়নি—সেটা তাঁর চোখে দেখা!

বাগচিও মনে মনে ভাবছিলেন প্রায় একই কথা। পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তাঁর। এর আগে তিনি ছিলেন একটা পি. এল. ক্যাম্পের এ্যাডমিনিস্ট্রেটর। সেই বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প-বাসীদের সঙ্গে কলোনির লোকগুলোকে মনে মনে তুলনা করছিলেন তিনি। বাঁচবার জন্যে এদের কী অপরিসীম আগ্রহ। অনভ্যস্ত হাতে কাজ করছে—চড়া রৌদ্রে দাঁড়িয়ে। বাঁচবে, ওরা বাঁচবে, নিশ্চয়ই মানুষ হয়ে উঠবে আবার। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আবার সামাজিক মানুষ হয়ে উঠবে ওরা। বিরাট পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ওদের মধ্যে, সকলের চোখের আড়ালে। এ পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবেই। অনেক প্রতিকূলতা দেখা দেবে। যাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে তারাই আসবে বাধা দিতে। বড় বড় ঠিকাদার এ ব্যবস্থাটা পছন্দ করবে না ; পছন্দ করবে না যারা বড় ঠিকাদারের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে অভ্যস্ত। ক্যাস-ডোলের ব্যবস্থায় যাদের বে-আইনি হচ্ছিল তারাও আসবে বাধা দিতে। কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করতে হবে। সব সরকারি কর্মচারীই কিছু অসৎ নয়—তারা নিশ্চয়ই প্রাণ দিয়ে সাহায্য করবে বাগচির আর মৈত্রের।

চোখের সামনে বাগচি ভাঙাগড়ার নতুন ইতিহাস শুরু হতে দেখছেন। ওপারে ওদের সমাজ বিভক্ত ছিল জাতের ভিত্তিতে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্য জল-অচল জাতের গণ্ডিতে। কর্মগত জাতিভেদও ছিল। ব্যবসায়ী, চাকুরে, ভূসত্বভোগী, ভূমিহীন চাষী অথবা ভাগচাষী। এ পারে এসে সবাই দাঁড়িয়েছে এক সমতলে। সবাই বেকার—সবাই উদ্‌বাস্তু! কর্মগত ভেদ হারিয়েছে তার সীমারেখা। এখন বরং জেলাগত গোষ্ঠি গড়ে উঠছে ওদের মধ্যে। যশোর, পাবনা, মৈমনসিং, কুষ্ঠিয়ার লোকেরা নিজেদের জেলার লোকের মধ্যে অনুভব করে একটা সূক্ষ্ম আত্মীয়তাবোধ। এক গ্রুপে কাজ করছে যারা তারা এক পাড়ার বা এক ব্লকের লোক নয়—এক-প্রাক্তন-জেলাবাসী। দু পাঁচ বছরে না হক—কালে ওরা সকলেই হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গবাসী। চট্টলা নোয়াখালী, ঢাকা, খুলনা, রাজসাহী হারাবে তাদের ভাষাগত বৈসম্য। ভাবেন বাগচি,—দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবের দেশে এক দেহে লীন হয়ে ওরা রচনা করবে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়!

পরিকল্পনার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নিতাই ঠাকুর্দা, ভূষণ যোগেনদের আর নাওয়া খাওয়ার বিরাম নেই। কুড়িজন গ্রুপলীডার বিশটা রাস্তায় কাজ করছে। নতুন গ্রুপ আর লাগানো হয়নি। সাতদিনের মাথায় বিল দেওয়া হয়েছে। মাতা পিছু মেহনতী মানুষেরা পেয়েছে দৈনিক আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা। লীডাররা পেয়েছে পাঁচ থেকে ছয় টাকা। এটা একেবারে আশাতীত। গ্রুপলীডাররা বেশি পাচ্ছে। সুতরাং সবাই গ্রুপলীডার হতে চায়! জীবেন বেনামিতে একজন গ্রুপলীডারের কাজ চালাচ্ছে। গোপনে কিনে নিয়েছে সে গ্রুপলীডারশিপটা। ফলে তার বিড়ি ফ্যাকটরির কাজ বন্ধ হতে বসেছে। যারা বিড়ি বানাতো তারা এসে অনুযোগ করল ঠাকুর্দার কাছে। এ জাতীয় অনুযোগ অভিযোগ লেগেই আছে।

এদিকে ফ্যাক্টারি তৈরি, প্রডাকশন সেন্টার তৈরি আর ইঁট-খোলা করার স্যাংশন এসে গেছে। মৈত্র খবরটা গোপনে জানালেন বাগচি সাহেবকে। এ কাজ তিনটি বড় কাজ—প্রত্যেকটিই লাখটাকার কাছাকাছি। এর জন্যে ভালো গ্রুপলীডার চাই। মানে শুধু সৎ হলেই হবে না—একেবারে

অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ লীডারও চলবে না। কি ভাবে গ্রুপলীডার বেছে নেওয়া হবে সেটা জানবার জন্যে মৈত্র সাহেব নির্দেশ চেয়েছিলেন উপরওয়ালা ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। চীফ-ইঞ্জিনিয়ার রহস্য করে ছাড়া কথা বলতে জানেন না। বলেছিলেন : তোমরা দুই বারেন্দ্রেই সেটা ঠিক কর। আমাকে বাদ দিলেও যথেষ্ট ঘোলা হবে জল।

বাগচি-সাহেব নিতাইপদকে মৌখিক বলেছিলেন ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভেবে দেখতে। নিতাইপদ সেরকম লোক খুঁজে পাননি। কলোনিতে যে কটি লোকের মূলধন আছে তারা বিশ্বাসযোগ্য নয় মোটেই। অথচ বেশি টাকার কাজ সাধারণ লোকের মধ্যে কাউকে দেওয়াও যায় না। কদিন আপন মনেই ব্যাপারটা ভেবেছেন নিতাইপদ। শেষে এক বুদ্ধি বার হয়েছে তাঁর মাথা থেকে। 'মালটি-পারপাস কোয়াপারেটিভ' তৈরি করতে হবে একটা। তার শেয়ার হোল্ডার হবে কলোনির যত দুঃস্থ বেকার লোক। দশটাকা বা একশ টাকার শেয়ার কিনবে সবাই। স্যোসাইটির কর্মীপরিষদে রাখতে হবে কয়েকজনকে—যাদের গঠনমূলক কাজের অভিজ্ঞতা আছে। ভূষণ, যতীন, রাখাল প্রভৃতি কয়েকজনকে মনে মনে স্থির করলেন নিতাইপদ।

গোড়া বেঁধে কাজ করার অভ্যাস ঠাকুর্দার। তিনি স্থির করলেন গোটা কলোনির প্রত্যেকটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা জানা থাকা উচিৎ তাঁর গণকল্যাণ সমিতির। এটা থেকে তিনি স্থির করবেন কে কে শেয়ার হোল্ডার হবে। সরকার থেকে যদি কোয়াপারেটিভ লোনের ব্যবস্থা করতে পারেন তবে তো সোণায় সোহাগা। কর্মীদের লাগিয়ে দিলেন তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে। কেন, কি বৃত্তান্ত, সেটা গোপন রাখলেন আপাতত। স্বেচ্ছাসেবকগুলিও ওসব প্রশ্ন করে না কখনও। অক্লান্ত পরিশ্রম করে যায় তারা।

ঠাকুর্দা বসে আছেন তাঁর বৈঠকখানার চেয়ারে। অনবরত লোকজন যাতায়াত করছে। এটাই এখন গণকল্যাণের অফিস। অফিসেই মাঝে মাঝে ঠাকুর্দা কারও নাড়ি দেখে ওষুধ দেন। সেটাও গণকল্যাণের কাজ।

: বিহারি তোমার ব্লকের স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্টটা হয়ে গেছে?

: হ্যাঁ ঠাকুর্দা, এই নিন।

একগাদা কাগজ সে এগিয়ে দেয় ঠাকুর্দার দিকে। পাতা উল্টে দেখতে দেখতে ঠাকুর্দা বলেন : প্রত্যেক বাড়ি গিয়েছিলেন?

: প্রত্যেক বাড়ি। ক'জন লোক, কত বয়স, কী করে, সব লিখে এনেছি। ছককাটা ঘরে লিখে দিয়েছি—যেমন চেয়েছিলেন।

রিপোর্টটা ঠাকুর্দা এগিয়ে দেন নমিতার দিকে : নাও ধর। কতগুলি ব্লক হল?

নমিতা বলে : চারটে হয়েছে। শুধু ভূষণবাবুর ব্লকের রিপোর্টটা আসেনি এখনও।

: শেষ পর্যন্ত ভূষণই লাস্ট? নাঃ, ডোবালে দেখছি ছেলেটা। ওতো এমন ছিল না। কী হয়েছে বলত আজকাল ওর? কই ভূষণ কই?

: ভূষণবাবু আজ আসেননি।

: দেখ দিকিনি কাণ্ড। ভূষণের রিপোর্টটা এলেই আমি কম্পাইল করে ফেলতে পারতাম।

সুরেন কর বলে : কিন্তু এ মহাভারত রচনা করে কী হবে ঠাকুর্দা?

ঠাকুর্দা হাসেন : সে কথা এখন বলব না।

নমিতা বলে : বা রে—আমরা খেটে মরব অথচ জানতে পারব না?

তখন নিতাই ঠাকুর্দা আসল কথাটা ভেঙে বলেন। ওঁর ইচ্ছা আছে একটা মাল্‌টিপারপাস্ কোয়াপারেটিভ গড়ে তোলা। বড় বড় তিনটি কাজের স্যাংশন এসেছে ;—প্রডাকশন সেণ্টার, ফ্যাক্‌টারি আর ইঁটখোলা। এ তিনটি কাজই নেবে এই কোয়াপারেটিভ।

রাখাল বলে : তার সঙ্গে এ স্ট্যাটিসটিক্সের কি সম্বন্ধ?

: বুঝলি না? কলোনির প্রত্যেকটি পরিবারের নাড়ি-নক্ষত্র থেকে গেল আমাদের কাছে। কোন পরিবারে ক'জন লোক, কত আয়। কোয়াপারেটিভ হবে শুনলে সবাই চাইবে মেম্বার হতে। আমরা তখন বেছে নিতে পারব এই চার্ট দেখে।

নমিতা যোগ দেয় : আচ্ছা ঠাকুর্দা, রিলিফ অফিস থেকেও তো গতবার ইকনমিক্যাল সার্ভে করানো হয়েছিল। সে সব কাগজ কোথায়? ভূষণবাবুর ব্লকের খবর তো সেখান থেকেও সংগ্রহ করা যায়।

: তা তো যায়, কিন্তু মুশ্‌কিল হয়েছে কি বাগচি সাহেবের মায়ের অসুখ। দিন দশেক ছুটি নিয়েছেন তিনি। যতীশবাবু অফিসিয়েট করছেন। তিনি বলছেন সে সব কাগজ কোথায় তা একমাত্র বাগচি সাহেবই বলতে পারেন।

: অসম্ভব। বাগচি সাহেব তো নতুন এসেছেন। পুরনো রেকর্ড কোথায় আছে তিনি ছাড়া অফিসে কেউ জানে না? রেকর্ড কোথায় থাকে তা রেকর্ড ক্লার্ক জানবে না—জানবে অফিসর?

ঠাকুর্দা বলেন : যতীশবাবুকে তো চিনিস্। আমাদের দু চোখে দেখতে পারেন না। কী মতলব আঁটছেন তা তিনিই জানেন।

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে যোগেন নায়েক, বলে : ঠাকুর্দা, কী কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন ঘরে বসে। বাইরে আসুন। ওদিকে সর্বনাশ হতে বসেছে।

: কি, হয়েছে কি?

উঠে পড়ে সবাই।

: ভূষণদা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন—আপনাদের ডেকে আনতে। ফ্যাকটারির মাঠটায় একদল নতুন রিফুজি এসে উঠেছে। যে স্টোর গোডাউনটা নতুন তৈরি হয়েছে—সেটা রিফুজিতে ভরে গেছে। মাঠেও এসে বসেছে অনেকে। মৈত্র সাহবেও এসেছেন। ওরা উঠ্‌বে না বলছে।

: নতুন রিফুজি? কই চল্‌তো দেখি।

ফাঁকা মাঠটার কাছে এসেই ওঁরা দেখতে পেলেন ফ্যাকটারির জন্যে যে বিস্তীর্ণ জমিটা নির্দিষ্ট হয়েছে সেখানে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। অন্তত দুশ পরিবার। কঙ্কালসার মানুষ। নরনারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মৃতবৎসা নারী, সন্তান ক্রোড়ে সদ্য জননী। এরা কারা? এল কি করে?

এরা নবীন অতিথি। এ দেশের লোক নয়—ভিন্‌দেশী মানুষ। নবীনতম প্রতিবেশি রাজ্যের প্রবীণতম অধিবাসী। যে দেশে এরা এতদিন ছিল সেটা সম্প্রতি স্বাধীন হয়েছে। ওদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের আমল থেকে এই পরাধীন দেশে বাস করে এসেছে ওরা। সম্প্রতি সেখানে ওরা আবিষ্কার করে বসল যে হাঠের বাজারে চাল নেই, চাকরির বাজারে স্থান নেই, পথে ঘাটে মর্যাদাটুকু পর্যন্ত নেই। তাই ওরা চলে এসেছে সে দেশে ছেড়ে এদেশে। পড়ে ছিল শেয়ালদা' স্টেশনে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ। পাশপোর্ট, ভিসা মানে না। অন্যায় করে থাকি—জেলে দাও। বে-আইনি কাজ করে থাকি—আইন-মাফিক্ শাস্তি দাও। জেলেও 'খাতি দেয়'।

ওদের জেলে দেওয়া হয়নি। তাই সংখ্যায় বাড়ছিল ওরা শেয়ালদ' স্টেশনে। বাক্‌স-তোরঙ্গ-পোঁটলা সাজিয়ে ডেলি-প্যাসেঞ্জারের স্রোত থেকে রক্ষা করত নিজেদের। দেশে থাকতে যেমন পদ্মার জলস্রোতের দিকে সজাগ সশঙ্ক দৃষ্টি রাখত—এখানেও তেমনি দশটা-পাঁচটার জনস্রোতের দিকে মেলে রাখে সতর্ক দৃষ্টি। ওদের ভীড় ঠেলে গেটে পৌঁছাতেই ডেলি প্যাসেঞ্জারদের লাগে পনের বিশ মিনিট। ওদের ডিঙ্গিয়ে মাড়িয়ে ছোটে তারা গেটের দিকে। দোষ দেওয়া যায় না তাদেরও। মনটা পড়ে থাকে অ্যাটেন্‌ডেন্স রেজিস্টারের দিকে। পাঁচ মিনিট পরেই সেটা চলে যাবে সেকশানাল বড় সাহেবের ঘরে। সেখানে গিয়ে সই করা মানে যে কি তা যাঁরা জানেন না তাঁদের বোঝান বৃথা চেষ্টা। আর যাঁরা জানেন তাঁদের তা বোঝাতে যাওয়া বাহুল্য। এই জোয়ারের জল আবার ফিরে আসে সাড়ে পাঁচটা

ছুটায়—ভাঁটার টানে। আবার ওরা মাদুরটাকে উঁচু করে বসে বসে তাকিয়ে দেখে।

এরই মধ্যে উনান জ্বালিয়ে ভাত ফোটায়, স্নান করে, খায়, ভিজে কাপড় নেড়ে নেড়ে শুকিয়ে নেয়। তারপর কি করে সেখানে খবর রটে গেল উদয়-নগর কলোনিতে কাজ করলে খেতে পাওয়া যায়। সরকার ব্যবস্থা করেছেন। কাজ কর, খাদ্য নাও! এর চেয়ে সুখবর আর কি হতে পারে। এই তো চায় ওরা। ওঠাও মালপত্র।

: ই টেরেন কই যাবো গো? উদয়নগর ইস্টিশানে ধরব?

একবার যদি কেউ বলে বসে 'হ্যাঁ'। ব্যস্। আর দেখতে হবে না। পিল্ পিল্ করে লোক ওঠে ট্রেনে। টিকিট লাগে না ওদের। বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠেছি? হাজতে দেবে? দাও। হাজতেও খেতে পাওয়া যায়। ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। দলে দলে লোক নেমে পড়ে উদয়নগর স্টেশনে।

: কই গো কি কাজ করুম কও। খাতি দাও।

ব্যাপার দেখে ঠাকুর্দা বিচলিত হলেন। অন্তত দুশ পরিবার এসে উপস্থিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার নরনারী। প্রডাকশন সেন্টারের সাইটে যেসব বাঁশ টিন এসেছে সেগুলো খাড়া করে মাথার উপর একটা আচ্ছাদন তুলতে চায়। নতুন গুদামঘর যেটা তৈরি হয়েছিল—তার মধ্যে তিল ধারণের স্থান নেই। বীরেন মৈত্র নিজে দাঁড়িয়ে আছেন। ভূষণও দাঁড়িয়েছিল সেখানে।

নিতাইপদ মৈত্র সাহেবকে হাত তুলে নমস্কার করলেন।

মৈত্র-সাহেব বলেন : এ কী নতুন ফ্যাসাদ বলুন দেখি। ওরা এসে জোর করে উঠেছে এখানে।

নিতাইপদ বলেন—ওরা এল কখন?

কে একজন বললে কাল রাত্রি থেকেই লোক আসছে। আজ সকালে লোকালেই এসেছে অধিকাংশ লোক।

মৈত্র বলেন : কী করা যায় বলুন তো? বার করে দিতেও পারছি না। সত্যিই ওরা যাবে কোথায়?

ঠাকুর্দা বলেন : তা তো বটেই।

আর সহ্য হয় না ভূষণের। বলে : ফিরতি ট্রেনে ওদের জোর করে তুলে দেওয়া হক। না হলে আপনার যে লরিতে মাল আসছে সেগুলো তো খালিই ফিরছে—তাতে বসিয়ে দেওয়া হক।

নিতাইপদ বলেন : ছি ভূষণ ; ওদের আজকে যে অবস্থা হয়েছে একদিন তোমার-আমারও ওই অবস্থা হয়েছিল। সেটা ভুলে যেও না।

: তাই বলে, আমাদের কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে?

: বন্ধ হয়ে যাবে কেন? যেসব ডেজার্টার্স প্লট খালি আছে সেগুলিতে ওদের বন্দোবস্ত দিতে হবে।

ইঞ্জিনিয়ার বলেন : কিন্তু ঐ তিন শ' পরিবারের পিছনে যে দু তিন হাজার পরিবার আসছে না—তাই বা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন?

ঠাকুর্দা চুপ করে রইলেন। কথাটা ভেবে দেখা দরকার।

ভূষণ মৈত্র-সাহেবকে লক্ষ্য করে বলে : প্রথম থেকেই যদি কঠিন না হন স্যার—তা হলে কিছুতেই এদের ঠেকাতে পারবেন না। আর প্রথম দলটিকেই যদি আমরা জোর করে ফেরত পাঠাতে পারি তাহলে আর কেউ আসবে না এখানে।

নিতাইপদ ধীর কণ্ঠে বলেন : যারা এসেছে আমাদের এখানে অতিথি হিসাবে—ঘাড়ে ধরে তাদের বার করে দেওয়াটায় আমার মত নেই।

যোগেন উত্তেজিত হয়েছে, বলে : বেশ তবে আপনার কী মত তা বলুন? এরা না হয় থাকল—যারা আসছে তাদের ঠেকাবেন কি করে?

ভূষণ বলে : আর ঘাড়ে হাত দিয়ে তো সত্যিই ওদের তাড়ানো হবে না। আপনি অনুমতি দিন, আমরা ওদের বুঝিয়ে—

অতি সযত্নে গাড়িতে তুলে দিই। ভূষণ, গণকল্যাণ সমিতি গঠনে তুমি ছিলে আমাব ডান হাত তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি —আমি তোমাব সঙ্গে একমত নই। যাবা এসেছে তাবা অতিথি, তাবা নাবাযণ

নিতাইপদ চলতে শুরু কবেন।

ভূষণ বিবক্ত হযে পিছন থেকে বলে তবে চলুক আপনাব অতিথি সেবা। আমাদেব পবিকল্পনা যাক বানচাল হযে। মরুক কলোনিব বাসিন্দা। নাবাযণ সেবা তো বন্ধ হতে পাবে না।

নিতাইপদ হঠাৎ ঘুবে দাঁড়ান। এ আঘাতটা বোধ হয অপ্রত্যাশিত। তিনি নিজে বোধ হয জানতেন না—তাঁব আদর্শ এবা মনে প্রাণে নিতে পাবেনি। এবা বাধ্য হযেই তাঁকে দলপতি কবে বেখেছে। নিজ সেনাপতিকেই এখন বিরুদ্ধাচবণ কবতে দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হযে উঠ্লেন। বলেন ভূষণ! এতটা সঙ্কীর্ণ স্বার্থপব মন যখন তোমাব—তখন তোমাব উচিত হযনি গণকল্যাণ সমিতিব সভ্য হওযা।

ভূষণ বলে কিন্তু এতটা সেন্টিমেণ্টাল হযে আপনাবই কি উচিত হযেছে সেই সমিতিব কর্ণধাব হওযা।

দলপতি আমি নিজে হইনি। এই সেন্টিমেন্টাল ফুলকে তোমবাই দলপতি নির্বাচিত কবেছিলে।

আমিও সভ্য নিজে হইনি ঠাকুর্দা। এই সঙ্কীর্ণচেতা স্বার্থপবকে কলোনিব পাঁচজনেই নির্বাচিত কবেছে।

নমিতা আব স্থিব থাকতে পাবে না, বলে কাব সঙ্গে তর্ক কবছেন ভূষণবাবু।

তোমাদেব নাবাযণভক্ত দলপতিব সঙ্গে, নমিতা।

ভূষণ ফিবে চল্‌ল।

কে একজন বললে ভাঙ্গন ধবল মনে হচ্ছে গণকল্যাণ সমিতিতে।

ইঞ্জিনিযাব মৈত্র বলেন আপনি উত্তেজিত হযেছেন নিতাইপদবাবু। কিন্তু ভূষণ বাবু তো অন্যায় কথা কিছু বলছেন না। ওদেব না ফিবিযে দিলে দলে দলে উদ্বাস্তু আসতে শুরু কবে দেবে। ফ্যাকটাবিব জমিটা ওবা এখনই দখল কবেছে। কাল কাজ বন্ধ। আবাব মববে সবাই। সমষ্টিব কল্যাণেব জন্য ব্যষ্টিব ক্ষতি তো অন্যায নয। এই তো মানব সভ্যতাব ইতিহাস।

নিতাইপদ ম্লান হাসেন। হাত দুটি জোব কবে বলেন ওইটা পাবব না মৈত্র সাহেব। দেশঘব, জমি জাযগা, স্ত্রী-পুত্র সব খুইযেছি একে একে—অবশিষ্ট আছে ঐ একটা জিনিসই। সেটি তো ছাডতে পাবব না আপনাব অনুবোধে।

মৈত্রসাহেব জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিযে থাকেন। ঠাকুর্দা বলেন আদর্শবাদেব কথা বলছিলাম আমি আজীবন বাজনীতি কবে এসেছি। আপনাদেব আধুনিক সভ্যতাব যাঁকে অর্ধনগ্ন ফকিব বলেছে সেই নাবাযণ ভক্ত গুরুব কাছেই দীক্ষা নিযেছিলাম একদিন যৌবনে। এত সহজে তো আমাব মত বদলাবে না মৈত্র-সাহেব।

ইঞ্জিনিযাব বলেন কিন্তু আমি বলছিলাম—

বাধা দিযে ঠাকুর্দা বলেন আপনিই এখানে কর্তা। পবিকল্পনাকে সুষ্ঠু ভাবে চালিযে নিতে যা করা উচিত কববেন আপনি।

আমি যদি এদেব সবিয়ে ফেলতে চাই, তাহলে আপনি অথবা আপনাব গণকল্যাণ সমিতি কি আপত্তি জানাবেন? বাধা দেবেন?

ঠাকুর্দা বলেন সমিতি কি কববে তা এখন বলতে পাবছি না। সমিতিব একজনেব কথা তো স্বকর্ণেই শুনলেন , তবে আমি নিজে নৈতিক আপত্তি জানাব। নমিতা, যোগেন—তোমবাও তোমাদেব মতামত জানাতে পাব।

নমিতা বলে আপনাকে যখন দলপতি হিসাবে মেনে নিযেছি তখন আপনাব নির্দেশই মেনে চলব আমি।

যোগেন বলে : আমিও ঐ কথা বলতে পারতাম যদি দেখতাম ঠাকুর্দার কোনও গঠনমূলক প্রস্তাব আছে। ওদের এখানে রাখতে চান এটুকুই জানিয়েছেন উনি। আর যারা আসছে তাদের সম্বন্ধে উনি কি মত পোষণ করেন তা জানি না। ওঁর যুক্তি অনুসারে পাঁচ-সাত-দশ হাজার লোক যদি এখানে আমাকে চায়—তবে তারাও অতিথি নারায়ণ। দলপতির প্রতি আনুগত্য রাখা যেমন প্রয়োজন—তেমনি যারা আমাদের নির্বাচন করে পাঠিয়েছে তাদের প্রতিও আমাদের একটা কর্তব্য আছে।

ঠাকুর্দা বলেন : আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হবে। সর্বপ্রথমেই ব্যবস্থা করা দরকার যাতে ওরা আর না আসে। আমি এখনই কলকাতা যাচ্ছি। এখনই গেলে লোকালটা ধরতে পারব। আমি চললাম। বীরেনবাবু, আমার অবর্তমানে নমিতাই গণকল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি।

ঠাকুর্দা সোজা স্টেশনের দিকে রওনা হন।

অনিমেষের বুকের ব্যথাটা অনেকটা ভালো হয়ে এসেছে। গায়েও বল পাচ্ছে এক আধটু। জংশন হাসপাতালেই সে আছে। দু তিন দিন অন্তর অন্তর আসে কামিনী। প্রথম প্রথম স্বেচ্ছাসেবকেরা নিয়ে আসত। আজকাল একাই আসতে পারে। পারলে রোজই আসত ; কিন্তু যাতায়াত ট্রেন ভাড়া পড়ে সাড়ে ছয় আনা। এটা তো রোজ খরচ করা চলে না। আজ কামিনী একাই এসেছিল। আঁচলে বেঁধে এনেছে দুটো ফল। ডাক্তারে অনিমেষকে ফল খেতে বলেছে।

হাসপাতালের বারান্দাতেই দেখা হল সেই নার্সটির সঙ্গে। ওকে দেখে বললে : কী? আজ যে খুব খুশি খুশি ভাব! কর্তাকে বাড়ি নিয়ে যাবার সময় হয়ে এল নাকি?

কামিনী প্রথম প্রথম সঙ্কোচ বোধ করত। আজকাল বেশ সহজ ভাবেই কথা বলতে পারে। এইসব সাদা পোশাক পরা মাথায় সাদা ঘোটার উপর লাল ফিতে বাঁধা মেয়েগুলি যে বাংলাতেই কথা বলতে পারে প্রথমটা সে বুঝতেই পারেনি। বললে : আপনারা ছেড়ে দিলেই নিয়ে যাই। আপনারাই যে ছেড়ে দিচ্ছেন না হাসপাতাল থেকে।

এ কথায় হাসির কি আছে? মেয়েটি হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে। ও পাশের আর একজন নার্সকে ডেকে বলে : ও মতিদি, দেখস কামিনী কি বল্‌ছে। বল্‌ছে ওর স্বামীকে ভালোমানুষ পেয়ে আমরা নাকি ভুলিয়ে ভালিয়ে আটকে রেখেছি, যার ধন তাকে ফিরে নিয়ে যেতে দিচ্ছি না।

মতিদি নার্সদের মধ্যে একটু আমুদে। এসে চোখ পাকিয়ে দাঁড়ান তিনি : আপনি এই কথা বলেছেন! আপনার কর্তাটি কি ভেড়া যে, আমরা খুঁটিতে বেঁধে রাখব?

কি কথা থেকে কি কথা! কামিনী ঘাবড়ে যায়। এরকম ব্যাপার বুঝলে সে ও কথা বলতই না। ওসব কিছু ভেবে বলেনি মোটেই। আমতা আমতা করে বলে : মানে আমি বলেছিলাম হাসপাতালের কর্তারা ছেড়ে দিলেই নিয়ে যেতে পারি। মানে, নার্সদের কেন দোষ দিতে যাব আমি? আপনারা এত সেবা যত্ন করেন আমাব স্বামীকে।

মতিদি আবার গর্জে ওঠেন : কী বললেন? আমরা আপনার স্বামী-সেবার অন্তরায়? আপনাকে স্বামী-সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আমরা নিজেরাই তার সেবা যত্ন করছি?

কামিনী একেবারে হতভম্ব!

প্রথম নার্স বলে : তাছাড়া আপনি কথা ফেরাচ্ছেন। প্রথমে আপনি হাসপাতালের কর্তাদের কথা মোটেই বলেননি। বলেছিলেন 'আপনারা ছেড়ে দিলেই নিয়ে যাই।' সেখানে আপনারা মানে—আমরা। নার্সরা। হাসপাতালের কর্তারা নয়।

কামিনী আমতা আমতা করে।

মতিদি ধমক্ দেয় : ঠিক করে বলুন হাসপাতালের কর্তারা না গিন্নিরা? আমরা হলাম হাসপাতালের গিন্নি। আর মেট্রন ঐ প্যাঁকাটি হচ্ছে হেডগিন্নি মানে মুগুগিন্নি। দেখছেন না খ্যাংরা কাঠির উপর আলুর

দমের মত মুণ্ডটাই শুধু আছে ওর।

বলেই হো হো করে হেসে ওঠে দুজন!

তাহলে সবটাই রসিকতা! কামিনী হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে : আপনারা এমন ভয় লাগিয়ে দেন।

: আবার ভয় কি ভাই? ভয়ের রাজ্য তো পার হয়ে এসেছ। আর কিছুদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে অনিমেষবাবুকে। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার দিন আমাদের খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু।

: নিশ্চয়ই। কী খাবেন বলুন? রসগোল্লা না সন্দেশ?—কামিনী খুশিতে উচ্ছল।

: না, এমন কিছু যা রেখে খাওয়া যায়। আচার, কাশুন্দি, আমসত্ত্ব কিংবা বড়ি। কিন্তু আপনার নিজের হাতের তৈরি হওয়া চাই। আমাদের মেসের ঠাকুরটার রান্না একেবারে অখাদ্য। খেয়ে খেয়ে মুখ মরে গেছে। রসগোল্লা, সন্দেশ তো দোকানে গেলেই পাওয়া যায়।

কামিনী অবাক হয়ে যায়। এই সুসজ্জিত মেয়েগুলির পাটভাঙা পোশাকের তলায় আছে নাকি ঘরোয়া বাঙালী মেয়ে? আচারের নামে যার জিবে জল আসে, কাশুন্দি দিয়ে শাক মেখে খেতে যে ভালোবাসে, বড়িভাজা যার প্রিয় খাদ্য?

সিঁড়ি দিয়ে গট্‌গট্‌ করে উঠে আসেন একজন ডাক্তার। কামিনী সরে দাঁড়ায়। ডাক্তার ডাকেন নার্স!

: স্যার?

: জমাদারকে মর্গ খুলতে বল। ডেডবডি এসেছে।

: ইয়েস স্যার।

নার্স দুজন তাড়াতাড়ি চলে যায় নিজের নিজের কাজে। কামিনীও অনিমেষের বিছানার দিকে এগিয়ে যায়। অনিমেষ আজ উঠে বসেছে। পিঠের দিকে একটা বালিশ দেওয়া। বলে : অত কি গল্প করছিলেন ওদের সঙ্গে? দেখলাম জানলা দিয়ে।

: জিজ্ঞাসা করছিলাম কবে ছেড়ে দেবে। ওমা জানো কি অসভ্য? আমার কথার উল্টো মানে করে আমাকে দিয়ে বলাতে চায় যে তোমাকে নাকি ওরাই আটকে রেখেছে।

অর্থগ্রহণ হয় না অনিমেষের। বলে : তার মানে?

: মানে মশ্‌করা আর কি!

: তা ভালো। গোরাকে আনলে না যে আজ?

: গোরা তার রাখালদার সাথে ফুটবল খেলা দেখতে গেল।

ঘরোয়া গল্প শুরু হয়ে যায়। কামিনী বলতে থাকে কলোনির কথা। নিতাই ঠাকুর্দার দলের লোকেরা কেমন যত্ন করছে তাকে। এবার থেকে সত্যিকারের দুঃস্থ লোকেরাই শুধু সাহায্য পাবে। কোনও পক্ষপাতিত্ব চলবে না। চালাক দেখি কে পারে? ঠাকুর্দার কাছে চালাকি চলবে না। ও দিকে কি যেন একটা বিরাট কারখানা হবে। তার যন্ত্রপাতি সব আসতে শুরু করেছে। বিরাট পাঁচিল গাঁথা শুরু হয়ে গেছে। রাস্তা ঘাটের কাজ আরম্ভ হয়েছে। ইঁট আসছে ট্রাক বোঝাই। নতুন টিউব-ওয়েলও বসবে অনেকগুলি। অনিমেষ আগ্রহের সঙ্গে সবকথা শোনে।

আবার অনিমেষ বলে এ দিকের গল্প। কালরাত্রে নিমুনিয়া রোগীটি মারা গেছে। ও ধারের বিষ খাওয়া লোকটা কাল খালাস পেয়েছে। তার বিছানায়? এসেছে নতুন একজন। ওর পেটে নাকি পাথর আছে।

কামিনী বলে : পাথর? খেয়ে ফেলেছে বুঝি ভুল করে?

: না গো। ভাত ডালই খেয়েছে—পেটে গিয়ে শুধু পাথর হয়েছে।

: ও মা সে কি, তাই আবার হয় না কি?

: তাই তো বললে নার্সরা। শুধু ভাত ডাল খায় আর পেটে পাথর জমে। অনেক রোগী আসে নাকি

এ রোগের।

কামিনী ভাবে—কই অন্য সকলেও তো ভাত-ডাল খায়—পেটে পাথর তো জমে না। তারপর নিজের মনকে নিজেই প্রবোধ দেয়—তবে আর ভবিতব্য বলেছে কেন?

অনিমেষ অনেক কথা বলতে থাকে। এবার কলোনিতে ফিরে গিয়ে আর সে রিক্সা চালাবে না। এবার সে একটা ঠিকাদারি কাজ জোগাড় করবে। বাড়ি ঘর তৈরি করা শিখবে। রাস্তা বানাবে, নলকূপ বসাবে। নিজে হাতে অবশ্য করবে না। মিস্ত্রি মজুরদের খাটাবে।

কামিনী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। সে শুনছিল বারান্দায় দুটি ওয়ার্ড এ্যাটেন্ডান্টের কথোপকথন।

: কেটে গেছে? একেবারে দু আধখানা?

: না তো বলছি কি? পেট বরাবর চলে গেছে চাকা।

: আহা ষাট ষাট,—কার বাছা গো। মা-বাপ বোধহয় জানেও না এতক্ষণ। কত বড় হবে গো?

: দুধের বাছা। না তো বলছি কি!

কামিনীর মাতৃহৃদয় দুলে ওঠে। অনিমেষকে বলে : বস শুনে আসি। বাইরে এসে জানতে পায়—মর্গে যে মড়াটা এসেছে তার সম্বন্ধেই কথা বলছে ওরা। কামিনী প্রশ্ন করে : কতটুকু ছেলে গো? কাটা পড়ল কি করে?

: দুধের বাছা গো, দুধের বাছা। ট্রেনে কাটা পড়েছে। একেবারে দু-আধখানা।

কামিনী বলে : তবু কত বয়স হবে?

: বছর দশ বারো। উদাম গা। তলার আধখানায় একটা খাঁকি হাফ প্যান্ট রক্তে ভেসে গেছে। ট্রেনে নাকি চানাচুর ফিরি করত। কলোনীর ছেলে।

ট্রেনে চানাচুর ফিরি করত? কলোনীর ছেলে!

মাথার মধ্যে দুলে ওঠে কামিনীর। হাসপাতালটা দুলতে থাকে। পড়ে যায় সে।

: ও মা, এ আবার কি হল গো!

: ভির্মি গেছে—দেখছ না?

একটু পরেই জ্ঞান হয় কামিনীর। মতিদি বলে : হঠাৎ কি হল বলুন তো?

কামিনী ধীরে ধীরে বলে : যে ছেলেটি কাটা গেছে তার নাম কি?

মতিদি বলে : নাম তো পাওয়া যায়নি। এখনও বেওয়ারিস্। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। কেন বলুন তো?

ডুগরে কেঁদে ওঠে কামিনী।

লোক জমে যায়।

নার্স ধমক দেয় : কী ছেলেমানুষী করছেন! আপনার ছেলেকে আমি চিনি। সে তো চার পাঁচ বছরের। এ অন্তত বারো চোদ্দ বছরের ছেলে। ট্রেনে চানাচুর ফিরি করত। হঠাৎ পা ফস্‌কে পড়ে যায়। আপনার কেউ নয়।

কামিনী কাঁদতেই থাকে : আমারই! ও আর কেউ নয়। ও বাবলু! আমার দেওর।

নার্স ওকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যায় নিজের ঘরে। মুখে চোখে জল দেয়। নিজের টুলের উপর বসিয়ে পাখাটা পুরা দমে খুলে দেয়।

: আপনি এ কী শুরু করলেন বলুন তো। কাকে কান নিয়ে গেছে শুনেই কান্না। কে বললে আপনার দেওর?

: সেও যে চানাচুর বিক্রি করে ট্রেনে। বছর এগারো বয়স।

একটু থমকে যায় মতিদি। বলে : ডেডবডি দেখবেন?

কামিনী প্রবলভাবে মাথা নাড়ে : না না, কাটা ছেলে আমি দেখতে পারব না। আমার বাবলুরে!

মতিদি এবার ভাবিত হয়ে পড়ে। হতেও পারে ওর সন্দোহটা ঠিক। বলে : এখানে চুপ করে বসে থাকুন, আসছি।

মতিদি উঠে যায় ডাক্তারকে খবর দিতে। ব্যাপারটা এখন কর্তৃপক্ষকে জানান উচিত। নিজের দায়িত্বে আর রাখা ঠিক না। ডাক্তার সমস্ত শুনে নার্সকে সঙ্গে করে আসেন এ ঘরে। সেখানে কেউ নেই। পাখাটা পুরো দমে ঘুরছে। কামিনী উঠে চলে গেছে। অনিমেষের কাছে যায়নি। হাসপাতালের আশেপাশেও খুঁজে পাওয়া গেল না তাকে। ডাক্তার নার্সকেই ধমক দিলেন : ওকে এ রকম একলা রেখে যাওয়া ঠিক হয়নি আপনার। অতবড় শক্ পেয়েছেন—কোথায় গেল মেয়েটি কে জানে! আবার না নতুন কোনও ফ্যাসাদ বাধে।

মতিদিও নিজের ভুল বোঝে! একলা রেখে যাওয়া কোনক্রমেই উচিত হয়নি।

এ দু-তিনদিন ভূষণ কোনও কাজে মন দিতে পারছিল না। কলকাতার দোকান থেকে খবর এসেছে—সেখানেও যাওয়া দরকার। ধারে কারবার করতে হয় ভূষণকে। তার তাগাদা পত্র আছে। এদিকে কলোনিতে জনপ্রবাহ আসতে শুরু হওয়ায় পরিকল্পনার কাজও ব্যাহত হয়েছে। ঠাকুর্দা কলকাতায় গেছেন—ফেরেননি এখনও। বাগচি সাহেবও অনুপস্থিত। এখানেও ভূষণের অনেক কিছু করণীয় ছিল। ঠাকুর্দার অনুপস্থিতিতে বস্তুত সেই নির্দেশ দিয়ে এসেছে এতদিন গণকল্যাণ সমিতিকে। এবার কিন্তু সে নিজে থেকে যেতে পারল না। ঠাকুর্দা নাকি যাওয়ার সময় নমিতাকেই তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত করে গেছেন। নমিতা তাকে ডেকে পাঠায়নি। যোগেন নায়েব এসে খবরটা জানিয়ে গেছে। নমিতা ভূষণের সাহায্যভিক্ষা করেনি। কেন করবে? ঠাকুর্দার পরিত্যক্ত আসনে উন্নীত হয়ে নমিতা নিশ্চয়ই এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। শুধু দারা-সুজা-ঔরঙ্গজেব আর মুরাদই নয় তাহলে স্বয়ং জাহানারাও সিংহাসনের একজন দাবিদার? যোগেন বলে একদল স্তাবক জুটেছে নাকি নমিতার। মক্ষিরাণী হয়েছেন তিনি!

একবার মনে হয়েছিল ফুৎকারে নমিতাকে সরিয়ে দেয়। এ কী ছেলেমানুষী! এতবড় একটা কলোনির এত হাজার লোকের ভাগ্য কি খেলার জিনিস? ঠাকুর্দা নিজেই রাজনীতির কিছু বোঝেন না—তিনি আবার দিয়ে গেলেন শাসনদণ্ড এমন একটি মেয়ের হাতে মাসখানেক আগে যে ছিল ভাঁড়ারঘরের চতুঃসীমার মধ্যে বন্দিনী নারী। তাও আবার এমন একটি সময়ে দিয়ে গেলেন যখন সমূহ সঙ্কট চলছে কলোনির ভাগ্যাকাশে। ভূষণ জানতো নমিতা চব্বিশ ঘণ্টাও এ দায়িত্ব বইতে পারবে না—তাকে ডেকে পাঠাবে। এ বিপদে ভূষণ ছাড়া আর কাকে ডাকতে পারে সে?

নমিতা কিন্তু তাকে ডাকতে পাঠালো না।

নিজের ঘরেই উস্‌খুস্ করে ভূষণ। এদিকে পিসীমাকেও লতুর ব্যাপারটা জানানো হয়নি। তিনি যথারীতি বিবাহের আয়োজন করে চলেছেন।

পিসীমা এসে বলেন : তুই যে সকাল থেকে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌লি না? ব্যাপার কি?

ভূষণ মনগড়া একটা জবাব দেয় : শরীরটা ভালো নেই।

পিসীমা এসে ওর ললাট স্পর্শ করেন। না, বেশ ঠাণ্ডা। বোধহয় ছেলে লজ্জা পেয়েছে। বয়স হয়েছে তো। বন্ধুবান্ধবেরাও হয়তো পিছনে লাগছে। তাই বাড়ি থেকে বার হয়নি আজ। পিসীর কিন্তু আজ একটু গরজ ছিল, তাই বললেন : শরীর বাপু তোমার ভালোই আছে। আজ একবার বাজারে যেতে হবে। একটু ভালো মাছ আর মিষ্টি আনতে হবে!

: কেন, আজ কি?

: না কিছু নয়, আজ লতুকে আর নমুকে দুপুরে এখানে খেতে বলেছি।

ভূষণ খুশি হয়। এ ভালোই হয়েছে। এই সূত্রে নমিতার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। নমিতা

ঠাকুর্দাপন্থী—ভূষণ উগ্রপন্থী। সে যাই হোক এ বিপদের দিনে সে সরে থাকতে চায় না। নমিতার সমস্ত দায় সে নিজ স্কন্ধে তুলে নিতে চায়,—নিজে যেচে গিয়ে সেটা বলা ভালো দেখায় না। কিন্তু আজ বাদে কাল যাকে ঘরের বধূ করে আনবে এই বিপদের দিনে তার পাশটিতে না দাঁড়ানোও অন্যায়। এই সুযোগে পিসীমাকেও বলে দেওয়া দরকার যে বিয়ে করতে সে পশ্চাৎপদ হবে না, শুধু—

ভূষণ ইতস্তত করে। কি ভাবে কথাটা পাড়বে বুঝতে পারে না! পিসীমা সেটা লক্ষ্য করে বলেন : আমায় কিছু বলবি ভূষণ?

: হ্যাঁ পিসীমা. তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এ বিয়ে আমি করতে পারব না।

পিসীমা যেন আকাশ থেকে পড়েন!

: বলিস্ কি রে? তুই তো এমন অস্থিরমতি ছিলি না।

: তুমি আমাকে না জানিয়ে ওঁদের কথা দিলে কেন?

: তোকে না জানিয়ে? মানে? তুইই তো নিজে থেকে প্রস্তাব করেছিলি নমিতার কাছে।

ভূষণ উত্তেজিত হয়ে বলে : কে বললে?

: কে আবার বলবে? নমিতা বলেছে। লতুও শুনেছে।

: কিন্তু—

: দ্যাখ ভূষণ! আমাকে আর পাগল করে তুলিস না। এতদূর এগিয়ে আসার পর তুই যদি এখন বেঁকে দাঁড়াস—তাহলে সত্যি বলছি গলায় দড়ি দেব আমি—তারপর তোর যা ইচ্ছে হয় করিস তুই—

হন্‌হন্ করে পিসীমা বেরিয়ে যান।

ভূষণ শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবতে থাকে। নমিতা নাকি আজ আসবে এ বাড়ি। ওর অবর্তমানেও নাকি একদিন এসেছিল। আজই সমস্ত ব্যাপারটার চূড়ান্ত মিমাংসা করে ফেলতে হবে। কিন্তু লতুটা যে উপস্থিত থাকবে। ওর সামনে কি করে ব্যাপারটা মেটানো যায় এটা বুঝে উঠতে পারে না।

মিঠু এসে বলে : লতু মামিমা আজ আমাদের বাড়িতে আসবে না মামা? ভূষণ বিরক্ত হয়ে বলে : লতু মামিমা কি? লতুকে তুমি দিদি বলবে।

: না দিদা বলেছে—ও মামিমা হয়।

: না লতুদি।

: বা রে। আমি লতুমামিকে লতুদি বলব কেন? ওতো আমার মামি হয়।

ভূষণ হঠাৎ ঠাস্ করে এক চড় মেরে বসে।

আদরের মিঠুয়া মামার হাতে কখনও মার খায় না। কেঁদে ওঠে সে। ভূষণ স্থির করে আর অগ্রসর হতে দেওয়া নয়। এখনই রান্নাঘরে গিয়ে পিসীমাকে বলে আসা দরকার যে সে লতুকে বিয়ে করতে পারবে না। কিছুতেই নয়। রাজি হলে সে নমিতাকেই গ্রহণ করবে। না হলে যেমন চলছিল সংসার তেমনিই চলুক।

রান্নাঘরের সামনে এসে দেখে পিসীমা নেই। টিউবওয়েল থেকে জল আনতে গেছেন। লতু বসে তরকারি কুট্‌ছে! কাজের বাড়ি,—পিসী একা মানুষ—তাই বোধহয় এই সাত সকালেই নমিতা পাঠিয়ে দিয়েছে বোনকে। একখানা খয়েরি রঙের লালপাড় তাঁতের শাড়ি পরেছে লতু। সদ্য স্নান করেছে। চুলের নিচে একটা গিঁঠ বেঁধে পিঠের উপর ফেলে রেখেছে ভিজা চুল। একটু প্রসাধন করেছে—বেশ বোঝা যায়। কপালে একটা খয়েরের টিপ। সরু করে কাজলপরা চোখ দুটি তুলে ভূষণের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ নিচু করে একাগ্রমনে তরকারি কুটতে লাগল।

ভূষণ বলে : পিসীমা কই?

: জল আনতে গেছেন।

: ও।

ভূষণ ঝাজ্ঞরের থলিটা তুলে নেয়। একবার ভাবে কথাটা লতুকে বললেই বা কেমন হয়? দুদিন আগে হলে ভূষণ হয়তো এ অবস্থায় বলত—'নেমন্তন্নের গন্ধে বুড়ি ঠানদি এই সাত সকালেই এসে জুটেছ? কি নোলা বাপু!' লতুও তৎক্ষণাৎ হয়তো জবাব দিত 'ভাত না ছড়াতেই আজ ভূষণ্ডীকাক রান্নাঘরের কাছে এই সাত সকালেই ঘুরঘুর করছে কেন? হ্যাংলা একেই বলে।'

আজ এ জাতীয় কথোপকথন যেন নিতান্তই অসম্ভব।

মিঠুয়া কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। লতুকে জড়িয়ে ধরে বলে : মামিমা—মামা মেরেছে।

লতু বঁটিটা কাত করে রেখে মিঠুয়াকে কোলে তুলে নেয়।

ভূষণ এক পা এগিয়ে আসে। বলে : তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

লতুর মুখে কে যেন একমুঠি আবীর ছুঁড়ে মারে। লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা ঐ পনের বছরের মেয়েটি কি বুঝল তা সেই জানে। নিচু স্বরে বললে : পাগলামো কর না। পিসীমা এখনই ফিরে আসবেন। মিঠুও জেগে রয়েছে!

বলেই দ্রুতপদে উঠে গেল ঘরে।

ভূষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর ধীরে ধীরে চলে যায় বাজারের দিকে।

ভূষণের উপস্থিতিতে আজ নমিতা প্রথম আসবে ওদের বাড়ি। ঘুরে ঘুরে বাজার থেকে ভালো ভালো জিনিস কেনে ভূষণ। পিসীমার যেমন কাণ্ড। কাল বললে জংশনের বাজার থেকে ভাল জিনিস নিয়ে আসতে পারত। নমিতার সঙ্গে ব্যবহারে ভূষণ তাকে বুঝিয়ে দেবে যে, গণকল্যাণ সমিতির দলাদলির জন্যে তার মনে কোনও রেখাপাত করেনি। হতে পারে সেখানে নমিতা আর ভূষণ ভিন্ন মতাবলম্বী। ভূষণ যোগেন এরা হল নব্যপন্থী। কত ধানে কত চাল তারা বোঝে। ঠাকুর্দা গত শতাব্দীর রাজনীতি আঁকড়ে পড়ে আছেন। গত শতাব্দীই বা কেন ও তো হচ্ছে শ্রীচৈতন্যের থিয়োরি। মেরেছ কলসি কানা! নমিতা ভাগ্যচক্রে ঠাকুর্দার অবর্তমানে উঠে বসেছে তাঁর শূন্য গদিতে। ভূষণ কথাবার্তায় বুঝিয়ে দেবে যে রাজনীতি আর জীবননীতি দুটো পৃথক জিনিস। গণকল্যাণ সমিতির কার্যকরী মিটিং-এ সে নমিতার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করবে ;—কিন্তু সমিতির বাইরে এই বিস্তৃত জীবনের ক্ষেত্রে সেজন্য কোনও ক্ষোভ নেই ভূষণের। সেখানে সে চায় নমিতার হাত ধরে চলতে। নমিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে। একথাটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। তাছাড়া তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, রাজনীতির সঙ্গে সমাজনীতি আর ধর্মকে জড়িয়ে ফেলা মারাত্মক ভুল। সরলতা যদি ধর্মের ভিত্তি হয় তবে শঠতা হবে রাজনীতির মেরুদণ্ড। চাণক্য থেকে চার্চিল সব বিখ্যাত রাজনীতিবিদই একথা প্রমাণ করে গেছেন। গান্ধীজি? তিনি ঐ বুদ্ধ চৈতন্যের দলে—রাজনীতিক তিনি ছিলেন না।

বাজারে বেশ উত্তেজনা। ফ্যাক্টারির ময়দানে না কি গণ্ডগোল হয়েছে। পুলিশ ভ্যান এসেছে। শুনে ভূষণ একটু বিচলিত হয়। পুলিশ এসেছে?

কেন?

বি. ব্লকের হারাণ দেবনাথের ভাইপো নয়ান দেবনাথ বলে : ভ্যান কর‍্যা ঐ রিফুজিদিকে লয়্যা যাবে গা।

হেমেন নন্দীমজুমদার বলে : ও! ছাইলার হাতের মোয়া নয় হে! পুলিশ কইলেই উয়ারা উঠব গাড়িৎ?

: এমনিতে না উঠে ঠেলার নামে উঠ্‌ব।

ভূষণ রীতিমত বিচলিত হয়। নমিতা হয়তো ওখানেই আছে। বাগচি নাই, ঠাকুর্দা নাই, ভূষণ,

যোগেন সবাই সরে দাঁড়িয়েছে। একলা মেয়েটি কি করতে পারে এখন? এ সময়ে সরে দাঁড়ানো অন্যায়। হতে পারে তার সঙ্গে ওর মতের মিল নেই—তবু এ সময়ে যদি ওর পাশে গিয়ে না দাঁড়ায় তবে সে কেমন সহযাত্রী। শুধু উৎসবের দিনে বন্ধুর আয়োজন নয়। দুঃখ রাত্রেই তার প্রয়োজন বেশি। আর আদর্শের ছুতা করে বিপদ থেকে সরে দাঁড়ানো কাপুরুষতা। নমিতা ভাবতে পারে বিপদ দেখে ছুতা করে ওরা সরে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া ঠাকুর্দার ঐ নারায়ণ-সেবা-মার্কা ভাবালুতায় নমিতাকে ভেসে যেতেই বা দেবে কেন ভূষণ? এটা গণতন্ত্রের দেশ। নিজের বিশ্বাস অপরকে বুঝিয়ে নিজের দলে টেনে আনার অধিকার এখানে প্রত্যেকেরই আছে। নমিতা, যে তার জীবনসঙ্গিনী হবে তাকে সে বুঝিয়ে-সুজিয়ে স্বমতে আনতে পারবে না? এত বুদ্ধিমতী নমিতা,—সে বুঝবে না যে ঠাকুর্দার অতিথি-নারায়ণের আদর্শবাদ কলোনির জন্য নয়—ওঁর উচিত বেলুড়মঠে গিয়ে রাজনীতি করা? হঠাৎ দেখা হয়ে গেল নবীন পতিতুণ্ডির সঙ্গে।

: এই যে ভূষণবাবু। আপনি কোন দলে?

: কোন দলে?

: বিতারণ পক্ষে না আমন্ত্রণ পক্ষে?

: মানে?

: শোনেন নি? আপনাদের দলেই যে ভাঙন ধরে গেছে। আপনাদের ঠাকুর্দা নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করছেন। তাতে পরিকল্পনা ভেস্তে যায় যাক। আর যোগেন, কানাই, তাছাড়া আমরা সবাই চাই যে মন করে হক কাজ চালিয়ে যেতে। নমিতাই এখন আপনাদের রাজরানী হয়েছেন। কয়েকজন চ্যাঙড়া স্তাবক তাকে চামর ঢোলাচ্ছে এখন।

কে একজন বলে : আরে নবীনদা আপনি যে মায়ের কাছে মাসির গল্প শুরু করছেন। বিতারণ পক্ষের কাণ্ডারী হচ্ছেন ভূষণবাবু!

এ আলোচনা ভালো লাগছিল না ভূষণের। দ্রুতপদে সে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

পিসীমার রান্না সারা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বেলা একটা বাজে। ভূষণ নিজের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিল। ফ্যাকটারির মাঠে তার যাওয়া হয়নি। সে ভেবেছিল নমিতা এলে খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে একসঙ্গেই যাবে সেখানে। নমিতাকে আগে বোঝাতে হবে পরিস্থিতিটা। না বুঝতে পারার মত জটিল নয় সমস্যাটা। মিঠু খেয়ে দেয়ে মামার পাশে চুপটি করে শুয়ে পড়েছে। কর্মব্যস্ত লতু মাঝে মাঝে ঘরবার করছে। দু একবার চোখাচোখিও হয়েছে ভূষণের সঙ্গে। কথাবার্তা হয়নি আর কিছু। নমিতা এতবেলাতেও আসেনি।

পিসীমা এসে ডাকেন : তুই এবার খেয়ে নে ভূষণ।

: সে কি? আর তোমরা? নমিতা দেবী তো এলেনই না এখনও।

: নমিতা খবর পাঠিয়েছে সে আসতে পারবে না।

: ও! গরিবের বাড়ির নিমন্ত্রণ রাখা বুঝি সম্ভবপর হল না।

পিসীমা ধমক দেন : তোর যেমন কথা। ওর এখন কত কাজ।

: তা তো বটেই। উনি হচ্ছেন গণকল্যাণ সমিতির কর্ণধার, আর আমরা সামান্য কাটা কাপড়ের কারবারি।

গামছাটা কাঁধে ফেলে টিউব-ওয়েলের দিকে পা বাড়ায় ভূষণ।

হরিপদ পণ্ডিত একা বসেছিলেন দাওয়ায়। মনটা ভালো নেই তাঁর। লতু সকালে উঠেই গেছে ভূষণদের বাড়ি। নিমন্ত্রণ আছে তার। নমিতাও বেরিয়ে গেছে সাত সকালে। স্কুলে যায়নি। গেছে গণকল্যাণ সমিতির কাজে। দুপুরেও ফিরবে না—তারও নিমন্ত্রণ আছে ভূষণদের ওখানে। বিন্দুবাসিনী

দুজনের জন্য ভাতে ভাত রাঁধতে বসেছেন রান্নাঘরে। সংসারটা যেন ক্রমশই নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। নমিতাকে এতটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। হাজার হক মেয়েমানুষ। কাল রাত্রে ফিরেছে রীতিমত রাত্রে। আজও ভোরবেলা উঠে বেরিয়ে গেছে।

ঝাপসা চোখের দৃষ্টিতে মনে হল কে যেন বাগানের গেট খুলে ভিতরে আসছে। সচকিত হন বৃদ্ধ। কে এল? লোকটি এগিয়ে এসে বসে পড়ে তাঁর পায়ের কাছে।

: কে?

উত্তর দেয় না কেউ। পায়ের ধূলা নেয়।

বৃদ্ধ হাতটা ধরেন।

: কে লতু? নমু?

জবাব পাওয়া যায় না। তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে লোকটা বলে ওঠে : বাবা!

: কে বৌমা! বৌমা তুমি! এস এস মা—অনু কেমন আছে?

অভিমানে, আশঙ্কায় কামিনী থরথর করে কাঁপতে থাকে! জবাব দিতে পারে না। সে হাসপাতাল থেকে প্রথমে পাগলের মতোই ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি। প্রতিমুহূর্তে মনে হয় পিছন পিছন ছুটে আসছে মতিদি। কোলে তার দলিত পিষ্ট এক খণ্ডিত বালকের ঊর্ধ্বাঙ্গ। মতিদি যেন কেবলই পিছন থেকে প্রশ্ন করে চলেছে : দেখুন তো এই কি আপনার দেওর?

কামিনী ছুটতে থাকে।

কোথায় যাবে সে? হাসপাতাল থেকে শুধু স্টেশনের পথটাই সে চেনে। নিজের অজ্ঞাতসারে অবচেতন মনের নির্দেশে এসে পৌঁছায় স্টেশানে। উত্তরমুখী একটা ট্রেন ছাড়ছে। কলোনির দিকেই যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সে মনস্থির করে ফেলে। সে যাবে তার শ্বশুরের কাছে—সেখানে থাকে বাবলু। হয়তো গিয়ে দেখবে বাবলু বাড়ির সামনে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ড্যাংগুলি খেলছে—অথবা এতটা বেলায় ঘুমিয়ে রয়েছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। মনটা হু হু করে ওঠে তার। ভগবান, বাবলুকে যেন সে দেখতে পায় ও বাড়ি। আর কিছু সে চায় না!

একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে যায় অন্ধের। চিৎকার করে ওঠেন তিনি : কী হয়েছে? কথা বলছ না কেন তুমি?

কামিনীর ঠোঁট দুটি নড়ে ওঠে। কিছু বলতে পারে না।

কামিনীর হাতের উপর দ্রুত হাত বুলাতে বুলাতে বৃদ্ধ বলেন : আঃ! কথা বলছ না কেন তুমি? বৌমা! এটা কি শাঁখা, না প্ল্যাস্টিক?

কামিনী রুদ্ধ কণ্ঠে বলে : উনি ভালো আছেন।

: বালো আছে! আঃ, বাঁচালে তুমি। অনিমেষ ভালো হয়ে গেছে? ওগো শুনছ?

ও পাশ থেকে বেরিয়ে আসেন বিন্দুবাসিনী। তাঁর দু'হাত হরিদ্রারঞ্জিত। কামিনীকে দেখে ভ্রূকুঞ্চিত হয় তাঁর। সেদিনকার সন্ধ্যে বেলার দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়। স্বামীর কাছেও গোপন রেখেছিলেন তিনি সে কথাটা।

: এই দেখ বৌমা এসেছেন। অনু ভালো হয়ে গেছে। আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন।

কামিনী বিন্দুবাসিনীকে প্রণাম করে। উবুড় হয়ে পড়ে পায়ের উপর। বাবলুর কথাটা প্রথমেই প্রশ্ন করতে মন সরে না। বলে : ঠাকুরঝি কোথায়?

: নমু? সে বেরিয়ে গেছে। ফ্যাকটারির মাঠে নাকি পুলিশ এসেছে। সেখানে গেছে।

: আর লতু?

: ভূষণদের বাড়ি গেছে নেমন্তন্ন খেতে।

: আর, আর বাবলু?

: বাবলু?

: আমার বাবলু কোথায়?

: সে তো তুমিই জানো। সে তো তোমার ওখানে থাকে।

: আমার কাছে থাকে? কতদিন এ বাড়ি আসেনি সে?

: কোনদিনই আসেনি। বাবলু তো এখানে নেই।

নেই! বাব্‌লু নেই! আর্তনাদ করে কেঁদে ওঠে কামিনী! পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে বিন্দুবাসিনীর। কি হল? সবাই ছুটে আসে। প্রতিবেশীরাও। কামিনীকে তুলতে গিয়ে দেখে—সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

সমস্ত শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন হরিপদ মাস্টার। ঘরে এসে জমায়েত হয়েছে প্রতিবেশীরা। নানা রকম মন্তব্য।

: খোঁড়ার পাই খানায় পড়ে গো। আহা অন্ধ মানুষের কোলের ছেলেটা।

: দুধের বাছারে ক্যান পাঠান বাপু চানাচুর বিক্রি করনের লগে?

হরিপদ পণ্ডিত শূন্যের দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁর চোয়ালসর্বস্ব গাল বেয়ে ঝরে অঝোর ধারায় অশ্রু। বলেন : বাবলুকে তুমি পাঠাতে চানাচুর ফিরি করতে? আমাদের বলনি কেন?

কামিনী মাথাটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বলে : আমি, আমিই মেরে ফেলেছি বাবলুকে।

কে একজন তাড়াতাড়ি ওকে ধরে তুলতে যায়।

বিন্দুবাসিনী এসে ঝাঁপিয়ে পড়েন। উন্মাদিনীর মত চেহারা হয়েছে তাঁর। কামিনীর কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বলেন : ভরেছে? তোর অভর পেট ভরেছে? রাক্ষসি! তোর ছায়া ছেড়ে পালিয়ে এলাম—তবু কেড়ে নিলি আমার ছেলেকে?

একজন এসে ছাড়িয়ে দেয় ওদের। কামিনী নির্জীবের মতো পড়ে থাকে। প্রতিবাদ করে না। সেই যে মেরে ফেলেছে বাবলুকে!

আর একজন বলে : আরে চানাচুর বিক্রি করে তো কত ছেলে। এ যে আপনাদের বাবলুই তা আগে থেকে ধরে নিচ্ছেন কেন?

হরিপদ বলে : আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাবা। এ বাবলুই। আর কেউ নয়। এ আমার পাপেই হয়েছে। আমার সতী লক্ষ্মী মাকে আমি মিথ্যা সন্দেহ করেছিলাম। সেই পাপেই আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। ওঃ, ভগবান!

ছেলেটি তবু বলে : ও সব বাজে কথা ছেড়ে দিন। চলুন আমার সঙ্গে হাসপাতালে। সেখানে নিজে দেখে যা হয় করুন।

পণ্ডিত বলেন · চলো, শেষকৃত্য তো আমাকেই করতে হবে।

কামিনী ওঠে : আমিও আসব বাবা?

: এস।

বিন্দুবাসিনী এতক্ষণে শয্যা নিয়েছেন। প্রতিবেশিনীরা তাঁর শুশ্রূষায় লেগেছেন। একজন খবর দিতে যায় নমিতাকে ফ্যাক্‌টারির মাঠে। আর একজন যায় ভূষণদের বাড়ি থেকে লতুকে ডেকে আনতে। ছেলেটি বলে : এই রিক্সায় উঠুন। স্টেশনে দিয়ে আসবে।

হরিপদ বলেন : রিক্সা লাগবে না বাবা। আমরা হেঁটেই যাবো। ওই তো স্টেশন। এটুকুর জন্য আর রিক্সা চাই না।

রিক্সা-ওয়ালা ধমক দেয় : আরে চুপ করেন বুড়া কর্তা। ভাড়া দ্যাওন লাগব না আপনার। ওঠেন বৌমারে লয়্যা।

হরিপদ তবুও ইতস্তত করেন।

রিক্সা-ওয়ালা বলে : আরে পাগল হইছেন নাকি আপ্‌নে বুড়াকর্তা? অনিমেষ রিক্সাআলার ভাই—আমি কি ভাড়া লইবার পারি?

হরিপদ পণ্ডিত কামিনীকে নিয়ে রিক্সায় ওঠেন, প্রশ্ন করেন : অনিমেষকে তুমি চেন বুঝি।

: চিনি না, তয় সব রিক্সাআলাই তো সব্বার ভাই। মানেন তো সে কথা। আমার ঘরেও তো ভাই-বুহন আছেন।

রিক্সা চলল রাস্তা দিয়ে। এ রাস্তায় রিক্সা চালানো এখন কঠিন হয়ে উঠেছে। দশফুট চওড়া করে এক বিঘৎ পরিমাণ মাটি কাটা হয়েছে। 'বক্সকাটিং' না কি যেন বলে ওরা। কোথাও আবার তার উপর ইঁট বিছিয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক সেখানে সেই বিছান ইঁটের উপর ছড়িয়ে রেখেছে খোয়ার টুকরা। হু হু করে কাজ করছে লোকগুলো। সরল রাস্তাকে—রিক্সায়ালার্ মতে—দুর্গম করে তুলছে প্রতিমুহূর্তে।

কামিনী কাঁদছিল। নীরব অশ্রুপাত।

পণ্ডিত ওর মাথায় ডান হাতখানা রাখেন। সে স্নেহস্পর্শে থর্‌থর্ করে কেঁপে ওঠে কামিনী।

: কেঁদে মনটা হাল্‌কা করে নিচ্ছ বৌমা? কাঁদ। আমি তো জানি বাবলুকে শুধু গর্ভেই ধরেছিলেন তোমার শাশুরী। ওঃ! এভাবে আমাদের ফাঁকি দিয়ে গেল!

রিক্সায়ালা আবার ধমক্ দেয় : ওই, ওই, আবার ঐ কথা কইতে আছেন?

: এই কথাই যে বল্‌ব বাবা সারাজীবন। এ আমারই পাপের ফল। সংসারের আয় নেই—অথচ বৌমা বাজারের টাকা দিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই। সে অন্ন আমার গলা দিয়ে নামতো না। তারপর, তারপর সে রাত্রে—

কামিনী বলে : থাক্ বাবা।

হরিপদও বলেন : থাক্ মা থাক্। সে রাত্রের ভুল বোঝাবুঝির কথা আর বল্‌ব না আমি। কিন্তু তুমি কেন বল্‌লে না আমাকে ডেকে যে, বাবলুর রোজগারে খাচ্ছিলাম আমরা?

কামিনী চুপ করে থাকে।

হরিপদ মাস্টার মাথা নেড়ে বলেন : না, আমারই ভুল হচ্ছে। তুমি বলতে চেয়েছিলে। আমিই শুনতে চাইনি। না বৌমা?

কামিনী আর্তকণ্ঠে বলে : ও কথা থাক বাবা।

: থামতে তো আমিও চাইনি। কিন্তু পারছি কই? আমার যে প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছে আমার সতীলক্ষ্মী মাকে মিথ্যা সন্দেহ করে বাবলুকে মেরে ফেলেছি আমি। আমি সন্তান হত্যা করেছি!

কামিনী ব্যথাবিধুর কণ্ঠে বলে : না বাবা, আপনি নয়। দুরন্ত অভিমানে আমিই দূরে সরে গিয়েছিলাম। পাপ আমারই—

কথাটা শেষ হয় না, ডুগরে কেঁদে ওঠে আবার।

রিক্সাআলা রিক্সা থামিয়ে নেমে পড়ে। বলে : করেন, আপনারা বিচার করে রায় দ্যান্ তারপর ফিব চালাইবাম।

হরিপদ বলেন : কি হল?

: যে ছেলে মরে নাই—সে কার পাপে মরল স্থির করেন তারপর যাইবাম্।

হরিপদ বলেন : আচ্ছা বাবা আর কোনও কথা বলব না আমরা। আপন মনে গজগজ করতে করতে রিক্সাআলা প্যাডলে বসে।

খাওয়া দাওয়া সেরে ভূষণ এসে আবার শুয়ে পড়ে নিজের বিছানায়। 'ডি'ব্লকের দিক থেকে একটা

ঝিলিত কোলাহল ভেসে আসছে। গণ্ডগোল বেশি হচ্ছে মনে হয। অনাহুতই যাবে নাকি একবাব ভূষণ? সেও তো সমিতিব একজন কার্যকবী সভ্য? তাবও তো একটা দাযিত্ব আছে। ঠাকুর্দা নেই, বাগচি সাহেব দৃটিতে। এত বড দাযিত্বে নমিতাব পাশে গিযে তাব দাঁড়ানো উচিত। নাই বা ডাকলো নমিতা। বিপদেব দিনে না ডাকতে যে পাশে গিযে দাঁড়ায সেই তো বন্ধু। এটা অভিমান কবাব সময নয। বিপদ কেটে গেলে যখন সকলে নমিতাকে অভিনন্দন জানাবে তখন অভিমান কবে সবে থাকাব তবু মানে হয।

আবাব ভাবে ভূষণ—কিন্তু বিপদটা কি স্বখাত-সলিল নয। নমিতা কেন যাচ্ছে ঐ গণ্ডগোলেব মধ্যে মাথা গলাতে? যোগেন, কানাই অথবা সে যা বলেছে সেটাই তো ঠিক কথা। এ সোজা কথাটা বুঝছে না কেন নমিতা? ওদেব জোব কবে উঠিযে না দিলে পবিকল্পনা কিছুতেই সার্থক হতে পাবে না। কলোনিব যদি আর্থিক উন্নতি হতে থাকে, কলোনিবাসিব এই উইটিপিগুলিকে যদি এবাবকাব মতো বাচানো যায দুর্দৈবেব আক্রমণ থেকে—তখন আবও লোককে আমবা স্থান দিতে পাবব। বর্তমান বেকাবদেব যদি কর্মসংস্থান হয তা হলে কলোনীব উন্নতি হবে। ফাঁকা প্লটগুলোয আমবা ডেকে আনতে পাবব ওদেব। আব ওবা যদি সেই সুদিনেব অপেক্ষা না কবে, আজই এখনই এসে আমাদেব জীবনধাবাব পথ বোধ কবে দাঁড়ায তাহলে অতিথি নাবাযণদেব কঠিনভাবে ফিবিযে দিতে হবে। এটা স্বার্থেব কথা নয, মুক্তিব কথা। গোটা দেহটাকে বাঁচাতে যেমন পচনশীল একটা অঙ্গকে কেটে বাদ দেন সার্জেন, এ তেমনিই। দেশেব মুক্তি, জাতিব মুক্তিব জন্যে আপাত নিষ্ঠুব আদেশ দেন সেনাপতি। বণাঙ্গনে একদল প্রাণ দিতে ছোটে,—আব একদল তাব ফলভোগ কবে উত্তবকালে। যুদ্ধ থেমে যায, গৃহাগত সৈনিকদেব তখন আবাব ঠাঁই হয গ্রামে নগবে। নেতাকে হতে হবে দূবদর্শী। তিনি শুধু বর্তমানেব কথাই ভাববেন না। সেন্টিমেন্টেব উর্ধ্বে উঠবেন তিনি। তাঁকে হতে হবে ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য জাহ্নবীব ভগীবথ। তাঁব দাযিত্ব অনেক। ঠাকুর্দা সেন্টিমেন্টাল হতে পাবেন, নমিতা তাঁব অন্ধ অনুসাবী হতে পাবে—তবু সমগ্র কলোনিব লোকে যা চাইছে তাই মঙ্গলেব পথ। ভূষণ যদি এখন গিযে দাঁড়াযও নমিতাব পাশে সে কেমন কবে সাহায্য কববে তাকে? নৈতিক সমর্থন তো সে দিতে পাববে না।

এবং সেটা জানে বলেই তাকে নমিতা ডাকেনি—ভাবে ভূষণ। ঐ মেযেটি ভালোভাবেই জানে যে, ভূষণ প্র্যাক্‌টিকাল মানুষ। দুর্ভিক্ষপীডিত নিরুপায নিবন্ন নবাগত লোকগুলোব প্রতি যতই সহানুভূতি থাক ভূষণেব—সমগ্র কলোনিব বৃহত্তব উন্নযন প্রচেষ্টায় ওবা এখন বাধারূপে উপস্থিত। সমূলে ওদেব উৎপাটিত কবতে ভূষণ কুণ্ঠিত হবে না। এখানে সে বিচাবকেব মতই অনম্র, বজ্রসুকঠিন। তাব এ পবিচয অন্তত নমিতা জানে। তাই সে ডাকেনি ওকে।

হঠাৎ পাযেব কাছে একটা সুবসুবি লাগায় ভূষণ উঠে বসে। লক্ষ্য কবে লতু এসে ওব পাযেব কাছে নিবেদন কবছে একটা সলজ্জ প্রণাম।

একি? হঠাৎ কি হল?

ওকে হাত ধবে তুলতে গিযে লক্ষ্য কবল একটি জিনিস।

লতুব দু'হাতে দুটো মকব-মুখো বালা।

এটা চিনতে কষ্ট হয না। এ বালা শৈশবে দেখেছে সে মাযেব হাতে। এ বংশেব মাঙ্গলিক অলঙ্কাব।

আমাকে আর্শীবাদ কবলে না?

আশীবাদ। ও, হ্যাঁ কবলাম বই কি।

মিঠু একটু বেকাযদায শুযে ছিল। লতু তাকে সবিযে ঠিক কবে শুইযে দিল। মাথাব নিচে বালিশটা টেনে দেয। তাবপব পানেব বাটাটা এগিযে দিল ভূষণেব দিকে। লতুবও খাওযা হযে গেছে। নিজে এক খিলি পান তুলে নিল মুখে। একবাব কৌতুকদীপ্ত চোখে ভূষণেব দিকে তাকিযে বলে কী গোপন কথা বল্‌বে বলছিলে তখন?

প্রশ্নটা করে মাটির দিকে তাকিয়েই।

ভূষণ জবাব দিতে পারে না।

হঠাৎ হেসে ফেলে লতু। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে : তুমি কী গো? বিয়ে না হতেই গোপন কথা শোনাবে?

বলেই ছোটে দরজার দিকে।

ভূষণ ডাকে—লতু শোন।

ভুলটা এখনই ভেঙ্গে দিতে চায়। এ কী অত্যাচার। এ মেয়েটা কেন ধরে নিয়েছে যে ঐ একফোঁটা লতিকাসুন্দরীর জন্যে ভূষণের প্রেম একেবারে উৎলে উঠেছে!

দ্বারের কাছ থেকে লতু বলে : ঈস্। আমি তোমার বিয়ে করা বৌ নাকি? দুপুর বেলায় বন্ধ ঘরে ডাকছ যে আমায়? শুনব না আমি।

পিসীমা হঠাৎ বাইরে থেকে ডাকেন : ভূষণ!

: কি পিসী?

: বন্দুকের আওয়াজ না?

তাই তো! দু দুবার ফায়ার হল! পর পর। তারপর একটা মিলিত কোলাহল ভেসে আসছে 'ডি ব্লকের দিক থেকেই।

এক লাফে উঠে পড়ে ভূষণ! পাঞ্জাবিটা তুলে নেয় আলনা থেকে। লতু ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ওকে : না, আমি যেতে দেব না। ওখানে গুলি চলছে।

: কী ছেলেমানুষী করছ লতু? তোমার দিদি রয়েছে ওখানে।

: না নেই। তুমি যেও না। দিদি নিশ্চয়ই পালিয়ে আসবে।

: তোমার দিদি পালিয়ে যাবার মেয়ে নয় লতু। তোমার চেয়ে তাকে বেশি চিনি আমি। ভয়টা আমার সে জন্যেই। ছাড় আমাকে।

জোর করে লতুর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ছুটে বেরিয়ে যায়। পিসীমা পিছন থেকে ডাকেন : ভূষণ, শোন, যাস্‌নে!

এখনই ফিরে আসছি আমি।

আপ্রাণ প্রচেষ্টাতেও দুর্দৈবকে নমিতা ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। ঠাকুর্দা নেই, বাগচি-সাহেব ছুটিতে,—যোগেন, কানাই প্রভৃতি প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করছে। ভূষণবাবু বিরোধী পক্ষের পাণ্ডা। সমস্ত কলোনিবাসী চাইছে এই লোকগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে। এই ব্যাপারে, আশ্চর্য, ভূষণবাবুর দল হাত মিলিয়েছে বিষ্টুপদ গোকুল নবীনের সঙ্গেও। কলোনির কর্তৃপক্ষও ওদের সরিয়ে দেওয়াই মনস্থ করেছেন। বাগচি-সাহেবের অনুপস্থিতিতে যতীশবাবু অফিসিয়েট করছেন। তিনি খবর পাঠিয়ে পুলিশ ভ্যান আনিয়েছেন। মারামারি গণ্ডগোল হলে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করবে তারা। বিষ্টুপদ নবীন যোগেন কানাই গোকুল হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। বেসরকারি লরি জোগাড় হয়েছে খান কয়েক। বিতারণপর্ব চলেছে নির্বিবাদে।

মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে ঠাকুর্দার বৈঠকখানায় নমিতা গুমরে মরছিল আপন মনে। এদের স্থানান্তরিত করা উচিত কি অনুচিত এটা সে ভেবে দেখেনি। সে যে নিতাই ঠাকুর্দার আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারছে না এটাই তার ক্ষোভ। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ঠাকুর্দার একটা গঠনমূলক পরিকল্পনা নিশ্চয়ই আছে। এ লোকগুলোকে তিনি কলোনিতে রাখতে চান। তার মানে এ নয় যে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাক্। উন্নয়ন পরিকল্পনা যদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তবে সেটা নিতাই ঠাকুর্দাকেই যে সবচেয়ে আঘাত করবে—এ

বিষয়ে নমিতার তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু একা সে কী করতে পারে?

ঠিক এই সময়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন হেডমিস্ট্রেস সুরেখা দেবী।

: ভেঙে পড়লে তো চলবে না নমিতা। আমাদের বাধা দিতে হবে। ঠাকুর্দা যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ যাতে একটি লোকও স্থানত্যাগ না করে তা আমাদের দেখতে হবে। দরকার হয় আমরা পিকেটিং করব।

: আপনিও? কিন্তু আপনি যে সরকারী চাকুরে—

: বাজে তর্ক কর না। এস আমার সঙ্গে—

ওরা দুজনে গিয়ে দেখা করে ইঞ্জিনিয়ার বীরেন মৈত্রের সঙ্গে।

মৈত্রসাহেব বলেন : আপনারা দুজনে আর কি বাধা দেবেন? বাধ্য হয়ে দারোগা আপনাদের অ্যারেষ্ট করবে। জনসাধারণ তো দূরের কথা গণকল্যান সমিতিও যখন আপনাদের পিছনে নেই, তখন, কিছু মনে করবেন না আপনারা—এটা নেহাৎই ছেলেমানুষি হবে।

ওরা দুজনে ফিরে আসে। কথাটা মিথ্যা নয়। তবু নমিতার ইচ্ছা নৈতিক আপত্তি জানাতেও ওদের দুজনের যাওয়া উচিত। যে লোকগুলি এখানে এসেছিল, যাদের জোর করে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তারা জানুক, তারা বুঝুক যে কলোনিতে অন্তত দুজন লোকও ছিল যারা চেয়েছিল তাদের স্থান দিতে।

হঠাৎ ছুটে আসে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক। ওদের সঙ্গে রয়েছে কানাই বাচ্চু রাখাল। প্রমোদ বলে : নমিতাদি খবর শুনেছেন?

: কি?

: রিফুজিদের সরাবার জন্যে যে লরিগুলি এসেছে সেগুলো জংশন থেকে ভাড়া করে এনেছে বিষ্টুপদ আর গোকুল। একলরি লোক পাঠানো হয়ে গেছে। ওরা দাঁড়িয়ে থেকে লোক বোঝাই করাচ্ছে।

সুরেখা দেবী বলেন : এ খবরে তো আপনাদের উল্লসিত হওয়ার কথা প্রমোদবাবু। আপনারাই তো চাইছিলেন ওদের পত্রপাঠ বিদায় করতে।

রাখাল বলে : কিন্তু ভেতরে যে এই ষড়যন্ত্র চলছে তা জানব কি করে?

: ষড়যন্ত্র?

কানাই বলে : আসল কথাটা খুলে বল। ওঁরা বোধ হয় এখনও কিছু জানেন না।

প্রমোদ পাল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে।

রাস্তার কাজে জনা কুড়িক গ্রুপ কাজ করছিল এতদিন। এবার বড় তিনটে কাজের স্যাংশান এসে যাওয়ায় মৈত্রসাহেব নতুন গ্রুপলীডারের নাম চেয়ে পাঠান বাগচি সাহেবের অফিসে। অর্থাৎ যে কাজ কোয়াপারেটিভের মাধ্যম করাতে চেয়েছিলেন নিতাইপদ। ইতিমধ্যে বাগচি সাহেব ছুটিতে যাওয়ায় যতীশবাবু পত্রের উত্তর দেন মৈত্রকে। তিনি তিনটি কাজের জন্য তিনটি নাম পাঠিয়েছেন। তাদের আর্থিক সঙ্গতির উল্লেখও করেছেন। মৈত্র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী ক্যাম্প অফিসের নির্বাচিত গ্রুপলীডার তিনজনকে তিনটি কাজ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রডাকশন সেণ্টার বানাবেন শ্রীবিষ্টুপদ মজুমদার, ফ্যাকটারিটা তৈরি করবেন শ্রীগোকুলদাস ;— আর ইটখোলার কন্ট্রাক্ট শ্রীনবীন পতিতুণ্ডির!

আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে নমিতার। সে আবার ফিরে যায় বীরেনবাবুর অফিসে। তাঁকে বুঝিয়ে বলতে চায় সব কথা। বীরেনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন : একজন কাজ পেলেই অন্য একজন বলে অন্যায়

করা হয়েছে। আপনারা যদি কেউ পেতেন—ওরাও এসে বলত অন্যায় হয়েছে। আমি ইঞ্জিনিয়ার, কাজ করতে এসেছি। আপনাদের দলাদলির মধ্যে আমি নেই।

নমিতা বলে : কিন্তু ঐ বিষ্টুপদ, নবীন আর গোকুলবাবু কি বেকার? না অন্নাভাবে ওদের পরিবার না খেতে পেয়ে মরছে?

মৈত্র বলেন : আপনি খামকা রাগ করছেন মিস্ চক্রবর্তী। আমি রিলিফ ডিপার্টমেন্টের লোক নই। আমার কাছে নবীন প্রাচীন, কেষ্ট-বিষ্টু সব সমান। কে অর্থবান আর কে বেকার তার আমি কি জানি?

: তা হলে কিছু না জেনে কাজ ডিস্ট্রিবিউট করলেন কেন? আপনি জানেন না, কিন্তু আমরা তো জানি। আপনার উচিত ছিল আমাদের জিজ্ঞাসা করা।

: আমার কি উচিত ছিল তা আপনার সঙ্গে আলোচনা না করলেও চলবে। গণকল্যাণ আর গণনাশন সমিতিকে আমার চেনার কথা নয়। আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের অফিস থেকে নাম পেয়ে কাজ দিয়েছি।

: আমি কি তাহলে ধরে নেব—এ ষড়যন্ত্রে আপনিও লিপ্ত আছেন?

বীরেন মৈত্র পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার তাকিয়ে বলেন : ষড়যন্ত্রটা আপনি কোথায় দেখলেন জানি না ; কিন্তু সে যাই হক, কোনও কাজের কথা যদি আপনাদের বলার না থাকে তাহলে আসতে পারেন। আমার ইন্টিগ্রিটি সম্বন্ধে আমারই ভিজিটার্স চেয়ারে বসা একটি মহিলার সঙ্গে আমি আলোচনা করব—এটা আপনি একটু বেশি আশা করছেন মিস্ চক্রবর্তী।

: বেশ আমরা চলে যাচ্ছি। কিন্তু এর ফল ভাল হবে না মিস্টার মৈত্র।

বীরেনবাবু একটু হাসলেন : কলোনির কাজে দলাদলি থাকবেই। এটা জেনেই আমি কাজে নেমেছি। দলাদলি করুন—ওটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ কিন্তু একটা জিনিস আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন আপনারা? যারা কাজ পেয়েছে হতে পারে তারা আপনাদের বিপক্ষ শিবিরের লোক ; কিন্তু ওরাও এমন কিছু বড়লোক নয়। ওরাও কলোনিবাসী। ওরা কাজ করে যদি পেমেন্ট পায় তবে সে-টাকা কলোনিতেই থাকবে। এত আপত্তিই বা কিসের?

: কেন আপত্তি শুনবেন? দুদিন পরে আমরা বলতে আসব পাঁচজন কাজ করছে আর পঁচিশজনের হিসাব দেওয়া হচ্ছে। কলোনির বাইরে থেকে অল্পমজুরির মিস্ত্রি মজুর এনে কাজ করানো হচ্ছে অথচ হিসাবে দেখানো হচ্ছে কলোনির লোকের নাম। ভুল হিসাব দাখিল করে, সই জাল করে ওরা তিনজনে টাকা আত্মসাৎ করছেন। আপনারা তদন্ত করতে আসবেন। আমরা পাঁচজন সাক্ষী হাজির করলে ওঁরা দশজন ভাড়া করা সাক্ষী হাজির করবেন। আমাদের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। আপনারা ফলাও করে খবরের কাগজে ছাপবেন—উদয়নগর কলোনিতে এত লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে, এত হাজার লোক কর্মসংস্থান করছে—অথচ কলোনির সত্যিকারের অর্থহীনেরা অনশনে মরতেই থাকবে। বেকার আত্মহত্যা করবে। স্ফীত হবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। এ আমরা আগেও হতে দেখছি—এবারও দেখব!

বীরেনবাবু বলেন : বেশ তো, সে রকম অন্যায় যদি হতে দেখেন তাহলে অভিযোগ জানাবেন। বিচারের প্রহসন হবে এটাই বা ধরে নিচ্ছেন কেন?

: এই তো অভিযোগ করছি। যতীশবাবু যে তিনজন লোকের নাম আপনার কাছে দিয়েছেন ওঁরা ছিলেন আগেকার কমিটির লোক—নানান অভিযোগ আছে আমাদের—ওঁদের বিরুদ্ধে। আপনি নতুন লোক তাই আমাদের এতকথা কিছুই জানেন না।

: অর্থাৎ আপনার মতে—একমাত্র গণকল্যাণ সমিতিই সততার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। রিলিফ অফিস আর ইঞ্জিনিয়ারের অফিসের সবাই চোর—তারা সৎ লোকের বিরুদ্ধে শুধু ষড়যন্ত্রই করছে,—কেমন? কিন্তু বলতে পারেন এতে আমাদের স্বার্থটা কি?

: খুব পারি। যতীশবাবুরা চায় না যে আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখি। ক্যাশ্-ডোল আর স্টারভেশন্ ডোলের ডামাডোলে তাদের সুযোগ-সুবিধা বেশি। উদ্বাস্তুদের সত্যিকারের পুনর্বসতি হলে তাঁদের চাকরিই থাকবে না—চোরাই কারবার চালানো তো দূরের কথা। আর আপনারা? আপনারা পয়সা-ওয়ালা বড় লোক ঠিকাদার দিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত। তাতে আপনাদের কি কি সুবিধা হয় সে কথা প্রকাশ্যে না বলাই ভালো—তবে কারণটা আপনি জানেন আমাদেরও বুঝতে কিছু বাকি নেই মিস্টার মৈত্র!

মৈত্র সাহেব কি একটা জবাব দিতে যান, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ কানাই ঘরে ঢুকে বলে : নমিতাদি শীগ্‌গির আসুন। ওখানে বোধহয় গণ্ডগোল বেধেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

পর পর দুবার।

ওরা ছুটে বেরিয়ে এল। কে একজন বললে : নমিতাদি আপনি এখনই বাড়ি চলে যান। আপনার মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। বাড়িতে ডাকছে।

নমিতা একটু থেমে পড়ে। বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা। খামোখা বিন্দুবাসিনীর অজ্ঞান হয়ে পড়ার কোনও কারণ নেই। এখানে গুলি চলছে বলে বোধহয় ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নেবার কৌশল করেছেন।

ছেলেটিকে বলে : তুমি বাড়ি যাও ভাই। মাকে একটু দেখ। আমি এখনই আসছি।

কানাই এগিয়ে গিয়েছিল, বলে : কি হল নমিতাদি? দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? আসুন শীগ্‌গির।

: এই যে আসছি।

দু'ব্যাচ লোককে জোর করে লরিতে চাপিয়ে পাঠানো হয়েছে পি. এল. ক্যাম্পের উদ্দেশে। লোকগুলো প্রতিবাদ করবার ভরসা পায়নি। ইউনিফর্ম পরা বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে স্বয়ং দারোগা সাহেব উপস্থিত। তাছাড়া এই কলোনির একজন লোকও চায় না ওদের এখানে রাখতে। কি আর করা যায়? ওরা বিনা প্রতিবাদে গাড়িতে ওঠে। যাবে, পি. এল. কাম্পেই যাবে ওরা। তৃতীয় ট্রিপ লোক বোঝাই দেবার সময় বাধলো গণ্ডগোল।

ইতিমধ্যে খবর রটে গিয়েছিল কাজ পেয়েছে বিষ্টুপদ, গোকুল আর পতিতুণ্ডির দল। তাই ওদের এত উৎসাহ। সে জন্যেই এ লোকগুলিকে কুকুর বেড়ালের মত গাড়ি বোঝাই করে পাঠান হচ্ছে তাড়াতাড়ি। না হলে কাজ শুরু করতে পারছে না ওরা।

মুখে মুখে রটে গেল কথাটা। গণকল্যাণ সমিতির ছেলেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেছে। বেকার যুবকেরা নাম লিখিয়েছে। আশা করেছিল স্বাভাবিকভাবে কাজ শুরু হলে তাদের ডাক পড়বে। নিতাই ঠাকুর্দার দলের অধীনে কাজ করলে আর যাই হোক সুবিচার পাবে। মজুরি করে হাজিরাও পাবে। হঠাৎ এ খবরটায় ওদের সে আশা যেন নির্মূল হল। এ কী অত্যাচার! যে লোকগুলো চুরি জুয়াচুরি করে এতদিন সর্বনাশ করে এসেছে কলোনির তারাই আবার কাজ পাবে?

: দেব না ওদের কাজ করতে।

: বন্ধ থাক্ কাজ। যতদিন না ঠাকুর্দা ফেরে, বাগচিসাহেব জয়েন করে।

একদল উৎসাহী যুবক গিয়ে চড়াও হল অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের অফিসে। ঘেরাও করল অফিস। উত্তেজিত জনতা মারমুখী হয়ে উঠেছে।

: কই মশাই গ্রুপ-লীডার রেকমেণ্ড করনেওয়ালা—একটু বেরিয়ে আসুন তো।

যতীশবাবু জানলা দিয়ে একবার উঁকি মেরেই ব্যাপারটা অনুধাবন করে নেন। চট করে বাথরুমে

ঢুকে পড়েন এবং ভিতর থেকে বন্ধ করে দেন।

: যতীশবাবুকে ডেকে দেন না মশাই. ঘরের বাইরে আসুন উনি। আমরা দেখা করতে চাই।

যতীশবাবু ততক্ষণে বাথরুমের ওদিককার দ্বার খুলে বেরিয়ে গেছেন। মৃণাল আর মিহির বেরিয়ে আসে।

: কেন ঝামেলা করছেন অফিসের সামনে? কি চাই আপনাদের?

: যতীশবাবুকে চাই।

যতীশবাবুকে পাওয়া গেল না অফিসে।

একদল গেল তাঁর বাড়ির দিকে। একদল গেল স্টেশনে।

মৃণাল মিহিরকে বললে : ঘেন্না ধরে গেল ভাই। বিয়ে যদি না করতাম—তোমায় বল্‌ছি মিহির চাকরির মাথায় লাথি মেরে বাড়ি চলে যেতাম।

মিহির বললে—সেটা তো কঠিন নয়। এর ভেতর থেকে যদি সততার সঙ্গে কাজ করতে পার তবেই না ক্ষমতা। কর্তাতো ভেগেছেন। একবার যাবে নাকি ফ্যাকটারির মাঠে?

মৃণাল ইতস্তত করছিল। হঠাৎ ঐ দিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ ভেসে আসায় উঠে পড়ে। দুজনে বেরিয়ে আসে অফিস থেকে।

জনতা চলেছে ফ্যাকটারির মাঠে। অর্ধদণ্ড আগে যারা বলছিল—'হাঠাও বখেড়া, তাড়াও ঐ নতুন লোকগুলোকে', তারাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ভাঁটার টানের মুখে হঠাৎ এসে পড়েছে কোটালের বান।

একদল উৎসাহী বেকার যুবক এসে সমবেত হল ময়দানে। সেখানে পূর্বেই উপস্থিত ছিল যোগেন তার কয়েকটি অনুচর নিয়ে। নিরুদ্ধ আক্রোশে ফুলছিল যোগেন। ঠাকুর্দা নেই। ভূষণ বিপদের সময় সরে দাঁড়ালো! কলোনিকে নেতৃত্ব দেবার একটা লোক নেই এই অসময়ে। দলটা এসে যোগেনেই কাছেই সুবিচার দাবী করল। এ অত্যাচার হতে দেব না! যোগেন মুহূর্তে এগিয়ে এল নেতৃত্ব দিতে। সে নিজেই তুলে নিল দলপতির ঝাণ্ডা! সতীশের চায়ের দোকান থেকে একখানা টিনের চেয়ার টেনে এনে তার উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিল—

: বন্ধুগণ—

মিনিট কয়েক পরে ওদের দলটা এসে পৌঁছালো যেখানে মানুষগুলোকে লরিতে বোঝাই দেওয়া হচ্ছে সেখানে। ইতিমধ্যে লোকসংখ্যা আরও বেড়েছে ওদের দলে। বেড়েছে উদ্দীপনা আর অসন্তোষ মানব না এ অত্যাচার!

ওরা বাধা দিল।

দারোগাবাবু এসে ওদের সতর্ক করে দিলেন। সরকারি কাজে বাধা দিলে তিনি বাধ্য হয়ে অ্যারেস্ট করবেন এদের।

যোগেন জবাবে শুধু বললে'—ইনক্লাব—!'

পাদপূরণটা জানা আছে সকলের। ধ্বনিত হল সেটা।

ওরা ঘিরে দাঁড়ালো লরিখানাকে।

: দেব না ওদের সরিয়ে নিতে।

দারোগা জনতাকে বে-আইনি ঘোষণা করলেন। চলে যেতে বললেন। ওরা জবাবে একই কথা বললে আবার '—ইনক্লাব!'

দারোগা সশস্ত্র পুলিশদের কি যেন হুকুম দিলেন।

বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। পর পর দুবার।

বন্দুকের মুখ উর্ধ্ব আকাশের দিকে! আঘাত করা ইচ্ছা নয়। এ বোধহয় একটা চরমতম সাবধান

বাণী। অর্থাৎ প্রয়োজন হলে বন্দুকও চালান হবে।

বিষ্টুপদ দারোগাবাবুর কানের কাছে এসে বলে : লাঠি চার্জ করেন ছার। আর ঐ হালা জগারে অ্যারেস্ট করেন।

দারোগা একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন : আপনি কে মশাই? বেশি বাজে কথা বলবেন না—চালান দেব আপনাকেই।

বিষ্টুপদ ঘাবড়ে যায়। এ বেটা তাঁকে চেনে না নাকি।

লোকগুলো ফাঁকা আওয়াজে ভয় পায় না।

নিরুপায় উদ্বাস্তুগুলোও সাহস পেয়ে ফিরে দাঁড়ায়। যাদের ওঠানো হয়েছিল গাড়িতে তাদের কয়েকজন ফের ঝুপঝাপ করে নেমে পড়ে। বিষ্টুপদর দলের কয়েকজন ছুটে গিয়ে পাকড়াও করে ওদের।

যোগেনদের দলের কয়েকজন গিয়ে বাধা দেয়। ফলে হাতা হাতি শুরু হয়ে যায়।

নমিতারা পৌঁছে গেল ঠিক সেই মুহূর্তেই।

দারোগা হুইসিল বাজালেন। সব কটি পুলিশ একত্র হল নিমেষে।

বিষ্টুপদ, গোকুল জানত এ জাতীয় ব্যাপার ঘটতে পারে। সব রকম বন্দোবস্ত করে রেখেছিল ওরা। বেশ কয়েকঝুড়ি ঝামা খোয়া গাদা করে রেখেছিল এক কোণে। ঠিকাদারী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আদলাঝামা-ব্যাটের এ উপকারিতাটা অজ্ঞাত ছিল না।

এক ঝাঁক ঢিল এসে পড়ল কোথা থেকে।

কানাই আহত হল, দারোগা সাহেবের কপালে এসে লাগলো একটা। বাঁ হাত দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে বসে পড়লেন তিনি।

একজন সাব ইন্সপেক্টর এসে তাঁকে ধরতেই পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন। ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত পড়ছে খাঁকি সার্টের উপর।

লাঠি চার্জ করবার হুকুম দিলেন তিনি। বে-আইনি জন সমাবেশ ভেঙে দিতে বললেন।

ওদিকে যষ্টিবর্ষণ তার আগেই শুরু হয়ে গেছে। বিষ্টুপদর ভাড়াটে গুণ্ডার দল এলোপাতাড়ি মারতে শুরু করে দিয়েছে যোগেন নায়েকের দলটাকে। এরা নিরস্ত্র এসেছিল বস্তুত মার খেয়ে পেছুতে লাগলো।

পুলিশের এক ঝাঁক লাঠি পড়ল।

ছুটে পালাচ্ছে সবাই। কঙ্কালসার উদ্বাস্তুগুলো এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না মোটেই। বুড়োবাচ্ছা সামলে দাপাদাপি করছে সারা মাঠ ময়। যোগেনের কাঁধে লাগলো একটা লাঠি! পড়লো সে ঘুরে।

পুলিশের উঠ্‌ল লাঠি। বিষ্টুপদর ভাড়া করা একটা লোক।

আবার উঠ্‌ল লাঠি। সামনে একজন বৃদ্ধা উদ্বাস্তু!

দু হাত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে চীৎকার করে উঠ্‌ল সে ভয়ে। গগন বিদীর্ণ করা সে আর্তনাদে নমিতা আত্মহারা হয়ে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই যষ্টিবর্ষণের মধ্যে। ঠেলে ফেলে দিল বৃদ্ধাকে সবলে। বেঁচে গেল বুড়িটা।

লাঠিখানা সজোরে নামলো নমিতার মাথায়! খোঁপা সমতে মাথার পিছন দিকটা নেমে এল।

নমিতা পড়লো মাটিতে।

যোগেনের পাশেই!

হরিপদমাস্টার মশাই যখন গিয়ে পৌঁছলেন জংশনের হাসপাতালে তখন মৃতদেহকে দাহ করবার জন্য দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কলোনির রিকসাআলা কিন্তু সঙ্গে এসেছে। একা ছেড়ে দেয়নি অন্ধকে

পুত্রবধূর সঙ্গে। রিক্শাখানা রেখে এসেছে উদয়নগর স্টেশনে একজন জানা লোকের জিম্মায়। মৃত ছেলেটিকে সনাক্ত করা হয়েছে। তার তিনকূলে কেউ নেই। আছে এক বুড়ো কাকা। এসেছেন তিনি। উদয়নগর কলোনিরই একজন বাসিন্দা। মৃতদেহকে বয়ে নিয়ে আসছে মর্টন, হাতকাটাতেল, তানসেনগুলি প্রভৃতি। বাবলুও এসেছে। বৌদিকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল না। সজল চোখ দুটি তুলে বললে : মশলামুড়ি কাটা পড়েছে বৌদি।

কামিনী ওকে টেনে নেয় নিজের কোলে। হরিপদ মাস্টার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন একটা। বাবলুর সর্বাঙ্গে ধুলো, বালি ময়লা। চিম্‌টি দিলে ময়লা উঠে আসে। খালি গা। প্যান্টটা এককালে খাঁকি ছিল এখন চেনা যায় না এতো কালো। রুক্ষ চুল, শুক্‌নো মুখ।

কামিনী বলে : তুই আজকাল চানাচুর বিক্রি করিস না?

: না, কে ভেজে দেবে?

: তবে কি করিস আজকাল? বাড়িতে থাকিস না যে?

: কয়লা বাছি।

উদ্যোগী সিংহশাবক বাবলু। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' মন্ত্র তার। যে বয়সে ওর বাপ দাদারা অঙ্ক ইংরাজি শিখেছে—সে বয়সেই ওকে শিখতে হয়েছে উপার্জন। বিনা মূলধনের ব্যবসায় এ বাজারে প্রায় অসম্ভব ; কিন্তু অসম্ভবকে জয় করতেই ওর তারুণ্যের অভিযান। খুঁজে খুঁজে তেমনি একটা ব্যবসা বার করেছে সে। জংশন স্টেশনে ইয়ার্ডে গিয়ে ইঞ্জিনের রাবিশ্ থেকে বেছে বেছে আধঃপোড়া কয়লা উদ্ধার করে। পোড়া ছাইয়ের স্তূপ থেকে কয়লার টুকরা খুঁজে বার করা আর হীরকখনিতে কয়লার স্তূপ থেকে হীরকখণ্ড বেছে বার করার মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। অন্তত পরিশ্রমের দিক থেকে, ধৈর্যের মাপকাঠিতে, অধ্যবসায়ের নিক্তিতে। তারপর ঝুড়ি করে বেচে দিয়ে আসে বাজারের দোকানে। বৌদি যদি চানাচুর নাই ভেজে দেয়—তাই বলে কি হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে হবে? বাবা মাকে মানুষ করার দায়িত্ব আছে না? দাদার অসুখ সারিয়ে তুলতে হবে না? ওর বলবার ভঙ্গি দেখে এত দুঃখেও হাসে কামিনী। বলে : থাকিস কোথায়? খাস্ কি?

: থাকি ঐ ইয়ার্ডেই। খাই যা পাই। কত টাকা জমেছে জানো? আঠারো টাকা! পঞ্চাশ টাকা জমলেই আমি ফিরে যাব কলোনিতে। তখন আর আলাদা থাকতে হবে না বাবা মাকে। সেখানে দোকান খুলব আমি।

হরিপদ মাস্টার হঠাৎ টেনে নেন বাবলুকে! ধুলাবালি মাথা ছেলেটাকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে শিরশ্চুম্বন করেন পণ্ডিত। বাবলুর সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা ছিল তাঁর। তিরস্কার করেছেন, মেরেছেন, শাসন করেছেন এই ঘরপালানো ছেলেটিকে। সংসারের কোনও কাজ করে না, পড়াশুনায় মন নেই এ জন্য মনে মনে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ একলব্যের মতো একক সাধনরত শিশুটির অন্য এক রূপ ফুটে উঠেছে অন্ধের দৃষ্টি-সম্মুখে। কয়লার গুড়ার মলিন তার সর্বাঙ্গ কিন্তু তার সাধনা, তার তপস্যা একনিষ্ঠ, অমলিন!

মর্টনদা ওকে ডাকে : বাবলু যাবি না?

বাবলু বলে : যাই বৌদি, যাই বাবা? মশলামুড়িকে দাহ করে আসি?

কামিনী বলে : এস ভাই। কিন্তু ওখান থেকে সোজা বাড়ি যাবে। বাড়িতে থেকেই ব্যবসা করতে হবে তোমাকে।

বাবলু ঘাড় নেড়ে চলে যায়।

ওরা এগিয়ে যায় ওদের এক প্রিয় বন্ধুর শেষকৃত্য করতে। কিশোর বন্ধুটির সঙ্গে ওরা ফেরি করত নানান সওদা ডেলি প্যাসেঞ্জার ভর্তি রেলের কামরায়। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে যাতায়াত করত এ ঘর থেকে

ওঘরে—রড ধরে ধরে।.একসঙ্গে খেত বিড়ি—গাইত সস্তা সিনেমা সঙ্গীত। সমব্যবসায়ীই শুধু নয়—জীবনের যাত্রাপথে ওরা সহযাত্রী, ঐ মশলামুড়ি, হাতকাটাতেল, মর্টন, আর বাব্লু। জীবন যুদ্ধের রণাঙ্গনে সংগ্রামরত বালসেনা! কমরেডস্!

হরিপদ মাস্টার তখন অন্য কথা ভাবছেন। হারানো ছোট ছেলেটিকে পেয়েই মন গিয়েছে বড়ছেলেটির দিকে। একবার দেখা হয় না? ঐ তো ঐ ওয়ার্ডে আছে অনিমেষ। যাকে বাঁচিয়ে তুলছে তাঁর বৌমা ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। সীমান্তিনীর একনিষ্ঠ সেবায় ফিরিয়ে এনেছে মৃতকল্প স্বামীকে—মৃত্যুর দ্বার থেকে।

ক্যাম্পের রিকসায়ালা ভেবেছিল বুড়োকর্তা যদি ছেলে ফিরে পায়—তবে সে একটা দাবী জানাবে। না ভাড়া নয়—একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দেবার দাবী। সে কথা কিন্তু সে বলতে পারল না। ঐ একফোঁটা ছেলেটার দ্বিখণ্ডিত দেহ, ঐ হরিধ্বনি, এ সবে তার মনটাও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। বাবলুকে সে চেনে না—তবু বাবলু বেঁচে যাক এটাই সে মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে বাবলু বেঁচেছে বটে ; কিন্তু মশলামুড়ি মারা গেছে। না, মশলামুড়িকেও সে চেনে না। মশলামুড়ির বংশে কেউ রিক্সাআলা আছে বলেও জানা নেই তার। তবু রিফুজি তো? সব রিফুজিই তো সব্বার ভাই, না কি কও? যুক্তিটা ওর এই জাতীয়। বলে : আয়েন বুড়াকর্তা, লয্যা যাই।

ফেরা কিন্তু হল না তাঁদের।

অ্যাম্বুলেন্সখানা এসে পৌছায়! পিছন পিছন একখানা জীপ। জীপ থেকে নামে ঠাকুর্দা আর কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার। অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামানো হল নমিতা আর যোগেনকে। এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হল ওদের।

ঠাকুর্দা এসে হরিপদ পণ্ডিতের হাতখানা চেপে ধরেন।

তিনি এসে পৌঁচেছেন কলকাতা থেকে। সোজা জীপে করে এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন কলকাতা থেকে কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার। বাগচি সাহেবও ছুটি সত্ত্বেও খবর পেয়ে এসেছেন।

মারামারি গণ্ডগোল সব থেমে গেছে।

নতুন উদ্বাস্তুরা যাতে আর উদয়-নগরে না আসতে পারে সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে, শেয়ালদ' স্টেশন থেকে ওদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যারা এসে পড়েছে ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে বেছে বেছে কর্মঠ লোকের পুনর্বসতি দেওয়া হবে এখানেই। বাকি লোক ফিরে যাবে ক্যাম্পে। সবই সুষ্ঠু ভাবে মিটে গেছে। পরিকল্পনার কাজ কাল থেকে পূর্ণোদ্যমে চালু হবে। নিতাইপদ লীডার বাছাই করা বিষয়ে কোয়াপারেটিভ গড়ার প্রস্তাবটাও দাখিল করেছিলেন। বাগচি সাহেবও পূর্ণ সম্পত্তি জানান এ ব্যবস্থায়। বস্তুত কোয়াপারেটিভ করে কাজ বিতরণ না করলে কিছুতেই সুষ্ঠু ব্যবস্থা হতে পারে না। বেকার নিঃস্বকে গ্রুপ লীডার করলে তারা কাজ করতে পারে না অর্থাভাবে। গোপনে তারা মহাজনের পক্ষপুটে আশ্রয় খোঁজে। এদিকে বিনা জামানতে, কাজ করার আগে দাদন দেওয়াও সম্ভব নয় সরকারি আইনে। যতীশবাবু চেয়েছিলেন এমন কিছু গ্রুপ-লীডার বেছে নিতে যারা প্রথম পর্যায়ে অর্থ বিনিযোগ করবার ক্ষমতা রাখে। তাই তিনি বিষ্টুপদ, গোকুল আর পতিতুণ্ডির নাম রেকমণ্ড করেছিলেন। বাগচি সাহেব তাতে রাজি নন। কলকাতা থেকে যে কজন অফিসার এসেছিলেন তাঁরাও চান না তেলামাথায় তেল ঢালতে। সুতরাং নিতাইপদর প্রস্তাবই গ্রহণ করেছেন সকলে। কাজ দেওয়া হবে কোয়াপারেটিভকে—ব্যক্তিগত মুনাফার অবলুপ্তি ঘটল! সমষ্টির লাভ লোকশান বুঝে নেবে শেয়ার হোল্ডাররা। কোয়াপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের একজন উচ্চপদস্থ মাদ্রাজী অফিসারও এসেছিলেন ওঁদের সঙ্গে। অবিলম্বে কি করে একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় তা তিনি সরজমিনে দেখতে এসেছেন।

বিষ্টুপদ-গোকুল-নবীন পতিতুণ্ডির শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। তাঁদের বড় মুরুব্বি স্বয়ং যতীশ বাবুই যখন হালে পানি পাচ্ছেন না তখন তাঁদের আর আশা কোথায়? সুতরাং ওঁরা সরে দাঁড়ালেন। খিড়কির দরজা দিয়ে পুনঃপ্রবেশেরও আর পথ রইল না। ওঁদের হিতাকাঙ্ক্ষী যতীশবাবুই এখন সে পথ দিয়ে প্রস্থান করতে পারলে বাঁচেন। বদলি হলেই খুশি হন তিনি ; কিন্তু ভাবে মনে হয় টিনের হিসাবটা না মিটানো পর্যন্ত বদলির কোনও আশা নেই।

সবই মিটে গেছে;—সবই সুষ্ঠুভাবে মিটিয়ে এনেছেন নিতাইপদ। এবার এই ছন্নছাড়া জীবগুলোকে নিয়ে নতুন পৃথিবী সৃজন করবেন ওঁরা। বল্মীকধর্মী মানুষগুলো শুধু বাড়ি করেই ক্ষান্ত হবে না — ওরা গড়ে তুলবে নতুন সমাজ ব্যবস্থা। পশ্চিমবাংলার আর পাঁচটা জরাজীর্ণ গ্রামে যা সম্ভব হয়নি — হবে না, তাই সফল করে তুলবে ওরা। ওদের কলোনিতে নেই পড়ো ভাঙা মন্দির আর মজা পানাপুকুর। সমাজপতির অর্কফলার আন্দোলনকে ওরা ভয় করে না। কালো স্লেটে নতুন করে পড়বে ওদের লেখা — নতুন পরিবেশে — মাঠের মাঝে গড়ে ওটা এই গ্রাম নগরীতে। গ্রাম্য সমাজজীবনের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে ওরা সচেতন — সেগুলি প্রথম থেকেই পরিহার করে চলবে। নিতাইপদ নবীন উৎসাহ নিয়ে তাই ফিরে এসেছেন বাগচি সাহেবকে সঙ্গে করে কলকাতা থেকে।

কিন্তু যদি কয়েকঘণ্টা আগেও এসে পৌঁছাতে পারতেন — তাহলে এ শুভকাজের সূচনায় রক্তপাতটা নিবারণ করা যেত।

পরের দিন প্রভাত।

জংশন হাসপাতালের সামনে একটা বিরাট জনতা।

মর্গ থেকে জনা চারেক লোক বার করে আনল নমিতাকে।

হাসপাতালের প্রাঙ্গণটা ভরে গেছে লোকে। তিন ধারণের স্থান নেই। রাত্রি থাকতেই লোক আসছে। ফার্স্ট লোকালেই এসেছে অসংখ্য লোক। কলোনির বাসিন্দা। সমস্ত উদয়-নগর কলোনী বুঝি সমবেত হয়েছে ওদের একটি মেয়ের শেষ সম্মান জানাতে। এসেছে প্রমোদ, কানাই, রাখাল, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা যোগেন। দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। সদ্য ফিরেছে সে শ্মশান থেকে। প্রিয়বন্ধুর শেষকৃত্য করে ফিরে এসেই শুনেছে এই দুঃসংবাদ। মর্টন আর হাতকাটা তেল ধরে আছে দু হাত। চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। শ্মশান বৈরাগ্য তার ছোট্ট দেহখানিতে মাখা। কাঁদছে না আর। অশ্রুর উৎস তার শুকিয়ে গেছে। গাজনের ক্ষুদে সন্ন্যাসী যেন একটা। জনতা নির্বাক!

নমিতাকে নামানো হল হাসপাতালের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন নিতাই কবিরাজ। তাঁর ডানহাতখানিতে ধরা আছে অন্ধ হরিপদ মাস্টারের একখানা হাত। আর একখানা হাত ধরা আছে অনিমেষের মুঠিতে। জরাগ্রস্ত পঙ্গু অন্ধ হরিপদ পণ্ডিত। বৃদ্ধ হাতড়ে হাতড়ে মুখখানার নাগাল পেলেন। সারা মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তার মধ্যে অপরাজিতা ফুলের মত ফুটে রয়েছে পঁচিশ বছরের কুমারী কালো মেয়েটির মুখখানি।

অন্ধ কোটরগত দু চোখ দিয়ে নেমেছে দুটি ধারা। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথাটায় বার কয়েক হাত বুলিয়ে দিলেন। মাথাটা নিচু করে অস্ফুটে মন্ত্রোচ্চারণের মতো কি যেন বললেন তিনি।

আঘাতে আঘাতে পাষাণ পণ্ডিত আজ যদি আকাশ বিদীর্ণ করা আর্তনাদ করে উঠতেন তাহলেও বুঝি এর চেয়ে আশ্বস্ত হত লোকগুলো।

নিতাইপদ বলেন : এবার ওদের নিয়ে যেতে দিন।

হরিপদ পণ্ডিত আপত্তি করেন না। উঠে দাঁড়ান। অস্ফুটে বলেন : আচ্ছা আয় মা!

সুরেখা দেবী বিরাট দুটো ফুলের তোড়া এনে রাখলেন মুখখানির দুপাশে। আঁচলে চোখটা মুছলেন।

নমিতা আজ শহীদ!

—বলহরি, হরিবোল!

আর্তনাদ করে নমিতার পায়ের উপর উবুড় হয়ে পড়ল লতু। ফুলে ফুলে কাঁদছিল সে। ভূষণ ওর হাত দুটি ধরে তোলে। ফুলে ঢাকা মেয়েটি ওঠে জনতার কাঁধে।

জীবনের প্রথম ফুলশয্যা।

শেষও!

বাগচি সাহেব ছুটে এসে বলেন : নামাও, নামাও।

নামানো হল নমিতাকে।

বাগচি বলেন : প্রেস ফটোগ্রাফাররা এসেছেন। নমিতার ফটো নেবেন। একখানা এনলার্জ করে রাখতে হবে আমার অফিসেও।

ইঞ্জিনিয়ার মৈত্র সাহেব একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন মেয়েটির দিকে। গতকালও ছিল এই মেয়েটির কত আশা আকাঙ্ক্ষা। সমস্ত কলোনির ভালো মন্দ নিয়ে তর্ক করে গেছে তাঁর সঙ্গে। কত কটু কথা বলে গেছে ওঁকে!

ওরা এখান থেকে যাবে কলোনিতে—নমিতার বাসায়। বিন্দুবাসিনী আছেন সেখানে। কামিনীও আছে তাঁর কাছে। সেখান থেকে ওকে নিয়ে যাওয়া হবে গণকল্যাণ-সমিতির অফিসে—অর্থাৎ নিতাই ঠাকুর্দার সেই এককামরার ঘরে। সেখান থেকে হাতিপোঁতার বিলে। উদয়নগর কলোনির অন্তিম মণিকর্ণিকায়। ওখানে ওদের অনেকেই গিয়েছে এতদিন দলে দলে, যাবে ভবিষ্যতেও—কিন্তু এমন সমারোহ করে শোকযাত্রা হয়নি কখনও হাতিপোঁতায়!

অন্ধ হরিপদ পণ্ডিতকে হাত ধরে নিতাই ঠাকুর্দা নিয়ে এসে বসালেন একটা রিক্সায়। পণ্ডিত তখনও নির্বাক। নিশ্চিন্তে আত্মসমর্পণ করেছেন নিতাইপদর হাতে। নিতাইপদ ভাবছিলেন তাঁর ডান হাতখানাই ভেঙে গেল। ভাঁড়ার ঘরের আগল খুলে বেরিয়ে এসেছিল যে ঘরোয়া মেয়েটি — তাকে গড়ে তুলেছিলেন তিনি আপন হাতে। মুখচোরা লাজুক মেয়েটির মধ্যেই ছিল সুপ্ত বহ্নিশিখা। জাগিয়ে তুলছিলেন তাকে তিনি। সংগ্রামের শুরুতেই বিদায় নিল সেই দক্ষ সেনাপতি। কিন্তু কলোনির জীবন এতো উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ নয়—এই সে শুরু। অন্ধ হরিপদ যেন এই উদয়নগর কলোনির একটা রূপক। নমিতাকে হারিয়ে বুকটা ফেটে গেলেও আর্তনাদ করার সময় নেই। এর পরেও আছে আগামী দিনের সমস্যা। রুটি চাই, অন্ন চাই। হরিপদ যেন সমগ্র কলোনির প্রতীকরূপে নিতাইপদর হাতে করেছেন অন্ধ আত্মসমর্পণ।

কাজ! কত কাজ!

সে কাজ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে নবাগতদের জন্য। দলে দলে লোক আসছে আরও। সার বেঁধে আসছে ও রাজ্য থেকে এ রাজ্যে। যেমন করে খাইবার পাস দিয়ে এসেছিল এদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ, যেমন করে নিতাইপদ এসেছেন কয়েকবছর আগে — তেমনি করেই আসছে ওরা। আসুক ওরাও আসুক! নিতাইপদ কিছুতেই ওদের ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। এখানে জমি নাই, এখানকার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে বারে বারে, তবু ঠাকুর্দা ওদের বরণ করে নেবারই পক্ষপাতী। অতিথি সব অবস্থাতেই নারায়ণ!

গঙ্গার জল পবিত্র। ভাদ্রের ভরা গঙ্গায় যখন বান ডাকে তখন দুপারের গ্রাম ভেসে যায় প্লাবনে। বন্যাবিধ্বস্ত গৃহহীনেরা সে জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে দেখতে পায় মৃত্যুর ছায়া। সে জলকে আমন্ত্রণ জানায় না কেউ। তবু সে ঘোলাজলও পূত গঙ্গোদক। তার মধ্যেও থাকে উর্বর পলিমাটির স্বর্ণরেণু। আজ যে

জন-জাহ্নবীর প্লাবনে ভেসে যেতে বসেছে নিতাইপদর দেশ — সেও পূত গঙ্গোদকই। মনুর পবিত্র বংশধর এই গণ-গঙ্গার প্রতিটি তরঙ্গ। সবার উপরে ওদের স্থান। অমৃতের পুত্র — কঙ্কালাবশেষ মনুষ্যাকৃতি জীবগুলো।

হয়তো ওদের ভাগ দিতে গিয়ে ভরপেট খাবার মিলবে না সকলের। তবু এদের সাথে অন্নপান ভাগ করে খেতে হবে। সে কষ্টটুকু স্বীকার করে নিতে হবে হাসিমুখেই।

সেই হাসিরই একটু টুক্‌রো লেগে আছে ঐ তাঁর ফুলে ঢাকা নাতনিটির অধরপ্রান্তে।

অপরাজিতার হাসি।

শ্মশান যাত্রীরা মোড় ফেরে বাঁয়ে।

বিরাট শোকযাত্রা।

সকলের পিছনে পিছনে আসছিল ভূষণ। হাত ধরে নিয়ে চলেছে লতুকে। পাশে পাশে চলেছে লতু। কাঁদছে সে। ভূষণের দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। কী ভাবছে সে — তা সেই জানে। অন্ধকার কেটে গিয়ে সূর্য উঠছে। ভূষণের চোয়ালের হাড় দুটো চেপে বসেছে। আশপাশের সম্বন্ধে সে মোটেই সচেতন নয়। চলেছে সামনের দিকে দৃঢ়মুষ্ঠিতে লতুর ডানহাতখানা চেপে ধরে।

খেয়াল নেই ওর হাতের তালুতে ফুটছে কাঁটা — ওর মায়ের হাতের মকরমুখো বালার সোনার কাঁটা!

দণ্ডক-উপনিবেশ

(ষাটের দশক)

আদিপর্ব

[উনিশ শ' ষাট সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি।]

—অরণ্যদণ্ড !

কথাটা বলেছিল মাকরেল ক্যাম্পের ছিনাথ। শ্রীনাথ মালাকার। উদ্ধত ভঙ্গিতে নয়—সবিনয়ে হাত দুটি জোড় করে নিবেদন করেছিল তার বক্তব্য : আজ্ঞে বাবুমশয়, পেরথমে তো ক'ন নাই, যে বিচারে আমাগো অরণ্যদণ্ড হইছে।

—অরণ্যদণ্ড ! সেটা আবার কী?

—হেই কথাডা তো আমরাও জিগাই। কারাদণ্ডরে চিনি, মিত্যুদণ্ডও না চিনি তা লয়, কিন্তুক্ এমন অরণ্যদণ্ড দিবার ব্যবস্থা হইছে, তা তো ক'ন নাই।

বসুজা চুপ করে থাকে। নতুন এসেছে সে ডেপুটেশ্যান নিয়ে মাত্র গতকাল রাত্রে। আজ সকালে জয়েনিং রিপোর্ট দিয়েছে কি দেয়নি; মৈত্র বললে, যাবেন নাকি রিতুদা কাজ দেখতে ?

—কাজ? আমার আবার কাজ কোথায় এখানে? আমার পোস্টিং তো সেই কোন্ডাগাঁও—এখান থেকে চল্লিশ মাইল।

—না না আপনার জুরিস্‌ডিকশন্ নয়। মাকরেল ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পে ধর্মঘট হয়েছে। সি.ই. আমাকে তদন্ত করে একটা রিপোর্ট দিতে বলেছেন। যাবেন দেখতে ?

অগত্যা রাজি হয়ে চলে এসেছে বসুজা। এখন মনে হচ্ছে এসে ভালই করেছে। দিব্যি একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা গেল মৌফৎসে।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার যাঁরা মহামহারথী তাঁরা আগামী সপ্তাহে সরেজমিনে একটা তদন্ত করতে আসছেন। সারা পরিকল্পনায় তাই সাড়া পড়ে গেছে। মাকরেল ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পেও ওঁদের পদধূলি পড়ার কথা। এই মওকায় ওরা ধর্মঘট ঘোষণা করে বসল। অভাব-অভিযোগের একটা লম্বা ফিরিস্তি তৈরি করেছে রত্নাকর ঘোষ—ওদের পাণ্ডা। আমরণ অনশন ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে। কপি ফরোয়ার্ডেড টু—তা-বড় তা-বড় আশমান তক্। ইউ. এন. ও-র সেক্রেটারি জেনারেলকে কেন কপি দেওয়া হল না সেটা বোঝা যায়নি অবশ্য। ফলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে হয়েছে বীরেন মৈত্রকে।

বীরেন মৈত্র ঋতব্রতের চেয়ে কলেজে একবছরের জুনিয়ার। যদিও চাকরি জীবনে দুজনে সহকর্মী বন্ধু ও দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় বীরেন ঋতব্রতের অগ্রজ, তবু বি ই কলেজের চিরাচরিত প্রথায় ঋতব্রতকে সে ঋতুদা বলেই ডাকে। সারা পরিকল্পনায় উদ্‌বাস্তুদের খোঁজ-খবর সুখ-দুঃখের হদিস-হিসাব রাখতে হয় মৈত্রকে। পরিকল্পনায় তার পদটা বিচিত্র—অফিসার-অন-স্পেশাল ডিউটি, অথবা সংক্ষেপে ও. এস. ডি.।

তাকিয়ে তাকিয়ে ঋতব্রত মাকরেল ক্যাম্পের পরিবেশটা দেখে নিচ্ছিল। দুই সারি তাঁবুর মাঝখান দিয়ে লাল সুরকিব পথ। না ভুল হল—সুরকি নয়—রাঙামাটির রাস্তা—মুরাম-রোড। বিরাট এক আমের বাগান—তারই ছায়ায় সারি সারি ছোলদারি তাঁবু। যেন পলাশীর আম-বাগানের প্রান্তে রণক্লান্ত নবাবি শিবির। যেন মীরজাফর আলি খাঁর বেইমানিটা এখনও ওরা ঠিক হজম করে উঠতে পারেনি। যুদ্ধে হার হয়েছে—মাতৃভূমি বিকিয়ে গেছে—তবু পলাশীপ্রান্তরের এই আমবাগানের শিবিরে বসে ওরা ভাবছে বোধহয় সবটাই স্বপ্ন! দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বের ভার যাদের হাতে তুলে দিয়ে ওরা নিশ্চিন্তে যুদ্ধযাত্রা করেছিল, সেই মীরজাফরের দল যে এভাবে মাতৃভূমিকে গদির লোভে বিকিয়ে

দেবে—তা যেন আজও ওদের বিশ্বাস হচ্ছে না। মসনদ কি মাতৃভূমির চেয়ে বড় ?

একজন অর্ধ-উলঙ্গ রিফুজি বাচ্চা পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে কচি আম পাড়তে ব্যস্ত। টিউব-ওয়েলটার কাছে চাপ ভিড়। দুটো কলের একটা টিকে আছে, দ্বিতীয়টায় জল ওঠে না—সেটা শোভাবর্ধন করতে আছে। তাই জলপ্রার্থীর সংখ্যাধিক্য। তাঁবুগুলো ছিঁড়ে এসেছে। এক পশলা বৃষ্টি হলেই তাঁবু ছেড়ে গাছতলায় এসে আশ্রয় নিতে হবে বোধকরি।

—রত্নাকর ঘোষ কার নাম?—প্রশ্ন করে বীরেন।

হাড়-পাঁজরা-সর্বস্ব একটি জীব ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসে—কী ক'ন?

—আপনি না কি আমরণ অনশন করবেন স্থির করেছেন?

—স্থির করনের আর আছে ডা কী? অনশনেই তো আছি। রোজগার করি মাসে বাইশ টাকা, আপনে কাটি নেন ছাব্বিশ টাকা—শ্যাষে বলেন ছাবছিডি দিবেন। মাসান্তে তাও আসে না।

—র'ণ, র'ণ,—আমারে কইবার দ্যান....বাবুমশায়, আমাগো এমন দগ্‌দি দগ্‌দি না মার‍্যা এ্যাক্কেরে মেশিনগান চালায়ে দ্যান না ক্যান? আমাগোও স্বস্তি, আপনাগোও শান্তি!

আরও পাঁচসাতজন একসঙ্গে কথা বলে ওঠে। পানীয় জলের অভাব, বোরহোল পায়খানা ভর্তি হয়ে যাওয়ার অভিযোগ, ছেঁড়া তাঁবুর বর্ণনা। অভিযোগের আদিই নেই তার অন্ত। বাধা দিয়ে বীরেন বলে—টিউবওয়েল আর তাঁবু মেরামত করতে লোক এসেছিল—আপনারাই নাকি তাড়িয়ে দিয়েছেন?

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অধোমুখে রাঙামাটিতে আঁচড় কাটে।

—কী হল? জবাব দিচ্ছেন না কেন? মিস্ত্রিকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

—হ দিছি। ক্যান দিমুনা? অ্যাদ্দিন যুদি কষ্ট করতি পারি, তয় আরও এক হপ্তা পারুম। ডাক্তার রায় আসুক—আমাগো অবস্থাডা দেখ্যা যাক্—শ্যাষে সারাই করবান্নানে।

আলোচনা এগিয়ে চলে। বীরেন বোঝাতে থাকে। নানা বিষয়ে। কখনও সাবসিডির হিসাব, কেন ওদের দিয়ে মাটি কাটানো হচ্ছে তার কারণ। কোথাও নরম সুরে বোঝাবার চেষ্টা করে, কোথাও গরম সুরে হুম্‌কি দেয়। ওদের স্বরগ্রামে কিন্তু কড়ি-কোমল নেই। সানাইয়ের পোঁর মতো একটানা বেজেই চলেছে—আগে ডাক্তার রায়ের পরিদর্শন হয়ে যাক—তারপর অন্য কথা। ইতিমধ্যে ওরা কাজও করবে না—কাজ করতে দেবেও না কাউকে।

বীরেন শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে—এটা কিন্তু আপনারা ভাল করলেন না। আপনাদের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আমি বলব .....

বাধা দিয়ে একজন বলে বসে, আমাগো মঙ্গল তো ব্যাবাকই দ্যাখলেন ছার, অখন হপ্তা-খানেক নিজ মঙ্গল দেখেন। চাকরিডা বাচান। বিধান রায় আইত্যাসেন,—তাই আপনাগো টনক নড়ছে—জিপে কর‍্যা ছুটে আইসেন আমাগো পায়ে ধরতি।

আশ্চর্য ধৈর্য বীরেনের। নির্লিপ্তের মতো বললে, রাগের মাথায় যদি একথা বলে থাকেন, তাহলে আমার আরও কিছু বলার ছিল—আর সত্যি যদি মন থেকে একথা বলে থাকেন, তাহলে না হয় এক হপ্তা পরেই আসব।

—তাই আসব্যান। মাটি আমরায় আর কাটুম না। ঘর-জমি যদি দ্যান তো দিন—নইলে শিয়ালদ' ইস্টিশনেই চইলে যাই গা।

বীরেন ইংরেজিতে বললে, চলুন ঋতুদা, এখন আর কিছু হবে না। ভিতরে রাজনীতির খেল চলেছে। দে হ্যাভ বিন্ পয়েজন্‌ড্।

আবার ধুলো উড়িয়ে জিপ ছুটে চলে ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে জগদলপুরের দিকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। মাকরেল ক্যাম্পে হঠাৎ শাঁখে ফুঁ পড়ল। চম্‌কে পিছন ফিরে তাকায়। হাড়-পাঁজরা-সর্বস্ব মাথায় ঘোমটা একটি উদ্বাস্তু বধূ জঙ্গলের দিকে মুখ করে শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে। রাস্তার দুধারে মাঝে মাঝে গ্যাঙ-কুলিরা কাজ করছে। মুরাম মাটি বিছিয়ে দিচ্ছে খানা-খন্দ দেখে দেখে। অশীতিপর মহামান্য

অতিথি স্বচক্ষে দেখাতে আসবেন পরিকল্পনা। গাড়িতে যেন ঝাঁকি না লাগে। পথের বাঁকে হারিয়ে গেল মাকরেল ক্যাম্প। শুধু শঙ্খ-ধ্বনির ক্ষীণ আওয়াজ তখনও লেগে আছে কানে।

অরণ্যের বিরুদ্ধে মানব-সন্তানের শঙ্খ-নির্ঘোষ!

তিনটি প্রদেশজুড়ে বিরাট এই পরিকল্পনা। অন্ধ্র, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ। আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের আড়াই থেকে তিন গুণ। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মকেন্দ্র জগদলপুর। সি ই-র অফিস সেখানেই। আর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাহেব থাকেন কোরাপুট—পাহাড়ের উপরে ছবির মতো ছোট্ট শহর। দুই রাজধানীর মধ্যে পথের দূরত্বটা মেপে দেখা গেছে—তা মাপবার একটা মানদণ্ড আছে—সেটা ঊনসত্তর মাইল। মতের দূরত্ব মাপবার কোন মানদণ্ড নেই—তাই মেপে সেটা দেখা যায়নি। দুই কেন্দ্র—দুই বিভিন্ন প্রদেশে। জগদলপুর বাস্তার জেলায়, মধ্যপ্রদেশে। কোরাপুট উড়িষ্যায়। সবচেয়ে মজার কথা যে অঞ্চলে উদ্‌বাস্তুদের জন্য জমি পাওয়া গেছে সেটা এই দুই রাজধানীর কোনটাবই কাছে-পিঠে নয়!

এত বড় দণ্ডকারণ্যে রেলের লাইন নেই। আদিম ভারতবর্ষ পাষাণী অহল্যার মতো এখানে ঘুমিয়ে আছে। শুধু বনজ আর খনিজ সম্পদই নয়—কেবলমাত্র উর্বর কুমারী ভূমিই নয়—প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক গাথা-এর অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো। ছেলেবেলায় বড়দিমা সুর করে রামায়ণ পড়তেন। ঠাকুরমাকেই ঋতব্রত দাদা-দিদিদের দেখাদেখি বড়দিমা বলত—কেন বলত তা জানে না। তাঁর মুখে শুনছিল এই আরণ্যক ভূমির এখানে ওখানে ছড়ানো ছিল মুনি-ঋষিদের আশ্রম। শ্রীরামচন্দ্র লোকটির প্রতি ঋতব্রতের আদৌ কোন শ্রদ্ধা ছিল না—স্ত্রৈণ বাপের কথায় বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, বউ যায় চুরি, ফিরে পেয়েও রকবাজ চ্যাংড়াদের কথায় আবার ত্যাগ করে এত-কষ্ট-করে পাওয়া বউকে। দণ্ডকারণ্যে এসে কিন্তু মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে টুপি খুলেছে সে—এত ভাল 'হনিমুন-স্পট' ভূ-ভারতে অতি অল্পই আছে। কিন্তু স্থান-নির্বাচনে ভুল না হলেও কোথাও না কোথাও গলদ ছিল তাঁর পরিকল্পনায়। এ অরণ্যে শান্তিময় নতুন জীবন যাপন করতে পারেননি। সব শুভ ইচ্ছাই বিসর্জন দিতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। স্বর্ণমৃগের সন্ধানে বিপথে পা বাড়িয়েছিলেন তিনি! অরণ্যবাসের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল ফলে! চরম মুহূর্তে জনম-দুখিনী সীতার আর্ত-ক্রন্দন তাঁর কানে যায়নি। রাজকন্যা সীতা ছিলেন ধরিত্রীর সন্তান—সুজলা-সুফলা মাটিকেই তিনি চিনতেন আপন করে। এ আরণ্যক জীবনের ভয়াবহতা সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। রাজপ্রাসাদের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা থেকে ভাগ্যতাড়িতা উদ্বাস্তু সীতাদেবীকে বাধ্য করা হয়েছিল এই আরণ্যক জীবন-যাপনে। তাই ভুলে গণ্ডির বাইরে পা বাড়িয়েছিলেন তিনি—লক্ষ্মণের গণ্ডিসীমা তাঁর খেয়াল ছিল না। একবার পদস্খলন হলে আর রক্ষে আছে? আর ফিরে আসতে পারেননি গণ্ডি-দেওয়া গার্হস্থ্য-জীবনের স্বাভাবিকতায়। মহাকাব্য কি আজও রচিত হচ্ছে অলক্ষ্যে? ইতিহাস কি নিজেরই পুনরাবৃত্তি ? র‍্যাডক্লিফের টানা-গণ্ডির বাইরে পা দিয়ে ঐ যে মেয়েটি শাঁখে ফুঁ দিচ্ছিল মাকরেল ক্যাম্প ও কি কলির রঙ্গমঞ্চে ত্রেতার সেই নাটকটিই অভিনয় করতে এসেছে?

পথের ধারে ধারে ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প। ওদের বলা হয়েছিল বাঙলাদেশে আর চাষের জমি নেই—তোমরা দণ্ডকারণ্যে চল, সেখানো তোমাদের জন্য পাকাবাড়ি, হাঁসিল-জমি, ভালো-জাতের বলদ, গরু, লাঙল, বীজ দেওয়া হবে। সেই আশায় ছুটে এসেছে মানুষগুলো, এই উপলবন্ধুর রাঙামাটির দেশে। পদ্মা-মেঘনা-আড়িয়েল খাঁ বিধৌত নদীমাতৃকা ভূখণ্ডের মানুষ ওরা। এসেছে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে, নিভু-নিভু আশার প্রদীপখানি সাবধানে বাঁচিয়ে। অনেক ঘাটের জল খেয়েছে ইতিমধ্যে। প্রথমে এসে উঠেছিল ভারতসীমান্তের রিসেপ্‌শন সেন্টারে—বানপুরে, বনগাঁয়, আরও অসংখ্য ছোট ছোট প্রাথমিক কেন্দ্রে। সে আজ একযুগ আগের কথা—দশ বারো বছর অতীতের কাহিনী। হলদে-রঙের এক চিলতে ছাপা কাগজে লিখতে হয়েছে নাম, পেশা, আদি নিবাস, পরিবারভুক্ত লোকের নাম ও বয়স। কর্তারা তার মাথায় বসিয়েছেন একটা ক্রমিক-সংখ্যা। রেজিস্ট্রেশন-কার্ডের নম্বর। সরকারি সিলমোহর-লাঞ্ছিত সেই কাগজখানির মূল্য অনেক। ওইটেই ওদের উদ্‌বাস্তু পরিচয়। ডোল বল, লোন বল—ওটা চাই!

সেই কাগজখানি রক্ষাকবচ করে তারপর ঘুরেছে এখানে ওখানে। এ-ঘাটে ও-ঘাটে। রিসেপ্‌শন সেন্টার থেকে ট্রানসিট সেন্টার। সেখান থেকে পি. এল. ক্যাম্প। কেউ কেউ পি. এল. ক্যাম্প থেকে অবশেষে পুনর্বাসন পেল কলোনিতে। সরকারি-আধাসরকারি বেসরকারি জবলদখল কলোনি। গয়েশপুর-তাহেরপুর-খাশ্‌বাশমহল্লা-হাবড়াবৈগাছী। দেশনেতাদের নামে নতুন নতুন কলোনি স্থাপন করল মহা উৎসাহে। প্রফুল্লনগর, নেতাজীনগর, রবীন্দ্রনগর, জওহর-কলোনি! কেউ নাম দিল নবজীবন কলোনী—কেউ নাম দিল উদয়নগর উদ্‌বাস্তু কলোনি! ক্যাম্প ছেড়ে যারা কলোনিতে গেল তারা ভাবল হাতে স্বর্গ পাওয়া গেল বুঝিবা। মাথার উপর নিজস্ব একখানা টিনের চালা—যার নিচে সপরিবারে আশ্রয় নিতে পারবে, পায়ের তলায় নিজস্ব একচিলতে জমি—যাতে ফলবে লাউ-কুমড়ো-শশা-বেগুন-লঙ্কা। নিজস্ব বাড়ি হওয়ায় বাপ বেটার দিকে চেয়ে হেসেছিল, স্ত্রী স্বামীর দিকে চেয়ে। কিন্তু দুদিনেই বোঝা গেল গলদটা। অনুর্বর বন্ধ্যা মাটির উপর সারি সারি বাড়ি তুলে দিলেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয় না। খাবে কী? জমি কোথায় চাষের? কেউ কেউ স্মল-ট্রেড লোন পেল—দোকান দিল, সাইকেল রিক্‌শা কিনল, হকারি শুরু করল—কিন্তু গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা হল না। কোথাও কোথাও কলোনিতে সরকারি কনট্রাক্ট ডিভিশন এল কাজ করতে। তারা রাস্তাঘাট বানাল, পুকুর কাটল, নলকূপ তৈরি করল ওদের দিয়ে। ওরা গতরে খেটে পয়সা কামালো। ছ-মাস-নমাস চলল সংসার। তারপর? কলোনির কাজ শেষ হল একদিন। আবার বেকার। তিল-তিল করে গড়ে তোলা বাড়ি তিল-তিল করেই খুলে ফেলল আবার। বিক্রি হয়ে গেল করোগেট-টিন, জানলা-দরজা। পেট বড় অবুঝ—তার দাবিটাই সবার আগে। আবার উদ্‌বাস্তু। কিন্তু আর রিসেপশান-সেন্টার নেই। এবার 'লোন পাওয়া' উদ্‌বাস্তু ওরা। তাই ঠাঁই হল শেয়ালদহ স্টেশন, স্ট্রান্ডরোডের ধারে ধারে। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ ঘুরে এল বিহার উড়িষ্যা-আসাম। ফিরে এল শেয়ালদ' আর হাওড়া স্টেশনে। হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোথা, অন্য কোনখানে। অবশেষে এল আহ্বান—চল দণ্ডকারণ্য! সেখানে জমি পাবে, বাড়ি পাবে, লাঙল, গরু, বীজধান পাবে। নতুন করে জীবন শুরু করবে তোমরা।

সেই নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ওরা এসেছে দণ্ডকারণ্যে।

মৈত্র পরদিন কোণ্ডাগাঁওয়ে এসেছিল একটা এন্‌কোয়ারিতে। ল্যাংজোলা ক্যাম্পের একটি উদ্‌বাস্তু চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে আবেদন করেছে—সে ঠিক মতো মজুরি পায়নি। স্পেশাল অফিসার বীরেন মৈত্রকে পাঠানো হয়েছে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে। ল্যাংজোলা ক্যাম্প ঋতব্রতের এলাকায়। তাই বললে—অভিযোগটা তাহলে আমার বিরুদ্ধে?

—আরে না না....

—না, না, কী রকম? আমার প্রেডিসেসরের সমস্ত কাজের জন্য এখন আমিই তো দায়ী—

—কী আশ্চর্য। আপনি শুনতেই চাইছেন না। আবেদন লিখেছে রাখহরি দাশ। সে বলছে গ্রুপ-লিডার তাকে ন্যায্য মজুরি দেয়নি। ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই।

—গ্রুপ-লিডারটা কী বস্তু?

—বলছি যেতে যেতে। উঠে বসুন জিপে।

দুজনকে নিয়ে ধুলোর ঝড় তুলে ছুটে চলল জিপ। মৈত্র বুঝিয়ে বলতে থাকে—ক্যাম্পের উদ্‌বাস্তুরা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে কাজ করে। এক একটি গ্রুপের কাজ দেখে একজন গ্রুপ-লিডার। ওরাও উদ্‌বাস্তু—মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। এটাও আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের একটি আবিষ্কার। তাঁর আসার আগে বিভিন্ন কাজের জন্য ঠিকাদার লাগান হত। উনিই এই গ্রুপ-লিডার প্রথার প্রবর্তন করেন। ঠিকাদারদের লভ্যাংশটাও যাতে উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে থাকে তাই এ প্রচেষ্টা। গ্রুপ-লিডার টেন্ডার দিয়ে কাজ ধরে না। শিডিউল-রেটে ওদের কাজ বণ্টন করা হয়। ওদের আর্নেস্ট মানিও দিতে হয় না।

—কে ওদের কাজ দেয়? কেই বা গ্রুপ-লিডার নির্বাচন করে?

—কাজ দেয় এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। আপনাকেই দিতে হবে এর পর থেকে। আর চূড়ান্ত নির্বাচন করেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার আমার সুপারিশে।

—এ তো মহা ঝকমারির কাজ।

—ঝকমারি তো বটেই। দুদিনেই বুঝবেন এদের কাণ্ডকারখানা। এখানে নিত্যি যা ঘটে তা নিয়ে রোজ একখানা করে ছোট গল্প লেখা যায় অথচ আশ্চর্য এই উদ্‌বাস্তুদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কেউ কিছু লিখল না। পঞ্চাশ লক্ষ লোক ঘর-বাড়ি-সমাজ-সংসার ছেড়ে চলে এল। দশ পনের বছর ধরে স্রোতের জলে ভেসে ভেসে বেড়ালো—শিকড় গাড়ল না কোথাও। নতুন জমিতে, নতুন করে ওরা বাঁচতে চায়—কী তীব্র ওদের বাঁচার আকাঙক্ষা। দরমা-ঘেরা খড়ো ঘরের অন্ধকারে জীবনকে ওরা খুঁজছে। অথচ ওদের সে জীবন-সংগ্রামের কথা দুনিয়া জানল না। আজকের সাহিত্যিকের দৃষ্টি পড়ল না ওদের দিকে। বাংলাদেশের সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের খোঁজ করছেন ইতিহাসের পাতায়—পুরনো কলকাতার নথিপত্রে—সিপাহি বিদ্রোহের ইতিবৃত্তে, লেখবার বিষয়বস্তুর সন্ধানে তাঁরা দেশছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নাগা হিলসে, সিন্ধুপারে। জীবনের রহস্যের সন্ধানে আড়ি পেতেছেন শ্মশানের বামাচারে।

ঋতব্রত হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে : ধান ভানতে হঠাৎ এ গাজনের গান কেন ভাই?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে মৈত্র। সামলে নিয়ে বলে : আপনিও তো এককালে লিখতেন কিছু কিছু। লিখুন না এই উদ্‌বাস্তু জীবন নিয়ে। যে কোন ক্যাম্পে বসে শুনতে পাবেন ওরা কোথা থেকে এল, কেমন করে এল—কেন এল। ওদের এ বারো বছরের জীবন নিয়ে রামায়ণ-মহাভারত না হক—ওয়ার অ্যান্ড পিস রচনা করা চলে একখানা।

তা হয়তো চলে—কিন্তু তা লিখবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। রুচিও নেই। তুমি যাদের নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছ আমি ওদের নিয়ে অতটা মাতামাতির কোন কারণ দেখি না। ওদের খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল—'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্পে'। ওরা ফুরিয়ে গেছে—ওরা মানুষ নয়, ভূতপূর্ব মানুষ।

দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে মৈত্র : ওদের খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ আমারও হয়েছিল। আমি দেখছি ওরা মোটেই মৃত নয়—ওরা বেঁচে আছে, ওরা বাঁচবে। উদয়নগর উদ্‌বাস্তু কলোনিতে আমি দেখেছি তার সূচনা। উইপোকার মতো বারে বারে ভেঙে যাওয়া 'বল্মীক' তারা আবার গড়ে তুলেছে। আমরা ওদের বাঁচার সুযোগ দিইনি—সে দোষ ওদের নয়। আমরা যদি সুযোগ দিতাম, ওদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতাম—তা হলে দেখতেন ওরা মরেনি মোটেই—আবার বেঁচে উঠত ওরা।

ঋতব্রত বলে : আমিও জীবনকেই দেখতে এসেছি এখানে। লিখবারও ইচ্ছে আছে আমার, তবে উদ্‌বাস্তু জীবন নয়, আদিবাসী জীবন—ঐ মারিয়া, মুরিয়া, হালবা আর গোণ্ডদের জীবন। কিন্তু যাক সে কথা। গ্রুপ-লিডার নির্বাচনের কথা কী বলছিলে যেন? যা নিয়ে নিত্য একটা ছোট গল্প লেখা যায়?

—কিন্তু সে কথা তো আপনাকে বলে লাভ নেই। ভূতপূর্ব মানুষদের কথা আলোচনা করে কী লাভ?

ঋতব্রত বুঝতে পারে মৈত্র আহত হয়েছে। তার পূর্ববঙ্গে বাড়ি বলেই কি ? নাকি ও সত্যই বিশ্বাস করে এদের মনুষ্যত্বে ? সে যাই হোক, হেসে বলে, বেশ আমি উইথড্র করছি আমার কথা। বল কী বলছিলে।

মৈত্রও বোধহয় পরিবেশটা হাল্‌কা করতেই উন্মুখ। সে গল্প শুরু করে, মাসখানেক আগেকার কথা বলছি। অফিসে বসে কাজ করছি। মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। এফ. এ.-র অফিস থেকে অবজেকশন এসেছে রিফুজি গ্রুপ-লিডারদের অগ্রিম টাকা দেওয়ায়। কাজ শুরু করার আগে বিনা জামানতে অগ্রিম দিলে অডিট অবজেকশন হবেই। অথচ প্রথমেই কিছু টাকা হাতে না থাকলে এইসব উদ্‌বাস্তু জি. এল.-রা কাজ শুরুই বা করে কেমন করে? চিফ ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, যাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ,

যাদের পোষ্য-সংখ্যা বেশি, যারা শিক্ষিত বেকার—তাদের মধ্যে থেকেই গ্রুপ-লিডার বেছে নিতে হবে তাই করছিলাম এতদিন। কিন্তু কাজে নেমে অসুবিধাটা বোঝা গেল। কাজে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রুপ-লিডারকে কিছু খরচ করতে হবে। ভারার বাঁশ কিনতে হবে, ইঁট ভেজাবার তাগাড় বানাতে হবে—প্রথম সপ্তাহের মজুরি মেটাতে হবে ঘরের থেকে—কারণ পেমেন্ট সে পাবে কিছুটা কাজ করার পর। ভেবে দেখলাম, একেবারে অদ্য-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণ গ্রুপ-লিডার দিয়ে আমার কাজ চলবে না। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উপযুক্ত লোক বেছে নিতে হবে—অন্তত শ'দুই টাকা মূলধন যার নেই, অন-প্রিন্সিপল তাকে গ্রুপ-লিডার করব না।

সেদিন অফিস থেকে কাজ সেরে উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল। প্রায় সাতটা বাজে। হ্যাঙার থেকে কোটটা নামিয়ে গায়ে দিচ্ছি, আর্দালী টেবিল থেকে একখণ্ড কাগজ তুলে দেখাল। ভিজিটিং স্লিপ। বললাম, এখন আর হবে না বলে দে। পিযনটা মাথা চুলকে বল্লে—লোকটা সেই দুপুর থেকে বসে আছে স্যার। ধমক দিয়ে উঠি, তাহলে এতক্ষণ কী করছিলে? ঘুমোচ্ছিলে বসে বসে? পিয়নটা চুপচাপ ঘাড় চুলকায়—একবারও বলে না টিফিন আওয়ার্সেই তাকে বলে রেখেছিলাম, বিকালে আমি জরুরী একটা রিপোর্ট লিখব, ফালতু লোকজনের সঙ্গে দেখা হবে না। কথাটা মনে পড়ায় বলি—আচ্ছা ডেকে দে।

ঘরে এসে ঢোকে একটা কঙ্কালসার লোক। বয়স ত্রিশ না পঞ্চাশ বুঝতে হলে ভাল করে সাবান দিয়ে স্নান করাতে হয় তাকে। রুক্ষ চুলে দিতে হয় তেল চিরুনি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে চালাতে হয় ব্লেড। যুক্তকর কপালে স্পর্শ করিয়েই বিযুক্ত হল না। বুকের কাছে নেমে এসে থেমে গেল। এই অতি-বিনয় আমি সহ্য করতে পারি না। বলি, বসুন।

—আপনি আমাকে তুমিই বলবেন স্যার—বললে লোকটা। বসল না কিন্তু। দাঁড়িয়ে রইল ঠায়।

—বলুন, কী বলতে এসেছেন?

—শুনলাম আপনি নতুন কয়েকজন গ্রুপ-লিডার নেবেন....

—তা নেব। আপনি গ্রুপ-লিডারি করতে চান? কী নাম? কোথায় থাকেন? ক্যাম্প ডি পি? রিফিউজি রেজিস্ট্রেশন্ কার্ড আছে?

একে একে আমার সবকয়টি প্রশ্নেরই জবাব দেয়। হ্যাঁ, দিবাকর গোস্বামী রেজিস্টার্ড রিফিউজি—আদি নিবাস পাকিস্তানের কোন এক কমলপুর। এখন আছে মাকরেল ক্যাম্পে। নতুন এসেছে। আই.এ. পাশ। সংসারের নিরতিশয় দৈন্য-দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে ওর গলা কেঁপে গেল। দু-এক ফোঁটা জলও বুঝি ঝরে পড়ল আমার রেক্সিনটপ টেবিলে। আমি কিন্তু বিচলিত হইনি একচুল। দীর্ঘদিন ওদের দুর্দশার কাহিনী শুনে শুনে পুনরুক্তি দোষে আমার আর ভাবান্তর হয় না। মনের উপর কড়া পড়ে গেছে ক্রমে। সব শুনে বললাম, টি. বি.-র কথাটা তো কই বললেন না?

লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বলে, আপনি কী করে জানলেন স্যার?

সর্বজ্ঞের মতো হেসে আমি একটা সিগারেট ধরাই, বলি, আমার সময় অল্প। কতদিন ধরে রক্ত উঠছে আপনার?

ও সামলে নিয়ে বলে—আজ্ঞে না, রাজরোগটা হয়েছে আমার স্ত্রীর।

—ভালো। বিয়েও করেছেন তাহলে। বয়স কত? ছেলেপিলে আছে?

—কার বয়স? আমার স্ত্রীর? উনত্রিশ—

—না, আপনার।

—পঁয়ত্রিশ।

বাজে কথা না বাড়িয়ে বলি : গ্রুপ-লিডারি কাজ আপনার দ্বারা হওয়া শক্ত ... আচ্ছা দাঁড়ান—ভেবে দেখি।

লোকটার চোখ দুটো জ্বল্‌জ্বল্ করতে থাকে। জজ-সাহেব যখন জুরিদের দিকে ফিরে বলেন—'বাট

দেয়ার্স ওয়ান পয়েন্ট ইন ফেভার অব দ্যা অ্যাকিয়ুস্‌ড' তখন ফাঁসীর আসামীর চোখে ফুঠে উঠে যে দৃষ্টি—সেই দৃষ্টি তখন ওর চোখে। আমি কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলি—আপনার হাতে তো একটি পয়সা নেই, কেমন?

একেবারে ম্লান হয়ে যায় লোকটা। তবু আমতা আমতা করে বলে—কতটাকা লাগবে স্যার?

—অন্তত শ'দুয়েক টাকা জোগাড় করতে পারবেন?

—আমতা আমতা করে লোকটা বললে, আপনি কাজ দিন স্যার, যেমন করে পারি জোগাড় করব টাকা।

আমি বলি—ও কথা সবাই বলে, অথচ কাজ পাওয়ার পর দেখা যায় কিছুতেই আর টাকাটা জোগাড় হচ্ছে না। আপনি নগদ দু'শো টাকা এনে যদি দেখাতে পারেন কাজ পাওয়ার আগে, তবেই কাজের অ্যালটমেন্ট দিতে পারি আপনাকে।

লোকটা হাসল, বললে—তাই হবে স্যার। সোমবার টাকা নিয়ে আসব।

হাসিটা দেখে কেমন খটকা লাগল। এ হাসিটা কেমন যেন চেনা। ঠিক এই হাসিই কাকে যেন হাসতে দেখেছি আমি। অতীত জীবনেব অন্ধকারে মিনিটখানেক হাতড়ে হতাশ হয়ে বললাম, আপনাকে এর আগে কোথাও দেখেছি?

দিবাকর এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নিল—তারপর অত্যন্ত গোপনসুরে নিচু গলায় বললে, উনিশ শ তেতাল্লিশ সালে আমি বহরমপুর জেলে আটকে ছিলাম।

আমার স্মৃতির কুয়াশা ততক্ষণে কেটে গেছে। বললাম—আরে, তুমি দেবু পণ্ডিত নয়?

—হ্যাঁ স্যার!

আমি হেসে বলি—আমাকে আবার স্যার কি হে দেবু?

বাবা ছিলেন বহরমপুরের জেলার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কর্মচারী হলেও মনে মনে তিনি শ্রদ্ধা করতেন স্বদেশী আন্দোলনের বন্দীদের। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বছর সতের-আঠারোর একটি কিশোর এল রাজবন্দী হিসাবে বাবার জেলে। আমারই সমবয়সী। সবচেয়ে মজার কথা ঐ একফোঁটা ছেলের নাম দেবু-পণ্ডিত! জেলারের ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল তার।

বেলটা বাজাই। পিয়নকে দু পেয়ালা চা আনতে দেব। পিয়ন ঢুকতেই তিন পা পিছিয়ে গেল দিবাকর। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললে, আজ চলি স্যার। গরিবের কথাটা মনে রাখবেন।

বুঝলাম একদিনে ওর জড়তা কাটবে না। তাছাড়া ওকে যখন কাজ দেব তখন খুব বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়াও উচিত নয়। একটু দূরত্ব রেখে না চললে সেই সুযোগে কাজে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তাই চায়ের অর্ডারটা আর দিলাম না। সামলে নিয়ে বলি, বেশ সোমবার আমার সঙ্গে দেখা কর। ঐ দিনই কাজটা বিলি করব। দিন-তিনেক সময় পেলে, এর ভিতর টাকাটা জোগাড় করে ফেল।

আমার ব্যবহারে অসংলগ্ন কিছু ছিল কি? দিবাকর যেন একেবারে শিউরে উঠল। একবার আমার দিকে একবার আমার পিয়নের দিকে চোরের মতো তাকিয়ে সুট করে সরে পড়ল।

বাধা পড়ল গল্পে। একটা কাঠের কালভার্ট মেরামত হচ্ছে। ডাইভারশন দিয়ে নেমে যেতে হল জিপকে। উদ্‌বাস্তু ছুতার কাজ করছে, আদিবাসী পুরুষ রমণী খাটছে সাথে। হাত তুলে নমস্কার করল ওরা। ডাইভারশন দিয়ে ঘুরে জিপ এসে আবার উঠল সড়কে। আবার গল্প শুরু করল বীরেন—পরের সোমবারে এল দিবাকর। অফিস থেকেই অ্যালট্‌মেন্ট লেটারটা নিয়ে দেখা করতে এল আমার সঙ্গে। ঘরে তখন আর কেউ ছিল না। লক্ষ্য করে দেখলাম দিবাকর দাড়িটা কামিয়েছে। চুলে তেল-চিরুনি তখনও পড়েনি—বোধকরি আজ আলটমেন্টটা হাতে পেয়ে কাল তেল মেখে স্নান করবে। বললাম, কী হে দিবাকর? টাকাটার জোগাড় হল?

দিবাকর হেসে বললে, হ্যাঁ, হল।

—কতটাকা? কী করে হল?

—কী করে হল, তা আর নাই শুনলে। তবে হয়েছে, পুরো দু শ'ই হয়েছে।

লক্ষ্য করে দেখলাম আজ দিবাকর অনেকটা সহজ হয়েছে—স্যার স্যার ছেড়ে 'তুমি'তে নেমেছে। হেসে বলি—ভেরি গুড়, কিন্তু কথা ছিল আগে টাকাটা দেখিয়ে তবে তুমি চিঠিখানা নেবে।

দিবাকরও হেসে বলে—সেই জন্যেই আজ দেখা করতে এসেছি তোমার সঙ্গে। মির‍্যাকুলাস কোয়েন্সিডেন্স বলতে পার—আজ আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী। আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগে ঠিক এই তারিখে আমি নতুন জীবন শুরু করেছিলাম। আজও তোমার অনুগ্রহে এই দিনেই নতুন করে জীবন শুরু করলাম। ধৃষ্টতা মাপ কর ভাই—আজ তাই তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। অফিস থেকে ফেরার পথে একবার আমাদের ক্যাম্পে যেতে হবে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম ওর স্পর্ধায়। মাত্র তিন দিন আগে যে লোক চোখ তুলে বলতে পারেনি যে, সে আমার বন্ধু ছিল এক-কালে—আজ সে আমাকে অনায়াসে নিমন্ত্রণ করবার স্পর্ধা পায় কী করে?

একটু রূঢ় সুরে বলি, আমার তো আজ সময় হবে না দিবাকর। আর তাছাড়া তোমার সঙ্গে যখন কাজের সম্পর্ক হল, তখন যতদিন সে সম্পর্ক বজায় থাকছে ততদিন এতটা ঘনিষ্ঠ হওয়া ভালো নয়। শুধু আমার নয়, তোমারও।

দিবাকর যেন একেবারে নিভে যায়। তবু থেমে থেমে বলে—কিছু মনে কর না ভাই, এ রকম অনুরোধ আর কখনও করব না আমি। কিন্তু এখনও তো আমি কাজে নামিনি। অন্তত আজকের একটি সন্ধ্যা যদি তুমি আমাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা ভুলে আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে, তবে সুখী হতাম। জানি না, তুমি ওর টি. বি.-র কথাটা কেমন করে আন্দাজ করেছিলে—তবে আমি নিশ্চিত জানি, এই আমাদের জীবনের শেষ বিবাহ-বার্ষিকী উদ্‌যাপন। গত তিন বছরও এই দিনটি এসেছে আমাদের জীবনে—বন্ধু-বান্ধবও না ছিল তা নয়—কিন্তু হাতে একটা পয়সা ছিল না, যে কাউকে নিমন্ত্রণ করি। এই আমাদের শেষ বিবাহ-বার্ষিকী। আমার বউ নিজে রান্না করতে পারে না! রাঁধি আমি। কিন্তু বাড়ির রান্নাও খেতে বলছি না তোমাকে। শহরের দোকান থেকে ভালো সন্দেশ আনিয়েছি। প্লেটে দেব না—প্যাকেট থেকেই তুলে নিয়ে দুটো সন্দেশ মুখে দিও তুমি।

আমি বাধা দিয়ে বলি—ছি ছি দিবাকর। আমাকে আর লজ্জা দিও না, কিন্তু আজই বা তুমি বন্ধুকে সন্দেশ খাওয়াবার পয়সা পেলে কোথায়?

দিবাকর বললে—আমার শ্বশুর ধনীলোক ছিলেন। তিনি আমার শাশুড়িকে একটা আংটি দিয়েছিলেন—সেটাই আমার শাশুড়ি যৌতুক দিয়েছিলেন আমাদের বিয়েতে। কাল বাধ্য হয়ে সেটা বিক্রি করেছি দু শ' টাকায়। তা থেকেই সামান্য খরচ করেছি ভাই।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি, অন্যায় করেছ দিবাকর।

দিবাকর ম্লান হাসে।

যাই হোক অফিস ছুটির পর গেলাম ওদের ক্যাম্পে। মাকরেল ক্যাম্পের একেবারে শেষ প্রান্তে ওদের ঘর। দিবাকর প্রায় একঘরে হয়ে আছে—ওর স্ত্রীর অসুখের জন্য। একটা কুমড়ো লতা লতিয়ে উঠেছে টিনের চালে। আমার মতো সম্মানিত অতিথির জন্য যতদূর সম্ভব ঘরদোর সাফা করা হয়েছে। অর্থাৎ যাবতীয় তোরঙ্গ-প্যাঁটরা চালান দেওয়া হয়েছে রান্নাঘরে। একটি মাত্র ঘর। সুতরাং ওর রুগ্না স্ত্রীর অন্তরালে যাবার উপায় নেই। কঙ্কালসার মেয়েটি বোধকরি সুন্দরী ছিল এককালে। আজ আর তা বোঝা যায় না। রক্তহীন হাতে একজোড়া শাঁখা শুধু। রুক্ষচুলের সীমন্তে সিন্দুর-চিহ্ন দগ্‌দগ্ করছে।

ঘণ্টাখানেক ছিলাম ওদের সেই দমবন্ধ করা কুঠুরিতে। ওরা দুজনে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে থাকে—যেন ওদের ঘরে পদধুলি দিতে আসাটা আমার তরফে একটা দুর্লভ ঔদার্য। যতবার অন্য কথা বলতে যাই, ততবারই ঘুরে ফিরে আসে সেই কথাটাই—আমিই ওদের বাঁচিয়েছি, আমার দয়ার তুলনা নেই, আমি মানুষ নই, দেবতা। বিরক্ত হয়ে উঠি ক্রমশ। দিবাকর বলেছিল ওর শ্বশুর বড়লোক ছিলেন; বুঝলাম চাল মেরেছে একটা। ওর স্ত্রীর, ওর নিজের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সই প্রমাণ

করছে আমার মতো মাননীয় অতিথির পরিচর্যা অভ্যাস নেই ওদের।

সত্যই কাগজের প্যাকেটে করে সন্দেশ এনে দেওয়া হল আমাকে। কেমন যেন বাড়াবাড়ি মনে হল সেটা। কিন্তু এ-নিয়ে রুগীর সামনেই কিছু বলা চলে না। ভদ্রতা রক্ষা করে একটি মাত্র সন্দেশ তুলে মুখে দিলাম। এ নিয়ে ওরা সদলবলে অনুযোগ করতে থাকে। আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম ওদের মনের ছবি। ওরা চাইছে যেন আমি যথেষ্ট ভুক্তাবশিষ্ট রেখে যাই। দিবাকরের রুগ্না স্ত্রীই শুধু নয়, জুল-জুল চোখ প্রতিবেশীর বাচ্চা ছেলেটার দৃষ্টিতেই শুধু নয়—দিবাকরের চোখেও দেখলাম ফুটে উঠেছে লোলুপতা। বেরিয়ে আসার সময় ওর স্ত্রী বলল—আবার আপনার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে কি না জানি না,—তবে আপনার দয়ার কথা ভুলব না।

আমি হেসে বলি, বারে বারে যদি ঐ কথাই বলতে থাকেন তবে সত্যিই আর দেখা করতে আসব না কোন দিন।

বিদায় নিলাম যখন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাকরেল ক্যাম্পের ঘর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে কাঠের উনানের ধোঁয়া। শাঁখের আওয়াজ ভেসে বেড়াচ্ছে জোনাকজ্বলা সান্ধ্য বাতাসে। দিবাকর আমাকে জিপে তুলে দিয়ে গেল। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিচ্ছি, হঠাৎ আমার হাত দুটি ধরে ভেঙে পড়ল সে, সত্যিই নতুন করে আমার প্রাণ দিলে তুমি। জানি বাঁচবে না, তবু ওকে বাঁচাবার একটা মন-ভোলানো ব্যর্থ চেষ্টা করতে পারব। সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছি না, একটা চিঠিতে সব লিখেছি —এটা পড়ে দেখ।

বন্ধ খামটা আমার কোলে ফেলে দিয়ে আর সে দাঁড়াল না।

বীরেন মৈত্র চুপ করে।

গাড়ি লাংজোলা ক্যাম্পে প্রবেশ করেছে।

ঋতব্রত বললে, মন্দ নয় শর্ট স্টোরিটা, ট্র্যাজিক পরিবেশটা ঠিকমতো ফুটিয়ে লিখতে পারলে—

বাধা দিয়ে বীরেন মৈত্র বলে—গল্পটা আমার শেষ হয়নি ঋতুদা। আসল ট্রাজেডির কথাটা বলা হয়নি। সে ট্রাজেডির নায়ক দিবাকর গোস্বামী নয়, আমি নিজে। বাড়ি এসে চিঠিখানা খুলে পড়লাম। দিবাকর লিখেছে—"তোমার অমায়িক ব্যবহারের কথা জীবনে ভুলিব না। ইতিপূর্বেও বহু বন্ধু-বান্ধবের নিকট চাকরির উমেদারি করিতে গিয়াছি—কিন্তু-সহজ-সরল কথাটা কেহই বলে নাই। পরিচয়ের জন্যই, বন্ধুত্বের জন্যই তাহারা সঙ্কোচ করিয়াছে। একমাত্র তুমিই সোজা কথাটা সরলভাবে বলিয়াছ। ভাবিয়াছিলাম আমাকে চিনিতে পারার পরে হয়তো তুমি পিছাইয়া যাইবে; কিন্তু তুমি মহৎ —বন্ধু বলিয়া অহেতুক চক্ষুলজ্জার জালে জড়াইয়া আমাকে প্রত্যাখ্যান কর নাই। ..... আংটিটা বিক্রয় করিয়া ঠিক দুইশত টাকাই পাইয়াছিলাম। তাহা হইতে আজকের উৎসবের জন্য দশটা টাকা খবচ করিয়াছি। এ জন্য ইতিপূর্বেই তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছ, সত্যই প্রতিশ্রুত অঙ্কের ভিতর হইতে এ দশটা টাকা খরচ করা আমার অন্যায় হইয়াছে। মনে করিও বন্ধুর বিবাহে দশটাকার একটা উপহার কিনিয়া দিয়াছ। বিশ্বাস কর এ দশটাকা পূরণ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। ভগবান দিন দিন তোমার শ্রীবৃদ্ধি করুন।"

বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন ঋতুদা, খামের ভিতর চিঠি ছাড়াও ছিল উনিশখানা দশটাকার নোট !

* * *

জিপ এসে খ্যাঁচ করে ব্রেক কষল লাংজোলা ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পে।

উদ্বাস্তুরা গোল হয়ে বসেছে একটা গাছের তলায়। বীরেন মৈত্রের একটা টুল জুটেছে। সামনে দাঁড়ানো একজন লোককে সে প্রশ্ন করে : তুমি স্বীকার করছে যে রাখহরি তোমার গ্রুপে কাজ করেছে এগার দিন?

—আজ্ঞে হ।

—তাহলে ওর প্রাপ্য টাকা ওকে দাও নি কেন?

—দিছি ছার। কড়ায় গণ্ডায় মিটায়ে দিছি।

—মিটিয়ে দিয়েছ তো অ্যাকুইটেন্স রোলে সই নেই কেন? মানে ওকে দিয়ে তোমার খাতায় লিখিয়ে নাওনি কেন?

—ও টাকা নিছে ছার—কিন্তুক টিপছাপ দে নাই।

ও পাশ থেকে গর্জে ওঠে হাড়-পাঁজরা সর্বস্ব একজন বৃদ্ধ উদ্বাস্তু। কাশির ধমকে আটকে যায় তার অর্ধেক কথা : মিছা কথা ছার! হালায় এক পয়সা দে' নাই.... যগনরে শুধান ..... মেধোরে শুধান... সব্বাই সাক্ষী আছে।

একসঙ্গে পাঁচছয়জন চিৎকার করে কথা বলতে যায়। মৈত্র এক ধমকে থামিয়ে দেয় ওদের। যগন পতিতুণ্ডি বোধহয় ক্যাম্পের একজন মাতব্বর—মৈত্র তাকেই বলে ঘটনার আনুপূর্বিক একটা বিবৃতি দিতে। এক নিশ্বাসে কী যেন বলে গেল যগন। পূর্ব-বঙ্গের ভাষা—নোয়াখালি অথবা চট্টগ্রামের। ঋতব্রতের বোধগম্য হল না—সে পশ্চিমবঙ্গের ছেলে; কিন্তু অনায়াসে বুঝে নিল বীরেন মৈত্র। ধৈর্য ধরে সবটা শুনে হো-হো করে হেসে ওঠে; ঋতব্রতের দিকে ফিরে বললে, আপনি যখন এসে পড়েছেন তখন আপনিই মামলার বিচারটা করে দিন। কেসটা খুব জটিল, অবধান করুন : এই শ্রীহরি দাশ হচ্ছে আমার গ্রুপ-লিডার। দিন দশেক আগে ও একটা পেমেন্ট পেয়েছে। দলের একজন কর্মী— কী যেন নাম তোমার?

বৃদ্ধ বলে, রাখহরি দাশ আজ্ঞে।

—হ্যাঁ, দলের একজন কর্মী রাখহরি অভিযোগ করেছে যে, দলপতি শ্রীহরি তাকে তার ন্যায্য মজুরি মিটিয়ে দেয়নি। বর্তমানে আমি তারই তদন্ত করছি। রাখহরি বলছে সে টাকা পায়নি আর শ্রীহরি বলছে সে টাকা দিয়েছে।

ঋতব্রত বাধা দিয়ে বলে, কিন্তু টাকা দিলে প্রাপককে সই দিয়ে টাকা নিতে হয় না?

মৈত্র ইংরেজিতে বলে—হয়; কিন্তু তদন্তে এইমাত্র একটি নতুন সত্যাবিষ্কার করা গেল। বাদী শ্রীমান্ রাখহরি হচ্ছেন প্রতিবাদী শ্রীমান্ শ্রীহরির পরম পূজ্যবাদ পিতৃদেব। শ্রীহরির বক্তব্য—গত বৎসর পিতৃআজ্ঞায় তিনি একটি উদ্বাস্তু কন্যার পাণিপীড়ন করেছেন; এবং তাঁর শ্বশুর মহাশয় যে পাঁচকুড়ি টাকা নগদ দিয়েছিলেন সেটা বাদী সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেছেন। সুতরাং বাদীর বর্তমান প্রাপ্য উনিশ টাকা বাদ দিলেও তিনি এখনও একাশি টাকা পাবেন। অপরপক্ষে রাখহরির বক্তব্য বিবাহরাত্রেই তিনকুড়ি টাকা খরচ হয়েছিল এবং বাকি টাকা দিয়ে তিনি বধূমাতাকে একখানি শাড়ি কিনে দিয়েছিলেন, সুতরাং...

*   *   *

রাঙা-মাটির আস্তরে ঢাকা অরণ্যময় পাহাড়ে দেশ এই দণ্ডকারণ্য। বিশাল মালভূমি একটা। প্রচুর খনিজ সম্ভার, প্রভূত বনজ সম্পদ আর সুবিস্তীর্ণ উর্বর কুমারী ভূমি কেমন করে এতদিন এখানে লুকিয়ে ছিল ভাবলে অবাক লাগে। উঁচু-নিচু পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। শীতে ঝরাপাতার দিনে অদ্ভুত নগ্ন তার রূপ—নেংটি-সার আদিবাসী মুরিয়া যুবকের মতো। বসন্তে কচিপাতার সবুজাভায় আবার যখন সে সাজে—আমের নতুন লালপাতার আগুন লাগে বনে বনে, মনে হয় যেন কাশ্মীরের চেনার-বন;উৎসব রজনীতে বাইসন-হেডেড মারিয়া-গোণ্ড রমণীর মতো তখন তার সাজের বাহার! এদেশে ধানের খেত আছে—কিন্তু তাঁর পশ্চাদ্‌পটে খাড়া পাহাড়। এ দেশে আমের গাছ আছে—কিন্তু তার তলায় দূর্বা নয়, রাঙামাটি। এ দেশে বর্ষা হয়, বাংলা দেশের মতো ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায় দিগ্‌দিগন্ত—আসে ধুলোর ঝড়—কালবৈশাখী; বর্ষা থাকেও তিন-চার মাস। কিন্তু সে বর্ষা বাংলা দেশের বন্যাবাহী বর্ষা নয়। তিন দিন দিবারাত্র বৃষ্টি হবার পর যখন তা থামে তখন আপনি সোয়েডের জুতা পায়ে পথে বার হতে পারেন। জল সরে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। ঋতব্রত চেয়ে চেয়ে দেখে আর ভাবে এমন একটা দেশ কি পছন্দ হবে, পদ্মা-মেঘনা-আড়িয়েলখাঁ বিধৌত নদীমাতৃক ভূখণ্ডের এই শ্যামল

মানুষগুলোর?

মানুষের যেমন মাথা আছে তেমনি আছে মন। সুতরাং মাথা গোঁজার জন্য এমন ঠাঁই খুঁজতে হবে যেখানে মাথাও গোঁজা যায় মনও বসতে পারে। গাছকে এক জায়গা থেকে তুলে যে-কোন আব একটা জায়গায় লাগিয়ে দিলেই সে বাঁচে না। কোন রকমে বেঁচে থাকলেও সে বাড়ে না, ডালপালা মেলে না। তার জন্য চাই অনুকূল আবহাওয়া আর অভ্যস্ত পরিবেশ। গাছের যদি মেজাজ থাকে, মানুষের থাকতে নেই?

কথাগুলো পড়ছিল একজন চিন্তাশীল কথাশিল্পীর উপন্যাসে এই পুনর্বাসনের প্রসেঙ্গই কথাগুলি বলেছিলেন তিনি। এ মতের সারবত্তা মেনে নিয়েছিল সে। আজ মাকরেল ক্যাম্প আর জুড়ানী গাঁয়ের মানুষগুলিকে দেখে ওর মনে সন্দেহ জেগেছে। বোধহয় পুনর্বাসন সম্বন্ধে এটাই শেষ কথা নয়। না হলে খাল-বিল-নদীর দেশের শ্যামলিমায় যারা মানুষ তারা এখানে এত উৎসাহভরে নীড় বাঁধছে কেমন করে?

বোধহয় প্রাণের তাগিদটা সবচেয়ে বড় বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। মানুষ খোঁজে তার পরিচিত অভ্যস্ত পরিবেশ, অনুকূল বাতাবরণ—কিন্তু তার চেয়েও বেশি করে চায় বাঁচতে। প্রাণধাবণের প্রেরণায় নতুনের সঙ্গে খাপ খাইযে নেওয়া তার কাছে নতুন কথা নয়। মেয়েদের জীবনে তো এই নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজন আবশ্যিক। যে পরিবেশে, যে জল-হাওয়ায় সে আঠার-বিশ-বাইশ বছর ধরে বেড়ে ওঠে সেখান থেকে তাকে সমূলে উৎপাটিত করে এনে রোপণ করা হয় নতুন জমিতে। রাতারাতি। তৎক্ষণাৎ পুনর্বাসন পায় সে। নতুন করে বাঁচতে শেখে নতুন পরিবেশে। ধনীর দুলালী এসে গোবর নিকাতে বসে—মেটে ঘরের মেয়ে গিয়ে বসে ড্রইংরুমের সেট-এ। কোন্নগরের কনে এসে ঘর করে বরিশালের বরের; মৈমনসিং-এর মেয়ে পুনর্বাসন পায় নদীয়ার নতুন সংসারে। পুরুষের জীবনও তাই। ইংল্যান্ড-স্পেন-পর্তুগালের মানুষ গিয়ে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে কানাডায়, আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়া আর নিউফাউন্ডল্যান্ডে। যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বরবুদরে গিয়ে একদিন বসতি স্থাপন করেছিল এদেশেরই মানুষ। ‑রকারি আনুকুল্য ছিল না তার পেছনে। বুলডোজার দিয়ে জঙ্গল সাফ করানো হয়নি, ট্রাক্টার দিযে চষে দেওয়া হয়নি কুমারী ভূমি—তৈরি করে দেয়নি কেউ বাস্তুবাড়ি—ঘরের দোরে পৌঁছে দেয়নি লাঙল-বলদ, অ্যামোনিয়াম সালফেট আর বীজধান। অজানা দেশে, প্রতিকূ া পরিবেশে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করেছে এদেরই পূর্বপুরুষ—আপন বীর্যে। ইসরাইলের মানুষ, জার্মানির মানুষ করেছে আমাদের চোখের ওপরেই। অত কথা কি, পশ্চিম পাকিস্থানের সর্দারজীদের গিয়ে দেখে আসুন দিল্লীর আশেপাশে, যুক্তপ্রদেশে আর মধ্যপ্রদেশের গ্রামে—তারা শুধু মাথাই গোঁজেনি, নতুন পরিবেশে মনও বসিয়েছে। তবে পুববাঙলার মানুষগুলিই বা পারবে না কেন? এদের রক্তের মধ্যে তো বীর্যহীনতার বীজ নেই। এদেরই পূর্বপুরুষ বাবেবারে বাস্তু বদলেছে। কীতিনাশার ভাঙনে—জমিদারের অত্যাচারে গ্রামকে গ্রাম উদ্বাস্তু হয়েছে, জরু-গরু বাল-বাচ্চা নিয়ে সরে গেছে নতুন অঞ্চলে। বাদা-অঞ্চলে জঙ্গল সাফ করে হাঁসিল করেছে নতুন ভূখণ্ড; নতুন জাগা চরের বুকে তুলেছে খড়ে ঘর। ইজারা নিয়েছে বুনো-শুয়োর অধ্যুষিত ঘন জঙ্গল—পত্তনি নিয়েছে পলিমাটি-পড়া নতুন চরের জমি—গড়ে তুলেছে নতুন গ্রাম, নতুন বসতি, নতুন জনপদ! এদেরই বাপ ঠাকুর্দা। ইতিহাস তার সাক্ষী। তারা তো কই সরকারি সাহায্য নেয়নি কোনদিন। তাদের জন্য তো সাব্‌সিস্টেন্স লেভেলের হিসাব করেনি কেউ? মেইন্টেনেন্স ডোলের বন্দোবস্ত রাখেনি কোন সবকারী সংস্থা?

স্থান-কাল আর পাত্র। স্থান নির্বাচনে ভুল হয়নি, পাত্ররাও নির্বীর্য নয়—ভুল হয়েছে কাল-নির্ণয়ে। দণ্ডকারণ্যে আসতে কালাপানি পার হতে হয় না। এদের প্রতিবেশী গিয়ে সুষ্ঠু পুনর্বাসন নিয়েছে আন্দামানে। তাই আবার বলি, ভুল হয়েছে কালে। এই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় যদি হাত দেওয়া যেত আজ থেকে দশ-বারো বছর আগে তাহলে ইতিমধ্যেই সোনা ফলে যেত এখানে। ত্রুটি হয়েছে বিলম্ব কবার। দশ-বারো বছর একটা সুস্থ মানুষকে পাগলা-গারদে আটকে রাখলে সে পাগল হয়ে

যায়—দশবারো বছর একজন নির্দোষীকে কারাকারে আবদ্ধ করে রাখলে পাকা ক্রিমিনাল হয়ে বেরিয়ে আসে সে! তেমনি একদল সুস্থ-সবল প্রাণচঞ্চল মানুষকে যদি একযুগ ধরে ভিক্ষা আর ডোল-নির্ভর করে কোন ক্যাম্পে ফেলে রাখা হয় তখন তারাও ভিক্ষাজীবী হয়ে পড়ে। বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্পের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেছিলেন, 'দে আর এ ক্লাস অফ পার্পিচুয়াল প্রফেশানাল লিগালাইজ্‌ড বেগার্স।' ওরা নাকি আইন-সম্মত একদল চির-ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদরান্নের সংস্থানের কথা আর তারা ভাবতে পারে না। দোষ ওদের নয়—দোষ তাদের, যারা ওদের ভাগ্য নিয়ে বারো বছর ধরে যারা জুয়া খেলেছে দায়ী তারা। দ্বাদশবর্ষব্যাপী পরনির্ভরশীল ভিক্ষাপুষ্ট জীবনের প্রতিক্রিয়া।

মনে আছে চিফ-ইঞ্জিনিয়ারের পরিদর্শনের কথা। কাজ দেখতে এসেছিলেন উনি বাথ্‌না ক্যাম্পে। উদ্বাস্তু-কর্মীরা রাস্তার নয়ানজুলিতে মাটি কাটছে। সঙ্গে ছিল ও. এস. ডি. মৈত্র আর লেডি ওয়েল-ফেয়ার অফিসার রেখা মিত্তির। হঠাৎ একজন উদ্বাস্তু কোদাল রেখে এগিয়ে এল। বছর পঁচিশেক বয়স—মাঝারি গঠন, বলিষ্ঠ। সর্বাঙ্গে তার ধুলার ছাপ। দু'হাতের তেলো-উল্‌টিয়ে বড়-সাহেবের সামনে মেলে ধরে বলে—'দ্যাহেন ছার অবস্থাডা দ্যাহেন!'

দু'হাতের তালুতে তার ফোস্কা পড়েছে আধুলির মাপে। ঋতব্রতের মনে হয়েছিল একে এখনই ছুটি দেওয়া উচিত। ফোস্কা গলে গেলে সেপ্‌টিক হতে পারে। বড় সাহেব ওর হাত দুটি দেখে লেডি ওয়েলফেয়ার অফিসার রেখা মিত্তিরকে বললেন—তোমার কাঁথা সেলাইয়ের কোন কাজ খালি আছে? অথবা বড়ি দেবার? এঁকে ভর্তি করে নাও।

রেখা মিত্র রুমালে মুখটা মোছে—হাসি গোপন করে আর কি।

এ অপমানে ছলছল করে ওঠে উদ্বাস্তু যুবকটির দু চোখ।

তার দিকে ফিরে বড়-সাহেব বলেছিলেন—তোমার বদলে আমি যদি মাটি কোপাতে শুরু করি আজ—তাহলে আমার হাতেও ফোস্কা পড়বে। অনভ্যাসের মাশুল। কিন্তু হাত দুটি লুকিয়ে রাখব আমি—চাষীর ছেলে না হলেও। কাউকে দেখতে দেব না। আর তুমি নিজেকে কৃষক বলে পরিচয় দিয়েও আমাকে হাতের ফোস্কা দেখাচ্ছো একটি মহিলার উপস্থিতিতে?

ঋতব্রতের মনে হয়েছিল এটা বড়-সাহেবের বাড়াবাড়ি। বয়স বাড়ছে যত ততই দুর্মুখ হয়ে উঠছেন ভদ্রলোক। সেটা বুঝতে পেরেছিলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার—তাই অফিসে ফিরে যেন ওকে উদ্দেশ করেই বললেন—এ পরিকল্পনার হিউম্যান আসপেক্টটা ভুল না বোস। সাত একর জমি, বাড়ি, লাঙল, গরু, আর বীজধানই এর সমাধান নয়। এদের মানুষ করে তুলতে হবে। এই ব্রত আমরা নিয়েছি।

জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার যশোবন্ত সিং ওঁকে খুশি করবার জন্য ইংরেজিতে বললেন—এঁরা একেবারে অমানুষ স্যার। ভারি অলস।

রুখে উঠেছিলেন চিফ— নো! ভুল বলছ তুমি। এরা অমানুষ নয়, অলস নয়। এদের অমানুষ করে তোলা হয়েছে—অলস হতে বাধ্য করা হয়েছে।—তারপর ঋতব্রতের দিকে ফিরে সাদা বাঙলায় বললেন, 'ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত ; এ তোমার এ আমার পাপ।'

যশোবন্ত সিং বুঝতে পারে না এ বাংলা উদ্ধৃতির মর্ম। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তার সপ্রশ্ন দৃষ্টির জবাবে বড়সাহেব ইংরেজিতে বলতে থাকেন—বারো বছর ধরে ওদের আমরা মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে এসেছি। ফিডিং-বট্‌লে ওদের খাবার খাইয়েছি আমরা—বিনিময়ে কুটোটি নাড়তে দিইনি। কোন কাজ করতে বলিনি ওদের—পাঁচবছর অন্তর ব্যালট-পেপারে অনুকূল একটা বাক্সে ভোট দিতে বলা ছাড়া। ওদের কর্মহীন ক্যাম্পের র‍্যাশনগুদামে প্রতি সপ্তাহে যে জোড়া-বলদ পৌঁছে দিয়ে গেছে সাপ্তাহিক র‍্যাশন, তার মর্যাদা ওরা দিয়েছে। পাঁচ বছর অন্তর একদিন তাস খেলা বন্ধ রেখে গেছে পোলিং-বুথে। আমাদের এ ব্যবস্থা যেন কোন প্রাণচঞ্চল দুরন্ত শিশুকে আফিং খাইয়ে নিশ্চিন্ত থাকা, আর তারপব যখন যৌবনে সে অকর্মণ্য হয়ে ওঠে তখন তাকেই দোষারোপ করা। প্লিজ রিমেম্বার যশোবন্ত সিং—ওদের মানুষ করে তোলার দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু সেটা হোয়াইট ম্যানস্

বার্ডেনের মতো উঁচু মঞ্চ থেকে ঘোষণা কর না—সেটা আমাদের পূর্ব-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুধু। তুমি-আমি আমাদের নিজেদের স্বার্থে আর অকর্মণ্যতায় ওদের বারোটি বছর ধরে গুদামে পচিয়েছি।

ওঁর পরিকল্পনাটা একদিন উনি বুঝিয়েছিলেন ঋতব্রতকে ধৈর্য ধরে—কোথায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ওঁর মতের মূল বিরোধ। কর্তৃপক্ষ চাইছেন, অতি দ্রুত জঙ্গল সাফ করে ফেলতে—বড় বড় ঠিকাদার এনে রাতারাতি গ্রামের পত্তন করতে। বাঙলাদেশ থেকে সরাসরি স্পেশাল ট্রেনে উদ্বাস্তুদের এনে সেই গ্রামে, সেই জমিতে বসিয়ে দিতে। তাদের প্রত্যেক পরিবারকে সাত একর জমি, বাড়ি, লাঙল-বলদ আর বীজধান চুকিয়ে দিয়ে নিশ্বাস ফেলে বলতে—তামাম শুদ্।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার বলেছিলেন—এতে তামাম শোধ হয় না বোস। স্বাধীনতা ক্রয় করবার উদ্দেশ্যে পূববাংলা থেকে এদের মূলোৎপাটন করে আমরা যে ঋণ করেছিলাম সেই ঋণের শোধ হয় মাত্র।

ঋতব্রত বলেছিল—এটাই তো আমাদের ঋণ, আর কী বাকি রইল?

—বারো বছর এদের বন্দিজীবনের খেসারত? ব্যাস্টিল আর বেলসেনের বর্ণনা শুধু পড়েছি—কিন্তু পি. এল. ক্যাম্প তো চোখে দেখা আছে বোস। এই যে দশ-বারো বছর ওদের বন্দী করে রাখলাম—কর্মক্ষমতা হরণ করলাম, ভিক্ষাজীবী করে তুললাম ওদের, তার খেসারত আছে না?

—তা আপনি কী করতে চান?

—আমি বলতে চাই শুধু জমি-বাড়ি-লাঙল-গরু বিলিয়ে আমরা যদি নিজেদের দায়িত্বমুক্ত মনে করি তাহলে বিরাট ভুল করব। এরা চাষ করতে পারবে না সে জমি! দু-পাঁচ বছর পর আবার একদিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে হাজির হবে হাওড়া-শেয়ালদ' স্টেশানে, এস্প্ল্যানেডে, স্ট্র্যান্ড-রোডের ধারে ধারে। সরকার বিরক্ত হয়ে বলবেন—ওদের তাহলে মরাই উচিত। বলব তুমি-আমিও। বলবে খবরের কাগজের রিপোর্টারেরাও। অথচ আসল গলদ কোথায় তা কেউ ভেবে দেখবে না।

—বুঝলাম, তাই আপনি ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্প খুলে আগে ওদের দিয়ে মাটি কোপানো অভ্যাস করাচ্ছেন। হাতে ফোস্কা পড়লে ব্যঙ্গ করছেন। কিন্তু একটা কথা স্যার, সরকারি রাস্তায় মাটি কুপিয়ে যদি ওরা অভ্যস্ত হতে পারে তবে নিজের জমিতেই বা কাজ করতে পারবে না কেন।

—কেন জান? জমি-বাড়ি-লাঙল-বীজ দেবার পর আইন অনুযায়ী তাকে আর ডোল দেওয়া যাবে না বলে। যতদিন না পুনর্বাসন পাচ্ছে, অর্থাৎ ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্প ছেড়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠছে ততদিন ওদের আংশিক ডোল দিতে পারি আমরা। পি. এল ক্যাম্প থেকে সরাসরি ওদের গ্রামে বসিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে আমি নারাজ— ওয়ার্ক-সাইট ক্যাম্পের বকযন্ত্রে চোলাই করে মানুষ করে নিতে চাই তার আগে। এখানে ওদের হাতে ফোস্কা পড়বে, ক্রমে ঘাঁটা পড়বে। এখানে প্রথমে ওদের গায়ে গতরে ব্যথা হবে, ক্রমে সে ব্যথা সারবে। ধীরে ধীরে ডোলের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। মাস ছ'য়েক পরে ওরা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হতে শিখবে। তখন জমি পেলে চাষও করতে পারবে—তার আগে নয়। এই ছয়মাসের মাটি কাটার পরিশ্রম ওদের জমি-বাড়ি পাওয়ার মূল্য বলেই ওরা বুঝতে শিখেছে আজ। প্রথম প্রথম ওদের প্রচণ্ড আপত্তি ছিল রাস্তার কাজ করায়—ওরা নাকি ভাগচাষী, মজুর নয়। কর্তৃপক্ষ গোপনে রাজি হয়েছিলেন নরম হতে—আমি হতে দিইনি। আজ ওরা বুঝেছে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। আজ ওরা কাজ করছে—হাতের ফোস্কা নিয়েও।

ঋতব্রত বলেছিল—কিন্তু কথাটাতো সত্যি। ওরা চাষী, মজুর নয়।

—ড্যাম ইট! —ধমক দিয়ে উঠেছিলেন চিফ। কে চাষী? কেউ নয়! সরকারি খাতায় এগ্রিকালচারিস্ট ফ্যামিলি লেখা আছে বলেই ওরা চাষী? ব্যাপারটা কোনদিন তলিয়ে ভেবে দেখেছ? এক যুগ আগে যে লোকটা এসে বলেছিল সে ভাগচাষী, আজ সে পঙ্গু বৃদ্ধ। এক দশকেই সে এতটা বুড়িয়ে যেত না অবশ্য—কিন্তু ডোলের অর্ধাহার, ক্যাম্পের অকর্মণ্য জীবন তাকে অকাল বাধ্যক্যে টেনে এনেছে দ্রুতগতিতে। লাঙলের মুঠ ও আর চেপে ধরতেই পারবে না কোনদিন। আর আজ যে কর্মক্ষম যুবক—ঐ যে বাইশ চব্বিশ বছরের ছেলেটি হাতের ফোস্কা দেখাচ্ছিল আমাকে, ও কি চাষী?

ও যখন পুব-পাকিস্তান ছেড়ে এ দেশে আসে তখন পাঠশালায় যেত, গাছে গাছে লাফালাফি করত, গরু চরাত অথবা ন্যাংটো হয়ে মাছ ধরত খালে-বিলে! জীবনে কখনও ও লাঙলের মুঠ ধরেছে? কাস্তে ধরেছে? কী অভিজ্ঞতা আছে ওর? চাষী! আমন ধান কোন মাসে রুইতে হয়, আউস ধান কোন মাসে পাকে, চাষের এসব রডিমেন্টারি কথাই কি ও জানে? গো অ্যান্ড আস্ক হিম! ও শুধু জানে সপ্তাহে মাথা পিছু কতটা ক্যাশডোল পাওয়া যায়—কত সের চাল, কত ছটাক ডাল। আর জানে, অ্যাসেমব্লি অভিযানে ফেস্টুন ঘাড়ে যোগ দিলে দৈনিক ক-আনা প্রাপ্য হয়। চাষী পরিবার! মাই ফুট্!

এদিকটা ভেবে দেখেনি ঋতব্রত। জানে না, ভেবে দেখেছেন কি না কর্তৃপক্ষও।

ঋতব্রত ভয়ে ভয়ে বলে, একটা কথা স্যার। আপনি যে ওদের স্পষ্ট কথা অমন কড়া ভাবে শুনিয়ে দেন—আমার ভয় করে। ফস্ করে যদি অপমান করে বসে?

বড় সাহেব হাসেন। বলেন, স্পষ্ট কথা বলার জন্য অপমান হয়তো হতে হবে আমকে, বোস—তবে ক্ষেত্রটা তুমি যা ভাবছ তা নয়। এর চেয়ে অনেক বেশি কড়া কথা আমি বলেছি উদ্বাস্তুদের—ওরা কখনও আমাকে অপমান করেনি। কারণ ওরা জানে আমার প্রকৃত স্বরূপ। একটা পোষা জন্তু যেটুকু বোঝে—মানুষ সেটা বুঝবে না? তবে তোমার আশঙ্কা অমূলক নয়। স্পষ্ট কথা বলার জন্য অপমানিত আমাকে হতে হবে। অন্য মহল থেকে। সেটা আমি জানি। সক্রেটিস, গ্যালেলিও, ব্রুনো সত্য কথা স্পষ্ট করে বলে কী শাস্তি পেয়েছিলেন তাও জানা আছে আমার। ইতিহাস তুমি একাই বড়নি বোস—আমিও কিছু কিছু পড়েছি!

ঋতব্রত আর কথা বাড়ায়নি।

বড়-সাহেব নিজে থেকেই আবার বলেন—আমি হয়তো চলে যাব,—মানে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—কিন্তু তোমরা থেক। দেখ, যদি কিছু করতে পার। স্কিমটা অপূর্ব! বাঙালির বাঁচবার মতো এই পরিকল্পনাটি পাঁচভূতে নষ্ট করে দিলে বাঙলারই সর্বনাশ! এতবড় সুযোগ আমরা বেশিদিন পাব না। বাঙালি উদ্‌বাস্তু যদি না আসে তবে এখানে আমদানি করা হবে ভিন্ন প্রদেশ থেকে ভূমিহীন কৃষক। সেটা বাঙালির পক্ষে যে কতবড় সর্বনাশ হবে তা শুধু আমিই জানি। যদি প্রাকৃতিক কারণে এ স্কিম নষ্ট হত, যদি দৈব-দুর্যোগে এতবড় সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যেত তবু যা হোক সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু এ তো তা নয়। 'মানব জীবন রইল পতিত' এটাই ক্লাইমেক্স নয় বোস—তার চেয়েও বড় ট্রাজেডি হচ্ছে 'আবাদ করলে ফলতো সোনা!'

আবার কিছুটা চুপচাপ। বড়সাহেব আবার বললেন—তুমি তো এককালে লিখতে, এদের নিয়ে লেখ না একটা কিছু।

—সেই জন্যেই তো এসেছি স্যার। পরিকল্পনাকে সফল করার সামর্থ্য একা আমার নেই—কিন্তু এই মানুষগুলির ইতিকথা লিখে যাবার মতো ক্ষমতা আমার একলারই আছে।

—হ্যাঁ, ওদের দেখ, ভাল করে দেখ, কাছ থেকে দেখ। মাঝে মাঝে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ওদের মধ্যে মিশে যাও; ওদের গাঁয়ে গিয়ে রাত্রিবাস কর, না হলে ওদের মনের কথা জানতে পারবে না। কোন পূর্বধারণা নিয়ে ওদের কথা লিখ না, তুমি রাজনৈতিক কারণে লিখছ না,—মনে রেখ তুমি কথাশিল্পী। দরদ দিয়ে ওদের দুঃখটা বুঝতে চেষ্টা কর। অতিরঞ্জন কর না, অথচ ওদের আশা-আকাঙক্ষা, ওদের সার্থকতা-ব্যর্থতার ইতিহাসকেও ছোট কর না।

অন্তপর্ব

[উনিশ শ' একষট্টি সালের মে মাসের মাঝামাঝি।]

কেমন একটা অবসাদে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দেবু পণ্ডিত মিটিং থেকে ফিরে এল। নতুন-পত্তন গাঁয়ের ঘরে ঘরে আজ উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার—অনেক-অনেকদিন পরে আজ আবার ওরা আশার আলো দেখতে পেয়েছে। এতদিনে ঘর হয়েছে, জমি হয়েছে, যৌথ-চাষের আয়োজন সম্পূর্ণ। গাঁয়ে কূপ হয়েছে, প্রাইমারি-স্কুল হয়েছে, মায়ের পট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। আজ ষোলো-আনার ডাকটা ছিল সেই উপলক্ষেই। মন্দিরের সামনে হরীতকী গাছতলায় বসেছিল মজলিস। জিপে চেপে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাহেব স্বয়ং এবং লেডি-ওয়েলফেয়ার অফিসার রেখা মিত্র এসেছিলেন। ওঁরা বললেন, ডেসপ্যাচ অর্ডার এসে গেছে, দু-চার দিনের মধ্যেই বীজধান গ্রামে পৌঁছে যাবে।

বলদ আর লাঙল তো ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। বিলি করা হয়নি—ষোলো-আনার ডাকে স্থির হয়েছে : আপাতত ঐ বলদ-লাঙল এ-গ্রামের যৌথ সম্পত্তি। ওরা একসঙ্গে জমিটা চাষ করে দেখবে এ বছর।

যৌথ-চাষের পরিকল্পনা দেবু পণ্ডিতের। তারই সবচেয়ে খুশি হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু আজকের মিটিঙে মনটা তার ভেঙে গেছে। গাঁয়ে বোধকরি একমাত্র সেই একা মানুষ যে দুর্মনস্যতায় ভুগছে, একমাত্র তার ঘরই আজ শূন্য—সেখানে কেউ সাঁঝের পিদিম জ্বালায় না।

উমা আজ সাতদিন হল কাঁকের যক্ষা-হাসপাতালের চলে গেছে।

কিন্তু না। এ বিষণ্ণতা তার ব্যক্তিগত শূন্যতায় নয়। তার চেয়ে অনেক অনেক বড় আঘাত সে পেয়েছে আজ ষোলো-আনার ডাকে। এবং আঘাতটা এসেছে এমন একজনের কাছ থেকে যাঁর সম্বন্ধে ওর ধারণা ছিল অন্যরকম। আজ ওর বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছে জওহরলাল নেহেরুর লেখা 'গ্লিমসেস-অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি'র সেই অনবদ্য পংক্তিটি : ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সব মানুষই বদলে যায়।

কিন্তু তাই বলে—তারাপ্রসন্ন ন্যায়তীর্থ!

সেই জ্ঞানবৃদ্ধ! যাঁর পায়ের তলায় বসে আকৈশোর জীবনের পাঠ নিয়েছে।

হ্যাঁ, তিনিই।

মন্দিরের পুরোহিত নির্বাচনের সময়েই খটকা লেগেছিল দেবু পণ্ডিতের। রসিকলাল শিরোমণির পরিবের্তে তারাপ্রসন্ন ন্যায়তীর্থের নির্বাচনে সে খুশি হতে পারেনি। কূপমণ্ডুক প্রাচীনপন্থী শিরোমণিকে সে কোনদিনই অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করত না; কিন্তু সেই হা-হা-করা আগুনের আলোয় ঐ গোঁড়া ব্রাহ্মণের চরিত্রের যেদিকটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাও ভুলতে পারেনি। ওর মনে হয়েছিল দেবীপূজার অধিকার অর্জন করেছিলেন শিরোমণি তাঁর বিকলাঙ্গ দেহটার বিনিময়ে। হয়তো দেবু পণ্ডিত প্রতিবাদও করত; কিন্তু পঙ্গুত্বের অজুহাত দেখিয়ে রসিকলাল নিজেই যখন অব্যাহতি চাইলেন তখন আর সে কথা বাড়ায়নি।

কিন্তু আজ? আজ যে ঘটনা সম্পূর্ণ অন্য খাতে বইল :

যৌথচাষের প্রসঙ্গ শেষ হলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-সাহেব বললেন; আব একটা কথা। আপনাদের

প্রাইমারি স্কুলের বাড়িটা তো শেষ হয়েছে। ব্ল্যাকবোর্ডও পৌঁছে গেছে। স্কুলটা কবে খুলছেন?

সকলের মুখপাত্র হিসাবে তারাপ্রসন্ন বললেন, সাতাশে বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন।

—তাহলে একজন স্কুল-টিচার এবার নির্বাচন করতে হয়। আপনারাই বলুন—

মন্দিরের পুরোহিত নির্বাচনের সময় রসিকলাল শিরোমণির যে অবস্থা হয়েছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই তখন পড়েছে দিবাকর। কোন লজ্জায় নিজে থেকে কথাটা বলে? তাকে রক্ষা করল রত্নাকর ঘোষ। উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বললে, আপনি যখন অনুমতি করলেন ছার, তখন কই—এ কাজের উপযুক্ত একজন মনিষ্যিই আছেন গাঁয়ে। আমাদের দেবু পণ্ডিত। কমলপুরে তিনি পণ্ডিতি করতেন।

সভায় একটা সম্মতিসূচক কলগুঞ্জন পরিস্ফুট হয়ে ওঠার আগেই তারাপ্রসন্ন বলে ওঠেন, না। দিবাকর গোস্বামীকে এ কাজে নির্বাচন করায় এখন অসুবিধা আছে।

—কেন? অসুবিধাটা কিসের?—জানতে চায় ঘোষের পো।

তার দিকে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃক্‌পাত করে তারাপ্রসন্ন বলেন, আমার কথাটা মেনে নাও রত্নাকর। দেবুকে তোমার চেয়ে আমি কম চিনি না। নিতান্ত অসম্ভব না হলে দেবুর তরফে আমিই প্রস্তাব রাখতাম।

দেবু পণ্ডিত বিস্ময়ে মূক হয়ে যায়।

তারাঠাকুরের মুখের উপর কথা বলবে এমন মানুষ কমলপুরেও ছিল না, এখানেও নেই। অগত্যা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-সাহেব বলেন, দেবুবাবু যদি না হতে পারেন, তাহলে?

অম্লানবদনে তারাপ্রসন্ন বললেন, যতদিন না বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন ও দায়িত্বটা আমিই পালন করব।

—ন্যায়তীর্থমশায় স্বয়ং এ দায়িত্ব নিলে তো কোন কথাই নেই—অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-সাহেব ও প্রসঙ্গে যবনিকা টানেন।

মিটিঙের শেষে সাহেবরা যখন চলে গেলেন তখন তারাপ্রসন্ন বললেন, দেবু, সন্ধ্যার সময় আমার বাড়িতে একবার এস তো! কয়েকটা জরুরি পরামর্শ আছে।

দিবাকর তখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি। বলে, কী কথা?

একটু অবাক হয়েছিলেন তারাপ্রসন্ন। বুঝিবা কিছুটা আহতও। কয়েকটি খণ্ড মুহূর্ত অপেক্ষা করে বললেন, গাঁয়ের ভালোমন্দের কথাই। আরও দু-চারজনকে আসতে বলেছি—এবং তোমার কথাও, কেন তোমাকে—

—থাক ঠাকুরমশায়! আমার কথা থাক। আর গাঁয়ের ভালোমন্দ যখন আপনিই দেখছেন, তখন আবার আমাকে কেন?

তারাপ্রসন্ন একেবারে অবাক হয়ে যান। কোন জবাব দেবার আগেই হনহনিয়ে চলে গিয়েছিল দিবাকর। শূন্য কুটিরে চুপচাপ পড়েছিল একা।

অভিমান করে দেবু পণ্ডিত যদি সরে না থাকত তাহলে দেখতে পেত সেই সন্ধ্যাতেই গ্রামের বেশ কয়েকজন এসে সমবেত হয়েছেন তারাপ্রসন্নের কুটীরে। কমলপুরেও এমন চণ্ডীমণ্ডপের বৈঠক হত —সেখানে মধ্যমণির মতো থাকতেন জমিদার রায়মশায়, আর তাঁকে ঘিরে সরোজ সাঁই, ননীমাধব হৃদয় ঘোষ, রসিকলাল চাটুজ্জের দল। পারালকোটের এই বিজন-বনের একান্তে যে মজলিস বসল সেখানে শুধু ভদ্রলোকরাই সমাগত হননি—এসেছে নবীন যুগী, নবাপাল, দ্বিজপদ কর্মকার, রত্নাকর আর নীলাম্বর, আছে যগন্দ, রাখহরি, মালাকার প্রভৃতিরাও।

ছোট্ট ঘর। শালের খুঁটি ঝাঁটি-মাটির দেয়াল, মাথায় করোগেটেড টিন। ঘরের একানে-ওখানে জ্বলছে কালিওঠা গোটাকতক লণ্ঠন। ফতুয়া-গায়ে একপ্রান্তে বসে আছেন তারাপ্রসন্ন—যিনি কমলপুরের মজলিসে কোনদিনই উপস্থিত হতেন না।

সবাই কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেটা কী, তা বোঝা গেল যখন মনুয়া এসে দ্বারাপ্রান্ত থেকে ঘোষণা করল, দেবু পণ্ডিত আসবেনি। বুললে, ঠাকুরমশায়কে বলিস আমার শরীলগতিকটো

ভালো লয়।

—ও! তাহলে দেবু আসতে পারল না। তা না হক। তোমরা পঞ্চজনা যখন সামিল হয়েছে, তখন আমার বক্তব্যটা পেশ করি। নবীন, প্রশ্নটা আমি তোমাকেই করব—তোমার মেয়ের কোন সন্ধান পেয়েছ?

নবীন যুগীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠে। মাথাটা একবার না-য়ের ভঙ্গিতে ঝাঁকিয়ে দু-হাঁটুর মধ্যে গুঁজে দেয়।

রত্নাকর বলে ওঠে, আপনে কিছু পাইছেন দ্যাবতা?

—হ্যাঁ, পেয়েছি। রাধা বেঁচে গেছে। সতীশ কর্মকার তাকে কাঁকের নিয়ে গিয়েছিল। সাহেব-ডাক্তারে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে।

নবীন সোজা হয়ে বসে। মুখ তুলে তাকায়। বলে : কই আছে সে?

—যেখানেই থাক, সে নিরাপদে আছে। এখন তোমরা পঞ্চজনা বিচার করে বল, রাধা যদি গাঁয়ে ফিরে আসে আমরা কী করব?

কেউ কোন কথা বলার আগেই ছিলেখোলা ধনুকের মত লাফিয়ে ওঠে নবীন, মুখদ্দর্শন করবনি! আমার ঘরে ও কুলটা মেয়ের আর ঠাঁই হবেনি, এ আমি নিযাস্ কয়ে দিলাম ঠাকুর।

তারাপ্রসন্ন বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হলেন না। নবীনকে উপেক্ষা করে বললেন, তোমরা পঞ্চজনা কী বল?

কেউ কোন জবাব দেয় না। যুগীই আবার কিছু বলতে যায়। তাকে থামিয়ে দিয়ে ন্যায়তীর্থ বলেন, তুমি নয়, তুমি তোমার কথা বলেছ। আমি পঞ্চজনার মত জানতে চাইছি।

দ্বিজপদ বলে ওঠে, আপনিই বিধান দ্যান দ্যাবতা?

—আমার মতে রাধা কিছু পাপ করেনি। তাকে সমাজচ্যুত করার প্রশ্ন ওঠে না। আমরা তাকে গ্রহণ করব।

নবীন হাত-পা ছুড়ে বলে ওঠে, কিছুতেই লয়। আমার ছামুতে অর ঠাঁই হবেনি; এ আমি নিয্যাস কয়ে দিলাম ঠাকুর।

নির্বিকারভাবে তারাপ্রসন্ন বলেন, বেশ কথা। কিন্তু গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই থাকবে। তাই এবার দ্বিজপদকে আমি প্রশ্ন করব—কী কর্মকার? তোমার ঘরে কি রাধার ঠাঁই হবে? তুমি কি তাকে পুত্রবধূ করে ঘরে নেবে?

দ্বিজপদকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে নবীন পুনরায় চিৎকার করে ওঠে, আপনে বামুন হয়ি যুগীর মেয়ের সাথে কম্মোকারের বিয়ে দেবেন! অসম্ভব! আমি রাজি নই!

এবার স্পষ্টতই বিরক্তি প্রকাশ করেন তারাপ্রসন্ন, তুমি অহেতুক চিৎকার কর না, নবীন। তোমার রাজি-অরাজিতে কিছুই যায় আসে না। রাধা স্বয়ম্বরা হয়েছে। সে প্রাপ্তবয়স্কা। এ বিবাহ সিদ্ধ। দ্বিজপদ সম্মত হলে আমি নিজে ঐ কন্যা সম্প্রদান করব।

দ্বিজপদ হাত দুটি জোড় করে বললে, আপনেই সমাজ। আপনে যখন অনুমতি দ্যালেন, তখন অরেই আমি ব্যাটাব বউ করব।

নবীনের বিক্রম তখনও শেষ হয়নি! বলে, না! ঠাকুরমশায় পণ্ডিত হতি পারেন, কিন্তু একা তিনি 'সমাজ' নন! যুগীর মেয়ের সঙ্গে কম্মোকারের বিয়ে হয় না, হবে না! গাঁয়ে আরও দশ ঘর মানুষ আছে। একা তারা-পণ্ডিতই সমাজ নয়, আমি মানি না।

যগন্দ কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে তারা-ঠাকুর বলে ওঠেন, এতক্ষণে তুমি একটা ন্যায্য কথা বলেছ নবীন! 'সমাজ' মানে পঞ্চজনার মত! গাঁয়ে দশ নয়, পঞ্চাশ ঘর লোকের বাস। তা এক কাজ কর, কাল সকালে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুধিয়ে এস। দেখ, ক-ঘর মানুষ তোমাকে পরামর্শ দেয় ঐ দশরথ বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে ! তারই বা প্রয়োজন কী? এখানে, এই

মজলিসেই তো দশবারো ঘর লোক আছে—এদেরই প্রশ্ন করে দেখ, কতজন তোমাকে সমর্থন করে।

নবীন মুখ তুলে তাকায়।

রতন ঘোষ বলে, নবীন, পাগলামি করিস না। দ্যাশই যখন গিছে, তখন জাত ধুয়ি কি জল খাবা?

নীলাম্বর বললে, দিনকাল সব বদলে গেছে দ্যাখছেন না যুগী খুড়ো? এই যে আমি, কালাপানি ফেরত আসামী, সাত জাতের ছোঁয়া জল খায়ে দণ্ডকারণ্যে আলাম, কই প্রাচিত্তিরের কথা তো কেউ বুললে না?

নবীন দাঁতে দাঁত চিপে বললে আজ শিরোমণি ঠাকুর নাই, তাই এই অনাচারের কথা বলতে সাহস পাতিছ তোমরা।

তারাপ্রসন্ন হাসলেন। বললেন, ওটাও তোমার ভুল ধারণা, যুগী। আজ সকালেই শিরোমণির পত্র পেয়েছি। কাছেই আছে, রসো, পড়ে শোনাই।

ফতুয়ার পকেট থেকে চশমা বার করে নাকে চড়ালেন। পকেট থেকে রসিকলালের পত্রখানি বার করে পড়তে থাকেন, "দাদা, আমি যদি আজ গ্রামে থাকিতাম, আর আমার যদি সে অধিকার থাকিত তাহা হইলে আমিই উদ্যোগী হইয়া নবীনের কন্যাটির সহিত সতীশ কর্মকারের বিবাহ দিতাম।"

রতন উৎসাহভরে বলে, ঠাকুরমশায়ের চিঠি? কই আছেন তিনি? গাঁয়ে ফিরবেন না?

—না! তিনি ঐ কাঁকেরেই আছেন। গ্রামে আর ফিরবেন না।

—কেন? ফিরবেন না কেন?

তারাপ্রসন্ন সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলেন, তাহলে নবীন! এ বিবাহে তোমার মত নেই?

নবীন মুখটা তুলল। মজলিসের উপর দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে বললে, ঠিক আছে। পঞ্চজনার আদেশ মানি নিলম। মেয়ে ফিরে আসুক—

বাধা দিয়ে তারাপ্রসন্ন বলেন, মেয়ে তোমার ফিরে এসেছে নবীন। একটু আগে তোমার স্ত্রী এসে আমার বাড়ি থেকে মেয়ে-জামাইকে নিয়ে গেছেন। তারা তোমার বাড়িতেই আছে। যাও, বাড়ি যাও। আর শোন, রাগারাগি কর না। তুমি জোর করে জাত বাঁচাতে বুড়োবরের সঙ্গে ওর বিবাহ দেবার চেষ্টা করায় মেয়ে তোমার বিষ খেয়েছিল। সতীশ কর্মকার ট্রাক ড্রাইভ করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় মেয়ে বেঁচে ফিরেছে—দেখ, যেন আবার থানা-পুলিশে জড়িয়ে পড় না!

ওরা উঠে দাঁড়ায়। তারাপ্রসন্ন নবীনকেই বলতে থাকেন, বিয়ের যোগাড় যন্ত্র দেখ, তেসরা জ্যৈষ্ঠ একটা ভালো দিন আছে।

একে একে সকলেই পথে নামে। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ নবীন যুগী গড় হয়ে পেন্নাম করলে ঠাকুরমশায়কে।

—এটা আবার কী হল যুগী?

নবীন যুগী জবাব দেয় না। মাথাটা হেঁট করে।

—ও, আচ্ছা আচ্ছা!

সবাই বিদায় হলে পুত্রবধূ এসে দাঁড়ায়। বলে, আপনার ঠাঁই করে দিই বাবা?

—না মা, একবার তোমার কাকিমাকে ডাক।

ডাকতে হল না। চৌকাঠের ওপারেই অপেক্ষা করছিলেন রসিকলাল শিরোমণির স্ত্রী। এগিয়ে এলেন তিনি, মাথার ঘোমটা তুলে দিয়ে।

বৃদ্ধ বললেন, তুমি বাঁধাছাঁদা করে তৈরি হয়ে নাও, মা। কাল সকালেই ছগনলালের ট্রাক কাঁকেরে যাবে। তোমাকে যেতে হবে।

ব্রাহ্মণী সংকোচ করলেন না। বললেন, আপনি কি আমাকে সেই পরামর্শই দিচ্ছেন?

—নিশ্চয়ই! আমি তো জানি, কী প্রচণ্ড অভিমানে সে আজ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। স্বামীর ধর্মই তোমার ধর্ম মা! তুমি যে তার সহধর্মিণী!

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন রসিকলালের গৃহিণী। তারপর বললেন, ছাগনলালের সঙ্গে আমি একা যাব?

—না! দেবু পণ্ডিতও যাবে। তাকে অবশ্য এখনও বলাই হয়নি। লণ্ঠনটা দাও তো মা। ছেলেটা অভিমান করে দূরে সরে রইল। একবার দেখা করে আসি।

—এত রাত্রে?

—রাত এমন কিছু হয়নি। নটাও বাজেনি বোধ হয়।

দিবাকর স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি এতরাত্রে উনি নিজে আসবেন।

—আপনি! এতরাত্রে?

—জরুরি কথা আছে দেবু। শরীর তোমার যতই খারাপ হোক আজ রাতেই কথাটা বলা দরকার। তুমি গুছিয়ে নাও। কাল সকালেই তোমাকে কাঁকের যেতে হবে।

—কাঁকের! কেন উমা কি —?

—না, না! উমা ভাল আছে। চল ভিতরে গিয়ে বসি।

দিবাকরের বিছানায় এসে বসলেন। ফতুয়ার পকেট থেকে বার করে দিলেন একখানি চিঠি। বললেন, ইংরেজি চিঠি। এর পাঠোদ্ধার করে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন লেডি ওয়েলফেয়ার অফিসার। পড়ে দেখ।

—কার চিঠি?

—কাঁকের হাসপাতালের সাহেব ডাক্তার পাঠিয়েছেন আমাদের লেডি ওয়েলফেয়ার অফিসারকে। টাইপ করা ইংরেজি চিঠি। লিখেছেন কাঁকের মিশনারি হাসপাতালের ফাদার মার্লো।

"প্রিয় ম্যাডাম,

"আপনি যে রোগিণীকে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন, শ্রীমতী উমা দেবী, তিনি তাঁর স্বামীকে একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানি বঙ্গভাষায় লেখা, আমি তার পাঠোদ্ধার করতে পারিনি। ডেভিডকে দিয়ে পড়াতে পারতাম কিন্তু সেটা উচিত হত না। একটি মহিলার স্বামীকে লেখা-চিঠি অপর পুরুষে পড়ে ওটা আমার মনোমত হয়নি। তাই এটি আপনার কাছে পাঠালাম। যাঁর চিঠি অনুগ্রহ করে তাঁকে পৌঁছে দেবেন।

"প্রসঙ্গত জানাই রোগিণীর কেমন যেন ধারণা হয়েছে, তিনি চিকিৎসার অতীত। আমি তা আদৌ মনে করি না। একটু দেরি হয়ে গেছে, এই যা। তা হোক, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও যথেষ্ট উন্নত। হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমরা উমা দেবীকে একটি কটেজে স্থানান্তরিত করেছি। তাঁর স্বামী যদি সেখানে এসে থাকেন তাহলে রোগিণীর সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা সহজতর হয়। সেটা ব্যবস্থা করা কি সম্ভব? ইতি—"

তারাপ্রসন্ন একটি মুখবন্ধ খাম বাড়িয়ে ধরেন দেবুর দিকে। খামটা খুলে ফেলতেই বার হয়ে পড়ল হলদে কাগজে পেন্সিলে লেখা চিঠি।

"মাস্টারমশায়,

একটা কথা না জানিয়ে গেলে মরেও আমি শান্তি পাব না। আশাকরি বুঝতে পেরেছেন, কোন কথা। কেন বিয়ে করতে রাজি হইনি আপনাকে। না মাস্টারমশায়, সংস্কার অতটা দৃঢ় ছিল না আমার: দেহেও কোন অপূর্ণতা ছিল না। কিন্তু কেমন করে রাজি হব আমি? আমার ঠোঁটে তৃষ্ণার পাশে পাশে বাসা বেঁধেছে মৃত্যুবীজ! কেমন করে আপনাকে দেব এই বিষাক্ত দেহটার ওপর অবাধ অধিকার? আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন— আপনার দেহে যে আমার এই রোগ সংক্রামিত হয়নি এটুকুই আমার সান্ত্বনা। এ চিঠি যখন আপনার হাতে পৌঁছাবে তখন আমি এ দুনিয়ায় থাকব না। আমি পরজন্মে বিশ্বাস করি। আশীর্বাদ করুন আবার যেন আপনার দেখা পাই। আর দোহাই মাস্টারমশায়, সে জন্মে আপনি যেন আমার মাস্টারমশায়ের পরিচয় নিয়ে আসবেন না।

ইতি— প্রণতা উমা।"

চিঠিখানা শেষ করে দিবাকর দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকল। ওর পিঠে একটি হাত রাখলেন তারাপ্রসন্ন। বললেন, কী লিখেছেন বৌমা?

নির্বিকারভাবে দিবাকর চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরে।

—আমি পড়ব?

—পড়ুন।

পত্রটি পড়ে বজ্রাহত হয়ে গেলেন তারাপ্রসন্ন। দীর্ঘ সময় দুজনেই নির্বাক। নীরবতা ভেঙে তারাপ্রসন্ন বলেন তার মানে উমা তোমার বিবাহিত পত্নী নয়?

মাথাটা নাড়ল দিবাকর। জবাব দিল না। ওর হাত দুটি তুলে নিয়ে তারাপ্রসন্ন বলেন, ভেঙে পড়লে তো চলবে না দেবু! কাল সকালে ছগনলালের ট্রাক কাঁকের যাবে। তোমাকে যেতে হবে। সাহেব-ডাক্তার তো ভরসা দিচ্ছেন। ভয় কী? বৌমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। কাল সকালেই রসিকভায়ার গিন্নিকে নিয়ে রওনা দাও তুমি।

দেবু পণ্ডিত জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকে।

তারাপ্রসন্ন বললেন, রসিকলাল কাঁকেরেই আছে। সে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। তার নাম হয়েছে ডেভিড! সে যা হোক আশা হচ্ছে আমরা পুনর্বাসন পেলাম। এমনকি শিরোমণি ভায়াও পুনর্বাসন পেয়েছে। শুধু তুমিই কি একা বাকি থাকবে দেবু? এই কখনও করুণাময়ের বিচার হতে পারে? সেইজন্যই তোমাকে স্কুলের মাস্টারিটা নিতে দিলাম না।

দেবু পণ্ডিত নত হয়ে প্রণাম করল তারাপ্রসন্নকে।

পাঁজি দেখে তারাঠাকুর দিনটা নির্দেশ করে দিলেন। প্রথম কর্ষণের শুভদিনটা। কালো করে আকাশ ছেয়ে মেঘ জমেছে। কাল রাত্রে বর্ষণ হয়েছে প্রচুর। ভিজে মাটির একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ। মায়ের মন্দিরে প্রণাম করে একজোটে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাঠে। পঞ্চাশ ঘর চাষীর একলপ্তে হাজার বিঘে ভুঁই। জোড়া জোড়া লাঙল ঘুরছে দিগন্তের এ-প্রান্তে। রত্নাকর ঘোষ অবাক চোখে তাকিয়ে দেখতে থাকে নতুন যুগের নতুন চাষীর কাণ্ডকারখানা। ওর স্যাঙাৎ যগন্দ ঘোষ যেন তিন-কুড়ি বয়সে নতুন করে যৌবন ফিরে পেয়েছে। যেন আর সামলাতে পারছে না নিজেকে। ভুলে-যাওয়া কী-একটা গান সুর-সুর করছে বুড়োর ঠিক্‌রে ওঠা গলকণ্ঠে। দিগন্ত-অনুসারী ভিজা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বুঝি বুড়োর ভীমরতি ধরে—হেঁড়ে গলায় হঠাৎ শুরু করে বাজখাঁই সুরে গান—"কালো বরণ ম্যাঘরে-এ-এ-এ, পানি নিয়া আয়" ...তারপর বোকার মতো ইতিউতি চায় পরের লাইনটা বেমালুম ভুলে গেছে। যাবে না? আজ বারো বছর যে গাওয়া হয়নি! ও পাশ থেকে ভিজতে ভিজতে দ্বিতীয় চরণটা যোগান দেয় নবা পাল—"মোর পরাণ জুড়ায়ে দে-এ-এ!"

পাঁচ চাষীর মনের মণিকোঠা থেকে ওরা তিল তিল করে উদ্ধার করে আনে কমলপুরের মাঠে হারিয়ে যাওয়া গোটা গানটাকে। আর শুধু কি ঐ একখানা গান? সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে ওদের মস্তিষ্কের রন্ধ্রকোষ থেকে একে এক বেরিয়ে এল আরও কত গানের রাজকন্যে। "ব্যাঙ লো রাণী দে লো পানি"—"পরাণ বন্ধু রে-এ-এ-এ—

খিল খিল করে হেসে ওঠে নবাপালের নাতি—রসময়ের ব্যাটা। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে মনুয়া-ট্যানার দল। ওসব গান ওরা বাপের জন্মে শোনেনি!

একহাঁটু কাদার মধ্যে লাঙল ঘোরে এড়ো-আলের কান ঘেঁষে—এ মাঠে, ও-মাঠে, যতদূর নজর চলে—হু-উই পাহাড়ের কোল পর্যন্ত। ঐ যগন্দ, রাখহরি, ছিদেম—তারপরের মাঠটায় নবীন যুগীর জামাই-বেটা রসময় আর আনন্দ—হুই দেখা যায় বিশে, পাঁচু ছিনাথ, সুধাময়, অর্জুন আর মাধোকে তারপরের ঐ দিগন্ত সই-সই মাঠটায়—হু-ই ছোট্ট মানুষগুলো। ওরা কারা? গোবিন্দ আর পেল্লাদ বায়েন মনে লাগে! না-না—ভুল হয়েছে ঘোষের পোর। বুড়ো মানুষ— মনের ভুলে কী বলতে কী

বলেছে। টেঁপীর সোয়ামী গোবিন্দ নাই—পদ্মর বাপ পেল্লাদ নাই! না থাক, সে সব দুঃখের কথা আজকের এই শুভদিনে ভাববে না রতন। বুড়োরাজা তেনার পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন ওদিগের। ওদের কথা আজকের দিনটিতে ভুলে থাকতে হবে, শুধু আজকের নয়, আগামী দিনেও। ভুলে যাচ্ছেও। না থাক পেল্লাদ, না থাক গোবিন্দ—এরা আছে। মনুয়া-আনন্দ-রসময়-ট্যানার দল। উট্‌কো জোয়ানের দল। না থাক অভিজ্ঞতা—সাতপুরুষে চাষীর ব্যাটা, শিখে নিতে কদিন? পারবে, নিশ্চিত পারবে ওরা এই জমিতে সোনা ফলাতে। গাঁ-সুদ্ধ লোক আশা রাখে—এবছর ভাল ফসল হবেই। দুই নয়, পাঁচ নয়—পাকা বারো বছর পরে, একযুগ অতিক্রম করে আজ চাষে নেমেছে মানুষগুলো। অন্তত এবার কি বিমুখ হতি পারেন দ্যাবতা? অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে ফেলতি পারেন মাঠ? অতিবৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিতি পারেন জমি? এতটা কঞ্জুষ হলি তাঁরে করুণাময় কেন কবে সবাই, কও?

আহা দেবু পণ্ডিত আজকের দিনটিতে গাঁয়ে থাকতি পারলনি! নিজের চখ্যে দেখি যাতে পারলনি। তা হক,—হে শিবঅ, হে শম্ভু ! তুমি দেখ—উমা মারে নিয়া দেবু পণ্ডিত যান ফিরি আসে—সেই যেদিন অ্যাদের সুনাহী ফসল মরাইয়ে উঠবে! সেই যখন ঢেঁকি ঘরে ঝিউরি-বউরির দল আলতা-আঙা চরণে বোল তুলবে : ঢকাটাঁই-ঢকাটাঁই-ঢকাটাঁই, আর তখন রতন-যগন্দ-রাখহরি, হরতুকীগাছের ছামুতে বসি ঐ ঢকাটাঁইয়ের উতোর গাইবে থেলো হুঁকোয় : গুড়ুক-গুড়ুক-গুড়ুক !

কিন্তুক্! হায় বাপ! বীজধানডা যে আজও আসে নাই! সময়ে তা আসবি তো?

আসবি! নিয্যস্ আসবি! হে শিবঅ—হে বুড়োরাজা, দেখো তোমার বদনাম না হয় যান্!

সোনার বাংলা

ছয়তানের ছাওয়াল
(সত্তরের দশক)

"ছালাম আলাইকুম, ভাইছাব! আঁইন্যেরা যুদি আঁ'রে পেত্যয় করেন, তয় এড্‌ড়া কতা কইতাম হারি। আইজ হেই কিস্‌সায় যা শুহ্‌নবান তয় এক্কেরে নিয্যস্‌ হক্কতা। হেইলগে হেইডাও শুনি রাহেন বাইজান—হেই কিস্‌সাটি ব্যাবাক্‌ লতুল লয়। কেয়ামৎ নজদিক, এ তারই আলামৎ—'ছয়তানের ছাওয়াল' হেই দুনিয়াৎ ঘুর্‌য়া ঘুর্‌য়া আইতেছে—আঁইন্যে দ্যাখবাব পান্না ব্যাক!..."

মাপ করবেন, না, আমারই ভুল হচ্ছে। আশঙ্কা হচ্ছে আপনারা ওঁর কথা কিছুই বুঝতে পারছেন না। মিথ্যে কথা বলব না—কী যে ছাই-পাঁশ শ্রুতিলিখন লিখলাম তা আমি নিজেও বুঝতে পারিনি। ব্যাপারটা কী জানেন, মৌলভী-সাহেব ঐ ভাষাতেই অভ্যস্ত, ওটাই ওঁর মাতৃভাষা। দক্ষিণ-পূর্বের ঐ ভাষাটা ওদেশের, মানে মতিগঞ্জের মানুষই ভাল বুঝে উঠতে পারেন না, আমি-আপনি কেমন করে বুঝব? জানি, আপনারা কী বলতে চান—পাঠক-পাঠিকা যে ভাষায় বুঝবে, যে ভাষায় কাহিনীটা লেখা হচ্ছে, কথাসাহিত্যে পাত্রপাত্রীর ভাষাও তাই হওয়া উচিত। তা ঠিক। শেক্সপীয়রের কাছে হ্যামলেট বা জুলিয়াস সীজার যথাক্রমে ড্যানিশ আর রোমান ভাষায় বক্‌বক্‌ করেননি। এই কল্লোলিনী কলকাতায় এসে মিশর-কুমারী, সেকেন্দার শাহ থেকে ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' পর্যন্ত খাশ্‌ কলকাত্তাইয়া ভাষায় লম্বা লম্বা ডায়ালগ ঝেড়ে গেছেন। তবু একটা 'কিন্তু' আছে। মিশর, গ্রীস, ডেনমার্ক বা রাশিয়ার মানুষ শুধু দেশের জন্যই প্রাণ দিয়েছে—মাতৃভাষার জন্য নয়। আমি আজ যাদের কথা শোনাতে বসেছি—ওপার-বাঙলার সেই আজীব মানুষগুলির কাছে শুধু দেশ নয়, ভাষাটাও বড় আপন। 'আ-মরি বাঙলা ভাষা'টা। প্রয়োজনে তার জন্যেও ওরা জান-কবুল!'

আমি যথাসাধ্য অনুবাদের চেষ্টা করব; কিন্তু মাঝে-মধ্যে উত্তেজনাবশে ওঁরা যদি মতিগঞ্জের ভাষায় বাৎচিৎ শুরু করে দেন তাহলে হয়তো আমার নাগালের বাইরে চলে যাবে। সেক্ষেত্রে সেটা আপনারা ক্ষমাঘেন্না করে মেনে নেবেন। ইচ্ছা করে আপনাদের কষ্ট দিচ্ছি না—বিশ্বাস করুন—আমার তিনপুরুষ এই পশ্চিমবঙ্গেরই মানুষ; শুধু নিজের উপাধি দেখে আন্দাজ করি আরও অতীতে পূর্বপুরুষেরা ছিলেন উত্তরবঙ্গে; যা নাকি আজকের হিসাবে ওপার-বাঙলা।

আমার কথা যাক। ওঁদের কথা বলি। মতিগঞ্জের কথা।

মুখবন্ধে মৌলভী মৌলানা মহীউদ্দীন হাজী-সাহেব যে-কথাটা বলতে বলতে থেমে গেছিলেন তা সংক্ষেপে এই :

শয়তানের চ্যালারা এই দুনিয়ার ঘুরে ঘুরে আসে, আপনারা খেয়াল করে দেখেন না। এই কাহিনীটি একেবারে নতুন নয়—সতের শ' সাতাত্তর. খ্রীষ্টাব্দে ঐ শয়তানের চেলাটাকে দেখা গিয়েছিল ওয়েবস্টার-ব্রীজ এলাকায়। তার সেবারকার পাপের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন বার্নার্ড শ-মশাই, তাঁর The Devil's Disciple-এ! হাজী-সাহেবের বিশ্বাস, ঐ শয়তানের চেলাটি হেলীর ধূমকেতুর মতো বারে বারে ফিরে আসে এই দুনিয়ায়। ওঁর ধারণা, তার একটি বিশেষ হেতু আছে : কাফেরদের কোন ধর্মপুস্তকে নাকি এই রকম লেখা আছে—আল্লাহ্‌-তায়ালাকে অবতারের রূপ ধরে এই পৃথিবীতে বারে বারে ফিরে আসতে হয়। আর তাইতেই ঐ শয়তান-শিষ্যকেও চক্রাবর্তনে ফিরে আসতে হয়! উপায় কী? না হলে হেঁদুদের পয়গম্বর যুগে যুগে কাকে ধরে ঠেঙাবেন, বলুন?

এবার সে এসেছিল ওঁর গাঁয়ে : মতিগঞ্জে।

মতিগঞ্জ, আহ্মেদনগর, সোনার-গাঁ, মোল্লাহাটি আর লক্ষ্মীকান্তপুর—এই নিয়ে পঞ্চগ্রাম।

একটি থেকে আর একটির দূরত্ব একবেলার জলপথ। পাঁচটি গ্রামই গড়ে উঠেছে গাঙের কিনার ঘেঁষে। প্রথম তিনটি পুবপারে, শেষের দুটি পশ্চিম-কিনারে। গাঙের মুখ দক্ষিণে—চলেছে সাগরসন্ধানে। লক্ষ্মীকান্তপুরে গোটাদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাদবাকি চারখানি মুসলমান-প্রধান গ্রাম। মৌলভী মহীউদ্দীন এই পঞ্চগ্রামের সর্বজনমান্য ধর্মনেতা। দরগা আর পীরতলা প্রায় সব গ্রামেই আছে, কিন্তু পাকা মস্‌জিদ বলতে এই মতিগঞ্জেই। নবাবী আমলের পাতলা ইটের গাঁথনি, চুন-সুরকির মশলা। আস্তর খসে খসে পড়ছে, বর্ষায় ফাটল বেয়ে মাথা তুলতে চায় বট-অশ্বত্থের চারা, কিন্তু মস্‌জিদের পশ্চিমপ্রাচীরে মিহ্‌রাব আর কিব্‌লার চিহ্নটি আজ কয়েক শতাব্দী ধরে রয়েছে অক্ষত। এই মস্‌জিদেই সমবেত হয় পঞ্চগ্রামের ধর্মপ্রাণ মুসলমান—ঈদ্-উজ্জোহার দিনে। মিম্‌বেরে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে হাজী মহীউদ্দীন উদাত্তস্বরে খুদ্‌বা পাঠ করেন, সর্বজনবোধ্য ভাষায়—যার নমুনা কাহিনীর প্রথম অনুচ্ছেদেই দিয়েছি। প্রতি বছর শুনিয়ে দেন ইস্‌লাম ধর্মের মূল তত্ত্বকথা—আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ থাক, দীনদরিদ্রকে সাহায্য কর, আত্মত্যাগ কর, পরের মঙ্গলকামনায় উদ্বুদ্ধ হও। ইমামের নির্দেশে সবাই সমবেতভাবে নামাজ পড়ে।

মহীউদ্দীনের বয়স আড়াই কুড়ি পার হয়েছে। মাথায় বাব্‌রি চুল, কাঁধের উপর এসে পড়েছে। তার উপর সব সময়ে কাজ করা একটা সাদা টুপি। সাদার উপর সফেদ নক্‌শা। গোঁফ-দাড়িতে পাক ধরেনি, যদিও দাড়ির জঙ্গলে ইদানিং সাদা চকখড়ি দিয়ে কে যেন লিখে দিতে শুরু করেছে ওঁর প্রৌঢ়ত্বের বার্তা। ছোট্টখাট্ট মানুষ; কিন্তু নিটোল স্বাস্থ্য। আর দিলটা দরাজ। গ্রাম্য দলাদলি, খেয়োখেয়ির মধ্যেই দিন গুজরান করতে হয় তাঁকে, কিন্তু পাঁকাল মাছের মতো, পাঁক তাঁর গায়ে লাগে না। সারাজীবন রাজনীতিকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। আওয়ামী লীগ থেকে একবার ওঁকে নির্বাচনের টিকিট গ্রহণ করার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়েছিল—সবাই জানত, এই ধর্মভীরু লোকটিকে কেউ ভোটযুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবে না—এমনই তাঁর সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মহীউদ্দীন সাহেব সবিনয়ে প্রত্যাখান করেছিলেন সেটা। বলেছিলেন, প্রত্যেকটি মানুষের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন। আমি এই পঞ্চগ্রামের মানুষের ধর্মবোধের দায়িত্ব নিয়েছি, আমাকে সেটুকুই করতে দিন। রাজনীতির মাধ্যমে দেশসেবার বাসনা এখানে অনেকেরই আছে, আপনারা আমাকে মার্জনা করুন।

একাত্তর সালের শ্রাবণের শেষাশেষি। গাঙ এখন টৈটম্বুর। মহীউদ্দীন যখন আহ্‌মেদনগরের খেয়াঘাটে নৌকায় চাপেন তখনো ভোরের কুঁকড়ো ডাকেনি—ভুক্কো তারাটা জ্বলজ্বল করছিল পুব আকাশে। রাত থাকতে বার হয়েছিলেন বলেই উজান ঠেলে মতিগঞ্জের খেয়াঘাটে এসে পৌঁচেছেন সূর্যোদয় মুহূর্তে। সারাটা পথই তিনি ভাবতে ভাবতে এসেছেন—দুনিয়ার এ কী হাল হচ্ছে! দুনিয়ার কথা ছাড়ান দাও, কোথায় চলেছে তাঁর অতি প্রিয় সোনার বাঙলা আজ চার-পাঁচ মাস ধরে গোটা পূর্ব-পাকিস্তান যেন তুফানের মুখে নাও। উত্থাল-পাতাল দুলছে গোটা দেশটা! গলুই-এর মাথায় এতদিন হাল হাতে বসেছিলেন এক দক্ষ কাণ্ডারী—কিন্তু তিনিও ইদানীং দেশছাড়া। বোধকরি বন্দী হয়ে আছেন পাকিস্তানে— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহ্‌মান। দল-নেতা দেশছাড়া—তবু লড়াই-কাজিয়া লেগেই আছে এখানে ওখানে। শুরু হয়েছিল নাকি পঁচিশে মার্চ—ঢাকার রমনাবাজারে। একদল পাকিস্তানী সৈন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ে। জহুরুল হক 'হল', সূর্য সেন 'হল', জগন্নাথ 'হল'-এ ঢুকে নিরস্ত্র মানুষকে বেয়নেটে বিদ্ধ করতে শুরু করে দেয় বিনা প্ররোচনায়। লোকে তো তাই বলে— মহীউদ্দীনের বিশ্বাস হয় না—পাকিস্তানী সেনাবাহিনী রোকেয়া আর শামসুন্নাহা ছাত্রীআবাসেও হাম্‌লা করেছিল! কলেজের শত শত ছাত্রীর ইজ্জত নিয়ে তারপর তাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছিল! অনেকে নাকি ছাত্রী আবাসের ছাদে উঠে যায়, আর সেখান থেকে ঝাঁপ খেয়ে নিচে পড়ে! ইজ্জত দেওয়ার চেয়ে জান দেওয়া সহজ মনে করেছিল তারা! আচ্ছা, তোমরাই বল, এসব কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? ঢাকার ছাত্রীরা সবাই মুসলমান—আর পাক বাহিনীর জওয়ানেরাও তাই! তাহ'লে...

কিন্তু কেন্দ্রীয় ছাত্র-পরিষদ আর জয়-বাঙলা বাহিনীর ছোঁড়াগুলো আজ ক'মাস ধরে এই সব গুজব ছড়াচ্ছে। মৌলভী মহীউদ্দীন বিশ্বাস করতেন না। তবে ইদানীং কেমন যেন একটা ধন্ধ লেগেছে। যুদ্ধটা গড়াতে গড়াতে এ পাড়ায় এগিয়ে আসার পর। পঞ্চগ্রাম এতদিন ছিল শান্ত, নিরুপদ্রব। ওই জয়-বাঙলার ছোঁড়াগুলোই খাল কেটে ডেকে আনল কুমিরটাকে। দিন-সাতেক আগে পাক-বাহিনীর গোটা দুই প্লেটুন এসে থানা গেড়েছে আহ্‌মেদনগরে। ঐ জয়-বাংলার ছোঁড়াগুলোর সন্ধানে। ছোঁড়াগুলো সেদিক থেকে শেয়ানা—পাক-বাহিনী এসে পড়ার আগেই তারা বেপাত্তা। পাক সেনাপতি ওয়ালি জব্বর বোধকরি এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ঘরে ঘরে শুরু হয়ে গেল তল্লাশি। মৌলভীসাহেব এসব ব্যাপারে মাথা গলাতে রাজি নন। রাজনীতিকে যেমন চিরকার পরিহার করে এসেছেন ঠিক তেমনি ওই সব জয়-বাঙলার মস্তান পার্টিকেও পাত্তা দেননি। তবু পাকেচক্রে তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হলো। যখন খবর পেলেন খান-সেনারা আহ্‌মেদনগরের আসান আলীকে ফাঁসি দেবার কথা ঘোষণা করল।

আসান আলীকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে চেনেন। নিতান্ত নির্বিরোধী মানুষ। রাজনীতির ধারে কাছে থাকে না। পাঁড় মাতাল। বে-থা করেনি। দিন-মজুর খাটে, আজ এর ক্ষেতে, কাল ওর খামারে। হপ্তা পেলেই সপ্তাহের রোজগারটা দিয়ে আসে তাড়িখানায়। সংসারে তার একটা মাত্র প্রাণী। একটি মেয়ে—বছর তের বয়স তার। সাদি না করলেও আসানের সন্তান আছে। আসান সাতজন্মে নামাজ পড়েনি, জুম্মাবারেও মদ্যপান করত। গাঁয়ের মানুষ তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না; কিন্তু হাজীসাহেবের অন্তরের একপ্রান্তে কী জানি কেন ওর প্রতি একটা করুণার সঞ্চার হয়েছিল—হোক মাতাল-দাঁতাল, তার বেজন্মা মেয়েটাকে তো সে ত্যাগ করেনি। মা-মরা মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছিল নিজের ছামুতে, নিজের আধবেলা জুটলে তাই ভাগাভাগি করে খেত ঐ মেয়েটার সঙ্গে। শুধু তাই নয়, অকপটে সে স্বীকারও করত : ফ্যালনা তারই আত্মজা!

এমন একটা মানুষকে খান-সেনারা বেমক্কা ধরবে কেন? ফাঁসি দেবে কেন?

শুনলেন সে-কথাও। জয়-বাঙলার ছোঁড়াগুলোর সন্ধানে খান-গুপ্তচরেরা যখন তার ছামুতে তল্লাশী করতে এসেছিল তখন নাকি আসান আলী তাদের গালমন্দ করে। কে জানে তখন কত পাঁইট পচাই ছিল তার পাকস্থলীতে—সে চিৎকার করে তার মনোভাব জানিয়ে দিয়েছিল—জয়-বাঙলার ছোঁড়াগুলো তার ছামুতে নেই, থাকলেও সে তাদের ধরিয়ে দিত না! কারণ তারা সোনার বাঙলার ভালই চায়। তারা লুটেরা নয়!

বোধকরি এটাই ছিল আসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ। অথবা কে জানে, একটা মানুষকে প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসি দিয়ে খান সেনাপতি ওয়ালি জব্বর একটা ত্রাসের সঞ্চার করতে চেয়েছিল। মোট কথা, হুকুম জারী হয়ে গেল, হাটবারে আসানের ফাঁসিই হবে!

তাই হাজী-সাহেবকে ছুটে আসতে হয়েছিল আহ্‌মেদনগরে। উপায় কী? তিনিই এ পঞ্চগ্রামের মোল্লা। ফাঁসির আসামীকে শেষবারের মতো খুদ্‌বা পাঠ করে শোনানো যে তাঁরই দায়িত্ব—তা হোক-না-কেন লোকটা কাফেরের অধম—বেহেড মাতাল।

তাছাড়া ওঁকে ডেকে নিয়ে যেতে এসেছিল ইব্রাহিম ওস্‌মান আলী। আসান আলীর সহোদর বড় ভাই। ছোট ভাইয়ের এই চরম বিপদে তার দাদা ইব্রাহিম যে এভাবে তাঁকে ডাকতে আসবে এটাও ছিল হাজী-সাহেবের আশাতীত। আহা! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'ভাই তাদের বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলেছে আজ! ইব্রাহিম আর আসান যে পরস্পরের মুখদর্শন করত না এটা না জানে কে?

রাজী হয়েছিলেন তিনি আহ্‌মেদনগরে যেতে। বিবিজানকে বলে এসেছিলেন পরদিনই ফিরে আসবেন মতিগঞ্জে। মুর্দা জমি নিলেই। কিন্তু এমনই ঘটনাচক্র যে, চার-চারটে রাত তিনি আটকে পড়লেন আহ্‌মেদনগরে! আসান নয়, তার দাদা ইব্রাহিমের মৃত্যুতে।

ইব্রাহিম ওসমান আলী মতিগঞ্জের সম্পন্ন চাষী। জোতদার। বাটা বন্দোবস্তই শুধু নয়, নানা খালবিল পথে তার অর্থাগমের আয়োজন। প্রধানত সে কুসীদজীবী। চার-ওয়ক্ত নামাজ পড়ত বটে, কিন্তু

কুসীদজীবীর যে সীমারেখা হাদিসে নির্দিষ্ট সেটা মানত বলে মনে হয় না। তার লাল খেড়ো খাতায় এ অঞ্চলের অনেকের ভাগ্যই বন্দী। পাকা বাড়ি, ধানের মড়াই, গোয়ালে গরু-বলদ, ঘরে বিবিজান—কী নেই! না, একটা সুখ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছিলেন খোদাতালা—সন্তানসুখ। দু'-দু'বার বিবাহ করেছে ইব্রাহিম—সন্তানও পয়দা করেছে—কিন্তু ঐ—ওর বরাতে সন্তান-সুখ লেখা নেই। দু-দু'টি পুত্রসন্তান—ছোটটি নির্বোধ গর্দভ আর বড়টি নিপাট 'ছয়তানের ছাওয়াল'!

আসান আলী তার সহোদর ছোট ভাই। কিন্তু দীর্ঘদিন দাদার সংসার থেকে বিতাড়িত। এতে গাঁয়ের লোক তার দোষ ধরেনি। আসানের সঙ্গে একই ছামুতে বাস করা যায় না। আসানকে গাছতলায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়নি। তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল পাশের গাঁয়ের আমজাদ আলী। দু-দু'টি হেতুতে। আহ্মেদনগরের আমজাদ হচ্ছে এই পঞ্চগ্রামের অর্থনৈতিক বাজারে ইব্রাহিমের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেও কুসীদজীবী। তার খেড়ো খাতাতেও অনেকের ভাগ্যলক্ষ্মী বন্দিনী। ইব্রাহিম আর আমজাদ রাজনীতির ক্ষেত্রেও বিপক্ষ শিবিরে। আমজাদ আসানকে খড়োচালের ঘর তুলে দিল। তার খাতায় না পড়েই আসান টিপছাপ দিয়েছিল। খোদায় মালুম সে 'বগুেড় লেবার' কিনা। মোট কথা পেটভাতারী চুক্তিতে আসান আমজাদের আশ্রয়ে চলে এসেছিল বছর দশ-পনের আগে। আমজাদ শুধু একটি ক্রীতদাস প্রজাই পেল না, লাভ করল দুর্লভ সুযোগ—যেন সে পাঁচজনাকে ডেকে বলতে চায়—'ওহে তোমরা দেখ, মতিগঞ্জের বদমায়েশটা তার মায়ের পেটের ভাইকেও ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করে না। আমি তাকে বাঁচবার সুযোগ দিয়েছি।

সে আজ পনের বছর আগেকার কথা।

এই পনের বছর ধরে দু'ভাইয়ের মুখ দেখাদেখি নেই।

গাঁয়ের লোক কিন্তু এজন্যে ইব্রাহিমের দোষ ধরেনি। কেন ধরবে? ওর ছোটভাই আসান তো শুধু নিজে-নিজেই দোজখের পথে পাড়ি জমিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, ঐ সঙ্গে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তার ন্যাওটা ভাইপোটাকে—ইব্রাহিমের জ্যেষ্ঠপুত্রটিকে।

আসানের সেই হাড়-হাবাতে ভাইপোটা আজন্ম বেয়াড়া! মক্তবে কোনোদিন মাথা গলায়নি। বাপ তাকে মেরে ধরে শায়েস্তা করতে পারে নি। কস্মিনকালেও নামাজ পড়বে না। সহবৎ শিখবে না, রমজানের দুপুরে পীরতলার কব্বরখানায় পাঁচ-ইয়ারের সঙ্গে মুর্গী জবাই করে খাবে। এদিকে বাপজানের জমি-জিরেত, খাতাপত্র নেড়ে-চেড়েও দেখবে না। মা-মরা ছেলেটার ছিল চাচা-অন্তপ্রাণ। আসানই তার আদর্শ। চাচার মতোই সে বাঁধনছেঁড়া পাগলাঘোড়া হবার খোয়াব দেখত! আসানই ওকে পাগল করে তুলেছে, শিখিয়েছে হাজার-কিসিমের ইবলিসী। ইব্রাহিম যখন তার দ্বিতীয় স্ত্রীর পরামর্শ মেনে নিয়ে আসানকে 'ত্যাজ্যভ্রাতা' করে, তখন তার বড় ছেলেটার—এ গাঁয়ে কেউ তার নামোচ্চারণ করে না, বলে 'ছয়তানের ছাওয়াল'—তা সেই ছেলেটার বয়স তখন বছর দশেক। বাপের ভালবাসা পায়নি, জন্মদায়িনী মাকে তো চোখেই দেখেনি, স্নেহের কাঙালটা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল চাচাকে—তাকেও তাড়িয়ে দিল ওর আব্বাজান। তাই সুযোগ পেলেই ছেলেটা ছুটত আহ্মেদনগরে। লোকে বলে, ঐ বয়সেই বিচ্ছুটা চাচার কাছে বিড়ি টানতে শিখেছে, মায় গাঁজা, চোলাই বানানোর কায়দা! বকে, মেরে, বেঁধে রেখেও ছেলেটাকে ইব্রাহিম বাগে আনতে পারেনি। বুঝে উঠতে পারেনি—কোন বশীকরণ মন্ত্রে আসান তাকে বেঁধেছে। ইব্রাহিমের শিক্ষা এতটা নয় যে, বুঝবে ঐ দশ বছরের বালকের চোখে তার চাচা একটা আদর্শ পুরুষ—যার ভয়ডর নেই, যে কাউকে পরোয়া করে না, যে শুধু সব রকম পাপ কাজ করতে প্রস্তুতই নয়, নিজকৃত পাপ স্বীকার করতেও যে পিছপাও নয়। তা হোক, শাসনের তলায় না থাকলেও তবু ইব্রাহিমের পাকা ছাদের তলায় ছিল এতদিন। সেটাও ঘুচল যখন ইব্রাহিমের শূন্য সংসারে এল ফরিদা বেগম। ওর বৃদ্ধবয়সের দ্বিতীয় পক্ষ। ছেলেটা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। ততদিনে সে তাগড়াই জোয়ান। বিমাতার চেয়ে বয়সে সে দু-চার বছরের ছোটই হবে। মানে সতের-আঠারো। কিন্তু ইয়া বুকের ছাতি, ইয়া দশাসই চেহারা। বাপের চেয়েও মাথায় একবিঘৎ

লম্বা! তেরাত্রিও টিকতে পারেনি ফরিদার নতুন পাতা সংসারে। বদমাশটা নিরুদ্দেশ হওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল মতিগঞ্জের মানুষের। সকলেরই ঘরে যুবতী মেয়ে। চোখের উপর অমন ষণ্ডামার্কা বেপরোয়া 'ছয়তানের ছাওয়াল'টাকে যেন সইতে পারা যাচ্ছিল না। চাচা ছাড়া আর কারও শাসন মানে না। আর তাকে শাসন করার তাগৎই ছিল নাকি কারও?

এ দশ-পনের বছরে অনেক-অনেক জল বয়ে গেছে গাঙ দিয়ে। আসান অথবা তার ভাইপো মতিগঞ্জে পদার্পণ করেনি। চাচাকে তবু দেখা যায় পাশের গাঁয়ে। ভাইপোটা একেবারে কর্পূর! মাঝে কে যেন এসে ইব্রাহিমকে গোপনে খবর দিয়ে গেছিল—শয়তানের চেলাটা নাম লিখিয়েছে ই. পি. আর-এ। ইব্রাহিম গর্জে উঠেছিল, খবর্দার, সে-শালার নাম আমার কাছে করবি না।

ইব্রাহিমের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে লোকটার সাহস হয়নি মনে করিয়ে দিতে যে, গালাগালটা সুপ্রযুক্ত নয়। গুণ্ডাটা তারই সন্তান। আবার কে যেন এসে বলে গেল, না, ই. পি. আর. নয়—বেঙ্গল রেজিমেন্ট। মোটকথা, ইদানীং তাকে নাকি খাকি পোশাক পরে ইতিউতি ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। ইব্রাহিম তড়পেছিল, গাঁয়ে ঢুকলে শয়তানটার ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দেব।

তারপর খান-সেনাদের সঙ্গে ঝামেলা বাধার পর এই তো সেদিন ইব্রাহিমের চাচাতো ভাই মেহ্‌বুব একদিন গোপনে খবর দিয়ে গেল—ওসব কিছু নয়, শয়তানের চেলাটা নাকি নাম লিখিয়েছে জেলাসদরের মস্তান-পার্টিতে। খাকি পোশাক স্রেফ একটা ভেক! মস্তানটা নাকি এক পকেটে রিভলভার, আর পকেটে বিলাইতি নিয়ে এ-রাজ্য সে-রাজ্য দাবড়ে বেড়ায় একটা মোটর-সাইকেলে। ঢাকার রমনাবাজারে যে গহনার দোকান লুট হলো, আর সিরাজগঞ্জে যে ব্যাঙ্ক-ডাকাতি হলো সে-দুটি ঐ ওদের মস্তান-পার্টির কীর্তি! ওর নামে নাকি হুলিয়া বেরিয়েছে!

এসব তথ্য ইব্রাহিম নিজেই বলেছিল হাজী-সাহেবকে। হোক কুসীদজীবী, ইব্রাহিম ছিল ধর্মভীরু মানুষ। হাজী-সাহেবের পরামর্শ মতো চলত। এ হেন ইব্রাহিম মিঞা যখন এসে ধরে পড়ল, তখন হাজী-সাহেব গররাজি হন কোন আক্কেলে? আসান একটা বেহেড মাতাল, বে-নমজি চোহবৎ তার; তবু তার বড়ভাই যখন তাকে ক্ষমা করেছে তখন হাজীসাহেবকেও যেতে হয়েছিল হতভাগাটার শেষ কাজ করতে। ওঁরা দু'জনে জুম্মাবারে নৌকা নিয়ে রওনা হয়েছিলেন আহ্‌মেদনগর-মুখো।

গিয়েছিলেন দু'জনে, ফিরে এলেন একা!

ইব্রাহিম ওসমান আলী বেমক্কা দুনিয়ার মায়া কাটালো!

সুস্থ সবল মানুষটা গেল ভাইয়ের শেষকৃত্য করতে—আর খোদাতালার কী মর্জি—ভাইয়ের পাশাপাশি মাটি নিল। ফিরেও তাকালো না তার ক্ষেত-খামার, খেড়ো খাতা বা জরু-গরুর দিকে!

কী বিচিত্র আল্লাহ্‌তালার বিধান!

নৌকা যখন মতিগঞ্জের খেয়াঘাটে ভিড়ল তখন পুব-আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। প্রথমেই দেখা হয়ে গেল দখিনপাড়ার মেহ্‌বুবচাচার সঙ্গে। উদোম গা, পরনে লুঙ্গি, হাতে বদনা। প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে প্রকাণ্ড দেহটি নিয়ে গজগমনে বাঁধপানে যাচ্ছিলেন। হাজী-সাহেবকে দেখে ডান-হাতের বদনাটা হস্তান্তরিত করে সালাম করলেন। বললেন, ছালাম, হাজী-ছায়েব। কই গেছিলেন? আহ্‌মেদনগরে? আসানডার শ্যাষ কাজে?

হাজী-সাহেব সখেদে বলেন, বদ নসিব মেহ্‌বুবচাচা! গেছিলাম বটে আসানডারে মাটি দেওনের লগে, কিন্তুক্ খতম্ পড়ি আলাম তার বড় ভাইডার!

—বড় ভাইডার! কয়েন কি! ইব্রাহিম-ভায়ার এন্তেকাল হয়েল আমেদনগরে? ক্যামনে?

—খোদাতালার মর্জি!

—ছুটা ভাইডারে দ্যাইখ্যা সামলাইতে পারে নাই, মনে লাগে। জিব্-ভাডা বাহির হয়্যা পড়ছিল নাকি?

প্রশ্নের ধরতাইটা প্রথমে ধরতে পারেননি। জিহ্বা! কার? আসানের বিষয়েই প্রশ্নটা করা হয়েছে

নিশ্চয়! ফাঁসির দড়িতে মৃত্যুর পব সে হতভাগ্যের মুখটা ছিল চটের থলি দিয়ে ঢাকা। তার ভিতর আসানের মুখাকৃতির বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। শেষ মুহূর্তে আসান আলীর জিহ্বা মুখবিবর থেকে নির্গত হয়েছিল কিনা এই তথ্যটা হঠাৎ এত জরুরী হয়ে পড়ল কেন সেটাও মালুম হলো না। আশ্চর্য মানুষের কৌতূহল। এই মেহ্বুর হচ্ছে ইব্রাহিমের রিস্তাদার—আপন চাচাতো ভাই; কিন্তু ইব্রাহিমের আকস্মিক মৃত্যুকে ছাপিয়ে এই মুহূর্তে ওঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে ঐ প্রশ্নটা : মৃত্যুমুহূর্তে আসানের জিবটা কোন তল্লাটে ছিল!

হ্যাঁ, ভাইয়ের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে ইব্রাহিম দাগা পেয়েছিল। হয়তো মনে মনে সে নিজেকেই দায়ী করেছিল। অভিশাপ তো সে বড় কম দেয়নি ছোটভাইয়ের উদ্দেশ্যে। বিশেষ, চাচার শিক্ষায় বিপথগামী ছেলেটা গৃহত্যাগ করার পর। তবু হাজার হোক, সহোদর ভাই! একসাথে খেলেছে, একই মক্তবে পড়তে গেছে, মহরমের মিছিলে দুই ভাইয়ে বুক-চাপড়ে কেঁদেছে। হ্যাঁ, অতি শৈশবে—তখনো আসান বিপথে যেতে শুরু করেনি, তখন রমজানের মাসে একপাতে ইফ্তারি করেছে! ইব্রাহিমের ছোটখাটো একটা হার্ট-অ্যাটাক এর আগেও হয়েছিল—সেই যেবার রাখহরি মোক্তারকে ডেকে এনে সে উইলখানা বানায়। তারপর এ ক' বছর বেশ ভালোই ছিল। আহ্মেদনগরে এসে, হাটতলায় দাঁড়িয়ে তার কী-যে হলো! আসানকে যখন ওরা মঞ্চে তুলছে তখন কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়েছিল ইব্রাহিম—'ইয়া আল্লাহ্' পুকার দিয়ে।

ধরাধরি করে ওকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। হাকিম নিজামুদ্দীনছায়েব দাওয়াই দিলেন; কিন্তু তে-রাত্তিরও টিকে থাকতে পারল না ইব্রাহিম। পনের বছর ছাড়াছাড়ির পর এবার ছোটভাইকে কোল-পাঁজরে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল। পাশাপাশি কবরে।

এই করুণ কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত করতে গেলেন হাজী-সাহেব। কিন্তু তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে মেহ্বুব বলে ওঠেন, রয়েন, রয়েন, পরে শুনব অনে। অহন আপনের শতেক কাজ, আপনারে রুখুম না।

বস্তুত তাঁর নিজেরই তাড়া ছিল। হনহনিয়ে চলে গেলেন তিনি আশ্ শ্যাওড়া ঝোপের ওপাশে।

হাজী-সাহেব একটু ইতস্তত করেন—সর্বপ্রথম কোথায় যাওয়া উচিত? নিজের বাড়ি, না ইব্রাহিমের ছামুতে? আমিনাকে ঘুম থেকে তুলে তাঁর পক্ষে সস্ত্রীক ফরিদাবিবির কাছে যাওয়াটাই বোধহয় শোভন। সদ্যোবিধবাকে মর্মান্তিক শোকে সামাল দেওয়ার কাজটা পুরুষের নয়! কিন্তু না, ফরিদাবিবি গতকাল রাত্রেই দুঃসংবাদটা নিশ্চিত পেয়েছেন। গতকাল সূর্য ডোবার আগেই ইব্রাহিমকে কবর দিয়ে তিনি মুর্তজাকে আহ্মেদনগর থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাপের মৃত্যুশয্যার পাশে হাজির ছিল মুর্তজা। ইব্রাহিমের নির্বোধ ছেলেটা। আহ্মেদনগর থেকে স্বামীর প্রত্যাবর্তনে অহেতুক বিলম্ব হচ্ছে দেখে ফরিদাই তাকে পাঠিয়েছিল তত্ত্বতালাশ নিতে। তাই হাজী-সাহেব তাকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন গতকাল সূয্যি ডোবার আগেই। অর্থাৎ কাল এক প্রহর রাতেই ইব্রাহিমের স্ত্রী মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা নিশ্চয় পেয়েছেন। প্রতিবেশিনীরা এসে যথাকর্তব্য করেছে। তারপর গোটা একটা রাত কেটে গেছে। ফরিদাবিবি নিশ্চয় এতক্ষণ সামলে উঠেছেন কিছুটা—হয়তো আচ্ছন্নের মতো বসে আছেন তাঁর দাওয়ায়। হাজী-সাহেব মনস্থির করলেন—না, বাড়ি নয়, প্রথমে ইব্রাহিমের ছামুতেই যাবেন তিনি। মুর্তজাটা নির্বোধ, হয়তো সব কথা গুছিয়ে বলতে পারেনি তার মাকে। সদ্যোবিধবা উদ্গ্রীব হয়ে আছেন—শেষ সময়ের কথাগুলি বিস্তারিত জানতে। মসজিদের ইমামের কাছে ফরিদাবিবি পর্দা নসীন নন, সরাসরি কথাবার্তায় অসুবিধা নেই কিছু। তাছাড়া আসানের ফাঁসির হুকুম হওয়ার পর তার বেজন্মা মেয়েটাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাপের ফাঁসি যাতে তাকে দেখতে না হয়। ফলে, ফ্যালনাও আছে ইব্রাহিমের বাড়িতে।

বাড়ির দিকে তাই আব গেলেন না। রওনা দিলেন ইব্রাহিমের ভিটেয়।

হাজী-সাহেবের আন্দাজটা কিন্তু ভুল।

মুর্তজা এক প্রহর রাতে মতিগঞ্জে পৌঁচেছিল ঠিকই। কিন্তু মায়ের মুখোমুখি হবার সাহস সঞ্চার করে উঠতে পারেনি। তাই নিজের বাড়ির সদর-দোরে কড়া নাড়েনি আদৌ। গুটিগুটি খামারবাড়ির দাওযায় উঠে শুয়ে পড়েছিল পেটে কিল মেরে। নিজের মনকে প্রবোধ দিয়েছিল, কী প্রেয়জন উ-সব উট্‌কো ঝ্যামেলায়? কাল ভোরবেলায় হাজী-ছায়েব আয়ে পড়বে, আম্মাজানরে সে-ই বুল্‌বে অনে।

বেচারি মুর্তজা! চোদ্দ বছর বয়স হলো তবু ঘড়ি দেখে 'টাইম' বলা শিখে উঠতে পারেনি। খায়-দায়, ডুগডুগি বাজায়। কারও সাতে-পাঁচে নেই।

বেচারি ফরিদাও। ঘরের মানুষটা গেল পাশের গাঁয়ে। বলে গেল, পরদিনই ফিরবে। ব্যস! তারপর থেকে জলজ্যান্ত মানুষটা বেপাত্তা। কী? না মায়ের পেটের ভাইটার ফাঁসি হবে, আমি গিয়ে দাঁড়াব না? কী দরকার তোর? যাক, গেলি তো গেলি—ফেরার নাম নেই? উপরন্তু বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো পাঠিয়ে দিলি ভাইয়ের ঐ বেজন্মাটাকে!

সারারাত ফরিদার ঘুম হয়নি। ঘর-বার করেছে। মেঝেতে মাদুর পেতে ঘুমাচ্ছিল ফ্যালনা। বোধকরি সেও জেগেছিল—হয়তো সে বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। তার আব্বাজানের ফাঁসি দেবার কথাটা সে আন্দাজ করেছে, কেউ সে কথা না বললেও। তাই সারারাত মেঝেয় শুয়ে অঝোর ধারে কেঁদেছে। শব্দ করেনি—পাছে চাচি খেঁকিয়ে ওঠে। তামাম রাত এপাশ ওপাশ করে ভোর রাতে ফরিদার চোখে নেমে এসেছিল ঘুম। ঠিক তখনই হলো সদরে কড়া-নাড়ার শব্দ।

তড়াক করে বিছানার উপর উঠে বসে ফরিদা। মশারী তুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। ঠেলে তোলে ফ্যালনাকে, অ্যাই ফ্যালনা! উঠ, উঠ! সরম নাই তর? তে রাত্তির কাটে নাই তর আব্বাজানের এন্তেকাল হোছে, আর তু মহিষের পারা ঘুমাইছিস! যা, উঠ্ কেয়ারি খুলি দে। তর বড়চাচা ফিরে আসিছে মনে লাগে।

ফ্যালনা উঠে বসে। বারো-তেরো বছর বয়স। ছেঁড়া একটা শাড়ি তার পরনে—ত্যানাই বলা চলে। ময়লা, জরাজীর্ণ, এখানে-ওখানে সেলাই করা। একমাথা রুক্ষ চুল। চোখ কচলাতে কচলাতে সদর দরজা খুলে দেয়।

মুর্তজা ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ফ্যালনাকে সে চেনে না। দেখেনি কোনোদিন। সে আহ্‌মেদনগরে পৌছানোর আগেই হাজীসাহেব লোক দিয়ে তাকে মতিগঞ্জে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বলে, তুই কেডা?

কিশোরীর প্রতিবর্তী প্রেরণায় ফ্যালনা তার খসে-পড়া আঁচলটা বুকে টেনে নেয়। কথার জবাব দেয় না। কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়েই থাকে, খোলা পাল্লার একপাশে।

দাওয়ার উপর ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে ফরিদাবিবি।

সেখান থেকে বলে, তুই অরে দেখিস্ নাই; তাই পহ্‌ছান্তে পারছস্ না। অরে আমাগোর ঘাড়ে চাপায়ে দেওয়া হোছে। অখন অরে ভাত-কাপড়ের যোগন দিতি হবে।

মুর্তজা তখনও মেয়েটাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখছিল, বললে, কিন্তুক ছুকরিটা কে কওছনে?

—গর্দভ কুথাকার! অখনো বুঝস্ নাই? তর ছুটচাচার বেজম্মা...

ফ্যালনা আহত হরিণীর মতো একবার চোখ তুলে তাকায় তার চাচির দিকে। কথা বলে না। ধীর পায়ে আড়ালে সরে যায়।

ফরিদা একনাগাড়ে কৈফিয়ৎ দিয়ে চলে। আসলে এতক্ষণে সে মনের আক্রোশকে প্রকাশ করার একটা সুযোগ পায়। বলে, খানসেনারা যখন তর ছুটচাচারে আমেদনগরে ফাঁসিকাঠ থনে ঝুলায়ে দেবার এন্তেজাম কর্‌ছে, তখন তার বেজম্মা মাইয়াডারে গাঁয়ের মান্‌যে এইহানে রাখ্যে দে গেল। আম্মা নাই, আব্বাজান ফাঁসি-কাঠ থিকে ঝুলল— অখন চাচিই তার দেখ্‌ভাল করবে অনে। অ্যাই নাকি হাদিসের নিদ্দেশ!

ফ্যালনার অর্ধাবৃত দেহটা দৃষ্টির আড়ালে অপসৃত হওয়ায় মুর্তজার মনে পড়ে গেল ভিন্নতর

বুভুক্ষার কথা। বললে, বড় ভুখ্ লাগিছে আম্মা! কাল রেতে কুছু খাই নাই!

ফরিদা ধমকে ওঠে, গিলনের কথা পরে। তর আব্বাজানের খপর কী ক? তার দেখা পেইছিলি?

—জী!

—কী কইল তর বাপ্‌জান? আইজ ফিরব?

মুর্তজা অসহায়ের মতো ইতিউতি চায়। বলে, হাজী-ছায়েব অখনো আয়ে নাই?

—না। ক্যান?

—সেই বুলবে অনে।

ফরিদা ওর চুলের মুঠি ধরে একটা ঝাঁকি দেয়, তো তুই ক্যান গিইছিলি? ছুটচাচার ফাঁসি দেখ্‌তি? কী দেখি এলি ক?

মুর্তজা বেমক্কা একটা বিষম কায়. তার ভাবগতিক দেখে ফরিদা সন্দিহান হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দিয়ে গর্জন করে ওঠে, কী? হইছেডো কী? ক দিনি?

হঠাৎ অশ্রহীন কান্নার অভিনয় করতে গিয়ে ককিয়ে ওঠে মুর্তজা : এ হেহেহে! আব্বাজানের এন্তেকাল হইছে!

ধীরে ধীরে ফরিদার মুঠিটা আলগা হয়ে যায়। ধীরে ধীরেই বসে পড়ে মাটিতে। নিজের অজান্তেই স্বগতোক্তি করে, কী? কী কইলি?

মুর্তজা অনেকটা হালকা বোধ করে। জগদ্দল বোঝাটা সে নামিয়ে ফেলতে পেরেছে এক নিশ্বাসে। এবার সে কৈফিয়ৎ দাখিল করতে শুরু করে, মোর কি গুনাহ্? আমরায় যখন আমেদনগরে আলাম তার আগেই তাঁই শয্যা নিছেন। আমারে তাঁই পহ্‌ছান্তে পয্যন্ত পারেন নাই। হাজীছায়েব কইলেন—মুৎজা, বাইরে গে খাড়া। আম্মো বাইরে খাড়াইয়া রইলাম। পরে শুনলাম, আব্বাজানের এন্তেকাল হইছে। হাজী-ছা'ব খতম পড়লেন, কাফনের এন্তেজাম করলেন, আর আমারে কইলেন—মুৎজা, ঘর যা কেনে। আম্মো চলি আলাম।

ফরিদার কর্ণকুহরে এসব কথা প্রবেশ করছিল কিনা বোঝা গেল না। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে সে নিথর বসেছিল। বরং ফ্যালনা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসেছে। বড়চাচার এই আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে সেও বোধকরি স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ঠিক তখনই সদরে শোনা গেল কড়া-নাড়ার শব্দ। কে বলে মুর্তজা নির্বোধ? সে ঠিকই-বুঝে ফেলেছে। এতক্ষণে হাজী-সাহেব এসে পড়েছেন। অনেকটা নিশ্চিন্ত হয় সে এবার। এখন যা করণীয় তা উনিই করবেন। শোকাহতা আম্মাজানকে তাঁর জিম্মায় গছিয়ে দিতে পারলে সে একবার পাকঘরের দিকে সরেজমিনে তদন্তে যেতে পারে।

দ্বার খুলে দিতে হাজী-সাহেব জনান্তিকে মুর্তজাকে ফিস্‌ফিস করে বলেন, তর আম্মাজানে কইছস্?

মুর্তজা সম্মতিসূচক গ্রীবা সঞ্চালন করে। হাজী-সাহেব ওকে ছেড়ে এগিয়ে আসেন। মুর্তজা গুটি গুটি পাকঘরের দিকে এগিয়ে যায়। হাজী-সাহেবকে দেখে ফরিদা দাঁড়িয়ে উঠেছে। হাজী-সাহেব সেদিকে আরও একপদ অগ্রসর হয়ে মুখস্থ্ বলার মতো দ্রুতভাষে বলে চলেন, বহিনজী! আঁই বুঝতাছি কী প্রেচণ্ড আঘাতি আঁইন্যে জর্জরিতা! কিন্তু অ্যাই তো আল্লাতালার বিধান! দুনিয়াদারী পদ্মপত্রে পানি! বেরাদরানে ইসলাম! আঁই অধম বান্দা—আঁইন্যের খেদমতে আঁই কী বয়ান করুম? আঁইন্যে তো শরিয়তের সব বয়ানে ওয়াকিব্‌হাল! খোদার গজব নামছে, দুনিয়া গুনাহ্‌গারিতে ভরছে! ইব্রাহিম ছায়েবের মতো শিরিন আদমির জুন্যি এ দুনিয়ায় আর ঠাঁই নাই! আয়েন, তেনার হেকমতে আঁইরা মোনাজাত করি : সোব্‌হানাকা রাব্বিকা রাবিল ইজ্জাতে আম্মাইয়ামেকুন! আস্‌সালাম...

ফরিদা ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, হাজী-ছাব?

—আঁই?

—আপ্‌নে কি এমন ভাষায় কথা কইবার পারেন, যাতে 'আঁই' টুক্ বুঝবার পারি?

...আপনার-আমার অবস্থাও তাই। 'আঁই'-রাও বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছি না। ফলে, ওঁর হৃদয়ের

উচ্ছ্বাসটা একটু চেঁচেছুলে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

মৌলানা মহীউদ্দীন সংক্ষেপে সব কথাই বললেন, আসান আলীর ফাঁসি, ফাঁসির মাঠে ইব্রাহিমের অকস্মাৎ বুকে ব্যথা, তার শয্যাগ্রহণ। হাকিম-সাহেবের চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয়নি; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার ভিতরেই ইব্রাহিমের সব যন্ত্রণার অবসান হলো। দু-ভাইকে পাশাপাশি কবরে শুইয়ে দিয়ে উনি এইমাত্র স্বগ্রামে ফিরে এসেছেন।

ফরিদা বারে বারে আঁচলে চোখ মুছল। মুর্তজা ইতিমধ্যে না-পাত্তা। খোদার মালুম এতক্ষণে সে পাকঘরে কী আরিষ্কার করেছে—পান্তা, মুড়ি-মোয়া, না কি জ্বাল দেওয়া ঘন দুধ আর পাটালি। ফ্যালনা কোথা থেকে একটা তালপাতা এনে চাচিকে পিছন থেকে বাতাস করতে শুরু করেছে। ফরিদা ইতিমধ্যে আবার বসে পড়েছে মাটিতে। নিজের কপাল চাপড়ে সে সক্ষোভে বলে ওঠে, আচ্ছা বলুন তো হাজী-ছাহেব, মুর্তজার বাপ কেন দৌড়াল আহ্‌মেদনগরে? পাকিস্তানী খান-সেনারা সেই বেহেড মাতালটারে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝোলাচ্ছে, তাতে তোর কী?

হাজী-সাহেব বললেন, বহিনজী, ভুলে যাবেন না, ওরা ছিল সহোদর ভাই।

—না! মুর্তজার বাপ কোনদিন আসান আলীকে ভাই বলে স্বীকার করেনি। অন্তত আমাদের সাদি হবার পর থেকে।

হাজী-সাহেব নতনেত্রে বলেন, আসান আলীকে খান-সেনারা ফাঁসি দিচ্ছে শুনে না-জানি কোথা থেকে মোটর-সাইকেলে চেপে আপনার বড়ছেলেও এসেছিল আহ্‌মেদনগরে...

ফরিদা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, সে আমার বড়ছেলে নয় হাজী-ছাহেব। মতিগঞ্জের সবাই তাকে বলে 'শয়তানের ছাওয়াল'। আপনি তা ভাল রকমই জানেন। তাকে তার বাপ ত্যাজ্যপুত্র করেছিল, তাছাড়া...

মাঝপথেই ফরিদা থেমে যায়। তার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। কী যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তার। স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে হাজী-সাহেবের দিকে। হাজী-সাহেব নিঃশব্দে তাঁর দাড়িতে হাত বুলাচ্ছিলেন। মুখে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্মিত হাসি। কিন্তু ঐ হাসির মধ্যেই ফরিদা কী যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত দেখতে পেল। ফ্যালনার হাত থেকে তালপাখাটা কেড়ে নিয়ে তকে ভিতরে যেতে বলল। হাজী-সাহেব লক্ষ্য করলেন ফরিদার ভাবান্তরটুকু। উপায় নেই! অপ্রিয়তর কাজটুকুও তাঁকে করতে হবে। এ গাঁয়ের ভালমন্দের জিম্মাদারী তাঁরই। দুঃসংবাদটা তাঁকেই দাখিল করতে হবে।

যে দুঃসংবাদ ইব্রাহিমের মৃত্যুর চেয়েও মর্মভেদী!

আশপাশে দেখে নিয়ে ফরিদা নিম্নকণ্ঠে জানতে চায়, হাজী-সাব্...ইয়ে হয়েছে...মুর্তজার বাপ কি জানতে পেরেছিল...'ছয়তানের ছাওয়ালটা' আমেদনগরে এসেছে?

হাজী-সাহেব ততক্ষণে একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়েছেন. রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, বেচারি হাসান...

—থাক! —হঠাৎ গর্জন করে ওঠে ফরিদা, ও নামটা এ ছামুতে উচ্চারণ করবেন না হাজী-সা'ব।

—বেশ থাক তবে। যাই তাহলে?

গাত্রোত্থানের উদ্যোগ করতেই বাধা দিল ফরিদা, না না, বসুন! কী বলছিলেন যেন?

—আমি কিছু বলতে চাইনি। আপনিই জানতে চাইছিলেন—ইব্রাহিম মিঞার সঙ্গে তার বড়ছেলের সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না।

—হ্যাঁ তাই। হয়েছিল?

—না, হয়নি! বাপ মৃত্যুশয্যায় শুনেও সে শেষবারের মতো বাপকে দেখতে এল না। ইব্রাহিম-মিঞাই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল—ও এল না। জানি না, সে তখন মত্তাবস্থায় ছিল কি না। জবাবে বলে পাঠিয়েছিল—অমন বাপের হাত ধরে সে বেহেস্তে যেতেও রাজি নয়, বরং ছোটচাচার হাত ধরে সে দোজখে যেতেই প্রস্তুত!

ফরিদার একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে! যাক! তাহলে শেষ সময়ে বাপ-বেটায় সাক্ষাৎটা হয়নি। ইব্রাহিমকে চিনতে তো আর বাকি নেই। ওদের বংশটাই অমন! দারুণ খেয়ালি! ঝোঁকের মাথায় কখন কী যে করে বসে ঠিক-ঠিকানা নেই। শেষ সময়ে সে যদি সর্বসমক্ষে ছেলের হাত ধরে বলে যেত—'তরে মাফ্ করি গ্যালাম রে হাসান!' তাহলেই চিত্তির! শয়তানের ছাওয়ালটা এসে হয়তো দাবী করে বসত তার হিস্যা! ফরিদা অবশ্য বজ্র আঁটুনি দিয়ে রেখেছে! রীতিমতো 'ইস্ট্যাম্পো' দেওয়া কাগজে—কিন্তু গাঁয়ের মানুষ যদি ধরে পড়ত...

হঠাৎ মুখ তুলে ফরিদা বললে, তাই যাবে সে! দোজখের কীট— দোজখেই যাবে!

হাজী-সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সবই আল্লাহ্-তায়ালার মর্জি!

ফরিদা ফুঁসে ওঠে, তা তো বটেই! তবে কি জানেন হাজী-সাহেব, আল্লাতালার মর্জিটাও বে-লাইনে চলে না। যারা হাদিস মানে, হালাল-হারামের ফারাক জানে, তারাই বেহেস্তে যায়। আর যারা শরিয়তী কানুন মানে না, কাফেরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই পবিত্র পাকিস্তানকে যারা দু-টুকরো করতে চায় তাদের কখনো আল্লাতালা ক্ষমা করেন না।

হাজী-সাহেব দার্শনিকের মতো উদাসীন হয়ে বলেন, আল্লার মর্জি কিছুই বুঝতে পারি না, বহিনজী. খোদাতালা হাসানকে ক্ষমা করবেন কিনা জানি না, কিন্তু হাসানের বাপ তাকে বোধ হয় ক্ষমা করেছিল—

ফরিদা বিষাক্ত ব্যঙ্গের সঙ্গে বলে, তাই নাকি? কী করে বুঝলেন?

—না হলে অন্তিম মুহূর্তে নতুন উইল করার কথা সে চিন্তা করতো না!

এতক্ষণে বজ্রাহতা হয়ে গেল ফরিদা। অস্ফুটে যেন স্বগতোক্তি করল, নতুন উইল! মানে?

—কেন? মুর্তজা সে-কথা আপনাকে বলেনি?

—কী কথা? কী বলছেন আপনি?

—মৃত্যুশয্যায় ইব্রাহিম একটা উইল বানিয়েছে সে কথা বলেনি?

ছিলেখোলা ধনুকের মতো দাঁড়িয়ে ওঠে ফরিদা। চাপা আক্রোশের সঙ্গে বলে, আপনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমার এতবড় সর্বনাশ হতে দিলেন?

হাজী-সাহেবও দাঁড়িয়ে পড়েছেনে। আমতা আমতা করতে থাকেন, আমি তো নিমিত্তমাত্র...

—থামুন আপনি! ছি-ছি ছি! আপনি না হাজী! মক্কা ফেরত! আপনি কি মানুষ?

মহীউদ্দীন ততক্ষণে দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে এসেছেন। সসঙ্কোচে বলেন, আপনার কথায় আমি আজ কিছু মনে করব না। সম্পত্তি যার, সে উইল করলে আমি বাধা দেবার কে? আপনি শোকের আঘাতে...

—শোক?

—আচ্ছা না হয় শোক নয়, হতাশা! বর্তমান অবস্থায় 'হতাশা' শব্দটা হয়তো আপনার হৃদয়ের অনুভূতির সঙ্গে খাপ খাবে।

ফরিদা কালনাগিনীর মতো হিস্‌হিস্ করে ওঠে, পরস্ত্রীর 'হৃদয়ের কথা' কবে থেকে সমঝাতে শুরু করেছেন হাজী-সাহেব?

ফরিদার বিষদাঁত দিয়ে সবটুকু বিষ বোধকরি তখনো বার হয়ে যায়নি। তাই পাদপূরণ করে, হাফেজ মৌলানা সেজেছেন, তাই সাজুন, ন্যাকা আর নাইবা সাজলেন।

মহীউদ্দীন হাত বাড়িয়ে ছাতাটাকে তুলে নিয়ে বগলদাবা করলেন। প্রায় স্বগতোক্তি করলেন একটা, আল্লাহ্-তায়ালা আপনাকে সান্ত্বনা দিন!

ধীর পদে ইব্রাহিম মিঞার বাস্তু ছেড়ে গ্রামের পথে নেমে পড়লেন আবার।

সব কথা শুনে আমিনা বলল, তুমিই বা কেন আগ্‌বাড়িয়ে ওসব কথা বলতে গেলে? ইব্রাহিম

চাচার শেষ মুহূর্তে উইল করার কথা?

—বাঃ! আমি বলব না তো কে বলবে? আমিই তো তার শেষ উইলের সাক্ষী। কাগজখানা আমার হাতে দিয়েই তো সে নিশ্চিন্তে দু-চোখ বুজল।

আমিনা মেয়েলী কৌতূহলে প্রশ্ন করে, চাচা কারে কি দিয়ে গেল?

—খোদায় মালুম। আমি তার কী জানি? —হাজী-সাহেব নির্লিপ্ত।

—বাঃ! তুমি তো তার উইলে সাক্ষী? পড়ে দেখনি? না পড়েই সই দিয়েছ?

হাজী-সাহেব আলখাল্লাটা গায়ে চাপাতে চাপাতে বলেন, তুমি ভুল করছ আমিনা। উইলে যে সাক্ষী থাকে তাকে যে উইলটা পড়ে দেখতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। সে শুধু দেখে নেবে—যে লোকটা দলিলের নিচে স্বাক্ষর করছে সে সাচ্চা আদমী কি না, সে সুস্থমস্তিষ্কে অপরের বিনা-প্ররোচনায় সই করছে কি না। আমার দায়িত্ব সেইটুকুই।

আমিনা অন্য প্রসঙ্গে আসে, তা তুমি আবার গায়ে জামা চড়াচ্ছ কেন? বেরুবে?

—হ্যাঁ, একটু পরেই রাখহরি-মোক্তার আর ইব্রাহিম-মিঞার দুই চাচাতো ভাই আবদুল আর মেহ্‌বুব-চাচা আসবেন। তাঁদের নিয়ে আমাকে ইব্রাহিম-চাচার বাড়িতে একবার যেতে হবে। সেখানেই বন্ধ খাম খুলে উইলখানা পড়ে শোনানো হবে।

আমিনা বিরক্ত হয়। কী দরকার এসব ঝামেলায় নিজেকে জড়ানো?

কিন্তু হাজী-সাহেবের যুক্তি অন্যরকম। এগুলো নাকি সামাজিক কর্তব্য। বলেন, তুমিও তৈরি হয়ে নাও। বরং এক কাজ কর। তুমি একটু আগেই ওখানে চলে যাও। শোকাহত মহিলা—এতগুলি মেহ্‌মান। প্রতিবেশীর বিপদে-আপদে সাহায্য করতে যেতে হয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমিনাকে তৈরি হয়ে নিতে হলো। শাড়িটা পাল্টে নেয়। সাজগোজ যেটুকু না করলে নয়। শোকের বাড়ি। বয়সে সে হাজী-সাহেবের আধাআধি। বিবাহিত জীবন মাত্র দু'বছরের। শ্যামলা গায়ের রঙ, কিন্তু অপরূপ দেহশ্রী। খোদাতালা শ্যামলা রঙের রজনীগন্ধা পয়দা করলে যেমনটি দেখতে হত। চোখ দুটি আয়ত, আর চোখের মণিদুটি সর্বদাই চঞ্চল। সে গাঁয়ের বধূ বটে, কিন্তু লেখাপড়া-জানা মেয়ে। হেঁটে বেড়ালে মনে হয়, সে বুঝি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আমিনা রওনা হয়ে যাবার একটু পরে অতিথিরা সদলবলে এসে উপস্থিত হলেন হাজী-সাহেবের ডেরায়। রাখহরি দত্ত হচ্ছেন প্রঞ্চগ্রামের মোক্তারবাবু। আদালতে যান না, হয়তো তার হেতু ত্রিসীমানায় আদালত নেই। তবে এককালে যেতেন। সদর শহরে বাস ছিল যখন। ইদানীং জমি-জেরাৎ চাষ-আবাদ নিয়ে দিন গুজরান করছেন। তবে আইনজ্ঞ মানুষ হিসাবে এ অঞ্চলে তাঁর খাতির আছে। আইনঘটিত পরামর্শ নিতে অনেকেই তাঁর ডেরায় আসে। দলিল-দস্তাবেজের মুসাবিদা করে দেন, উপর-মহলে দরখাস্ত পাঠানোর প্রয়োজন হলে তার বয়ান লিখে দেন। 'ফি' নেন না, পরিবর্তে এর পুকুরের মাছ, ওর ক্ষেতের ফসল ভেট হিসাবে জোটে। না জুটলেও তাঁর আপত্তি নেই। ওকালতি কেরামতিটুকু দেখাতে পারলেই তিনি খুশি। গাঁয়ে সভা-সমিতি হলে সামনের সারির একখানি চেয়ার তাঁর প্রাপ্য। হাজী-সাহেব ইব্রাহিম মিঞার উইলখানি মুখবন্ধ খামে তাঁর কাছেই দিয়েছেন। সর্বসমক্ষে খাম থেকে মোক্তারবাবুই কাগজখানা বার করবেন, পড়ে শোনাবেন পঞ্চজনাকে। ইব্রাহিমের শেষ ইচ্চা যাতে কার্যকরী হয় সেটাও দেখে দেবার দায়িত্ব তাঁর।

এদিকে ইব্রাহিম মিঞার বাড়িতে রীতিমতো সাড়া পড়ে গেছে।

সকাল দশটার সময় মেহ্‌মানদের আসার কথা। ফরিদার কলিজার ভিতর দিলটা জালে-পড়া কাতলা-মাছের মতো ঘাই দিয়ে দিয়ে উঠছে। শেষ সময়ে বুড়োটার এমন মতিচ্ছন্ন হলো কেন? ভুলই হয়েছে তার—বুড়োটাকে আহ্‌মেদনগর যেতে দেওয়া। চোখের আড়াল হতে দেওয়া। ঝাড়ে-বংশে এরা বেহেড, বেহিসাবী। একটি বেলার জন্য দৃষ্টির আড়াল করেছে-কি-করেনি বুড়োটা ওকে দ'য়ে মজিয়ে গেল! না, তা বোধহয় হবে না। আল্লা-রসুলের অপার করুণা, সেই হাড়-হারামজাদাটা সুযোগ বুঝে

বাপের কাছে গিয়ে মায়াকান্না কাঁদতে শুরু করেনি। করলে হয়তো বুড়োটা একমুঠো কোম্পানির কাগজ তাকেই ধরিয়ে দিত! তা দেয়নি। দিতে পারে না। শয়তানের চেলাটার সুমতি হয়েছিল—বাপের ডাকে সে সাড়া দেয়নি। তাহলে নতুন করে উইল বানানোর এমন কী দরকার পড়ল? ফরিদা ইতিমধ্যে তার কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকটা খুলে নিচেকার ন্যাপথালিন দেওয়া পুলিন্দাটা বার করেছে। ইব্রাহিম মিঞার পাকা উইলখানি। ইস্ট্যাম্পো কাগজে রাখহরির লেখা। সাত বছর আগেই ইব্রাহিম তার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর নির্ব্যূঢ়-স্বত্বে দিয়ে গেছে তার ধর্ম-পত্নীকে।

মুর্তজা যথারীতি পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিল। তাকে ঠেলে তুলে দিল ফরিদা, অ্যাই মুর্তজা! উঠ, উঠ! সরম নাই তর? বাপের হলো এন্তেকাল, আর এত বেলায় তু মোষের পারা ঘুমাইছস?

মুর্তজা উঠে বসে। চোখ মুছতে মুছতে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে, যা ব্যাপা! বাপ মরলি মান্‌ষে বাকি জেবন জাগি থাহে নাকি?

ফ্যালনা একটা ঝাঁটা দিয়ে উঠোনটা ঝাঁট দিচ্ছিল। ধুলোয় হঠাৎ মুর্তজা বেমক্কা কাশতে শুরু করে। ফরিদা ধমকে ওঠে, আইস্তে বাছা, আইস্তে। ধুলা ওড়াওনা খামকা। রোগা পোলাটা কাশতে আছে, দ্যাখস্ না চক্ষু মেইল্যা?

ফ্যালনা থমকে যায়। একটু আগে উঠোনটা ঝাঁট দেবার নির্দেশ পেয়েছিল—মেহ্‌মানরা এসে পড়ার আগে সেটা শেষ করার নির্দেশও ছিল। কিন্তু ধুলো না উড়িয়ে কী ভাবে ঝাঁট দেওয়া যায় সে কায়দা ওর জানা নেই। ফরিদা ওর সমস্যার সমাধান দাখিল করে : চ্যারগুলান মোছ না বাপু? গতরে কি পোকা পড়িছে?

ফ্যালনা ঝাঁটাটাকে চৌকির তলায় ঠেলে দেয়। সসঙ্কোচে তার ভাষায় বলে, একটু ত্যানা যদি দেন.

—কেন? আঁচল দিয়েই মোছ না সোনামণি! কী এমন বেনারসী পরে আছ?

অগত্যা ফ্যালনা তার আঁচল দিয়েই চেয়ারগুলো মুছতে থাকে। বেচারির দেহের তুলনায় শাড়িটা এমনিতেই বহরে ছোট। আঁচল দিয়ে কাঠের চেয়ারগুলো মুছতে গিয়ে ও একটু বে-আব্রু হয়ে পড়ছিল। মুর্তজা তার দিকে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ জানলা দিয়ে কী একটা নজরে পড়ায় মুর্তজা বলে ওঠে, আমিনা বিবি-সাহেবা আস্‌তিছেন মনে লাগে।

ফরিদা ঘুরে দাঁড়ায়, কেডা? ঐ হাজী-সাহেবের জরু? রূপের দ্যামাকে যাঁর মাটিতে পা পড়ে না? তা অ্যাই সাতসকালে তাঁই ক্যান?

সদর খোলাই ছিল। আমিনা সসঙ্কোচে দ্বারপথে দাঁড়িয়ে পড়ে। এক পা ভিতরে এসে মুখ থেকে আব্রুটা সরিয়ে দেয়।

—অ! তুমি এয়েছ? আমি বলি এই কাক-ডাকা ভোরে কে আবার এল জ্বালাতে।

আমিনা রীতিমতো অপ্রস্তুত। বেলা দশটার কাছাকাছি। কাক অবশ্য এখনও ডাকছে। ফরিদার কথাগুলো যে চ্যাটাং-চ্যাটাং এটুকু তার ভালোরকম জানা। পারতপক্ষে ঐ মহিলাটির দিগড়ে ভেড়ে না। তার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল স্বামীর উপর। তবু কণ্ঠস্বরে তার রাগের কোনও প্রকাশ হলো না। বললে, হ্যাঁ, আমিই। আপনাকে সাহায্য করতে এলাম।

—সাহায্য? খামকা সাহায্য কি গো? ও বুঝেছি! হাদিসে ঐরকম একটা নির্দেশ আছে বটে। প্রতিবেশীর এন্তেকাল হলে তার পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে যেতে হয়।

আমিনা আরও অপ্রস্তুত। বলে, না, মানে ইনি বললেন কি না—এখানে এখনি অনেকে আসবেন

—তাই কী?

—আচ্ছা, আমি বরং এখন যাই।

ফরিদা এক টিপ জরদা না মিসি কি যেন মুখবিবরে ফেলে দিয়ে বললে, না বাছা, এসে যখন পড়েছ তখন তামাসাটা দেখেই যাও। সব কটা মরদ, আমি একা মেয়েছেলে...

ফরিদা বোধকরি দ্বন্দ্বটাকে নারী বনাম পুরুষ হিসাবে দেখছে। হঠাৎ ঘুরে ফ্যালনাকে প্রচণ্ড একটা

ধমক লাগায়, শাড়িটা ওভাবে ধুলোয় রগড়াচ্ছ কেন? ঐ একটিই তো ত্যানা জড়িয়ে এসেছ। আব্রুর জোগান তো আমারেই দিতি হবে, না কী?

ফ্যালনা বিহ্বলের মতো বলে, আপনেই তো বললেন...

—ফের মুখে মুখে চোপা? ঐহানে চুপটি করি বসি থাক্। ইমানদার মেহ্‌মানরা সব আসপেন, বে-সরম বাৎচিৎ একদম করবি না। বুঝছস্?

ফ্যালনা দাওয়ার প্রান্তে পা ঝুলিয়ে চুপটি করে বসে থাকে। আমিনার উপস্থিতির কথা ভুলে গৃহকর্ত্রী আপনমনে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

আমিনা কী করবে ভেবে পায় না। এখানে থাকা বিড়ম্বনা, আবার গৃহকর্ত্রীকে কিছু না বলে চলে যাওয়াও ঠিক নয়। সে ধীরপদে ফ্যালনার দিকে এগিয়ে যায়। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে ফ্যালনা উঠে দাঁড়ায়। আমিনা তার পরিচয়টা জানে, আগে কখনো দেখেনি। বলে, বসো, বসো। উঠে দাঁড়ালে কেন আবার?

নিজেও একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে বসে। ফ্যালনা কিন্তু অনুরুদ্ধ হয়েও বসে না। বাঁশের খুঁটিটায় হেলান দিয়ে নখ খুঁটতে থাকে। আমিনার কেমন যেন মায়া হয়। বলে, তোমার নামটা যেন কী?

—ফ্যালনা। আমি হলাম গে...

—জানি। শোন ফ্যালনা, অমন মুখভার করে থেক না। তোমার চাচি আসলে লোক খারাপ নন, তবে ওঁর মন-মেজাজ তো এখন ভাল নেই...বুঝলে না?

ফ্যালনা নতনেত্রে ঘাড় নেড়ে জানায় সে বুঝেছে। আমিনা আবার বলে, এখনি তোমার বাবার আত্মীয়স্বজনরা আসবেন। তাঁদের সবাইকে চেন?

—জী না। আব্বাজানের সঙ্গে ওঁরা তো কোনো সম্পর্ক রাখতেন না। তাঁর কাছে শুধু একজনের নামই শুনেছি। প্রায়ই বলতেন তার কথা। চোখে অবশ্য কখনো দেখিনি...

—কী নাম? কার কথা বলছ?

—হাছানভাই।

আমিনা একটু চমকে ওঠে। হাসানের নাম সেও শুনেছে বিয়ে হয়ে এ গ্রামে আসার পর। চোখে কখনো দেখেনি। তার আগমনের অনেক আগেই হাসান মতিগঞ্জ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। কিন্তু গলিত মৃতদেহ অপসারণের পরেও যেমন বাতাসে তার দুর্গন্ধটা ভাসতে থাকে, তেমনি মতিগঞ্জের মানুষের স্মৃতিতে ঐ বিভীষিকার দূষিত স্মৃতির একটা রেশ এই এতদিনেও মুছে যায়নি। নববধূ হিসাবে এ গাঁয়ে এসে সেই 'ছয়তানের ছাওয়ালটা'র বিষয়ে অনেক মুখরোচক কিস্‌সা শুনেছিল সে। অনেক অনূঢ়া তরুণীর মুখে তার অসভ্যতা, অশালীনতা আর ষণ্ডামার্কা চেহারার কথাও। আমিনার কিছু কৌতূহলও ছিল—অস্বীকার করবে না সে—কারণ তার সমবয়সী মেয়েদের সেই ভৎর্সনার মধ্যে সে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেয়েছিল—ওর মনে হয়েছে সেই অসভ্য, ষণ্ডামার্কা ছেলেটার স্মৃতি তারা তাদের বুকের উপত্যকায় সযত্নে গোপন রেখেছে। কেন? আমিনার মনে হলো এই কিশোরীটিকে সাবধান করে দেওযা তার কর্তব্য। বললে, ফ্যালনা, তুমি যদি সত্যিকারের শীরীন মেয়ে হতে চাও তাহলে ঐ লোকটার নাম কখনো মুখে উচ্চারণ করো না। বুঝলে?

মেয়েটা ভারী শান্ত। এক কথায় মেনে নিল। তবু কৌতূহলটাও দমন করতে পারে না। বলে, কেন? হাছানভাই কী গুণাহ্ করেছে?

—আঃ! আবার! বললাম না, ও নামটা উচ্চারণ কর না! এ গাঁয়ে কেউ তার নাম করে না। সে খুব খারাপ। অসৎ! লোকে বলে সে 'ছয়তানের ছাওয়াল'। হেন দুষ্কর্ম নেই যা সে করেনি। সে মদ খায়, জুয়াবারে জুয়া খেলে, নামাজ পড়ে না, বেপাড়ায় যায়...

ফ্যালনার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায়। বিস্ময়েই নিশ্চয়, ভাবে আমিনা। সে বুঝে উঠতে পারে না

ফ্যালনার এই ভাবান্তরের অন্য কোনও হেতু থাকতে পারে। বোকা মেয়েটা তখন ভাবছিল—ওর আব্বাজানও তো মদ খেত, সপ্তাহের সাত দিনই সে জুয়া খেলত, নামাজও তাকে কস্মিনকালে পড়তে দেখেনি। তাহলে হাসানভাই খারাপ হলো কোন্ সুবাদে? ওর আব্বাজান তো খুব ভাল মানুষ ছিল। ওকে কত ভালবাসত। এক মুঠো খাবার জুটলে কোঁচড়ে বেঁধে নিয়ে আসত মেয়েটার জন্যে। তবে ঐ শেষ কথাটার অর্থ বেচারি বুঝে উঠতে পারেনি। জানতে চায়, বেপাড়ায় মানে কী?

আমিনা বিব্রত বোধ করে। বলে, সে তোমার বুঝে কাজ নেই। কিন্তু এটুকু তো বোঝ যে, অন্য কাজগুলো খারাপ, খুবই খারাপ?

ফ্যালনা সেটা বোঝে না। কিন্তু না-বুঝলে যে রেহাই নেই, এটুকু বোঝে। তাই ঘাড় নেড়ে বলে, জী।

ঠিক সেই সময়েই সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। দ্বার খোলাই ছিল, অর্গলবদ্ধ নয়। আমিনার ইঙ্গিতে ফ্যালনা এসে পাল্লা দুটো হাট করে খুলে দেয়। যা ভেবেছে তাই। প্রথমে ছাতা হাতে হাজী-সাহেব এবং তাঁর পিছনে পিছনে রাখহরি মোক্তার আর ইব্রাহিম মিঞার দুই চাচাতো ভাই—আব্দুল ও মেহ্‌বুব প্রবেশ করলেন। আমিনা ইতিউতি তাকিয়ে দেখে। গৃহকর্ত্রী এখনো ভিতর বাড়িতে। মুর্তজা বেপাত্তা, সে হাজী-সাহেবের দিকে সরে আসে। মুখের সামনে জালের নেটটা টেনে দিয়ে অনুচ্চস্বরে বলে, ওঁদের বসতে বল। বহিনজী এখনি এসে পড়বেন।

হাজী-সাহেব কৌতুক বোধ করেন। তিনি জানতেন, আমিনা স্কুলে-কলেজে পড়েছে। একটা পাসও দিয়েছে। অথচ এখন গ্রাম্যবধূর চরিত্রে সে অভিনয় করছে। সকৌতুকে বলেন, তাহলে ওঁদের আপ্যায়ন করে বসাও। আমাকে বলছ কেন?

আমিনা ভ্রূকুটি করে। বলে, এমন বেপর্দা হয়ে বাইরের লোকের সামনে কথা বলতে সরম হয় না বুঝি?

ইতিমধ্যে রাখহরি আর আব্দুল দাওয়ায় উঠে নিজেরাই চেয়ার টেনে বসে পড়েছেন। মেহ্‌বুব সাহেবের পায়ে চটি ছিল না, ছিল ফিতে বাঁধা ক্যাম্বিসের জুতো। দাওয়ায় বসে তিনি জুতোর ফিতে খুলতে ব্যস্ত ছিলেন। সেখান থেকেই রসিকতা করেন, কী হাজী-সাহেব, বিবি পেয়ে কি আমাদের কথা ভুলে গেলেন? বলেন তো আমরা একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই?

সৌন্দর্যের খ্যাতিতে আমিনা এ গাঁয়ের কারও কাছে অপরিচিতা নয়। বেচারি দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে যায়। হাজী-সাহেব ছাতিটাকে চৌকির গায়ে ঠেকিয়ে রেখে স্ত্রীর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। বলেন, উনি আমাকে বলছিলেন, আপনারা বসুন। গৃহস্বামিনী এখনি এসে পড়বেন।

আব্দুল ইতিমধ্যে একটি হাতপাখাও যোগাড় করেছেন। পাঞ্জাবির উপরের বোতামগুলি খুলে তালপাতার বাঁট দিয়ে পিঠে চুলকাতে চুলকাতে বলেন, তা অনুমতি পাবার আগেই তো আমরা জমিয়ে বসেছি। এ কি আমাদের অচেনা ছামু? ইব্রাহিম মিঞা ছিল আমার আপন চাচাতো ভাই, না কি বল বড়ভাই?

ইতিমধ্যে অন্দর থেকে মুর্তজা বেরিয়ে এসেছে। তার হাতে একটা বারমেসে গাছের আধাপাকা পেয়ারা। ফ্যালনার কল্‌জে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। মেহবুব এতক্ষণে ক্যাম্বিসের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁর দেহখানি কিঞ্চিৎ বৃহদায়তন। চেয়ারে তাঁর জুৎ হয় না। চৌকিতে উঠে একটি তাকিয়ে টেনে নিয়ে আরাম করে বসেছেন। আব্দুলের ঐ অবান্তর প্রশ্নের জবাব বাহুল্যবোধে বলেন, আমরায় হক্কলে আয়া পড়সি, মনে লাগে?

মুর্তজার মুখভরা ডাঁসা পেয়ারা। সে বেমক্কা বলে ওঠে, হাছানভাই অখনো আয়ে নাই!

আব্দুল শুনতে পাননি। অথবা নামটা মনে ছিল না তাঁর। বলেন, কেডা?

মেহবুব শুনতে পেয়েছিলেন, বলেন, ইব্রাহিমের বড় পুলা গো! হুনছি কাইল রাতে সে শালা এ গাঁয়ে আইছে। কিন্তুক্ এইহানে আসপো বলি তো মনে লাগে না।

আব্দুল এতক্ষণে সায় দেন, হক্কতা! সেডায় ক্যামনে আসপো? বাপে তারে খ্যাদাইছিল, অখন বাপের এন্তেকাল হওনের পরে...

কথাটা তাঁর শেষ হলো না। অন্দরমহল থেকে আবির্ভূতা হলেন শোকের প্রতিমূর্তি।

ফরিদা কখনো মঞ্চে অভিনয় করেছে বলে জানা নেই, কিন্তু আমিনার মনে হলো—একেই বলে নাটকীয় আবির্ভাব! শুধু দর্শকদলের মুণ্ডুই নয়, স্পট-লাইট থাকলে সেটাও অনিবার্যভাবে সেদিকে মুখ ফেরাত। সবাই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়। শুধু মুর্তজা এই সুযোগে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে। ফরিদা তার রুমালে নীরবে অশ্রুমোচন করতে থাকে। দেখাদেখি আব্দুল তাঁর পাঞ্জাবির হাতায় আর মেহবুব বাঁ-হাতের তালুতে চক্ষুমার্জনা করেন।

আব্দুল ধরা গলায় সৌজন্য প্রকাশ করেন, ভাবিজী! আমরা যদি সবাই সমবেতভাবে মোনাজাত করি তাহলে কি...

হাজী-সাহেব গলা খাঁকারি দিয়ে বাধা দেন, ওসব থাক। আমি এর আগেও এসেছিলাম। খতম পড়ে গেছি, মোনাজাতও করে গেছি। বহিনজীর হৃদয়ের ভিতর...

কথাটা তাঁর শেষ হয় না। বোধকরি কিছু পূর্বস্মৃতি মনে পড়ায়।

ঠিক তখনই চেয়ার থেকে একটা কোলা ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে নেমে পড়ে মুর্তজা। সে জানলা দিয়ে দেখতে পেয়েছিল। বলে, অই তো! আয়া পড়সে!

স্পট-লাইট নেই। থাকলে এতক্ষণে সেটা ফরিদাবিবিকে ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়ত সদর দ্বারের উপর। খোলা দরজার ফ্রেমে বাঁধানো একটি সুঠাম যুবকের মুখে। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। পরনে খাকি ব্রিচেস, পায়ে হান্টিং শু। পিঠে ব্যাগ, হাতে খেটো ব্যাটন, মাজায় রিভলভার। হিপ্ পকেট থেকে নির্লজ্জভাবে মুণ্ডটুকু বার করে আছে একটা বিলাইতির চ্যাপ্টা শিশি।

কারও মুখে কথা নেই। বোধকরি সকলের মনেই তখন উচ্চারিত হচ্ছিল এ কাহিনীর শিরোনামটা, ছয়তানের ছাওয়াল!

হাসান কাদা-মাখা বুট পায়েই উঠে আসে দাওয়ায়। মাথা থেকে টুপিটা খুলে বিচিত্র কায়দায় দোলায়—অনেকটা যে ভঙ্গিতে ম্যাজিশিয়ান তার খেলা দেখানোর আগে ন্যাকামি করে। নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে, লেডিস অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন! আপনাদের বান্দা হাজির। আপনাদের নফর-কি-খিদমদ্‌গার, টেংরি-কি-গর্দা, জুতিকি হাফসোল, ছয়তানের ছাওয়াল, হাসান আলী বান্দা।

হাজী-সাহেব ওর দিকে এক পা এগিয়ে আসেন। তাঁর মাথাটা ওর বুকের সমতলে। বিশালকায় দানবটার কাঁধে একটা হাত রেখে একটু ধমকের সুরে বলেন, হাসান! এটা কি তোমার রসিকতা করার সময়, না পরিবেশ?

হাসান ভ্রূক্ষেপ করে না। কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে, মৌলানা সা'ব, তোমার শরিয়ৎ আর হাদিসের সব বিধান আমি মাথা পেতে মেনে নেব—কিন্তু পনের বছর পর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল—সবার সঙ্গে একটু পীরিত করে নিই আগে। দেখছ না, হারানো মানিক ফিরে পেয়ে সবাই কেমন সিঁটিয়ে গেছে?

সে কথা সত্য। সকলেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। যেন প্রাক্তন গৃহস্বামীর পুত্র নয়, তার প্রেতাত্মাটাই হাজির হয়েছে বেমক্কা! হাসান ঘনিয়ে এল ফরিদার কাছে। বললে, আম্মাজান, তোমার রুমালটা সপ্‌সপে হয়ে গেছে। নতুন একখানা তোমার দরকার...

আল্‌তো করে ফরিদার কোল-আঁচড়ে সে ফেলে দেয় একটা সুগন্ধী সিল্কের রুমাল। ফরিদা কঠিন স্বরে কিছু বলবার আগেই হাসান এক-লাফে সরে আসে আব্দুলের কাছে।

—আরে কে ও? আব্দুলচাচা! ওফ! কদ্দিন পরে তোমার এই মেচেতায়-ভরা বদনখানি দেখলাম! মনে আছে, ছোটচাচার নিজের হাতে বানানো পচাই এককালে লুকিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিতাম?

আব্দুল লজ্জা পেয়ে প্রতিবাদ করতে যান, কিন্তু হাসান নাছোড়বান্দা। এক নাগাড়ে বলে চলে, সরম

কিসেব চাচাজী? তখন বড়ি-আব্বা বেঁচে ছিল। এখন তো বুড়োটা ফৌত হয়েছে। আমাব কাছে কিছ ভাল বিলাইতি আছে। সাঁঝেব বেলা হবে নাকি একটু?

আব্দুল কী কববেন, কী বলবেন ভেবে পান না। হাসানেব আক্রমণ থেকে বাঁচতে তিনি তাব চাচাতো বড ভাইকে দেখিয়ে দেন, বডভাইকে আদাব কববে না?

হাসান ঘুবে দাঁডায। মেহবুবেব মুখোমুখি। তিনি ইতিমধ্যে তাকিযাটা ঠেলে ফেলে দিযে ফেব সোজ হযে বসেছেন। হাসান এতক্ষণে তাঁকে দেখতে পেল। আবাব একলাফে তাব বডচাচাব কাছে সবে এসে বললে, শোভনাল্লা! তোমাব এতবড বপুখানা আমাব নজবেই পডেনি! এ কী হাল হযেছে গো তোমাব মেহবুবচাচা? তুমি যে মেদেব মেঘালয হযে উঠেছ! ও হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পডে গেল বডচাচা! ঢাকাব বণ্ডিবাজাবেব বাবেযা বিবিকে মনে পডে? না, না, সবম কিসেব? তোমাব নাম কবুল কবাব পব আমি আব তাব ঘবে বাত কাটাইনি। বলেছিলুম, থাক বাবেযা, তুমি আমাব চাচিব মতো

মেহবুব চাপা গর্জন কবে ওঠেন, কী সব আবোল-তাবোল বকছ হাসান! বাবেযা কে? আমি তাকে চিনতেই পাবছি না

—খুব স্বাভাবিক! তা তো হতেই পাবে বডচাচা! তুমি তোমাব জওযানীতে ছিলে বেস্তদাব বহিস আদমী—আমাব মতো ফোতো-কাপ্তেন তো নয। আজ বাবেযা, তো কাল ফতিমা, পবশু নাজনি বেগম! অ্যাদ্দিন পবে অত নাম কি মনে থাকে? কাফেববা বলে 'ষোডশ গোপিনী'!

মেহবুব গর্জে ওঠেন, বে-সবম কাঁহাকা!

হাজী-সাহেব দ্বিতীযবাব টাল-মাটাল নৌকাব হালটা চেপে ধবতে এগিযে আসেন। তাঁব মনে হলো পবিস্থিতি ক্রমশ তাঁব এক্তিযাবেব বাইবে চলে যাচ্ছে। হাসান কাবও কথা শোনে না। লঘুগুক জ্ঞান নেই তাব। ইযার্কি, ফাজলামি আব অশ্লীল বসিকতা তাব মজ্জাগত। একমাত্র ওব ছোটচাচা পাবত বাস্কেলটাকে ঘাড ধবে শান্ত কবতে। কিন্তু আসান আজ নেই। ঐ বল্‌গা ছেঁডা পাগলা-ঘোডাকে এখন সামলানো প্রায অসম্ভব। তবু হাজী-সাহেব হাল ছাডতে বাজি নন। গম্ভীবভাবে বলেন, হাসান! শোন আমাব দিকে তাকাও!

বডা-ইমামেব এই জলদগম্ভীব স্ববে পাঁচ-গাঁব মানুষ থমকে দাঁডায। কিন্তু হাসানেব কোনো ভাবান্তব হলো না। গোডালিতে ভব দিযে ব্যালে-ডান্সাবেব মতো একটা পাক খেযে হাজী-সাহেবেব মুখোমুখি হযে দাঁডায। একই সুবে বলে, আলবাৎ! তোমাব দিকে তাকাবো বইকি হাজী-সাহেব! তোমাব সুনাম তো মুযাজ্জিনেব আজানেব মতো দূব থেকে দূবান্তবে ছডিযে পডেছে! তুমি নাকি আওযামী লীগেব টিকিট প্রত্যাখ্যান কবেছিলে? সাব্বাস! আব ভাল কথা, গাঁযে এসে শুনলাম, তুমি নাকি এই বুডো বযসে এক দিলতোড বেহেস্তেব হুবীকে সাদী কবে

—হাসান!

প্রৌঢ হলেও হাজী-সাহেব বলশালী। বজ্রমুষ্টিতে ওব দুই কাঁধে আবাব বাঘেব থাবা ফেলেন। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দেবাব চেষ্টা কবেন। হাসান ওঁব চেযে মাথায এক বিঘৎ লম্বা। তবু প্রৌঢ মানুষটাব ঐ বজ্রকণ্ঠে হাসান একটু থতমত খেযে যায। হাজী-সাহেব গম্ভীবভাবে বলেন, অসভ্য হওযাটা কোনো বাহাদুবী নয! আমাব স্ত্রীব সঙ্গে তোমাব পবিচয নেই

একটা হাত হাসানেব কাঁধ থেকে সবিযে আমিনাব পৃষ্ঠদেশে বাখেন।

হাসান একেবাবে নিবে যায। অস্ফুটে শুধু বলে, শোভনাল্লা!

সত্যই সে এতক্ষণ আমিনাকে লক্ষ্য কবে দেখেনি। এবাব কবতে হলো। নিজেকে সংযত কবে সে সসম্ভ্রম অভিবাদন কবে আমিনাকে। সলজ্জ কণ্ঠে বলে, ম্যযনে মাফি মাংতা হুঁ বিবিসাহেবা! ম্যযনে আপকো নহী দেখি!

আমিনা এতক্ষণ দুবন্ত বাগে আগ্নেযগিবিব মতো উদ্‌গীবণ-উন্মুখ হযেছিল। কিন্তু তাব কণ্ঠস্ববে সে কথা বোঝা গেল না। সে স্পষ্টভাবে বললে, আমি বাঙলাদেশেব মেযে। উর্দু বুঝি না।

হাসান পুনরায় অভিবাদন করল। বলল, আমারই ভুল! আপনার সৌন্দর্যে যে স্নিগ্ধতা, তা একমাত্র এই বাঙলাদেশেই সম্ভব!

আমিনা কী একটা কঠিন জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই হাসান ফিরেছে হাজী-সাহেবের দিকে। বললে, আপনাকে আমার অভিনন্দন। উনি উর্দু বোঝেন না, তাই জনান্তিকে আপনাকে জানাই—ময়নে কুছ গলতি নহী কি! যো হুরী আপনে চুন্‌হা হ্যাঁয়, আপ তো স্রিফ জোহুরী হ্যাঁয়!

হাজী-সাহেবও কোন জুৎসই জবাব দিয়ে উঠতে পারলেন না। তার পূর্বেই হাসান প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছে : ভাল কথা, শুনেছিলাম আমাব পূজ্যপাদ ছোটচাচার একটি অবৈধ পুত্রসন্তান হয়েছিল। সে হতভাগ্য কি আপনাদের স্নেহের আতিশয্যে মরে বেঁচেছে?

হাজী-সাহেব বলেন, পুত্র নয়, কন্যা। এই সে। ফ্যালনা।

ফ্যালনা এতক্ষণ ডাগর দুটি চোখ মেলে ঐ আশ্চর্য মানুষটাকে দেখছিল। দৈত্যের মতো বিরাট মানুষটার কথা সে তার বাপের কাছে অনেক শুনেছে। চোখে দেখেনি কখনো। দুরন্ত কৌতূহল ছিল।

হাসানের হঠাৎ কী যেন ভাবান্তর হলো। পা টিপে টিপে এগিয়ে এল কিশোরী মেয়েটির কাছে। অবাক চোখে আপাদমস্তক দেখতে থাকে। তারপর ওর খড়িওঠা গাল দুটো টিপে দিয়ে বলল, ঠিক ছোটচাচার মুখের আদল! কী নাম রে তোর! ফ্যালনা? দূর! তোর নাম খেলনা!

কোথাও কিছু নেই, একফোঁটা মেয়েটা ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল।

মুহূর্তে রূপান্তর হলো হাসানের। স্বভাবজাত মুখের কাঠিন্যে মুহূর্তপূর্বে যে একটা বেহেস্তী আভা লেগেছিল তা উপে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, ও কাঁদছে কেন? কী হয়েছে? কে ওকে কাঁদিয়েছে? আল্লার নামে শপথ নিয়ে বলছি...

—ব্যস! খামোশ!

এবারও হাসানের কথাটা শেষ হলো না। ফরিদা অনেক—অনেকক্ষণ নীরবে সহ্য করেছে। আর পারল না। এ ভিটে তার, অথচ ঐ উট্‌কো লোকটা যেন তাকে পাত্তাই দিচ্ছিল না এতক্ষণ! এবার কঠিনস্বরে বললে, আমার ভিটেয় যাদের ঢুকতে দিয়েছি তারা যেন ভুলে না যায়—দিব্যি-দিলেস্ শরিয়তে মানা! এ ছামুতে ঐ বেআদবি আমি সহ্য করব না।

হাসান এক পা এগিয়ে এল। তারপর বিমাতার মুখোমুখি হয়ে হাসিমুখে বলল, উইলটা পড়া না-হতেই কেমন করে জানলে আম্মাজান যে, ছামুটা তোমার?

ঘরে অস্বাভাবিক নীরবতা।

হাসানই সেটা ভাঙল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে গিয়েও বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলল, শুনলাম আমার পূজ্যপাদ আব্বাজান শেষ সময়ে একটি উইল লিখে গেছেন এবং আজ সকালে সেটা নাকি সীল ভেঙে পড়ে শোনানো হবে। আমি দীর্ঘদিন মতিগঞ্জ ছাড়া। ছোটচাচাকে খান-সেনারা ফাঁসি দিচ্ছে শুনে ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু সময়ে পৌঁছাতে পারিনি। চলেই যেতাম, নেহাৎ হাজী-সাহেব আমাকে রুখে দিলেন। তিনিই আমাকে আজ সকালে এখানে আসতে বলায় আমি এসেছি। আমার আব্বাজান খলিফা ব্যক্তি ছিলেন। আশা করছি, তাঁর বখে-যাওযা বড়ছেলেকে তিনি সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেছেন। এই খবরটা পেলেই আমি বিদেয় হব। আপনারাও নিশ্চিন্ত হবেন। নিন, রাখহরিচাচা আপনি শুরু করুন। আব্বাজানের উইলটা তো আপনার কাছেই আছে। নাকি?

রাখহরি এতক্ষণ নির্বাক দর্শকের অভিনয় করে যাচ্ছিলেন। এবার শিরশ্চালনে স্বীকার করলেন। পকেট থেকে একটি মুখবন্ধ খাম বার করে বললেন, সীলমোহর করা নয়, আঠা দিয়ে সাঁটা আছে খামটা।

হাসান বললে, তাই সই। নিন্, আপনি শুরু করুন। আম্মাজান এমনিতেই শোকাহতা। 'ছামু'টা যে উইল-মোতাবেক তাঁর, এ তথ্যটা না জানা ইস্তক তিনি সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছেন না।

আমিনা ইতিমধ্যে সবার পিছনে সরে গেছে। যাতে তার দিকে কারও নজর না পড়ে। দুরন্ত

কৌতূহলে সে একদৃষ্টে দেখছিল ঐ দৈত্যের মতো মানুষটাকে। কেন এমন দুর্মুখ লোকটা! মানুষজনকে খোঁচা না দিয়ে কি ও একটা কথাও বলতে পারে না?

রাখহরি বলেন, আপনারা সবাই জানেন—ইব্রাহিম আলী সাহেবকে আমি 'বড়মিঞা' ডাকতাম। তিনি ছিলেন আমার বড় ভাইয়ের মতো। অথচ আইন-ঘটিত ব্যাপারে তিনিই আমাকে বড়ভাইয়ের মর্যাদা দিতেন। তাঁর এতবড় বিষয় সম্পত্তি আমিই এতদিন দেখ-ভাল করেছি। আর ঈশ্বরের কী বিধান দেখুন! সেই বড়মিঞার স্বহস্ত-লিখিত উইলটাও আজ আমাকে পড়ে শোনাতে হচ্ছে। আপনাদের আগেই বলে রাখি, উইলের ভাষাটা অত্যন্ত কাঁচা—

হাসান বাধা দিয়ে বলে, আপনি পড়েছেন?

—আজ্ঞে না! মুখবন্ধ লেফাফা যখন হাজী-সাহেব আমাকে হস্তান্তর করেন তখনি, তাঁর সামনেই, আমি আঠা দেওয়া অংশটায় স্বাক্ষর করি। আমি আইনজ্ঞ ব্যক্তি। সীলমোহরাঙ্কিত নয় দেখেই ওটুকু সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম। মুখবন্ধ লেফাফা এখন আপনাদের সামনেই খুলব। আপনারা পরীক্ষা করে দেখুন।

হাসান পুনরায় বলে, তাহলে মতিগঞ্জে বসে আপনি কেমন করে জানতে পারলেন যে, আহ্‌মেদনগরের বানানো উইলের ভাষাটা কাঁচা?

রাখহরি হাসলেন। বললেন, যেহেতু আমি বুদ্ধিজীবী মানুষ, বড়মিঞাকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। আমরা একই ইস্কুলে পড়েছি। তাই জানি। এটা তাঁর স্বহস্তে লেখা উইল। উনি আমার চেয়ে তিন ক্লাস উঁচুতে পড়তেন। আমি জানি, এক লাইন লিখতে হলে ওঁর সচরাচর আড়াইটা বানান ভুল হয়। গড়ে। আড়াই পাতা লিখলে একটা নিব ভাঙে। গড়ে।

হাসান বলে, স্বাবাবিক। ক্লাস ফাইভের পর তিনি আর স্কুলে পড়েননি। পড়ুন।

রাখহরি একটিপ নস্যি নিয়ে সকলকে দেখিয়ে খামটা খুলে ফেললেন। উদাত্ত কণ্ঠে—যেন অনেক দিন পরে মুন্সেফ-আদালতে সওয়াল করছেন—তিনি পড়তে থাকেন :

"আমি, ইব্রাহিম ওস্‌মান আলী, সাকিন মতিগঞ্জ, থানা কোতোয়ালি স্বজ্ঞানে ও বহাল তবিয়তে আহ্‌মেদনগর গ্রামের উপকণ্ঠে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়..."

—অ্যাই দেখুন কাণ্ড! আহ্‌মেদনগর গ্রাম নয়, গঞ্জ— 'নগর' কখনো 'গ্রাম' হয়?

—তা হোক, পড়ুন আপনি।

—তারপর ধরুন, "মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় বহাল তবিয়তে—" ...কাঁচা কাজ সব।

হাসান বিরক্ত হয়ে ওঠে। বলে, কাঁচা-পাকা বিচার করতে হবে না, পড়ে যান।

—বলছেন পড়ছি : "মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় অদ্য সাতই আগস্ট, রবিবার, উনিশ শত একাত্তর খ্রীষ্টাব্দে এই শেষ উইলপত্র স্বহস্তে সম্পাদন করিতেছি। অত্র উইলপত্র দ্বারা ইতিপূর্বেকৃত জাবতীয়.." আঃ! বর্গীয় 'জ' নয়, বড়মিঞা, অন্তস্থ 'য'!

যা হোক, "ইতিপূর্বেকৃত জাবতীয় উইল নাকচ করা হইল। আমার কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিয়া আমার কনিষ্ঠ পুত্র স্নেহাস্পদ মুর্তজা ওসমান আলীকে দুই সহস্র পাকিস্তানী মুদ্রা প্রদান করিতে হইবেক। এক সহস্র মুদ্রা তাহার সাদির দিনে প্রদেয়, শুধুমাত্র যদি সে মদীয় চাচাতো ভাই আবদুল গণি-ছাহেবের একমাত্র সন্তান সিতারাকে সাদি করে,...

হাজী-সাহেব বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আর সিতারা যদি মুর্তজাকে সাদি করতে রাজি না হয়?

মুর্তজা রুখে ওঠে, ঈল্লি, মামদোবাজি নাকি? দুই হাজার টাহা! আয়ে কুত্থিকা?

আব্দুলও হবু-জামাতার কথায় সায় দেন, না, না, সেসব তোমাদের ভাবতে হবে না। সে দায়িত্ব আমার। বেটিকে ঘাড় ধরে...

আমিনার মনে হলো, এখানে কেউ না কেউ প্রতিবাদ করবেই। একটা মেয়ের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ নেই? তাহলে শরিয়তী-কানুনে 'ইয়াব' আর 'কবুল' শব্দ দুটি আছে কেন? এ তো আর হেঁদুর বিয়ে

নয় যে, বাবা যাকে ধরে আনবে, জাত-পাত দেখে...

প্রতিবাদ করলেন স্বয়ং রাখহরি মোক্তার। সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। একটিপ নস্য নাসারন্ধ্রে চালিয়ে দিয়ে সহাস্যবদনে বললেন, দু-হাজার টাকা আবার কোথায় দেখলেন আপনারা?

আব্দুল বলেন, মানে? আপ্‌নেয় তো কইলেন...

—কী কইলাম? টাহা? না তো!

ফরিদা এই সময় আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, না। টাকার কথা উইলে আদৌ বলা হয়নি। বলা হয়েছে পাকিস্তানী মুদ্রা। তা সিকি-দোয়ানিও তো পাকিস্তানী মুদ্রা...

আব্দুল আঁৎকে ওঠে, সিকি-দোয়ানি?

ফরিদা যেন পাদপূরণ করে, এবং পয়সা!

হাসান ঊর্ধ্বমুখে স্বগতোক্তি করে, লে হালুয়া!

রাখহরি সপ্রশংস মুখে ফরিদা বেগমের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এজন্যই বড়মিঞা ওকে এত ভালবাসতো! উইলের বয়ানে কী জাতীয় ভুল হয়েছে তা শুধু ফরিদারই নজরে পড়েছে। আব্দুল গণির মুখ দেখে মনে হলো—ঐ অপোগণ্ডটাকে দামাদ করার ইচ্ছেটা তাঁর হঠাৎ উপে গেছে। হাজী-সাহেব পুনরুক্তি করেন, আপনি পড়ে যান, মোক্তারবাবু।

—বলছেন পড়ছি। কিন্তু পড়তে আমার কষ্ট হচ্ছে! এত ভুলে ভরা বয়ান। যাক, শুনুন : "এবং আমার কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিয়া আমার একমাত্র বিবি-সাহেবা ফরিদা বেগমকে তাঁহার যাবৎজীবন এবং/অথবা যাবৎনিকা-কালে মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসোবে বার্ষিক ছয়শত টাকা মাসোহারা দিতে হইবেক..."

—দেখুন, দেখুন বড়মিঞার কাণ্ডটা। "বার্ষিক মাসোহারা"! সোনার পাথরবাটি!

মেহবুব বলেন, তা হোক। ইব্রাহিম ভায়া এবার আর পাকিস্তানী মুদ্রা লেখেনি। টাকাই লিখেছে! বেগম-সাহেবার নসিবে অন্তত সিকি-দোয়ানি...

হাসান যোগ করে, এবং পয়সা...

—হ্যাঁ, পয়সা জোটেনি!

হাজী-সা'হেব যেন কেটে-যাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড। বলেন, আপনি পড়ে যান—

"এতদ্ভিন্ন আমার স্থাবর-অস্থাবর, মোকাম, জমি-জেরাত, জলকর, ব্যাঙ্ক-আমানত, বন্ধকী তমশুক, গরু-লাঙল, বীজধান, রায়তী-স্বত্ব ইত্যাদি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান আলীকে দিয়া গেলাম। খুদা হাফিজ।"

হাসান বলে, ব্যস, ব্যস! আব্দুলচাচা! মুর্তজা তাহলে নগদ টাকাই পাবে। সিকি-দোয়ানি এবং পয়সা নয়। আপনি সিতারকে রাজি করান।

আব্দুল একগাল হেসে বলেন, সে ভাবনা আমার। আমার মেয়ে, আমি চিনি না?

ফরিদা হঠাৎ বলে ওঠে, উকিল-সাহেব! একটা কথা! এত ভুলে ভরা উইল তো আইনত সিদ্ধ হবে না। আমার কাছে তাঁর আর একখানি উইল আছে...

রাখহরি একগাল হেসে বলেন, এ যে মৌসীর কাছে আম্মাজানের কিস্‌সা হয়ে গেল, বেগম-সাহেবা! সে উইল তো আমারই স্বহস্তে বানানো। কিন্তু আপনার স্মরণ হতে পারে আমি তখনই বলেছিলাম, কাজটা ভাল হলো না। দু-দুটি উপযুক্ত পুত্রকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে...

—কিন্তু এত ভুলে-ভরা উইল কি সিদ্ধ হবে?

—হবে! যেহেতু এটি বড়মিঞার স্বহস্তে লিখিত শেষ উইল। এতে সে কাউকেই বঞ্চিত করেনি। বেশ বোঝা যায়, আগেরটা সে স্বেচ্ছায় করেনি। হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়ে দেখতে পারেন বেগমসাহেবা—আইনের খাঁড়িতে এই ভুলে-ভরা উইলখানাই সিদ্ধ হতে থাকবে।

ফরিদা মুখ নিচু করে মেজেতে আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে থাকে। হাসান উঠে দাঁড়ায়। ফ্যালনা

এতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। আব্বাজানের কাছে ঐ লোকটার বিষয়ে সে অনেক কথা শুনেছে। অনেক সোহাগের কথা, স্নেহের কথা। অথচ ঐ হাজী-সাহেবের বেগম বলেছেন, লোকটা খারাপ! কিন্তু খারাপ কিছু তো ওর নজরে পড়েনি। সে তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এটুকু বুঝতে পেরেছিল বড়চাচা ঐ হাসানভাইকে কিছু টাকা-কড়ি দিয়ে গেছে। না হলে চাচি এমন গুম খেয়ে গেল কেন? হাসান উঠে দাঁড়াতেই সে কেমন যেন অসহায় বোধ করে। মনে হয় ঐ লোকটা আবার বেপাত্তা হয়ে যাবে। তার মানে ঐ বড়চাচির ঝি-গিরি করে দিন-গুজরান করতে হবে তাকে—ঐ চাচাতো ভাই মুর্তজার লুব্ধ দৃষ্টির সামনে থেকে প্রতিনিয়ত আড়াল করতে হবে তার অঙ্কুরোন্মুখ দেহটা। সে ঘনিয়ে আসে হাসানের কাছে। বলে, হাছানভাই, তুমি আমারে নে যাবে?

—নিয়ে যাব? কোথায় নিয়ে যাব রে পাগলি?

—যেই হানে তুমি থাহ!

হাসান অট্টহাস্য করে ওঠে। বলে, দূর গর্ধভ ! কী শুনলি এতক্ষণ তবে? এখন থেকে আমি তো এখানেই থাকব। এইটেই হবে শয়তানের হেড-কোয়ার্টার্স।

আর সহ্য হয় না হাজী-সাহেবের। বলেন, ছিঃ হাসান! ওকে কি ওসব কথা...

—মাপ কর হাজী-সাব। তোমার জামায়েতে আমি বাধা দিতে যাই না। আমার ইব্‌লিসীতেও তুমি বাধা দিতে এস না।

তারপর ফ্যালনাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, এরা সবাই আমাকে কী বলে ডাকে জানিস? বলে, 'ছয়তানের ছাওয়াল'!

ফ্যালনা ইতিমধ্যে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করেছে। বলে, তুমি ওদের বলতে দাও কেন? তোমার কোমরে তো ঐ যন্তরটা আছে...

—কিন্তু কথাটা যে নিয্যস সত্যি রে ফ্যালনা! তোর আব্বাজান আমাকে দীক্ষা দিয়েছিল! বুঝিয়ে দিয়েছিল—আল্লাতালা এ দুনিয়াটা পয়দা করেনি—এই এরা তাঁর নামে ব্যবসা করতে চায় বলে ঈশ্বরকে পয়দা করেছে!

ইতিমধ্যে সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছে। ঐ নরকের কীটটার সান্নিধ্য ত্যাগ করতে সকলেই উদ্‌গ্রীব। মেহবুব ইতিমধ্যে ক্যাম্বিসের জুতোটা পরে ফেলেছেন। দ্বারের কাছে একটা জটলা। হঠাৎ হাসান সবাইকে সম্বোধন করে জোর গলায় বলে ওঠে, এই যে, আপনারা শুনছেন? এই মঞ্জিলটি আজ থেকে হয়ে গেল শয়তানের ঘাঁটি! আপনারা তো সবাই ধার্মিক! ভাত-কাপড়ের যোগান দিয়ে আমার এই নিষ্পাপ অবৈধ বহিনটিকে কেউ শয়তানের হাত থেকে বাঁচাতে চান?

সবাই নির্বাক। হঠাৎ আমিনা এগিয়ে এল এক পা। দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরল ফ্যালনার বাহুমূল। বললে, আমি চাই! তোমাকে জিয়ন্তে গোর দেওয়া উচিত।

ফ্যালনার হঠাৎ কী হলো। এক ঝটাকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, না! আমি আপনার লগে যাইতাম না!

আমিনা থমকে গেল। হাসান তাকে একটা ছদ্ম কুর্নিশ করে বললে, আমি দুঃখিত, হে মহীয়সী মহিলা! আপনাদের শরিয়তী বেহেস্তে 'ফ্যালনা' হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে ও এই শয়তানের দোজখে 'খেলনা' হয়েই বাঁচতে চায়।

মেহবুবের আর সহ্য হলো না। ইতিমধ্যেই তিনি দ্বারের কাছে এগিয়ে এসেছেন। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, একটা কথা বলে যাই হাসান। সম্পত্তি পেয়েছ ভাল কথা, কিন্তু ঐ মেয়েটার উপর তোমার কোনো অধিকার নেই। ও নাবালিকা। পাকিস্তানে এখনো শরিয়তী কানুন বর্তমান। তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।

হাসান হাসল। বললে, কথাটা যখন তুললেই বড়চাচা তখন তোমাকেও আমি একটু সাবধান করে দিই। গোটা পাকিস্তানের কথা থাক। এই মতিগঞ্জে আজ সন্ধ্যার মধ্যে যে আইনটা চালু হতে চলেছে,

তার নাম মার্শাল ল! বুঝেছ? আহ্‌মেদনগর থেকে আসার পথে এখনি দেখে এসেছি মেজর ওয়ালি জব্বরের নেতৃত্বে খানসেনার দল গাঁয়ের পাঁচ-মাইলের ভিতর এসে পড়েছে। আজ দুপুরের মধ্যেই বাঘাডাঙার মাঠে ওদের ছাউনি পড়বে। সন্ধ্যার আগেই হাটতলায় ওরা ফাঁসিকাঠটা খাটিয়ে ফেলবে।

আবার নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে আসে শোকাহত মজ্লিসে। হাসান একই ভাবে বলে চলে, আর এটাও তোমরা মনে রেখ, আহ্‌মেদনগরে যে ভুলটা করেছে সেই ভুল মেজর জব্বর এখানে দ্বিতীয়বার করবে না।

হাজী-সাহেব প্রশ্নটা না করে থাকতে পারেন না, সেখানে কী ভুল করেছিল ওরা?

—ভুল লোককে ফাঁসি দিয়েছিল। তোমরা সবাই জান, আহ্‌মেদনগরের আসল মাথা হচ্ছে আশি বছরের ঝানু আখ্‌তারুজ্জমান এক্রামচাচা—কিন্তু ওরা সেটা সমঝে উঠতে পারেনি। আসানচাচা মদের ঝোঁকে খিস্তি-খেউড় করেছিল—ওরা ভেবেছে সেই বুঝি এই মুক্তিবাহিনীর নেতা! এখানে বিদ্রোহ দমন করতে এসে ওরা দ্বিতীয়বার সে ভুল করবে না। মতিগঞ্জের মানুষ কার নির্দেশে চলে এবার তা ওরা ঠিক খুঁজে বার করবে।

হাজী-সাহেবের সঙ্গে আমিনার দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। আমিনা ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। তাকে সাহস দিতেই বোধ করি হাজী-সাহেব বলে ওঠেন, মতিগঞ্জের মুক্তিবাহিনীর বিদ্রোহীরা অন্তত আমার নির্দেশে চলে না। আমি পঞ্চগ্রামের মৌলানা—আমি রাজনীতি করি না।

হাসান বলে, রাজনীতি কর আর না কর, আমরা সবাই মনে মনে বিদ্রোহী, এটা তো মান?

এতক্ষণে সবাই কণ্ঠস্বর ফিরে পায়। প্রায় সমস্বরে সকলে প্রতিবাদ করে ওঠে।

হাসান এক ধমকে ওদের থামিয়ে দেয়। বলে, আমি যেমন চীৎকার করে বলবার হিম্মৎ রাখি—'ইয়াহিয়া খান মুর্দাবাদ'—তা তোমরা পার না। ন্যায্য কথা। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বল তো সবাই—কে না চাও সোনার বাঙলার এ শোষণ বন্ধ হোক? কে না চাও—বঙ্গবন্ধু ফিরে আসুন?

এবার আর প্রতিবাদে সোচ্চার হতে পারে না কেউ।

হাসান বিশ্লেষণ করে বলে, মেজর জব্বর বুঝেছে : গাঁয়ের মানুষ যে হতভাগ্যকে 'ছয়তানের ছাওয়াল' বলে সেই নরকের কীটটাকে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝোলালে কেউ ভয় পাবে না, সবাই খুশি হবে। তাই এবার আমার কোনো ভয় নেই। ভয় তোমাদের! মামলাবাজ কাফের একটা ভাল শিকার! সুদখোর মহাজন কিংবা মক্ষিচুষ জোদ্দার!

রাখহরি, আব্দুল অথবা মেহবুব এ ঘোষণায় প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পান না। হাসান এবার হাজী-সাহেবকে একটা কুর্নিশ করে বলে, কিংবা মসজিদের বড়া-ইমাম একটা জুৎসউ টার্গেট! তাহলেই ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্য সফল হবে। পঞ্চগ্রামে একটা ত্রাসের সঞ্চার হবে।

হাজী-সাহেব আমিনার হাতটা ধরে ফেলেন। সেটা বরফের মতো ঠাণ্ডা। দৃঢ়স্বরে বলেন, চলে এস আমিনা। ও ছোকরা তোমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাতে চাইছে।

হাজী-সাহেবের পিছন পিছন সকলেই বেরিয়ে যান। হাসান যেন তাঁদের এগিয়ে দিতে গেল। পিছন থেকে ফরিদা শেষবারের মতো বিষোদগার করে, আমি...আমি কঠিন দিব্যি দিচ্ছি! হে আল্লাহ্! যেন তে-রাত্তির না পোহায়।

হাসান অট্টহাস্য করে ওঠে, এই তো! এই তো! এ ভিটেয় শয়তানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে! আম্মাজানের পর্যন্ত য়্যাদ নেই—দিব্যি-দিলেস হাদিসে মানা! এ ছাদের নিচে ওটা নাকি চলবে না!

পরদিন সন্ধ্যা।

হাসানের কথা ভুল নয়। খান-সেনার দল গত সন্ধ্যাতেই বাঘাডাঙার মাঠে ছাউনি ফেলেছে। ফাঁসিকাঠ খাটানো হয়েছে কিনা জানা যায়নি, তবে সকলের মুখেই আতঙ্কের আভাস—কী হয়, কী হয় অবস্থা। পারতপক্ষে ঘর ছেড়ে কেউ বারই হচ্ছে না। নেহাৎ মজুর-কিষাণ ছাড়া। আগামীকাল হাটবার। একটিও গো-গাড়ি আসছে না। খেয়াঘাটের পারানি নৌকার মাঝি পর্যন্ত আসেনি ঘাটে। দুপুর থেকেই

ঝেঁপে বর্ষা নেমেছে। পথঘাট কর্দমাক্ত। এই বর্ষণ মাথায় করেই হাজী-সাহেব বার হয়েছিলেন পড়ন্ত বেলায়। আমিনা অর্গলবদ্ধ ঘরে জানলায় বসে দেখছিল ধারাপতন। সেলাইয়ের সরঞ্জাম তার হাতে— একটি ফোঁড়ও দেয়নি। কাল থেকেই একটা দারুণ দুশ্চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে আছে। ওই ডাকাতটার কথাটাকে সে উড়িতে দিতে পারছিল না—মসজিদের বড় উমাম একটা জুৎসই টার্গেট। হাজী-সাহেব কথাটা গ্রাহ্য করেননি। আমিনাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন— পশ্চিম পাকিস্তানের খান-সেনারাও ধর্মে মুসলমান। যাই করুক— ধর্মে ওরা আঘাত দেবে না।

ক্রমে আঁধার ঘনিয়ে এল। নদীর ওপারে লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ভেসে এল শঙ্খধ্বনি। মাঝে মাঝে বন্দুকের শব্দও ভেসে আসছে—কে জানে কোথা থেকে। মাঝে মাঝে মার্চ করে জল-কাদা ভেঙে খান-সেনার দল গ্রামের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যাচ্ছে—কেন, কে জানে?

হঠাৎ দরজায় কে যেন খুব ধীরে ধীরে টোকা দিল। ছাঁৎ করে উঠল বুকের ভিতর। সদরের ফাটলে মুখ রেখে আমিনা অস্ফুটে বলল কে?

—দোর খোল, আমিনা। আমি!

আ! স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল এতক্ষণে। আগড় খুলে দিল আমিনা। হাজী-সাহেব প্রবেশ করেই আবার বন্ধ করে দিলেন দরজাটা। আমিনার কী হলো—হঠাৎ জড়িয়ে ধরতে গেল তার মরদকে। হাজী-সাহেবই বাধা দিলেন, অ্যাই, অ্যাই! কী করছ! আমার সর্বাঙ্গ ভিজে!

আলখাল্লাটা খুলে আলনা থেকে টাঙিয়ে দেন। ছাতার জল ঝেড়ে সেটা খোলা অবস্থাতেই রেখে দিলেন দাওয়ায়—জল ঝরে যাবে আপনা থেকেই। তস্‌বিছড়াও টাঙিয়ে দেন একটা হুক থেকে। তারপর দুটি হাত প্রসারিত করে বলেন, এইবার...

আমিনা এগিয়ে এসে ওঁর দরাজ বুকে অশ্রুসিক্ত মুখখানা লুকায়।

—এত ভাবনা কিসের?

আমিনা জবাব না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করে, কোথায় গিয়েছিলে?

হাজী-সাহেব সংক্ষেপে জানালেন সব খবর। জয়-বাঙলার ছোঁড়াগুলো এ দিগড়ে নেই। রহিম-গোলাম কুদ্দুস-যোগেশ্বর, নেতাই। সবাই সরে পড়েছে। কেউ ধরা পড়েনি। পঞ্চগ্রাম পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে—বর্ষার নয়, কোনো খেয়াঘাটেই পারানি-নৌকা চলছে না। হাসান নিরুদ্দেশ। ইব্রাহিমের ভিটেয় তালা ঝুলছে।

আমিনা বলে, সে কী? মুর্তজা, ফ্যালনা আর ফরিদা বেগম?

হাজী-সাহেব জানালেন, ফরিদা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে মেহ্‌বুবচাচার বাড়িতে। মুর্তজাও সেখানে। আর ফ্যালনাকে বোধ হয় সেই শয়তানের চেলাটাই সঙ্গে করে নিয়ে গেছে—কোথায় কে জানে!

হঠাৎ একটা বিকট শব্দে আমিনা চম্‌কে ওঠে, ওটা কী?

—আরে এত ভয় কিসের? ওটা বিউগ্‌ল্‌। বাঘাডাঙার মাঠে ওরা বাজাচ্ছে।

আমিনা বলে, সত্যি করে বল তো! তোমার ভয়ের কিছু নেই তো? আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছ না তো?

হাজী-সাহেব ওকে বোঝাতে থাকেন। ইয়াহিয়া খান চাইছেন পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখতে। সে বন্ধনের মেরুদণ্ড হচ্ছে ইসলাম ধর্ম—শরিয়তী কানুন। মহীউদ্দীন এই পঞ্চগ্রামের বড়া-ইমাম। তাছাড়া উনি কোনোদিনই রাজনীতির ধারে-কাছে ছিলেন না। খান-সেনারা ওঁকে ঘাঁটাবে কেন?

—কিন্তু বাঙলাদেশের মুক্তি তুমিও তো চাও?

হাজী-সাহেব অনেকক্ষণ জবাব দিলেন না। দাড়িতে হাত বুলাতে থাকেন। আমিনা তাগাদা দেয়, কই কিছুতো বললে না?

—দেখ আমিনা, খোদাতালার দুনিয়ায় নানান কাজ। সবাইকে সব কাজ সাজে না। কেউ মাস্টারি

করে, কেউ ডাক্তারি করে, কেউ দেশের মুক্তির জন্য বুকের খুন দেয়। মান্‌ছি, ডাক্তার-শিক্ষক-চাষীভাইদের চেয়ে ঐ ছেলেগুলোর—যারা বুকের রক্ত দিয়ে দেশের সেবা করে, তারা আরও উঁচুদরের দেশ-সেবক। কিন্তু সবাইকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে কাজ করে যেতে হবে তো? আমি আমার কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছি—ইন্‌সানিয়তের নৈতিক দিকটা—ধর্মবোধ।

—কিন্তু ঐ লোকটা কেন তখন বলল—

—কে? হাসানভাই?

আমিনা তার মাথা ঝাঁকিয়ে বিরক্তি জানায়। বলে, আচ্ছা আমি ওর নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করি না, আর তুমি বল 'ভাই'?

হাজী-সাহেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি মিলিয়ে বলেন, কী করব আমিনা? আমি যে পঞ্চগ্রামের ইমাম! এ পাঁচগাঁয়ের মুসলমান মাত্রেই আমার ভাই।

আমিনা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, কিন্তু ও কেমনতর মুসলমান? কী অশ্রাব্য ভাষা ওর! ও আল্লাকে পর্যন্ত মানে না!

—তা বটে! তবে কী জান, আমিনা, হিন্দুরা বলে, শত্রু হিসাবেও ঈশ্বরকে ভজনা করা যায়।

আমিনা সোৎসাহে বলে ওঠে, আমিও তো তাই বলছি, ও হিঁদু! ও কাফের!

—আমি কিন্তু সে অর্থে বলিনি। আমি বলছিলাম যে, ওর অন্তরে চৌম্বকবৃত্তিটা ঠিকই আছে, শুধু নিতান্ত ঘটনাচক্রে ওর মুখটা আল্লারসুলের বিপরীত দিকে ফেরানো। যদি কোনও কঠিন আঘাতে ওর মুখটা ঘুরে যায় তাহলে দেখবে ও সম্পূর্ণ অন্যজাতের মানুষ হয়ে গেছে!

আমিনার বিশ্বাস হয় না। নতনেত্রে কী ভেবে নিয়ে প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বলে, আমার বিশ্বাস হয় না। কঠিন আঘাতে মানুষ কখনো সেভাবে বদলে যেতে পারে না। তার শিক্ষা-দীক্ষা-জীবনবোধ পালটে ফেলে একটা পাষণ্ড রাতারাতি পয়গম্বর হয়ে যেতে পারে না কখনো!

—কেমন করে জানলে? চোখে দেখনি বলে?

আমিনা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, তাহলে ওর কনভার্স থিওরেমটাও মান?

হাজী-সাহেব ঠিক ধরতাইটা ধরতে পারেন না। তিনি আমিনার মতো কলেজে পড়েননি। বললেন, ঠিক কী বলতে চাইছ?

—মানে তাহলে উল্টোটাও হতে পারে? একটা কঠিন আঘাতে তোমার মনও আল্লারসুলের বিপরীত দিকে ফিরে যেতে পারে? তুমি ঐ রকম খিস্তি-খেউড় শুরু করে দিতে পার?

এবার হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, তাও হতে পারে! খোদাতালার দুনিয়ায় কী না হয়?

—না! যা হবার নয়, তা কখনো হয় না। আমি...আমি তো ভাবতেই পারি না আমি নিজে ওভাবে বদলে যেতে পারি।

হাজী-সাহেব হাসতে হাসতেই বললেন, তা হলে তো খুব বিপদের কথা বেগম! তর্কের খাতিরে ধরা যাক আমরা দুজনেই—মানে, আমি আর ঐ যার নাম করা বারণ, দুজনেই বদলে গেলুম। তুমি বদলালে না। তখন তোমার-আমার অবস্থাটা কী হবে?

এবার আমিনাই ধরতাইটা ধরতে পারে না। বলে, কেন? কী হবে আমার?

—তুমি তখন আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে, আর তোমার সব প্যার মহব্বৎ...

আমিনা ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর বুকে। দুহাতে ওঁর মুখ চাপা দিয়ে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, ছি ছি ছি! রসিকতার ছলেও এসব কথা বলবে না কিন্তু!

হাজী ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তারপর বলেন, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় কি এ হতভাগা এক কাপ চাও পাবে না। আমার মুখ তো এখনো ঘোরেনি বাপু!

আমিনা নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করে। ছি ছি! তার খেয়ালই হয়নি। বিকেলে চা না খেয়েই হাজী-সাহেব বেরিয়ে গেছিলেন। ওর নিজেরও চা খাওয়া হয়নি। হাজী-সাহেব আগে চা পান করতেন না।

স্ত্রীর সাহচর্যেই এ নেশাটা হয়েছে এতদিনে। আমিনার দুবেলা দুপেয়ালা চা চাই। না হলে সারাদিন আধকপালে লেগে থাকবে। আঁচল সামলিয়ে সে চায়ের জলটা বসাতে গেল। হাজী-সাহেব উঠে গিয়ে রেডিওটা খুলে দিলেন। সংক্ষিপ্ত সংবাদ বলছে :

"মুজিবনগর থেকে বলছি। মুক্তিবাহিনীর জওয়ানেরা আহ্‌মেদনগর-মতিগঞ্জ এলাকায় পাকিস্তানী খান-সেনাদের উপর প্রচণ্ড হামলা করেছে। পাকিস্তানীদের একটা প্লেটুন আত্মসমর্পণ করেছে। বাকিরা মতিগঞ্জের দিকে পিছু হটেছে। আহ্‌মেদনগরের গণ-আদালতে পাক-বাহিনীর মেজর ওয়ালি জব্বরের প্রাণদণ্ড হয়। গত পরশু বেলা বারোটার সময় আহ্‌মেদনগরের হাটতলায় জব্বরের ফাঁসি হয়। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্থানীয় প্রবীণনেতা আখ্‌তারুজ্জমান এক্রাম খাঁ।"

হাজী-সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। আপনমনেই বলে ওঠেন, যা বাব্বা! এমন খবর ওরা কোথা থেকে পেল? মেজর জব্বর তো বহাল তবিয়তে মতিগঞ্জে চলে এসেছে। পিছু হটেও নয়। তাহলে?

ঘড়িটা দেখলেন। ঠিক এই সময়ে রাওয়ালপিণ্ডি থেকেও সংবাদ প্রচারিত হয়। রেডিওর নব ঘুরিয়ে ধরবার চেষ্টা করলেন। সংবাদের শেষাংশটুকু শোনা গেল ঃ

"...আহ্‌মেদনগরমে লড়াই বিল্‌কুল খতম্ হো চুকি হ্যয়...আহ্‌মেদনগরমে দুষমনোকে নেতা আখ্‌তারুজ্জমান এক্রাম খাঁকো ফাঁসি দে দিয়া গয়া। অব্ হমারে জওয়ান মেজর ওয়ালি জব্বরকে সাথ মতিগঞ্জ পঁহুছ গয়া!"

আমিনা ট্রে-হাতে ফিরে আসছিল ঘরে। বললে, আহ্‌মেদনগরে ফাঁসির কথা কী যেন বলল, নয়?

হাজী-সাহেব রেডিও বন্ধ করে দিয়ে বললেন, তা বলল! তবে যে হতভাগা ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলেছিল—শত্রুই হোক, মিত্রই হোক— কেউ তার নামটাও উচ্চারণ করল না!

আমিনা বুঝতে পারে না। বললে, কেন?

—বোধকরি ছয়তানের ছাওয়ালের গুরুদেবের নাম করা বারণ!

ঠিক তখনই কে যেন কড়া নাড়ল দরজায়।

গাঁয়ের এমন অবস্থা যে প্রতিটি শব্দে মানুষ চমকে ওঠে। আমিনার হাতে চলকে উঠল ধূমায়িত চায়ের কাপ। হাজী-সাহেব সন্তর্পণে দরজার কাছে এগিয়ে এসে অস্ফুটে বললেন, কে?

বাইরে থেকে ভারী গলায় কে বলল, এ ছামুতেও যে তার নামটা উচ্চারণ করা বারণ, হাজী-সাহেব!

হাজী-সাহেব আগড়টা সরিয়ে দিলেন : হাসান! তুমি! কী মনে করে?

হাসানের বেশবাস এখন অন্যরকম। কোট-পাৎলুন। গায়ে আলোয়ান। ছাতা নেই হাতে। সর্বাঙ্গ দিয়ে জল ঝরছে তার। হাজী-সাহেব বলেন, এস, এস, ভিতরে এস।

—কিন্তু ঘরটা যে ভিজে একশা হয়ে যাবে। এই শালার বৃষ্টি...

হঠাৎ আমিনাকে দেখতে পেয়ে জিব কাটে। বলে, একটা জরুরী কথা বলতে এলাম হাজী-সাহেব। কোথায় কথাটা হতে পারে?

হাজী-সাহেব ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে ভিতরে নিয়ে এলেন। অর্গলবদ্ধ করে দিলেন দরজাটা। বললেন, কোটটা খুলে ফেল হাসানভাই। কুর্তাটাও খুলে ফেল। এখানে সরম করার কিছু নেই। আমিনা, আর এক পেয়ালা গরম চা—

আমিনা নির্নিমেষ-নেত্রে তাকিয়ে দেখছিল। হাসান বললে, আপনার ঘরটা ভিজিয়ে দিয়ে গেলাম বলে নিতান্ত লজ্জিত— কিন্তু আমি নিরুপায় বেগম-সাহেবা—যে কথাটা বলতে এসেছি তা সত্যই জরুরী। আর সেটা আপনাদের স্বার্থেই।

আমিনা জবাব দিল না। নিঃশব্দে এক কাপ গরম চা এগিয়ে দিল অতিথির দিকে। হাসান সেটা হাত বাড়িয়ে নিল। ডিশ দিয়ে কাপটা ঢাকা দিয়ে টেবিলে রাখল। অসঙ্কোচে খুলে ফেলল তার কোট আর কুর্তা। পেশীবহুল লোমশ বুকটা অনাবৃত করে। কোটের উপর আলোয়ান চড়ানোর হেতুটা বোঝা

গেল। তার মাজায় বাঁধা আছে একটা কোল্ট রিভলভার। অভ্যস্ত সৈনিকের মতো সে কোটটা টাঙিয়ে রাখল একটা হ্যাঙার থেকে। মাজা থেকে চামড়ার বেল্ট খুলে রিভলভার আর টোটার পাউচটা ঝুলিয়ে দিল হুক থেকে। তার উপর চাপা দিতে গেল আলোয়ানটা। হঠাৎ আচমকা হেসে উঠল সে।

হাজী সাহেব বলেন, কী হলো আবার? হেসে উঠলে যে?

হাসান হাসতে হাসতেই বলে, দেখ হাজী-সাহেব! তোমার তস্‌বিছড়া আমার রিভলভারটাকে কী সুন্দরভাবে জড়িয়ে ধরেছে। যেন যুগ-যুগান্তরের মহব্বৎ!

হাজী-সাহেবও হেসে ওঠেন। বলেন, এবার বল, জরুরী কথাটা কী?

—হ্যাঁ, আমার সময় কম। জেদাজেদি-তর্কাতর্কি কর না। যা বলছি তাই কর। আজ শেষ রাতে—তিনটে দশ মিনিটে আমার লোক আসবে —দরজায় টোকা দেবে। তুমি জিজ্ঞাসা করবে—কে? লোকটা বলবে 'মিকি-মাউস'। এটাই কোড নাম! নামটা স্বকর্ণে শুনে দরজা খুলে দিও। তার সঙ্গে কেটে পড়। বুঝলে? জামাল মিঞার বাড়ির পিছনে যে তেঁতুল গাছটা আছে সেখানে মোটরবাইক নিয়ে অপেক্ষা করব আমি। ঐ 'মিকি-মাউস' তোমাকে পৌঁছে দেবে। জামা-কাপড় সঙ্গে নিতে হবে না। সেসব আমরা যোগান দেব। তবে তোমার তস্‌বিছড়া নিতে ভুল না। ও চীজ আমার আর্সেনেলে নেই। বুঝলে?

হাজী সাহেব বললেন, এ তো বদ্ধ উন্মাদের প্রলাপ! বুঝব কী?

—আবার বলছি, আমার সময় কম। শোন, সংক্ষেপে বলি। কাল ভোরে তোমার বাড়ি রেইড হবে। হ্যাঁ, তোমাকেই নির্বাচন করেছে ওয়ালি জব্বর। এ আমার পাকা খবর। দিন দশ-পনেরর জন্য তোমাকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। বেগম-সাহেবার জন্যে চিন্তা নেই। তাঁর দেখ্‌ভাল করবে আমার লোক। কিন্তু টাকা-পয়সা রেখে যেও বাপু। আমাদের পকেট ফাঁকা। জরু-গরু পোষার মতো রেস্তো নেই!

আমিনা একেবারে সাদা হয়ে গেছে। তার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে।

হাজী-সাহেব বললেন, ও, এই ব্যাপার? আমি দুঃখিত হাসানভাই। আমি কোথাও যাব না! আমি এই পঞ্চগ্রামের ইমাম। আমার একটা দায়িত্ব আছে, একটা কর্তব্য আছে। আমি তো পালিয়ে যেতে পারব না। তাছাড়া আমার মনে হয় তোমার ও খবরটাও ঠিক নয়। আমি রাজনীতি করি না...

হাসান চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়েছিল। ঠক্ করে সেটা টেবিলে নামিয়ে রাখে। বলে, শোন হাজী-সাহেব! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা যাদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে তারা আমার মতো 'শয়তানের ছাওয়াল' ছিল না। তারা তোমারই মতো পণ্ডিত ছিল—তাদের মধ্যেও ছিল অনেক হাফেজ, হাজী, মৌলানা! বুঝেছ?

হাজী-সাহেব আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। ক্ষিপ্র শার্দুলের মতো লাপ দিয়ে উঠে পড়ে হাসান। হুক থেকে রিভলভারটা পেড়ে নিয়ে সরে যায় পাশের ঘরে। ব্যাপারটা যে কী তা বুঝে ওটার আগেই দরজায় কে যেন টোকা দিল। হাজী-সাহবে বুঝলেন, তিনি শুনতে পাননি কিন্তু ঐ শয়তানের ছাওয়ালটা কয়েক সেকেণ্ড আগেই কারও পদশব্দ শুনতে পেয়েছে। উনি উঠে গেলেন কপাটের কাছে। আমিনা ওঁর হাতটা চেপে ধরল। অস্ফুটে বলল, না! যদি ওরা হয়? তুমিও ও ঘরে চলে যাও! আমি দেখছি।

হাজী-সাহেব বুঝে উঠতে পারেন না—কী তাঁর করণীয়। এমন বিপদের মুখে আমিনাকে রেখে আত্মগোপন করাটা তাঁর বিবেক মেনে নিতে পারছিল না। সৌভাগ্যই বলতে হবে—দ্বারের বাহির থেকে শোনা গেল আব্দুল ভায়ের কণ্ঠস্বর : হাজী-সাহেব আছেন নাকি? আমি আব্দুল!

হাজী-সাহেবই এগিয়ে এসে দ্বার খুলে দিলেন। আব্দুল মিঞার সঙ্গে ছাতা আছে। বৃষ্টিটাও ধরে এসেছে। ভেজেননি তিনি। তবু ভিতরে এলেন না। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েই একটি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দিলেন—ফরিদা-বেগমের অবস্থা একটু বাড়াবাড়ি রকমের। হাকিম-সাহেব দেখে গেছেন। বলছেন ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু ফরিদার বিশ্বাস তাঁর মৃত্যু-সময় উপস্থিত। হাজী-সাহেব যেন অবিলম্বে চলে আসেন।

—সত্যিই কি অবস্থা খুব খারাপ?

—মনে তো হয় না। তবে তগ্‌দিরের কথাটা তো বলা যায় না। যদি রাতটা না কাটে? ফরিদা বেগমের অন্তিম ইচ্ছেটা সে ক্ষেত্রে...

হাজী-সাহেব বললেন, ঠিক আছে। আমি একটু পরেই আসছি। আপনি এগোন।

আব্দুল সকুণ্ঠভাবে বললেন, হয়তো অহেতুক কষ্ট দিচ্ছি আপনাকে...

—এই তো আমার কাজ আব্দুল ভাই। কষ্ট কিসের? আধঘণ্টার মধ্যেই আসব আমি। আপনি এগোন। মুর্তজা আছে তো তার মায়ের কাছে?

আব্দুল জানালেন, আছে।

—টর্চ দেব আপনাকে? —জানতে চাইলেন হাজী-সাহেব।

—না, আছে আমার সঙ্গে।

আব্দুর দু-পা এগিয়েই আবার ফিরে এলেন। প্রশ্ন করেন, একটা কথা হাজী-সাহেব, হাসান আলী কি এসেছিল আপনার কাছে একটু আগে?

জ্ঞানত হাজী-সাহেব মিছে কথা বলেন না। প্রতিপ্রশ্ন করেন, কেন বলুন তো!

উনিও জবাব দিলেন না। নিজের মনেই বলেন, না আসেনি। এলে তো ধরাই পড়ত। তাহলে আর আমাকে আটক করে ওসব কথা জানতে চাইবে কেন?

—কী সব কথা? কী হয়েছে বলুন তো?

আব্দুল বলেন, হাজী-সাহেবের বাড়িতে আসবার পথে একটি খান গুপ্তচর ওঁকে আটকায়। পরিচয় জানতে চায়। লোকটা জানতে চেয়েছিল ইব্রাহিম ওসমান আলীর বড়ছেলে হাসান আলীকে তিনি চেনেন কিনা। সে কোথায় আছে তা জানেন কিনা। আব্দুল নিজের পরিচয় দেন। হাসান আলীকে চেনেন সে কথাও স্বীকার করেছেন। তাকে গতকাল সকালে মতিগঞ্জে দেখেছেন এ কথাও। কিন্তু সে বর্তমানে কোথায় আছে তা উনি জানেন না বলেছেন। যাবার আগে সাবধান করে দেন, শয়তানের চ্যালাটার সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে।

আব্দুল প্রস্থান করার পর উনি দ্বার অর্গলবদ্ধ করে ফিরে দাঁড়িয়েই দেখেন অন্তরাল থেকে বার হয়ে এসেছে হাসান। হাজী-সাহেব বললেন, শুনলে?

—তা শুনলাম বইকি। আপনি কিন্তু এখন বাইরে যাবেন না। আম্মাজানের কিচ্ছু হয়নি! এসব তার ন্যাকামি।

হাজী-সাহেব বলে ওঠেন, আব্দুলের কথাটা শুনেছ, কিন্তু তার অর্থ তুমি গ্রহণ করতে পারনি হাসানভাই। ওরা আমাকে খুঁজছে না, খুঁজছে তোমাকেই। শোন, আমি একটু বের হচ্ছি। আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। তুমি এখানেই লুকিয়ে থাক। রাত গভীর হওয়ার আগে পথে নেম না।

আমিনা কী-একটা কথা বলতে গেল, কিন্তু তার আগেই হাজী-সাহেব বলে ওঠেন, ভয় নেই আমিনা। আমি যাব আর আসব। তুমি ততক্ষণ হাসানকে কিছু খেতে দাও। ওর বোধহয় সারাদিন কিছু জোটেনি।

আমিনা আর্তনাদ করে ওঠে, আমি...এখানে...একা...

—না, না, একা কেন? হাসানভাই তো রইল। আমি যাব আর আসব।

ছাতাটা তুলে নিয়ে উনি যেমন ছিলেন বেরিয়ে গেলেন।

হাসান জানলার কাছে সরে এল। বৃষ্টিটা থেমেছে। টর্চ জ্বেলে পা টিপে টিপে হাজী-সাহেব ক্রমশ বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেলেন। হাসান ঘুরে দাঁড়ায়। দেখে ভয়ে নীল হয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে আমিনা। হাসান বলে, বেগম-সাহেবা! উনি না জানলেও আমি জানি, আপনি আমাকে কী চোখে দেখেন। আপনাকে আর বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলব না। চলি। আদাব।

ভিজে কুর্তাটা হ্যাঙার থেকে পেড়ে নামাবার জন্য হাত বাড়ায়। আমিনা হঠাৎ বলে ওঠে, না।

আপনি যাবেন না! আমি মিনতি করছি।

হাসান থমকে যায়। বলে, কেন বলুন তো? আপনি কি সত্যিই চান, এই নির্জন ঘরে আমি আপনার কাছে থাকি? কেন?

আমিনা অসহায়ভাবে বলে, সত্যি বললে তো আপনি বিশ্বাস করবেন না, অহেতুক আমাকে বিদ্রূপ করবেন।

—বিদ্রূপ? আমি কি জানোয়ার! ...এর পরেও আপনি আমাকে থাকতে বলেন?

—হ্যাঁ বলি। বলছি!

হাসান কী-জানি কেন হেসে ফেলে। বসে পড়ে একটা চেয়ারে। তার সেই হাসি দেখে যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল আমিনার অন্তঃকরণ। বললে, মনে করবেন না তার অন্য কোনও কারণ আছে। আপনার সঙ্গ আমার ভাল লাগবে বলে নয়।

—ও! তাই বুঝি! তাহলে আমাকে যেতে দিচ্ছেন না কেন?

—উনি...মানে, আমার স্বামী যদি ফিরে এসে আপনাকে দেখতে না পান, তাহলে ভাববেন আমিই আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

হাসান চিন্তিতভাবে বলে, তাই তো! এ তো মহা ফ্যাসাদ হলো দেখছি! বুঝিয়ে বললেও কি তিনি বুঝতে পারবেন না যে, আপনি আপনার মেহ্‌মানের প্রতি সত্যিই সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন, অথচ আপনার মেহ্‌মানই ছুটে পালিয়ে গেছে?

আমিনা এ আঘাত সইতে পারে না। দু-হাতে মুখ ঢাকে। সে জানে, খান-সেনারা ঐ দুঃসাহসী বেপরোয়া মুক্তিবাহিনীর নেতাটাকে খুঁজছে। ও এখান থেকে বার হলেই ধরা পড়ে যাবে। অথচ এই নির্জন ঘরে সে কেমন করে ঐ পাষণ্ডটার সঙ্গে আধঘণ্টা সময়...

আমিনাকে কাঁদতে দেখে হাসান নিত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। আপনমনেই বলে ওঠে, লে হালুয়া! এ কী ফ্যাসাদ! এই, দেখুন, শুনছেন? এর মধ্যে কাঁদাকাটির কী আছে? শুনুন, আপনি যদি কান্না না থামান তাহলে আমি কিন্তু সত্যিই দরজা খুলে বেরিয়ে যাব। তারপর যা হয় হোক...

আমিনা চোখ মুছে তাকায়। বলে, বসুন আপনি!

—এই তো! ব্যস! আসুন চা-টা খেয়ে ফেলা যাক!

—না, থাক। ওটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আবার করে আনি—হাসান বলে, আপনি যদি আমার সান্নিধ্য এড়াতে ও ঘরে যেতে চান তাহলে বাধা দেব না। না হলে, থাক। চা খেতে ইচ্ছে করছে না এখন।

—তাহলে কী করবেন?

—এই একটু গল্প-স্বল্প। জানেন বেগম-সাহেবা—এই ঘর-গেরস্থালি জিনিসটা আমার কাছে একেবারে অচেনা। ছেলেবেলা থেকে সারাটা জীবনই আমার মাঠে-ঘাটে কেটেছে। দশ বছর বয়স থেকেই বাপে-খেদানো ছেলে। তাই আজ আপনাদের এই ঘরটা. .মানে, এমন একটা ছিমছাম পরিবেশ আমার খুব অদ্ভুত লাগছে। ছোট্ট একটা ঘর, ছোট্ট সংসার, একটি টেবিল, দু-পেয়ালা চা, দু-প্রান্তে দুটি মানুষ, আর বাইরে জোনাকজ্বলা বর্ষণ-ক্লান্ত একটি নিবিড় সন্ধ্যা...না, না, যা ভাবছেন তা নয়, কাব্য করছি না। এই মুহূর্তে এটা আমার কাছে যতই লোভনীয় মনে হোক, বেশিদিন এ আমার সইতো না! এ আমার ধাতে নেই।

আমিনা ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছে টি-কোজিতে ঢাকা দেয়া লীকারটা ঠাণ্ডা হয়নি। দু-কাপ চা বানানো যায়নি—দুটি হাফ-কাপ করা গেছে। একটি নিজের রেখে একটি আগিয়ে দেয় হাসানের দিকে। হাসান সেটা হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়ে হঠাৎ হেসে ফেলে। আমিনার ভ্রূকুঞ্চন হয় তৎক্ষণাৎ, আপনি হাসলেন যে?

—ও কিছু নয়। —হাসান ব্যাপারটা চাপা দিতে চায়।

—না, আপনাকে বলতেই হবে। কেন হাসলেন, বলুন?

—আপনিই বা একটু আগে কেঁদে ফেলেছিলেন, কেন?

—বুঝেছি। আপনাকে বলতে হবে না।

—কী বুঝেছেন?

—আমিই বা তা বলতে যাব কেন?

হঠাৎ আবার ঝেঁপে জল এল।

হাজী-সাহেব বেরিয়ে যাবার পর দরজাটা ভেজানো ছিল। দমকা হাওয়ায় পাল্লাটা খুলে গেল পশ্চিমের ছাঁট। বড় বড় জলের ফোঁটা আসতে শুরু করল ঘরের ভিতর। হাসান বললে, দরজাটা বন্ধ করে দিই বরং।

আমিনা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে, না—না—না!

হাসান থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের বিহ্বলতা। তারপর ছাদ কাঁপিয়ে হেসে ওঠে। এবার আর আমিনা জানতে চায় না তার কারণটা। হাসান পাল্লা দুটো আবার ভেজিয়ে দিল। একটা চেয়ার দিয়ে একটু ঠেকো দিয়ে ফিরে এসে বললে, এই জন্যই তখন আমি হেসেছিলাম বেগম-সাহেবা! এখন অচেনা কেউ যদি এসে পড়ে, সে কী ভাববে বলুন তো? একটি টেবিল, দু পেয়ালা চা...

হঠাৎ ছিলাখোলা ধনুকের মতো ছিটকে সরে যায় আমিনা। বলে, মিস্টার আলী!

এক ঝলক বিদ্যুৎ। বাইরে বোধহয় বজ্রপাত হলো। হাসানের হাসি তখনো থামেনি। আমিনা ঘরের দূরতম প্রান্তে সরে গেছে। সেখান থেকেই বলে, আপনি বোধহয় আমার স্বামীর সঙ্গে আমার বয়সের ফারাকটা মনে করেই অমন একটা কদর্য ইঙ্গিত করলেন; কিন্তু শুনে রাখুন...

বাধা দিয়ে হাসান বললে, না! বয়সের তফাৎটা এতক্ষণ খেয়াল হয়নি! আপনি বলার পর...

আমিনাও ওকে মাঝপথে থামিয়ে বলে, আচ্ছা আমার স্বামী তো বরাবর আপনার ভাল করবারই চেষ্টা করছেন। তবু কেন আপনি তাঁকে ক্রমাগত আপমান করতে চান?

—আমি তাঁকে আপনাম করেছি?

—করেছেন। মনে মনে নিজেকে তাঁর জায়গায় বসিয়েছেন। একটা কুৎসিত চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিয়েছেন।

হাসান নতনেত্রে কী যেন ভাবল। তারপর আমিনার চোখে চোখে রেখে বললে, বেগম-সাহেবা, এমনও তো হতে পারে যে, আপনার ভালবাসা পেয়েছেন বলেই উনি ঈশ্বরবিশ্বাসী শীরীন আদমী, আর আমি আপনার ঘৃণার পাত্র বলেই শয়তানের চেলা!

আমিনা এ-কথার প্রত্যুত্তর করার সুযোগ পেল না। ঠিক তখনই ভেসে এল সৈন্যদলের মার্চের শব্দ। হাসান হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনের আলোটা কমিয়ে দেয়। অস্ফুটে দাঁতে-দাঁতে বলে, খানসেনা!

হঠাৎ দ্বারের বাইরেই শোনা গেল কণ্ঠস্বর : হল্ট! চার আদমী বাহার খাড়া রহো! দো আ-যাও মেরা সাথ।

ধীরে ধীরে খুলে গেল পাল্লাটা। হাসান একটা লাফ দিয়ে তার রিভলবারের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করতে পারল না। তার আগেই তিনজন উর্দিধারী খান-সেনা বেয়নেট উঁচিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। ওরা দু'-জনই তখন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। আমিনা আতঙ্কের তুঙ্গশীর্ষে। নগ্নগাত্রে হাসান বিহ্বল।

একজন হাবিলদার এগিয়ে এল। আমিনাকে অভিবাদন করে বললে, মাফ কিজিয়েগা বেগম সাহেবা। ইয়ে সেরফ ডিউটিকা বারেমে।

হাসান গর্জে ওঠে, ক্যা মাংতা তুম্‌লোগ?

হাবিলদার শান্তকণ্ঠে বলে, মৌলানা মহীউদ্দীন হাজী! You are under arrest!

আমিনা কী একটা কথা বলতে যায়। গলা দিয়ে তার স্বর ফোটে না। হাবিলদারই পুনরায় বলে, মৌলানা সা'ব! আপকো কুর্তা পহিন লিজিয়ে, ঔর আইয়ে মেরা সাথ।

আমিনা ততক্ষণে চেয়ারের উপর এলিয়ে পড়েছে। হাসান চেয়ার থেকে নিজের জামাটা নিতে গিয়েই নিজের ভুল বুঝতে পারে। হাবিলদারের দিকে পিছন ফিরে, মাথা না সরিয়ে ঘরের চারিদিক দেখে নেয়। নজরে পড়ে হাজী সাহেবের আলখাল্লাটা। হুক থেকে সেটাই পেড়ে গায়ে চড়ায়। হঠাৎ দেখতে পায় হুক থেকে টাঙানো রিভলভারটা। চট করে নিজের কোট দিয়ে সেটা চাপা দেয়। হাবিলদার এতক্ষণ একদৃষ্টে মূর্ছাতুরা আমিনাবিবিকে দেখছিল—তার আঁচলটা যে বুক থেকে খসে পড়েছে সেটা সে টের পায়নি। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে বেশবাস সামলে নেয়। হাবিলদার তৎক্ষণাৎ হাসানের দিকে ফেরে। আর যাদুকর যেভাবে টুপির ভিতর থেকে খরগোশ বার করে আনে সেই কায়দায় কোটের পিছনে রিভলভারটাকে রেখে হাসান বার করে আনে হাজী-সাহেবের তস্‌বিছড়া। হাবিলদারকে সেটা দেখিয়ে বলে, এটা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি হাবিলদার সাব?

লোকটা বিনয়ে গলে যায়। খানদানি উর্দুতে বলে, সে মুসলমানের বাচ্চা! মিলিটারি হুকুমে কাজ করছে বটে তবে অমানুষ নয়, কাফের নয়!

হাসান তস্‌বিছড়া বাড়িয়ে ধরে। নতমস্তক হাবিলদারের মাথায় ঠেকিয়ে মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে বলে ওঠে, লায় লাহা ইল্‌লেল্লাহ! খসমকে কহো কি ছোড়ে ইয়ে কিল্লা!

হাবিলদার বিস্মিত হয়ে উপর পানে চাইতেই হাসান বলে, হ্যাণ্ডকাফ?

—কোই জরুরৎ নেই মৌলভীসাব! আপ ইমানদার আদমী।

—চল তবে।

কী খেয়াল হলো, হাবিলদার নিজে থেকেই বলে, মৌলভী সাব! আপনার খিদমতে তাহলে আরও একটি আর্জি পেশ করি। বেগম-সাহেবার কাছ থেকে আপনি বিদায় চেয়ে নিতে পারেন। আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি।

হাসান ম্লান হেসে বললে, কেন ভাই? ওঁর সঙ্গে তো আবার আমার দেখা হবে? নাকি তার আগেই সসস-চ?

নিজের গলায় তর্জনী চালিয়ে জবাইয়ের মুদ্রা করে।

হাবিলদার অনেক তোবা-তোবা জানাল। তারপর মুখটা কানের কাছে এনে বলল যে, তার ঘরেও আছে খুবসুরত জরু। সে হাজী-সাহেবকে একটা শেষ সুযোগ দিতে চায়। হয়তো লোকটা সত্যই ধর্মভীরু, অথবা একটা নাটকীয় দৃশ্য দেখার শখ চেপেছে তার। বাকি দুজন সঙ্গীকে তাড়িয়ে সে নিজেও দ্বারের বাইরে গেল। কিন্তু একেবারে দৃষ্টিসীমার বাইরে নয়।

হাসান ঘুরে দাঁড়ায়। আমিনার মুখোমুখি। হাবিলদারের প্রত্যাশা মিটিয়ে দিতে সে কসুর করে না। হিন্দী পিক্‌চারের নায়কের মতো দরদ্-ভরা কণ্ঠে যেন তার অভ্যস্ত ডায়ালগটা ঝাড়তে শুরু করে : আমিনা! মেরি পেয়ারি! মেরি দিল-কি-রানী!

দরজার ফাঁকে নিবদ্ধচক্ষু একমাত্র দর্শকটি বোধকরি সিটি মারার দুরন্ত বাসনাকে সংযত কবল।

আমিনা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে। কথা সরে না তার মুখে। সে বুঝতে পারছে—দুঃসাহসী শয়তানের চেলাটা কী করতে চলেছে—কিন্তু প্রতিবাদ করার শক্তি নেই তার। চেয়ারের হাতলদুটি ধরে সে কোনক্রমে ভারসাম্য রক্ষা করছে।

হাসান এক পা আগিয়ে আসে। বলে, শোন আমিনা, হাবিলদারভাই শরিফ আদমী! আমাদের শেষ বিদায় নেবার একটা সুযোগ দিয়েছেন...এগিয়ে এস আমিনা...

আমিনার চোখ দুটি বুঁজে যায়! সে কী করবে, কী বলবে, কিছুই স্থির করে উঠতে পারে না।

হাসান আর ইতস্তত করে না। সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দুই বাঘের থাবায় আমিনার দুটি বাহুমূল চেপে ধরে। বলে, সত্যি কথাটা হাবিলদার-সাহেব স্বীকার করলেন না। কিন্তু বুঝতে পারছ নিশ্চয়—আমার এই যাওয়াই শেষ যাওয়া! তুমি...তুমি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছ আমিনা?

আমিনা মাথা নেড়ে জানায় সে বুঝতে পারছে। হাসান লক্ষ্য করে দেখে উত্তেজনায় হাবিলদার এ

ঘবেব ভিতবেই এগিযে এসেছে এক পা। হযতো লোকটা বাঙলা ভাষা বুঝবে না, তবু সাবধানেব মাব নেই। হাসান দ্ব্যর্থভাষায পবিস্থিতিটা আমিনাকে বুঝিযে দিতে চায, এটা নিশ্চয বুঝতে পাবছ যে, ওবা মৌলানা মহীউদ্দীনকে ফাঁসিব মঞ্চে নিযে যাচ্ছে

আমিনা জলভবা দুটি চোখ মেলে হাসানেব দিকে তাকায। ওব চোখ নাকি খঞ্জনেব মতো চঞ্চল কিন্তু এখন তা অতলান্ত সমুদ্রেব মতো লবণাক্ত।

—শোন। আমাদেব দুজনেব যে বন্ধুটি এইমাত্র এখানে ছিলেন তাঁকে ঘৃণাক্ষবেও কিছু বল না মিকি মাউস কাল ভোববাতে আসবে সেই বিকল্প ব্যবস্থা কববে। আমাকে বাঁচানোব চেষ্টা যেন সে না কবে তাহলে আমাদেব দুজনেবই ফাঁসি হবে যে কাণ্ডটা এইমাত্র কবেছি, তাব ক্ষমা নেই তুমি বুঝতে পাবছ আমাব কথা?

আমিনা কোনক্রমে গ্রীবাসঞ্চালনে সম্মতি জানায।

হাসান ওব বাহুমূল ছেড়ে দেবাব আগে ওকে ধবে ধবে চেযাবে বসিযে দেয। যাবাব জন্য পা বাড়িযেই ওব লক্ষ্য হয হাবিলদাব অদ্ভুতভাবে তাকিযে আছে। তাব চোখে দুবন্ত বিস্ময।

হাসান ঘুবে দাঁড়ায। আবাব দুই বাহুমূল ধবে আমিনাকে দাঁড় কবিযে দেয। তাব কর্ণমূলে ফিসফিস কবে বলে, বেগম সাহেবা। লোকটাব চোখে আমি অবিশ্বাসেব ছাযা দেখেছি। এমন একটা নিবামিষ বিদাযপর্ব ও ববদাস্ত কববে না। খোঁজখবব নিতে চেষ্টা কববে। প্লীজ, আমিনা। আমাকে একবাব জড়িযে ধব।

আমিনা কোনক্রমে কণ্ঠস্বব ফিবে পায। বলে, এ তো হত্যা। আপনাকে আমি

—আপনি নয আমিনা 'তুমি, তুমি'। হাবামীব বাচ্চাটা শুনছে। একটি মুহূর্তেব জন্য ভুলে যাও আমিনা যে, তুনি আমাকে ঘৃণা কব। আমাকে জড়িযে ধব। প্লীজ।

আমিনা ঝবঝবিযে কেঁদে ফেলে, বলে, পাবব না, আমি কিছুতেই পাবব না।

—পাববে আমিনা, পাববে। আমি মবতে পাবব, আব তুমি এটুকু পাববে না। এ তো আমাকে ভালবেসে দিচ্ছ না আমাকে ঘৃণাই কব এ যে তাব জন্য।

আমিনাব বাহুমূল ধবে সামান্য আকর্ষণ কবে।

হঠাৎ কী যেন হযে গেল। আমিনা সবেগে ঝাঁপিযে পড়ল ওব বুকে।

নিবিড় কবে জড়িযে ধবল হাসানকে।

সমযেব ব্যাপ্তিটাব সম্বন্ধে ধাবণা নেই। যুগ-যুগান্ত না সেকেণ্ড-মিনিট? অনুভূতিটাকে সমযেব মাপকাঠিতে পবিমাপ কবা যায না বোধ হয। আলিঙ্গনমুক্ত হতে গিযে বুঝতে পাবে ওব বাহুবন্ধে আমিনা জ্ঞান হাবিযেছে। হাসান ধীবে ধীবে ওকে মাটিতে শুইযে দেয। গাযেব কাপড়টা ঠিক কবে দিল। এই সুযোগ। হাসান দাঁড়িযে উঠে দুটি মুষ্টিবদ্ধ হাত বাড়িযে ধবে বলে, হাবিলদাব। কুইক। হ্যান্ডকাফ।

হাবিলদাব পুনরুক্তি কবে, ছোড়িযে মৌলানা সাব। আপ ইমানদাব আদমী। হ্যান্ডকাফকা কোই জরুবৎ নেহী। আইযে মেবা সাথ।

দবজাটা হাট কবে খোলা বইল। দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে পাল্লা-দুটো যেন আপসাতে থাকে। আবাব ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। দপ্ কবে নিবে গেল বাতিটা। ঝোড়ো হাওযায আমিনাব বুকেব কাপড় যে সবে গেল অন্ধকাব ঘবটা তা টেব পেল না।

ফেবাব পথে কথাটা খেযাল হলো ওঁব কাজটা ভাল হযনি।

হ্যাঁ, কথাটা ঠিক—'মানুষেব প্রতি বিশ্বাস হাবানো পাপ।' কিন্তু মানুষকে প্রলুব্ধ কবাও তো পুণ্যকর্ম নয। খোদাতালা ঐ মানুষটাকে যে কী ধাতুতে গড়েছেন তা তো জানতে বাকি নেই। বর্ষণমুখব একটা নির্জন প্রাযান্ধকাব কক্ষ, একটি সুন্দবী যুবতীব উষ্ণ সান্নিধ্য—মানুষ যদি খণ্ডকালেব জন্য শুভবুদ্ধি

হারিয়ে ফেলে, তাহলে দোষ কি তার একার? যারা এ পরিবেশটা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে তাদের কোনো দায়িত্ব নেই?

কিন্তু কী করতে পারতেন উনি? একদিকে কর্তব্যের আহ্বান—মৃত্যুপথযাত্রীর শেষকৃত্য, অন্য দিকেও একটি আর্ত মানুষ, যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে একদল হিংস্র নেকড়ে! কিন্তু আমিনার প্রতি তিনি কি অন্যায় করেননি? আমিনা যে ঐ পাষণ্ডটাকে— না, তিনি ওকে পাষণ্ড বলতে চান না, কিন্তু আমিনার চোখে তো সে তাই—কী চোখে দেখে তা তো জানা ছিল হাজী-সাহেবের। তাহলে কেন তাকে বাধ্য করলেন এমন বিপদের মধ্যে ঘণ্টাখানেক কাটাতে?

রাত এক প্রহর অতিক্রান্ত। গ্রাম-বাঙলার কাছে সেটা মধ্যরাত্রি—বিশেষ এমন রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের দিনে। দূরে দূরে দু-একটা টেমি জ্বলছে। কাশেম মিঞার ভিটের কাছাকাছি আসতে একটা কুকুর আচমকা ককিয়ে উঠল। বৃষ্টিটা থেমেছে। দমকা হাওয়ায় বিরাম নেই! মেঘের ফাঁক দিয়ে বার হয়ে এসেছে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ। নারিকেল গাছ মাথা দোলাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়ায়। ব্যাঙ ডাকছে এক-নাগাড়ে। টুপটাপ ঝরে পড়ছে গাছের পাতার জল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল।

সদর-দরজা হাট করে খোলা। ঘরে বাতি জ্বলছে না!

চৌকাঠের উপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। গেল কোথায় ওরা?

নাম ধরে ডাকলেন—আমিনা! আমিনা!

আশ্চর্য! কেউ সাড়া দিল না। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভিতর এলেন। অন্ধকারের ভিতর টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে ফেললেন চারিদিকে। হঠাৎ নজরে পড়ল মেঝের দিকে।

—ঈয়া আল্লাহ্!

অন্ধকার ঘরে মেঝের উপর লুটাচ্ছে আমিনার অচৈতন্য দেহটা। টর্চের আলো পড়ল ওর মুখে। সাড়া নেই। বুকের উপর থেকে কাপড়টা সরে গেছে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে মাটিতে; একটা হাত আলতো করে রাখা আছে বুকের উপর।

বসে পড়লেন ভূশয্যালীন দেহটির পাশে। না, রক্তের কোনো চিহ্ন নেই। নাড়িটা দেখলেন! হ্যাঁ, স্পন্দন অনুভব করতে পারা যায়। কী খেয়াল হলো—টর্চের আলোটা ফেললেন ওর বুকের উপত্যকায়—না, ব্লাউসের বোতামগুলি লাগানো। তার মানে কি যাবার আগে ও...

না, না, এসব কী ভাবছেন? কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে এনে বার দুই ঝাপটা দিলেন ওর মুখে। আবার ডাকলেন, আমিনা! আমিনা!

এবার জ্ঞান ফিরে এল ওর। সাড়া দিল। অস্ফুটে বললে, উঁ?

—তোমার কী কোনো কষ্ট হচ্ছে? কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?

ধীরে ধীরে উঠে বসে এবার। আঁচল দিয়ে ভিজে মুখটা মোছে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, না! কষ্ট হচ্ছে না তো কিছু? আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? মাটিতে ?

হাজী-সাহেব ওর বাহুমূল দুহাতে চেপে ধরলেন। হাত থেকে পড়ে টর্চটা গড়িয়ে গিয়েছিল কিছুদূরে। তার আলোয় বিরাট দুটি ছায়া পড়ল বিপরীত দেয়ালে। সে ছায়ামূর্তি দুটি নিরেট কালো—তাদের বহিরঙ্গ রেখাটুকুই শুধু আঁকা পড়েছে, বাদবাকি নিকষকালো। ভিতরে কার কী আছে বোঝা যায় না।

হাজী-সাহেব বললেন, না, ঘুমিয়ে পড়নি। তুমি অজ্ঞান হয়ে গেছিলে, আমিনা।

—তা হবে! —এবাব ও উঠে দাঁড়ায়. টলতে টলতে দু-পা গিয়ে চেয়ারে বসে।

টর্চের আলোয় দেশলাইটা খুঁজে বাব করে বাতিটা আবার জ্বাললেন। ফিরে দেখলেন আমিনার দিকে। তার মুখ ভাবলেশহীন। এমন নির্লিপ্ততা আশা করেননি। আশা না আশঙ্কা? বললেন, কী ভাবে অজ্ঞান হয়ে গেলে তুমি? কখন?

--মনে পড়ছে না।

--ও চলে যাবার পরে?

--ও? 'ও' মানে?

হাজী-সাহেব অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে বললেন, আমি যখন চলে যাই, তখন তো তুমি একা ছিলে না, আমিনা?

—ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হাসানভাই!

হাজী-সাহেবের মনে পড়ে গেল এই সন্ধ্যারই আর একটি কথোপকথন—ঐ মেয়েটিরই উচ্চারিত আচ্ছা, আমি, ওর নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করি না, আর তুমি বল...

বুঝতে পারেন, আমিনার একে একে সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সব, স—ব কথা। তাঁর অনুপস্থিতিতে এই নির্জন ঘরে নাটকের যে মর্মান্তিক দৃশ্যটা অভিনীত হয়েছে। স্তিমিত আলোতেই লক্ষ্য করলেন মেয়েটির মুখে কয়েকটি অভিব্যক্তি। কথা বলছে না, কিন্তু মুখের রঙ বদলাচ্ছে—কী সেই মূর্ছনা? অনুরাগ, অভিমান, সুখস্মৃতি? নাঃ, ঘৃণা বা অনুশোচনার চিহ্নমাত্র তো নজরে পড়ছে না—তবে লজ্জার একটা আভাস আছে! আমিনার হাত দুটি তুলে নিয়ে হাজী-সাহেব বলেন, কী হয়েছিল আমিনা? ও কি তোমাকে অরক্ষিতা পেয়ে...

--না! ও-কথা বল না! ...না, আমাকে কোনো কথা বলতে বল না!

কিন্তু কেমন করে উনি সেটা মেনে নেবেন? গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে গৃহাভ্যন্তরে যেটা ঘটেছে তা যে জানতেই হবে ওঁকে। তার উপরেই যে নির্ভর করছে তাঁর বাকি জীবন—দাম্পত্য-জীবনের বনিয়াদ! এটুকু বোঝা যাচ্ছে, আমিনা ধর্ষিতা নয়। তা হলে সে কাঁদত, তাহলে সে অনুশোচনায় মরমে মরে যেত। তা হয়নি। তাহলে তার যে দুটি বিকল্প! না, দুটি নয়, একটিই—যার ফলশ্রুতিতে শয়তানের চেলাটা ওর কাছে হয়ে গেছে : হাসানভাই!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল হাজী-সাহেবের। বললেন, তবে থাক। একন বলতে হবে না। কাল সকালে বল।

না! সে-কথা তুমি কোনদিনই জানতে চেও না। কোনদিন নয়! বল, জানতে চাইবে না?

থমকে যান হাজী-সাহেব!

এই আকুল অনুরোধেরও যে দু-দুটি বিকল্প হতে পারে তা খেয়াল হলো না হাজী-সাহেবের। রবি ঠাকুরের 'শ্যামা' নাটক বোধকরি পড়েননি তিনি। ওঁর বরং মনে পড়ে গেল, এক-সময়ে আমিনার রূপে মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিবাহে স্বীকৃত হতে ইতস্তত করেছিলেন বয়সের পার্থক্যটার কথা ভেবে। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। বললেন, তাই হবে আমিনা। আমি সে-কথা কোনদিনই জানতে চাইব না। আমারই ভুল। আমিই চিনতে পারিনি শয়তানটাকে—

হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে এল আমিনা। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল তার। গাঢ় আবেগের সঙ্গে বললে, শুধু তুমি একা নও! তোমার... তোমরা কেউই ওকে চিনতে পারনি!

আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না প্রৌঢ় মানুষটি। বলে ফেললেন, যাক! তবু একজন তার সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছে। এটাই সান্ত্বনা।

আমিনা আগুনঝরা চোখ মেলে তাকিয়ে বসে রইল।

ঠিক তখনই নজর হলো হাজী-সাহেবের—খোলা দরজার পশ্চাদপটে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে একটা ছায়ামূর্তি। লাফ দিয়ে উঠে পড়েন উনি : কে? কে ওখানে?

লোকটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। সাড়া দিল না। এবার টর্চটা জ্বাললেন। তৎক্ষণাৎ পাল্লার আড়ালে সরে গেল। পালাল না কিন্তু। এগিয়ে এলেন হাজী-সাহেব। বেরিয়ে এলেন বাইরে। আমিনা দূরন্ত কৌতূহলে তাকিয়ে রইল—এগিয়ে এল না।

লোকটা বলল, টর্চটা নিবিয়ে দিন। চাঁদের আলো তো আছে।

-কে তুমি? কী নাম? কি চাও?

হাতের টর্চটা নিবিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু তার আগেই দেখে নিয়েছেন ছেলেটাকে। বছর সতের-আঠার বয়স। পরনে কালো রঙের একটা চোঙা প্যান্ট, ঊর্ধ্বাঙ্গে হাফশার্ট। দাড়ি-গোঁফ কামায় না—গজায়ওনি বেশি।

ছেলেটা বললে, নাম বললে তো চিনতে পারবেন না, হাজী-সাহেব। আমি এ গাঁয়ে থাকিই না। তা হোক, পিতৃদত্ত নামটা না জানলেও পার্টিদত্ত নামটা হয়তো অচেনা নয় আপনার কাছে। আমার নাম : মিকি-মাউস!

মহীউদ্দীন চিনলেন। কিন্তু এই রাষ্ট্রবিপ্লবের রাতে সব রকম সম্ভাবনাই বাজিয়ে দেখতে হয়। তাই বললেন, মিকি-মাউস? তোমার কি আসার কথা ছিল আমার কাছে এখন?

—না। রাত তিনটে দশে আমার আসার কথা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি অতি দ্রুত বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে। আপনি তৈরি হয়ে নিন। দশ মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরে আসব। আপনাকে পৌঁছে দেব।

—কোথায়? কেন?

—কেন তা আপনি জানেন। কোথায় তা আমি জানি, আপনাকে জানাতে পাববো না। আমাদের ক্যাম্পে—

—'ক্যাম্পে' মানে?

—মুক্তিবাহিনীর টেম্পরারি ক্যাম্পে। দূরত্ব মাইল আষ্টেক।

—তুমি কার অর্ডার মোতাবেক কাজ করছ?

—ওস্তাদের, মানে ঐ যাকে আপনারা বলেন 'ছয়তানের ছাওয়াল'। তার মটোর-সাইকেলটা এখন আমার জিম্বায়।

—কিন্তু সে নিজে কোথায়?

—বেগম-সাহেবা বলেননি? তাকে তো এখান থেকেই অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল ওরা—আধঘণ্টাখানেক আগে! তখন আপনি বাড়ি ছিলেন না। কিন্তু এখনি ওরা আবার আসবে। আপনার খোঁজে। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসি...

বাধা দিয়ে হাজী-সাহেব বলেন, কিন্তু আমার স্ত্রীকে অরক্ষিত রেখে...

এবার ছেলেটিই বাধা দিয়ে বলে, না! আমরা তাঁর দেখভাল করব। আর ওস্তাদ বলে গেছে, ফ্যালনা এসে থাকবে তাঁর কাছে। আপনি তৈরি হয়ে নিন। এখন দশটা পাঁচ। রাত দশটা পনেরয় আমি আসব। ডাকাডাকি করব না কিন্তু...

—শোন! আর একটা কথা—

ছেলেটা শুনল না। অন্ধকাবের মধ্যেই মিলিয়ে গেল গাছের আড়ালে। টহলদার দুটো সেপাই রাস্তা দিয়ে কোথায় চলেছে। তাদের হাতে স্টেনগান।

হাজী-সাহেব ফিরে এলেন ঘরের ভিতর। রুদ্ধ করে দিলেন কবাট। দাঁড়ালেন আমিনার মুখোমুখি। বললেন, ওর কথা শুনেছ?

আমিনা জবাব দিল না। গ্রীবাসঞ্চালনে জানাল, শুনেছে।

—কিন্তু তুমি তো বলনি, হাসানকে ওরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে এখান থেকে?

—না, বলিনি। কথাটা ও গোপন করতে বলেছিল তোমার কাছ থেকে।

হাজী-সাহেব ওর চোখে-চোখে তাকিয়ে বলেন, আর কোন কোন কথা তোমার স্বামীর কাছ থেকে সারাজীবন ধরে গোপন রাখতে বলেছিল তোমার হাসানভাই?

আমিনা তার আশ্চর্য চোখ-জোড়া মেলে তাকায়। এবার তা অতলান্তিক রহস্যময় নয়—মরণাহতা হরিণীর চোখ।

সামলে নিয়ে বললে, তোমার সময় কম। দশ মিনিটের মধ্যে ছেলেটা ফিরে আসবে। তুমি তৈরি হয়ে নাও।

—আমি ওর সঙ্গে যাব না, আমিনা। পালিয়ে যেতে শিখিনি আমি। আমি বরং এখন একবার মেজর জব্বরের কাছে যাব। সে যদি মতিগঞ্জের মানুষের সহযোগিতা চায়, পাকিস্তানকে অটুট রাখতে চায়, তাহলে এখানে তাকে অত্যাচার করতে দেব না। হাসানকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করব। সহযোগিতার বিনিময়ে।

আমিনা বসে পড়ে ওঁর পায়ের কাছে। বলে, না, না, না! পরিচয় দিলেই ওরা তোমাকেও অ্যারেস্ট করবে! তোমরা দুজনেই মরবে তাহলে—

—কিন্তু তুমি তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আমিনা...

—হ্যাঁ দিয়েছিলাম। আমার চেষ্টার তো ত্রুটি নেই! আমি কথা দিয়েছিলাম—কথাটা তোমার কাছে গোপন রাখব, তোমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করব, আর হাসান ভাইয়ের মৃত্যুতে কাঁদব না।

—হাসানের মৃত্যুর কথা উঠছে কেন? আমি তো যাচ্ছি তাকে ছাড়িয়ে আনতে—

একটা নির্বেদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল আমিনা। বললে, যাও! এ তোমার নিয়তি। এ আমাদের নিয়তি। সে তোমাকে বাঁচাতে পারল না!

হাজী-সাহেব হেসে ওঠেন, আমাকে বাঁচানোর কথা আর এখন ভাবছে না তোমার হাসানভাই। সে এখন নিজের জানটা কী করে বাঁচবে...

হঠাৎ চাপা আর্তনাদ করে ওঠে আমিনা, চুপ কর...না হলে এখন থেকে তোমাকেই ঘৃণা করতে শুরু করব!

এবার আর চমকে উঠলেন না উনি। আপনমনেই বলে চলেন, মিলিটারি ব্যারাকে যেতে হবে মতিগঞ্জের মৌলভীর বেশে। পাকিস্তান পবিত্র ইসলামের মন্ত্রে দীক্ষিত। মসজিদের বড়-ইমামের আলখাল্লাটাই আমার ছাড়পত্র, কারণ...

কথাটা শেষ হলো না ওঁর। চারিদিকে চোখ মেলে খুঁজলেন। আলখাল্লাটা দেখতে পেলেন না। এমন কি তস্‌বি-ছড়াও বেপাত্তা। পড়ে আছে হাসানের কোট, আলোয়ান, আর তার তলায়—কী আশ্চর্য! ওর মারণাস্ত্রটা।

আমিনার দিকে ফিরে বললেন, এর মানে কী?

আমিনা নীরব। মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি।

—ও কি ভুল করে আমার আলখাল্লাটাই গায়ে চাপিয়ে গেল নাকি?

আমিনা বুঝতে পারে, এর পর আর গোপন করার অর্থ হয় না। বোধকরি এখন সময় হয়েছে ওঁকে বুঝিয়ে বলার যে, ওয়ালি জব্বর আজ মহীউদ্দীন হাজীকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে, হাসান আলীকে নয়। তাহলেই হয়তো উনি রাজি হবেন আত্মগোপন করতে। তাই বললে, না, ভুলটা হাসান করেনি। করেছে সেই হাবিলদারটা। খালি গায়ে হাসানকে আমার মুখোমুখি বসে থাকতে দেখে ওরা ভেবেছিল হাসানই আমার খসম্‌।

মৌলানা স্তম্ভিত। গম্ভীরভাবে বলেন, তাহলে তুমি তাদের ভুলটা ভেঙে দিলে না কেন?

—সুযোগ পেলাম কোথায়? পাগলটা তোমার আলখাল্লাটা গায়ে চাপাল, কোটের নিচে রিভলভারটা লুকিয়ে রেখে তস্‌বি-ছড়া তুলে নিল। আর তারপর হাসতে হাসতে মরতে চলে গেল! পাছে হাবিলদারটা সন্দেহ করে, আমি তাই...তাই, হ্যাঁ, আমি হাসানকে বুকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠেছিলাম।

মৌলানা বজ্রাহত। মুখটা রক্তাভ। বোধকরি তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করতে তাঁর নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে ওঠে, সমস্ত দেহের মাংসপেশী কঠিন হয়ে ওঠে। যেন ধর্মভীরু লোকটার অন্তরে একটা চৌম্বকশক্তি তখন দিক্‌পরিবর্তন করছে। আমিনার তা নজরে পড়েনি। সে আপনমনেই বলে চলে, এখন তুমি তোমার ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে ঘৃণা করতে পার! বিশ্বাস কর—সেই খণ্ডমুহূর্তে আমি একটুও অভিনয় করিনি! ওর বুকে মাথা রেখে আমি তখন ওকে ঘৃণা করতে ভুলে গেছিলাম...

একটা অস্ফুট গর্জন শুনে আমিনা চমকে ওঠে— শালে হারামিকা বাচ্চে।

এ কী ভাষা! মৌলানা-সাহেব এ কী ভাষায় কথা বলছেন? এপাশে ফিরে দেখে মৌলনা তখন হাসানের ফেলে-যাওয়া রিভলভারটা মাজায় বাঁধছেন। প্রাণের মায়া একেই বলে—ভাবে আমিনা। বলে, তুমি কি ঐ ছেলেটার সঙ্গে তাহলে পালিয়ে যাচ্ছ?

আগুনঝরা চোখ তুলে হাজী-সাহেব বলেন, না তো কী? তুই কি ভেবেছিলি এখন আমি খান-হারামজাদদের ব্যারাকে যাব হাসান-শালার প্রাণ-ভিক্ষা চাইতে?

এবার স্তম্ভিত হবার পালা আমিনার। সে যা চাইছিল তাই হচ্ছে—মৌলানা এতক্ষণে পালিয়ে যেতেই স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য! যে লোকটা তাঁর প্রাণ দিল—তাঁর বদলে হাসতে হাসতে মরতে গেল, তার প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতাও নেই! আর কী ভাষা! হাসান-শালা! তুই-তোকারি!

পরদিন ভোরবেলা। স্বাভাবিক সময়ে এই সূর্যোদয়-মুহূর্তে মতিগঞ্জ কলমুখর হয়ে ওঠে। গাঁয়ের মানুষ বিছানা নেয় সূয্যি ডুবলেই—আলো থাকতে থাকতেই নৈশাহার সেরে নেয়—মানে যাদের দুবেলা আহার জোটে। কেরোসিন কোথা যে, টেমি জ্বালবে? তাই ওঠেও খুব ভোরে। গাছ-গাছালিতে পাখ-পাখালির সাড়া জাগারও আগে। ক্ষেত-খামারে নেমে পড়ে উদার-গা নেংটি-সারের দল। তৈলতৃষিত চাকায় আর্তনাদ তুলে গো-গাড়ির সারি বিনিয়ে-বিনিয়ে চলতে শুরু করে। তার উপর আজ আবার হাটবার। আজ কিন্তু মতিগঞ্জের ঘুম ভাঙেনি। অর্গলবদ্ধ গৃহে গোটা গ্রাম রুদ্ধনিশ্বাসে প্রহর গুণছে। হাট আদৌ বসবে কিনা সন্দেহ।

কর্মচঞ্চলতা শুধু বাঘাডাঙায়। খান-সেনাদের অস্থায়ী ছাউনিতে।

মেজর জব্বরের গোছল সারা। ছোট-হাজারির সামনে বসেছেন একটা ফোল্ডিং স্টীল টেবিলে। জব্বর-সাহেবের মেজাজ আজ শরীফ নয়। হতেই পারে। ভুলটা বুঝতে পেরেছেন এতক্ষণে—আহ্‌মেদনগরে যে লোকটাকে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝোলানো হল সে একটা বেহেড মাতাল—তিনকুলে তার কেউ নেই যে কাঁদবে। লোকটা মদের ঝোঁকে খিস্তি-খেউর করেছিল মাত্র। আহ্‌মেদনগরে যে লোকটা মুক্তিবাহিনীর মস্তিষ্ক—আশি বছরের বুড়ো আখ্‌তারুজ্জমান এক্রাম খাঁ—সে লোকটা সরে পড়েছে। মুক্তিবাহিনীর সেই বিচ্ছু ছোঁড়াগুলোও বেপাত্তা। অত্যাচারের কসুর হয়নি—কিন্তু গাঁয়ের কেউ তাদের পাত্তা বাৎলাতে পারেনি। জব্বর-সাহেব এখনো সমঝে উঠতে পারছেন না—গেঁয়ো ভূতগুলো মিছে কথা বলছে, নাকি সত্যিই জানে না—ঐ ভীমরুলের দল কোন গোপন আস্তানায় তাদের নতুন চাক বেঁধেছে। তবে আশঙ্কার কিছু নেই—ঐ বিদ্রোহী ছেলেগুলো নিতান্ত চাষাভুষো! লড়াই-কাজিয়া ওরা বাপের জন্মে দেখেনি। বন্দুক চালানো তো দূরের কথা। পায়ে পা মিলিয়ে লেফ্‌ট-রাইট্ পর্যন্ত শেখেনি। হ্যান্ড-গ্রেনেড চেনে না, চেনে হেঁসো; স্টেনগানের নাম শোনেনি, সড়কি-বল্লম ওদের হাতিয়ার। ওদের রণহুঙ্কার—হ্যাট-হ্যাট-উররর্-খ্যাদা-খ্যাদা—জানে, এক হাঁটু কাদায় লাঙল চালাতে। ওদের শায়েস্তা করা কিছুই নয়, কিন্তু ইতিমধ্যে পশ্চিম দিক থেকে পিল্‌পিল্ করে আসতে শুরু করেছে প্রতিবেশী রাজ্যের স্যাঙাৎরা। সাজে-পোশাকে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না—কিন্তু তারা সমরশিক্ষাপ্রাপ্ত। সেটা কোনো কথা নয়, মিলিটারি ট্রেনিং ওঁর সৈন্যদলও পেয়েছে, মুশকিল কি বাৎ এই যে, তাঁর হেড-কোয়ার্টার্স, তাঁর আর্সেনেল ঐ বিশালায়তন প্রতিবেশী রাজ্যটি পেরিয়ে। সময়ে সমরোপকরণ না এসে পৌছালে এই শত্রুরাজ্যে তিনি নিতান্ত অসহায়!

মেজর জব্বরের গোপন খবর, পাঁচ-ছয়টি রণতরী ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পূর্ব-বাঙলায় এসে পৌঁচেছে। কনভয়ের প্রধান জাহাজ এস. ইউ. এঞ্জিনিয়ার্স এল. সি. তিন-এর ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ্‌কে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। ধলেশ্বরী নদীর পারে, সিরাজকান্দি ঘাট পর্যন্ত জাহাজগুলি পৌঁচেছে এ খবর পেয়েছেন। আর তার পরেই ওঁর রিসিভিং সেটটা গড়বড় শুরু করেছে। বেতারবার্তা ধরতে পারছেন না। ইউনিটের ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়াররা আজ দুদিন দিবারাত্র পরিশ্রম করেও যন্ত্রটা ঠিক

করে উঠতে পারেনি। মেজর জব্বরের দায়িত্ব ঐ অস্ত্রশস্ত্র জাহাজ থেকে খালাস করে নিরাপদে বিভিন্ন ইউনিটে বিতরণ করা। না, বিতরণ করার দায়িত্ব তাঁর নয়। আহ্‌মেদনগর পৌঁছানোর পূর্বেই তিনি আদেশ পেয়েছিলেন—এই গুরুদায়িত্বের ভার নিয়ে মতিগঞ্জে এসে ওঁর প্লেটুনের সঙ্গে মিলিত হবেন একজন উচ্চপর্যায়ের মিলিটারি অফিসার : ব্রিগেডিয়ার হোসেন কুদ্‌রৎ!

ব্রিগেডিয়ার কুদ্‌রৎকে উনি ইতিপূর্বে কখনো দেখেননি। নাম শুনেছেন। তিনি এতদিন ছিলেন পি এম. আর এফ-এ। অর্থাৎ পাকিস্তান মিলিটারি রিজার্ভ ফোর্স-এ। লড়াই-কাজিয়া তো সবসময় থাকে না। তাই উপর-মহলের অফিসারদের বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেওয়া হয় না। তাঁরা রিজার্ভ ফোর্সে নাম লিখিয়ে যে-যার বৃত্তিতে গ্রাসাচ্ছাদন করেন, নামমাত্র মিলিটারি অ্যালাউন্স পান। লড়াই-কাজিয়া বাধলে—আর তা অনিবার্যভাবেই বাধে ঐ প্রতিবেশী রাজ্যের উৎলে-ওঠা মহব্বতে—তখন তাঁদের ডাক পড়ে। বিজ্ঞানী তাঁর ল্যাবরেটারি ছেড়ে, ডাক্তার তাঁর স্টেথিসকোপ ফেলে এসে সামিল হন মিলিটারি ছাউনীতে। আবার সন্ধি হয়ে গেলে ফিরে যান যে বার কর্মক্ষেত্রে। ঐ ব্রিগেডিয়ার কুদ্‌রৎও তেমনি ছিলেন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে। পণ্ডিত মানুষ তিনি। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শ্রেণীতে দর্শন পড়ান। এখন তিনি সামরিক অফিসার। উনি এসে গেলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে জব্বর। সম্ভবত আজ সকালেই এসে পড়বেন তিনি।

খিদ্‌মৎগার কফির পটটা নামিয়ে রেখে সবিনয়ে বললে, স্যার, এক ঔরৎ আয়া হ্যয় আপ-সে মিলনে কো লিয়ে!

—ঔরৎ! কৌন সি ঔরৎ?

খিদ্‌মৎগারকে জবাব দিতে হল না। একটি বোরখাপরা রমণী এগিয়ে এসে সালাম করল ওঁকে। খিদ্‌মৎগার উর্দুতে বললে, গতকাল যাঁকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে ইনি সেই বন্দী মৌলানা মহীউদ্দীনের জরু।

—ও! তা কী চান উনি?

আমিনা জবাব দেবে কিনা স্থির করে ওঠার আগেই খিদ্‌মৎগারটি পেশ করে তার উদ্দেশ্য, বন্দীর সঙ্গে মুলাকাৎ, জনাব।

—না, না, এখন মুলাকাৎ-টুলাকাৎ হবে না। ওঁকে বেলা বারোটার পর আসতে বল। কোর্ট-মার্শালের পরে, অপরাধীর সঙ্গে তখন তাঁর দেখা হবে।

আমিনা আর দ্বিধা করল না। মুখের উপর যে নেটের জালটা ছিল সেটা সরিয়ে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বললে, এক্সকিউজ মি, মেজর জব্বর, কোর্ট-মার্শালের আগে ওঁকে অপরাধী বলাটা কি ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ? এখনো সে আসামী, অপরাধী নয়! এমন কি মিলিটারি মার্শাল ল অনুসারেও। তাই নয়?

বঙ্কিম পড়া নেই, কিন্তু ওটা নিত্যসত্য,—সর্বদেশে সর্বকালে : 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'।

যেন প্রতিবর্তী-প্রেরণায় উঠে দাঁড়ায় মেজর জব্বর। ইংরেজিতেই বলে, আমার বাহিনীতে নারীসৈনিক নেই। আপনার বোরখার আড়ালে কোনো আস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা...

আমিনা অসঙ্কোচে তার বোরখার নির্মোক ছেড়ে বেরিয়ে আসে। দু-হাত মাথার উপরে তুলে বললে, আপনি তল্লাসী করে দেখতে পারেন। আমার স্বামী এ অঞ্চলের বড়-ইমাম। আপনিও মুসলমান—আসুন, দেখুন।

মেজর জব্বর নিমন্ত্রণ পেয়েও তল্লাসী করতে এগিয়ে আসে না। খিদ্‌মৎগারকে বলে, ক্যাপ্টেন ইউসুফকে বল, এঁকে বন্দীর কাছে নিয়ে যেতে। লেকিন হোঁশিয়ার, কোনও মাঙ্কি বিজনেস্ যেন না হয়...

আমিনাকে নিয়ে লোকটা বন্দী-শিবিরের দিকে চলতে শুরু করে। জব্বর পিছন থেকে তার গমনভঙ্গিমা লক্ষ্য করতে থাকে। আশ্চর্য! পিছন থেকে ওকে ঠিক ফতিমার মতো লাগছে!

ফতিমা আছে ঐ বিরাট প্রতিবেশী রাজ্যের পশ্চিমে—রাওয়ালপিণ্ডিতে। এক মাস তাকে কাছে

পায়নি জব্বর।

ক্যাপ্টেন ইউসুফ বেগম-সাহেবাকে হস্তান্তরিত করল আমাদের পূর্বদৃষ্ট হাবিলদারের জিম্মায়। আদেশ করল বন্দীর কাছে নিয়ে যেতে। যথারীতি সাবধানবাণী শুনিয়ে দিল, লেকিন হোঁশিয়ার...

হাবিলদার কী-জানি-কেন—আদাব জানাল আমিনাকে। খোদায় মালুম, তার হেতু ওর বড়া-ইমামের ধর্মপত্নীত্ব নাকি এ আদাব শুধু সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রাপ্য। বললে, আসুন আমার সঙ্গে—

—জেলখানাটা কোথায়?

—এ ক্যাম্পে আবার জেলখানা কোথায় পাব বেগম-সাহেবা? আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন। উনি আছেন ঐ সামনের তাঁবুতে। আমি ডেকে আনছি। ওঁর বোধহয় এখনো ঘুম ভাঙেনি।

অবাক হল আমিনা। লোকটা ঘুমাচ্ছে কেমন করে? হয়তো এটাই ওর জীবনের শেষ সূর্যোদয়। সেই মর্মে প্রশ্ন করতেই হাবিলদার-ভাই বুঝিয়ে দিল। জানাল যে, সারা রাত্তির রামি খেলে মৌলান-সা'ব এই শেষ-রাত্রে শুয়েছেন।

—রামি খেলে? মানে?

—ঐ তাসের জুয়া আর কি! আমাদের প্লেটুনে আছেন মৌলভী কামালুদ্দীন সা'ব। সুফী পণ্ডিত। কাল রাত্রে তিনি আপনার স্বামীর সঙ্গে ধর্মবিষয়ে কিছু আলোচনা করতে এসেছিলেন। ফল কী হল জানেন? মৌলভী কামালুদ্দীন সাহেবের বাইশ টাকা গাঁট-গচ্ছা গেল। ওঁরা তামাম রাত 'রামি' খেলেছিলেন। কিন্তু একথাও বলব, আপনার স্বামী একজন শরীফ আদমী। বললেন, 'এখন আর এ টাকা নিয়ে আমি কী করব?' সে-টাকা আমাদের মধ্যেই বিলিয়ে দিলেন। ইমানদার আদমী, বিলকুল শরীফ!

আমিনাকে অর্জুন গাছতলায় দাঁড় করিয়ে সে ঘুম থেকে তুলে আনতে গেল বন্দীকে। আমিনা ভেবে পায় না, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী-করে একটা মানুষ জুয়া খেলতে পারে! আর তারপর পড়ে পড়ে ঘুমায়!

কারণ হাসানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটা ও দেখতে পায় না।

সন্ধ্যা রাত্রে হাসান নিজেও বুঝে উঠতে পারেনি—কেন সে এমন বুড়বকিটা করল। এটা তো তার ধাতে নেই! কেন—কেন—কেন? সারাটা জীবন সে শুধু বাজে লোকের সঙ্গে মিশেছে...আর হ্যাঁ, বাজে মেয়ে-মানুষের সঙ্গে। সেই সব বাজে লোকও উত্তেজনার বশে, মহব্বতে মাতোয়ারা হয়ে মাঝে মাঝে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে—এ ওর প্রত্যক্ষ-করা সত্য। কিন্তু হাসান তো ঝোঁকের মাথায় কিছু করেনি। ঠাণ্ডা মাথাতেই শয়তানিটা করেছে। না, কোনও মহৎ কাজ করার অনুপ্রেরণায় নয়। এ দুনিয়ায় হাসান আলীর চেয়ে মৌলানা মহীউদ্দীনের জীবন বেশি মূল্যবান মনে করে নয়। তাহলে কেন সে এভাবে খান-সেনাদের বোকা বানালো?

আমিনার চোখে 'হিরো' সাজার মোহে? —ধু—স্! সেজন্য কি একটা মানুষ জান দিতে পারে?

কিন্তু পদক্ষেপটা করা মাত্র সে বুঝে নিয়েছে—এ সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়। এখন নিজের পরিচয় দিলেও তার নিস্তার নেই। মৃত্যু তার অনিবার্য। যে অপরাধ করেছে—নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে—তার আর ক্ষমা নেই। এখন বাঁচবার চেষ্টা মানে—এক নম্বর, হাজী-সাহেবের জীবন বিপন্ন করা; দু নম্বর, নিজেকে কাপুরুষ প্রমাণিত করা। মরতে যদি হয় মাথা খাড়া রেখে সাচ্চা শয়তানের বাচ্চার মতোই মরা উচিত। ঠিক যেভাবে খিস্তি-খেউড় করতে করতে ওর ছোটচাচা ফাঁসির মঞ্চে জল্লাদটাকে ডেকে বলেছিল, দে, হারামির বাচ্চা! দড়িটা গলায় পরায়ে দে! আসান আলিরেই তাতে মারতে পারবি—কিন্তু গোটা বাংলাদ্যাশে আজ লাখ্ লাখ্ ছয়তানের ছাওয়াল আছে! বুঝছস? —পারবা না, পারবা না. তগোর ইয়াহিয়া খাঁরে কইস্... আমাগো শ্যাষ কর্তি পারবা না।

এই নাকি ছিল ছোটচাচার শেষ রণহুঙ্কার!

তারই মন্ত্রশিষ্য হয়ে হাসান কি এখন আর কিছু করতে পারে? ভাবতে পারে?

ঘটনাচক্রে ঐ সময়েই মৌলানা মহীউদ্দীনের সঙ্গে সুফীধর্মের মর্মকথা বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছিলেন কামালুদ্দীন-সাহেব। 'হাতে-নরক' পেয়েছিল হাসান। ভুলে থাকতে পেরেছিল তার মৃত্যুচিন্তা—বাকি রাতটুকুর জন্য।

একটু পরেই বন্দীকে নিয়ে ফিরে এল হাবিলদার। হাসানের খালি পা, চুল উস্‌কো-খুস্‌কো। সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে। আলখাল্লাটা নগ্ন গায়ে চাপাতে চাপাতে এগিয়ে এসে বলল, একি...বেগম-সাহেবা, আপনি...

তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল সংশোধন করে হিন্দি-ফিল্মের পরিচিত ডায়ালগে ফিরে যায়, আমিনা...পেয়ারী মেরি...দিলকি রানী!

আমিনা প্রথমটা চম্‌কে ওঠে। পরক্ষণেই বুঝতে পারে। নতনেত্রে দাঁড়িয়ে থাকে।

হাসান হাবিলদারের কাঁধে একটা হাত রেখে বললে, কতক্ষণ সময় আমাদের দেবে হাবিলদারভাই? আমি কি ওকে তাঁবুর ভিতর নিয়ে যেতে পারি?

—জী না! আমার চোখের আড়ালে যেতে পারবেন না। তবে বাৎচিৎ অনেকক্ষণ চালাতে পারেন—তাড়াহুড়ার কিছু নেই। কোর্ট মার্শাল বসতে এখনো আধঘণ্টা।

হাসান অবাক মানে, সে কী? কাল ওরা যে বলছিল সকাল ছয়টায়? ছটা তো বেজে গেছে!

—তা গেছে। তবে কী জানেন মৌলানা-সাব, এখানে সময়মতো কোনো কাজই হয় না। জনাব ব্রিগেডিয়ার কুদরৎ-সাব এখনই এসে পৌঁচেছেন। এখন তিনি গোছল করছেন। এর পর দাড়িতে আতর দেবেন, গোঁফে মোম দেবেন। আধঘণ্টার এদিকে নয়।

—ব্রিগেডিয়ার কুদ্‌রৎ? তোমাদের সেনাপতি?

—জী! ব্রিগেডিয়ার হোসেন কুদ্‌রৎ। আড়ালে অনেকে তাঁকে হোঁদল কুৎকুতও বলে থাকে। কিন্তু না, আপনাদের অহেতুক সময় নষ্ট করব না। আদাব।

লোকটা একটু দূরে সরে গিয়ে একটা ধান ক্ষেতের আলের ওপর বসল। রাইফেল হাতে। দৃষ্টিসীমার ভিতরেই। শ্রুতিসীমার ভিতরে কিনা সেটা নির্ভর করবে প্রেমিক-যুগলের কণ্ঠস্বরে।

হাসান বললে, বেগম-সাহেবা, আপনি আবার কেন কষ্ট করে এলেন? কাল আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে চলে আসতে হয়েছিল, তারপর...

আমিনা বাধা দিয়ে বললে, আমার কথা থাক। ওরা কি আপনাকে...আপনাকে...

—হ্যাঁ। ঠিক বেলা বারোটার সময়। ঐ বারোটাই হচ্ছে ওদের রেওয়াজ। আসান-চাচাকেও—

আমিনা ব্যাকুলকণ্ঠে বলে, কিন্তু বিচার তো এখনো হয়নি।

—না হোক। ফাঁসির মঞ্চটা খাটানো হয়ে গেছে। যাক, আপনার স্বামী কি...

আমিনা মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, তিনি আমার স্বামী নন!

হাসান নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, লে হালুয়া! মানে?

—আমি সব কথা তাকে খুলে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। প্রথম দিকে সে খুব তড়পাচ্ছিল! জব্বরের কাছে এসে আপনার জন্যে দরবার করবে। কিন্তু যেই শুনল, জব্বর ওকেই খুঁজছে, ভুল করে আপনাকে গ্রেপ্তার করেছে, অমনি সে ভয়ে পালিয়ে গেল। আপনার সেই কিশোর সঙ্গীটিব ভট্‌ভটিয়ায়! আর...বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না...যাবার সময় সব টাকাকড়ি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আমি রুখে উঠেছিলাম, বলেছিলাম—'সব টাকা নিয়ে যাচ্ছ, আমি হাট করব কী করে?' তাতে কী বলল জানেন? বলল, 'ঘটিবাটি বাঁধা দিয়ে যেমন করে পারিস্ চালিয়ে নিস্!' যাবার সময় আপনার রিভলভারটাও নিয়ে গেছে!

হাসান বললে, বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন! এখানে উনি আমাকে বাঁচাতে এলে আজ মতিগঞ্জে জোড়া-ফাঁসি হত!

আমিনা ওর চোখে চোখ রেখে প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললে, জনাব হাসান আলী!

আল্লার দোহাই, আমাকে সত্য করে বলুন তো, আপনি ওর অবস্থায় পড়লে কী করতেন?

হাসান হাসতে হাসতেই জবাবে বললে, শয়তানের দোহাই, ঠিক উনি যা করেছেন, তাই! রিভলভারটা তুলে নিয়ে রাতারাতি পগার পার!

আমিনা প্রতিবাদ করে, কেন আমাকে অত বোকা ভাবছেন বলুন তো? অতই যদি আপনার প্রাণের মায়া তাহলে এভাবে তাঁর জায়গায় প্রাণ দিতে এলেন কেন?

আঃ আবার সেই প্রশ্নটা। হাসান নতনেত্রে কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর মনস্থির করে বলল, বিশ্বাস করুন, বেগম-সাহেবা! তা আমি এখনো ভেবে পাইনি! কেন অমন অদ্ভুত খেয়ালের ভূতটা হঠাৎ আমার ঘাড়ে চাপল!

—খেয়াল! জীবন-মৃত্যু নিয়ে খেয়াল!

হাসান কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। আমিনা এবার বলে, শুনুন, আপনি আমাকে সাক্ষী মানুন কোর্ট-মার্শালে। ওরা যখন জানতে পারবে, আপনি মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে...হাজার হোক, ওরাও তো সৈনিক! বীরের মর্যাদা ওরা দেবে না?

হাসান তার মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, ওসব নাটক-নভেলে হয়! তাছাড়া যে মুহূর্তে আমি আত্মপরিচয় দেব, সেই মুহূর্তেই আমার বীরত্বের বেলুনটা চুপসে যাবে না?

আমিনা কাতরস্বরে বলে, আশ্চর্য! আপনি কি ভুলে গেছেন যে, ...আপনি নিজেকে হত্যা করতে চলেছেন?

—না, ভুলিনি। ভুলব কেন? তবে সেজন্য আমার কোন অনুশোচনা নেই। আমার তিন কুলে কেউ নেই যে, সেজন্যে কারও চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়াবে।

—কেমন করে জানলেন?

—কে আর আমার আছে বলুন? খেল্‌না? কাল রাত্রে উইল করে আমার সব কিছু—আব্বাজানের সব সম্পত্তি তাকে দিয়ে দিয়েছি। বাকি জীবনে সে যেন না কাঁদে, এটাই শয়তানের কাছে আমার শেষ প্রার্থনা।

আমিনা ইতস্তত করে বললে, আর আমি?

—আপনি? কী আপনি?

—আমার চোখেও কি জল আসবে না?

—পাগল! আপনি আমাকে কী চোখে দেখেন তা কি আমি জানি না?

আমিনা আরও ঘনিয়ে আসে। বলে, কেমন করে আমি সে ভুল ভেঙে দেব হাসান?

হাসান বিব্রত বোধ করে। বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। উপরোধে মানুষ আস্ত ঢেঁকি পর্যন্ত গিলে ফেলে। আর এ তো দু-ফোঁটা সামান্য চোখের পানি। তা না হয় ফেললেনই। আমি বলছিলুম—ওই যাকে কবি বলেছেন, 'বাল বিখারকে টুটি কবরোপ্যে যব কোই মেহেজবীন রোহ্‌তি হ্যাঁয়'—তেমন করে ধূলায় লুটিয়ে তো কেউ কাঁদবে না?

আমিনা আর নিজেকে সামলাতে পারে না। ওর হাতদুটি নিজ করমুষ্টিতে গ্রহণ করে আবেগের সঙ্গে বলে, তাই বা তুমি কেমন করে জানলে, হাসান?

হাসান বিহ্বলের মতো বলে, মানে?

—এখনও 'মানে'? তুমি কি কিছুই বুঝতে পার না? আমি বাঁচতে চাই...তোমাকে নিয়ে আমি নতুন করে বাঁচতে চাই...তুমি...তোমাকে...আর কী ভাবে বলব তোমায়?

এমন একটা রোমাণ্টিক ডায়ালগ শুনে কথাসাহিত্যের কানুনে নায়কের বজ্রাহত হয়ে যাবার কথা। প্রত্যুত্তরে তার এমন কিছু বলার কথা যা প্রত্যাশিত, মিঠে-মিঠে, দিলতোড়! সে বলতে পারত : 'এ-কথা যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, আমিনা'; কিংবা...কিংবা...হাজারটা রোমাণ্টিক ডায়ালগ, যাতে গল্পের নায়িকা অস্তসূর্য-উদ্ভাসিত কমলকলির মতো তার চুম্বনতৃষিত ওষ্ঠাধর মেলে ঘনিয়ে আসতে

পারে। কিন্তু হাসান সে-সব কিছু বলল না। তার বিমূঢ় অধরোষ্ঠ উচ্চারণ করল একটা অভ্যস্ত লব্‌জ লে হালুয়া!

আমিনা শুনতে পায়নি, এটাই রক্ষা। বললে, কী বললে?

হাসান সামলে নেয়। বলে, কিন্তু আমি তো তোমার কথা মনে করে হাজী-সাহেবকে বাঁচাতে যাইনি...কেন এ কাজ হঠাৎ করে বসেছি তা জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি যে-কোন টম-ডিক্‌-হ্যারির জন্য, যে-কোন হাঁদি-পেঁচি-খাঁদির স্বামীর জন্যে আমি ঐ শয়তানিটা করতাম। আমার ছিল একটাই লক্ষ্য—ঐ হারামীর বাচ্চাগুলোর নাকে ঝামা ঘষে দেওয়া।

আমিনা ম্লান হয়ে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। বলে, বুঝেছি! আমারই ভুল! আপনার চোখে হাঁদি-পেঁচি-খাঁদির সঙ্গে আমিনার কোনো ফারাক নেই...

হাসান প্রতিবাদ করতে যায়, কিন্তু তার আগেই হাবিলদার বলে ওঠে, টাইম হয়ে গেছে মৌলান-সাব। জুতা পিহিন লেন। এবার কোর্ট-মার্শালে যেতে হবে।

আমিনা বলে, আমি মেজর জব্বরের কাছে অনুমতি চাইব—বিচার-সভায় উপস্থিত থাকব—আপনি আপত্তি করবেন না যেন—

—তুমি চুপটি করে থাকবে? একটাও কথা বলবে না?

—খোদা কসম!

বাঘাডাঙার মাঠে কোর্ট-মার্শালের বিচারসভার আয়োজন হয়েছে।

এরকম অস্থায়ী ছাউনিতে সেটা এমন কিছু জমকালো ব্যাপার নয়। খান-আষ্টেক ফোল্ডিং চেয়ার, একটা লম্বাটে স্টীল টেব্‌ল। টেবিলের উপর একটা ম্যাপ—এ অঞ্চলের। বিচারকদল এখনো এসে পৌঁছাননি। মেজর জব্বর একখানা চেয়ার দখল করে ম্যাপটা দেখছিল। সিরাজকান্দি বন্দরটা ম্যাপের চৌহদ্দির বাইরে—বস্তুত ধলেশ্বরী নদীটিও ম্যাপের এলাকার বাইরে। তা হোক, তবু কোন পথে অস্ত্রসম্ভার আসবে তা বোঝা যায়।

জব্বর একজন জঙ্গী জওয়ান। স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শেখার সুযোগ হয়নি, কিন্তু সে সুদক্ষ সৈনিক। প্রতিবেশী রাজ্যটির সঙ্গে আগের বারে যে লড়াই-কাজিয়া হয়েছিল তাতে কৃতিত্ব দেখিয়ে মেজর পর্যন্ত হয়েছ। অংরেজি ভাল জানে না, যুদ্ধের কায়দা-কানুন রপ্ত করেছে। জব্বর একটা সিগারেট ধরায়। ঘড়িটা দেখে। সাড়ে ছয়টা! এখনো কারও পাত্তা নেই। নাঃ —নিয়মানুবর্তিতা এরা আর রপ্ত করতে পারল না! ব্রিগেডিয়ার সাব এসে গেছেন, সে খবর পেয়েছে। এখনো মুলাকাৎ হয়নি। আলাপ-পরিচয় নেই, শোনা গেছে শৌখিন এবং পণ্ডিত মানুষ। তিনি কোর্ট-মার্শালে উপস্থিত থাকবেন বটে, তবে বিচারক হিসাবে নন। কারণ কখন তিনি এসে পৌঁছাতে পারবেন তা জানা ছিল না। মেজর জব্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন আরও দুজন অফিসার, কিন্তু মুশকিল-কি-বাৎ, তাঁরা পুস্তভাষী—আসামীর ভাষা বুঝবেন না।

কিন্তু ব্যাপার কী? ছয়টা পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল, কেউ আসছে না কেন?

মেজর জব্বর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, ঠ্যাঙজোড়া তুলে দেয় টেবিলে।

একটু পরেই জ্বলন্ত সিগারেটটা ওষ্ঠচ্যুত হলো। কাল প্রায় সারারাত্রিই জাগতে হয়েছে। চোখজোড়া তাই ঘুমে জড়িয়ে আসছে। তন্দ্রার মধ্যেই মনে হলো কর্ণমূলে কে যেন বলছে, সাব?

ধড়মড়িয়ে জেগে ওঠে। দেখে, হাবিলদারটা ঘনিয়ে এসেছে। তর্জনী সঙ্কেতে কী যেন দেখাচ্ছে।

কাঁধের তারকা-চিহ্নেই ওঁর পরিচয়। মোম দিয়ে পাকানো গোঁফ। ব্রিগেডিয়ার-সাব একটা আগাছা তুলে নিয়ে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে দেখছেন। বোধ করি আগাছাটি এই আর্দ্র-আবহাওয়ার এক দুর্লভ স্পেসিমেন—ব্রিগেডিয়ার-সাহেবের অচেনা।

জব্বর অ্যাটেনশান হল। বুট-জুতোর নালে-নালে শব্দ ওঠে—ক্লিক্‌।

ব্রিগেডিয়ার এতক্ষণে ওকে নজর করেন। এগিয়ে এসে বলেন, মেজর ওয়ালি জব্বর, ইফ আই

মিস্‌টেক নট?

—ইয়েস স্যার! আপ হ্যঁয় ব্রিগেডিয়ার হুসেন কুদ্‌রৎজী। সুক্রিয়া।

সামরিক অভিবাদন বিনিময়াস্তে উভয়ে বসেন। জব্বর বলেন, আপনি এসে পড়েছেন, আমরা খুবই ভরসা পাচ্ছি স্যার। অবশ্য এখানে এসেই আপনাকে একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে—একটা গেঁয়ো মোল্লাকে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝোলানো।

—তা বটে! এত সকালে বীয়ারটা ঠিক জমে না।

উনি পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে ম্যাপের উপর ঝুঁকে পড়েন। জব্বরের নজরে পড়ে—ইতিপূর্বে যখন ঠ্যাঙজোড়া টেবিলে তুলেছিল তখন একটা কাদামাটির চাপড়া টেবিলে পড়েছে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বার করে ময়লাটা সাফা করতে যায়। ব্রিগেডিয়ার বাধা দিয়ে বলেন, থাক, থাক, আমি যে অঞ্চলটা দেখছি সেখানে আপনাব শ্রীবুটের কর্দম নেই।

জব্বর সলজ্জে বলেন, আয়াম সরি স্যার, মানে...

—না, না, লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। বুটের তলায় দেশটাকে দাবিয়ে রাখার মহান ব্রত নিয়েই তো আমরা এসেছি। ভাল কথা, আহ্‌মেদনগরের শেষ সংবাদটা পেয়েছেন?

—ইয়েস স্যার! এইমাত্র নিউজ-বুলেটিনে বলল—ওদিকটা বিলকুল ঠাণ্ডা।

—নিউজ-বুলেটিন মানে? রেডিও নিউজ? আপনার নিজস্ব রেডিও মনিটারিং...

জব্বর কুণ্ঠিতভাবে জানাতে বাধ্য হল যে, তার রিসিভিং সেটটা দুদিন অকেজো হয়ে পড়ে আছে। জানতে চায়, কেন স্যার? আপনি কি কোনও খবর পেয়েছেন?

—তা পেয়েছি। রেড়িও পাকিস্তান অবশ্য অভ্রান্ত—কিন্তু সেসব সিভিলিয়ানদের জন্য। এই নিন, ধরুন।

এক তাড়া মিলিটারি ডেসপ্যাচ তিনি হিপ্‌-পকেট থেকে বার করে বাড়িয়ে ধরেন। শাঙ্করভাষ্যও যোগ করে দেন, কাল রাত দুটোর সময় আহ্‌মেদনগর আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এক হিসাবে পাকিস্তান নিউজ অবশ্য কারেক্ট! ওদিকটা বিলকুল ঠাণ্ডা! বিদ্রোহীরা দখল নিয়েছে। আমাদের পুরো একটা প্লেটুন—না, না, আপনি ঘাবড়াবেন না—তারা এদিকে আসছে না, আপনার র‍্যাশানে ভাগ বসাবে না—তারা আত্মসমর্পণ করেছে।

জব্বর স্বগতোক্তি করে : ঈয়া আল্লাহ্‌!

—আল্লা দূর-অস্ত্‌! হেঁদুরা বলে, তিনি অসিদ্ধ, unboiled—প্রমাণাভাবাৎ! ওর পরের ডেসপ্যাচটা বরং দেখুন। আহ্‌মেদনগরের বিদ্রোহীরা রাতারাতি এক ভুঁইফোড় নেতাকে খাড়া করেছে। দ্যাট ডার্ক হর্স নাকি স্বয়ং শয়তানের সম্বন্ধী! কাল রাতে আহ্‌মেদনগরে তিনিই নাকি আমাদের তুলোধুনা ধুনেছেন। এখন তিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে এদিক পানে আসছেন।

জব্বর অস্ফুট গর্জন করে ওঠে, আসুক! আমরা প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য জান দেব...

ওর কথার মাঝখানেই কুদ্‌রৎ বলে ওঠেন, এক্সকিউজ মি, মেজর জব্বর, সাম মিস্টার জব্বর একজন জব্বর নাট্যকার ছিলেন আপনিই কি তিনি?

জব্বর অবাক হয়। বলে, জী না। আমি তো কখনো নাটক-ফাটক লিখিনি।

—আই সী। কিন্তু আপনি কি এটা ভেবে দেখেছেন যে, আপনার প্লেটুনে বর্তমানে তিন শ' সৈনিক, আর ওরা কয়েক হাজার?

—তাতে কী? ওদের সম্বল তো হেঁসো আর বল্লম। আমাদের জওয়ানদের হাতে স্টেনগান, অটোমেটিক! আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও...

আবার বাধা দিলেন ব্রিগেডিয়ার, আপনি একটা কথা খেয়াল করেননি। আমাদের যে প্লেটুনটা অস্ত্রশস্ত্র সমেত আহ্‌মেদনগরে সারেন্ডার করেছে তাদের হাতে হেঁসো আর বল্লম ছিল না। যাক সে-কথা, আপাতত এ মোল্লাটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া যাক। ব্যবস্থা সব হয়ে আছে তো?

—হ্যাঁ, স্যার। ফাঁসির মঞ্চটাও খাটানো হয়ে গেছে। এখন শুধু কোর্ট-মার্শালের ফর্মালিটিটুকু সেরে ফেলা।

কুদ্‌রৎ এ পাশে ফিরে হাবিলদারকে বললেন, ওহে, কী নাম তোমার? সবাইকে সেলাম দাও।

হাবিলদার অর্ডার শুনে স্যালুট করল। অ্যাবাউট-টার্ন করে তার অধীনস্থ এক সেপাইকে হুকুমান্তরিত করল, আরে এ ভাইয়া...ক্যা নাম তুমহারা? সব কোইকে আনে বোল।৷

দু-তিনজন সেপাই দিগ্‌বিদিকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

জব্বরের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ব্রিগেডিয়ার কুদ্‌রৎ পেশায় অধ্যাপক— বহুভাষী পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে দু-চারটি বুদ্ধিদীপ্ত বাৎচিৎ না হলে তিনি ওকে গাঁওয়ার ভাবতে পারেন। তাই আচমকা বলে ওঠে, মানুষগুলো বেতমিজ, ওয়ার্ণা দেশটা দারুণ! চারিদিকেই সারি সারি তালগাছ, যেন মস্‌জিদের মিনারেট! It's a wonderland ! ক্যা অ্যাফ্‌শোষ কি-বাৎ, এখানে এসেই আপনাকে একটা কোর্ট মার্শাল করতে হচ্ছে।

কুদ্‌রৎ প্রতিবাদ করলেন না। ওকে বুঝিয়ে দিলেন না যে, গাছগুলো তাল নয়, নারিকেল। পকেট থেকে টোব্যাকো-পাউচ আর পাইপ বার করতে করতে বরং বললেন, এটাই ওয়ান্ডারল্যান্ডের রেওয়াজ, মেজর! এর আগেও আমি একটা wonderland-এ গেছিলাম, লুই ক্যারলের সঙ্গে। সেখানে পৌঁছেই এক বিচারসভায় হাজির হতে হয়েছিল। সময় থাকলে কিস্‌সাটা আপনাকে শুনিয়ে দিতাম। But, it's a long 'tail' !

জব্বর ওঁকে খুশি করতে আগ্রহ দেখায়। বন্দী আর বিচারকরা এসে পড়ার আগে উনি যদি সংক্ষেপে সেই জবর কিস্‌সাটা মেহেরবানি করে শুনিয়ে দেন—

—শুনবেন? শুনুন তবে : "Fury said to a mouse/That he met in the house/Let us both go to law : 'I will prosecute you/Come, I'll take no denial/We must have a trial/For really this morning I've nothing to do'/Said the mouse to the cur/'Such a trial dear Sir! With no jury or judge, would be wasting out breath/I'll be judge, I'll be jury'/Said cunning Old Fuiy/I'll try the whole cause and condemn you to DEATH."

একবর্ণও বুঝতে পারে না। কিন্তু উৎসাহে তার খাম্‌তি নেই। বলে, এক্‌সেলেণ্ট! এটা মনে হচ্ছে শেক্সপীয়ারের 'প্যারাডাইস লস্ট' থেকে! না স্যার?

কুদ্‌রৎ খণ্ড-মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে গর্জন করে ওঠেন : ঈডিয়ট!

জব্বর উঠে দাঁড়ায়! জঙ্গী মানুষটার মুখ রক্তাভ!

কুদ্‌রতের তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে, এটা তাঁর লাহোরের ক্লাস-রুম নয়। বলে, ইয়েস! It's from 'Idiot'! ডট্‌স্কোয়েভস্কির 'ঈডিয়ট' পড়েননি?

জব্বর মনে মনে জিব কাটে। কী যাচ্ছেতাই ভুল বোঝাবুঝি হতে যাচ্ছিল!

ইতিমধ্যে দুই দীর্ঘদেহী অফিসার মার্চ করে এগিয়ে এসে স্যালুট করলেন। মেজর জব্বর তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিল। দুজনেই ওর থার্ড প্লেটুনের অফিসার। ক্যাপ্টেন আজিদ আহমেদ আর ক্যাপ্টেন মহম্মদ ইউসুফ। সামরিক অভিবাদন ও সৌজন্যের বখেড়া মিটিয়ে কুদ্‌রৎ জানতে চান যে, ওঁরা দুজন সওয়াল-জবাবের সময় আসামীর জবাবটা বুঝতে পারবেন কিনা।

মেজর জব্বর বলে, সেটাই মুসকিল-কি-বাৎ। ওঁরা বালুচ রেজিমেণ্টের, পুস্তুভাষী। আসামী উর্দু বা অংরেজি বলতে না পারলে এঁরা কিছুই বুঝবেন না। এই কাফের-কা-জবান ওঁদের নাগলের বাইরে।

ব্রিগেডিয়ার অবাক হয়ে বলেন, কাফের! কাফের আবার কে? ঐ মৌলভীটা!

—জী নেহী! লেকিন জবানটা তো কাফেরদের। আই মীন বাঙলা ভাষাটা।

—আই সী! রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল, বিভূতি বাঁড়ুজ্জে থেকে মুজতবা আলী...আই ফলো। তা

হোক, এঁরা ডেথ-ওয়ারেন্টে সই দিতে পারলেই হল।

বিচারকদল আসন গ্রহণ করার সময় জব্বর সৌজন্যবোধে ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে মাঝের চেয়ারখানি দখল করতে অনুরোধ জানাল। তিনি অস্বীকৃত হলেন। বললেন, তিনি একটি জরুরী মেসেজ-এর প্রতীক্ষায় আছেন। সেটা পেলেই ওঁকে হয়তো উঠে পড়তে হবে। জব্বর বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলে, আপনি উপস্থিত থাকতে...মানে, ইয়ে, সেটা cart before the horse হয়ে যাবে না, স্যার?

ব্রিগেডিয়ার ওকে আশ্বস্ত করলেন, তা যাবে না। ওয়ান্ডারল্যান্ডে ওসব কানুন চলে না।

অগত্যা মধ্যমণি হয়ে জব্বরকেই বসতে হল। হাবিলদারের দিকে ফিরে বলে, আসামীকো বোলাও।

হাবিলদার স্যালুট করে অ্যাবাউট টার্ন করল। অধীনস্থ সেপাইকে হুকুম দিল, আসামীকো পাকাড়কে লাও।

আদেশের অপেক্ষায় অদূরে অপেক্ষা করছিল দু'জন প্রহরী। হুকুম শোনামাত্র তারা হাসানকে হাজির করল। তার উর্ধ্বাঙ্গে আলখাল্লা, হাতে তসবীছড়া, তদুপরি হ্যান্ডকাফ্। তার পিছন পিছনে বোরখাবৃতা আমিনা। ব্রিগেডিয়ার নির্মীলিত নেত্রে কুর্ণকুহরে একটি পাখির পালক প্রবিষ্ট করাতে ব্যস্ত ছিলেন। আচমকা খোঁটা লাগল। চমকে উঠে বলেন, whozzat?

হাবিলদার স্যালুট করে জানায়, প্রিয়নারের ঔরৎ, জনাব!

জব্বর কিছু ফুটনোট দাখিল করে, মানে...ইয়ে...ভদ্রমহিলা আদালতে উপস্থিত থাকার জন্য একটি আর্জি পেশ করেছিলেন। তাই আমি ভাবলাম...

—বটেই তো, বটেই তো! এমন দুর্লভ সৌভাগ্য তো ওঁর দ্বিতীয়বার হবে না।

হাবিলদারকে বলেন, এই শুনছ? ভদ্রমহিলাকে একখানা চেয়ার এনে দাও।

হাবিলদার ফৌজি কায়দায় স্যালুট করে তার অধীনস্থ সেপাইকে তড়পে ওঠে শুন্‌তে হো নেহী বুড়বক ? ঔর এক কুর্সি!

চেয়ার এল। দর্শকের আসনগুলি ফাঁকা। বিচার দেখতে গ্রামবাসীরা কেউই আসেনি। সেখানে চেয়ারটা পাতা হলো। আমিনা ইতস্তত করছে দেখে ব্রিগেডিয়ার বলেন, এসেই যখন পড়েছেন তখন আরাম করে বসে দেখুন। এর তো আর 'রিপিট-শো' হবে না।

মেজর জব্বর সওয়াল শুরু করে : আপকা শুভ-নাম?

হাসান খিঁচিয়ে ওঠে, কেন ধাষ্টামো করছেন মাইরি? নাম না জেনেই কি আমাকে ধরে আনার হুকুম দিয়েছিলেন?

জব্ব বিশুদ্ধ উর্দুতে গর্জন করে ওঠে, আপনি সংযত হয়ে কথা বলুন। কার বিচার হচ্ছে সেটা লিপিবদ্ধ রাখার কানুন আছে।

—সেক্ষেত্রে লিখে রাখুন—বিচার হচ্ছে মতিগঞ্জের ইমাম, মৌলানা মহীউদ্দীন হাজী-সাহেবের।

ব্রিগেডিয়ার সাদা বাঙলায় বলেন, হাজী! আপনি মক্কা-ফেরত ? এই বয়সেই?

হাসান সত্যমিথ্যা এড়িয়ে বলে, আপনি বাঙলা জানেন? পাকিস্তান-বাহিনীতে ?

জব্বর পুনরায় গর্জে ওঠে, ফালতু বাতে বিলকুল না-মঞ্জুর। যা জিজ্ঞাসা করা হবে তার জবাব দেবেন।

ব্রিগেডিয়ার এবার প্রশ্ন করেন, হাজী-সাহেব, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সম্বন্ধে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন সেটা একটু জানতে পারি কি ?

হাসান বললে, সেটাই এই বিচারসভার বিচার্য বিষয়।

জব্বর বলে, ওসব কথা থাক। আমি বলছি, আপনি একজন বিদ্রোহী! অস্বীকার করতে পারেন?

হাসান বললে, আমি বলছি, আমি একজন বাঙালী। অস্বীকার করতে পারেন?

কুদ্‌রৎ বলে ওঠেন, জাস্ট এ মিনিট ! বাঙালী নয়, বলুন পাকিস্তানী। পাকিস্তান-কা-রাহ্‌নেওয়ালা।

হাসান বলে, আপনি নিজে কী? বেলুচ না সিন্ধি ?

—না, আমি লাহোরের বাসিন্দা, আমি পাঞ্জাবী।

—আমি মতিগঞ্জের বাসিন্দা, আমি বাঙালী।

কুদ্‌রৎ পাইপে অগ্নিসংযোগের অবকাশে সংক্ষেপে বলেন, আই সী!

জব্বর গর্জে ওঠে, বাট আই ডোন্ট! এ কথার কোনো অর্থ আমার মাথায় ঢুকছে না।

হাসানের চট-জলদি জবাব, স্বাভাবিক। তার কারণ আপনি এসেছেন দেশটা লুট করতে। অর্থ তো আপনার মাথায় ঢোকে না, ঢোকে পকেটে। মাথায় একটি মাত্র জিনিস ঢুকতে পারে, যদি টিপ করে কেউ ঝাড়তে পারে : সীসের বল।

ব্রিগেডিয়ার আচমকা বিষম খেলেন। জব্বর উত্তেজিত। পুস্তভাষী জনৈক বিচারক জব্বরের দিকে ঝুঁকে জানতে চান, বন্দী কী বলছে। জব্বর ব্যাখ্যা দাখিল করে না। বন্দীকে ধমকে ওঠে, আমি শেষবারের মতো তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, বন্দী...

হাসান মাঝপথেই বলে ওঠে, আপনি ভুলে যাচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার সা'ব যে, আমি মৃত্যুদণ্ড নিতেই এখানে উঠে দাঁড়িয়েছি। ভয় করব কাকে?

জব্বর বলে, মৃত্যুদণ্ড যে হবেই তা ধরে নিচ্ছেন কেন? আর ইয়ে—আমি হচ্ছি মেজর জব্বর, আমি ব্রিগেডিয়ার নই।

হাসান বলে, গোস্তাকি মাফ্ করবেন। মাঝের চেয়ারখানায় বসেছেন তো, তাই আমি ভেবেছি, আপনিই ব্রিগেডিয়ার হোঁদল কুৎকুৎ!

জব্বরের চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়ে। আড়চোখে বড় সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখে। এবার হাবিলদার আচমকা বিষম খায়। কুদ্‌রৎ তখন গাত্রোত্থান করে আসামীর দিকে ফিরে একটা 'বাও' করেন। বলেন আমিই ব্রিগেডিয়ার হোঁদল কুৎকুৎ! তবে সামনা-সামনি লোকে আমাকে ব্রিগেডিয়ার হোসেন কুদ্‌রৎ বলেই ডাকে।

হাসান সশ্রদ্ধ প্রত্যভিবাদন করে।

কুদ্‌রৎ বলেন, আপনার কথা শুনে মৌলভী জাতটার উপরেই আমার শ্রদ্ধাটা বেড়ে যাচ্ছে। আপনি শরিফ আদমী, হাজী-সাহেব। আশা করি আপনি বিশ্বাস করবেন, শেষ পর্যন্ত বিচারে যদি আপনার ফাঁসিই বহাল থাকে তাহলে সেটা হবে নিতান্ত রাজনৈকিত প্রয়োজনে। ব্যক্তিগতভাবে আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কোনও আক্রোশ নেই।

হাসান দাঁতে দাঁতে দিয়ে বলে, তাহলে আর দুঃখ কী!

আমিনা আর নিজেকে সামলাতে পারে না। চীৎকার করে ওঠে, তুমি কি মানুষ?

হাসান বিদ্যুৎগতিতে তার দিকে ফিরে বলে, চুপ! তোমার কথা বলা বারণ!

কুদ্‌রৎ এবার আমিনাকে বললেন, বিশ্বাস করুন বেগম-সাহেবা, আপনার স্বামী আমাদের অনুগৃহীত করছেন। সমস্ত ব্যাপারটাকে উনি একজন স্পোর্টসম্যানের মতো নেওয়ায় এটাকে আর তত কদর্য মনে হচ্ছে না। এই কে আছিস, হাজী-সাহেবকে একটা চেয়ার দে। আর ওঁর হ্যান্ডকাফটা খুলে দে!

হাবিলদার অ্যাবাউট টার্ন করে যথারীতি হাঁকাড় পাড়ে, এই কৌন হ্যয়, হাজী-সা'বকে লিয়ে ঔর এক কুর্সি লগাও। উন্‌কো হ্যাণ্ডকাফ্ খুল দিহ।

চেয়ার এল। আসামী বসল। কুদ্‌রৎ জব্বরকে বললেন বিচার চালিয়ে যেতে।

জব্বর নতুন করে শুরু করে, মৌলানা মহীউদ্দীন, আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, পবিত্র পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে মহামহিম প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রতিটি পাকিস্তানীর কাছে কী বাণী প্রচার করেছেন?

হাসান প্রতিপ্রশ্ন করে, কোনটার কথা বলছেন, বলুন তো? আয়ুব খাঁকে তাড়িয়ে মসনদে বসেই যে বাণীটা তিনি প্রচার করেছিলেন? সেইটা? অর্থাৎ, এবার জঙ্গী শাহীর আবসান, পবিত্র পাকিস্তানে এবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে? জী, হাঁ, জানি বইকি। গণতন্ত্র তো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু ভোটে জেতার

অপরাধে জেলে গেছেন।

জব্বর খিঁচেয়ে ওঠে, আমরা এখানে রাজনীতি আলোচনা করতে আসিনি—

—আমিও তো সে কথাই বলছি. ফাঁসি দিতে এসেছেন, ঝুলিয়ে দিন। আবার এই বিচার-বিচার খেলার ধাষ্টামো কেন?

কুদ্‌রৎ অসহিষ্ণু হয়ে বলেন, আপনি বুঝতে পারছেন না, হাজী-সাহেব। মার্শাল ল! জেনিভা কন্‌ভেনশান! বিচার একটা করতেই হবে। আচ্ছা বুঝিয়ে বলুন তো মৌলানা সা'ব, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপর আপনার এতটা মহব্বৎ কেন?

—লোকটা সোনার বাঙলাকে লুটে পুটে পশ্চিম পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ করছে বলে—

—আহা-হা, সে তো ইংরাজও দু'শ বছর ধরে করেছিল—করেনি?

জব্বর দাঁড়িয়ে ওঠে, এসব কী বলছেন স্যার?

কুদ্‌রৎ ওকে বলেন, অফ দ্য রেকর্ড, অফ দ্য রেকর্ড! এসব আপনাকে প্রসিডিংসে লিখতে হবে না। আমি এদের পলিটিক্যাল ফিলজফিটা একটু সম্‌ঝে নিতে চাই। আপনি বলুন, হাজী-সাহেব?

হাসান বলে, ইংরেজের বুদ্ধি ছিল, ক্ষমতা ছিল। তারা আমাদের ঠকিয়েছে, ঠেঙিয়েছে, তাতে দুঃখ নেই। না-খেতে পাওয়াটা বড় কথা নয়, ব্রিগেডিয়ার সা'ব, ওতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু তাই বলে ইয়াহিয়ার মতো ইয়া ভুঁড়িওয়ালা একটা মাথামোটা হাম্বাগ এই বাঙালী জাতটাকে ঠকিয়ে খাবে? এটা ক কি সহ্য হয়?

জব্বর চিৎকার করে ওঠে, ফাঁসির রায়ই বহাল রইল!

কুদ্‌রৎ বোধহয় সে-কথা শুনতে পেলেন না। বলেন, আই সী। এই অ্যাঙ্গল অফ ভিশনটা আমার খেয়াল হয়নি। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে আরও একটা প্রশ্ন হাজী-সা'ব! আপনারা ভোট দিয়ে যাঁকে গদীতে বসাবেন তিনিই যে শাসনের নামে শোষণ শুরু করে দেবেন না, তার গ্যারান্টি কী? আপনি কি জানেন—এটাই পৃথিবীর ইতিহাস? গদীতে চড়ে বসেই মানুষ বেমালুম বদলে যায়। বাই দ্য ওয়ে, আপনি কি 'ডিস্‌কভারি অফ ইণ্ডিয়া' বইটা পড়েছেন?

হাসান স্বীকার করে, সে পড়েনি। জানতে চায়, সেটা কার লেখা?

—একজন পণ্ডিতের লেখা। তিনি ইতিহাস হাতড়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে বিপ্লবীরা যুগে যুগে গদীতে চড়েই আমূল বদলে গেছে। তারা 'ডাইন্যাস্টিক রুল' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে—চাচা-ফুফা-ভাই-ভাতিজাকে বড় বড় চাকরি দিয়ে কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনিকে গদীতে বসাতে চেয়েছে! পাছে তত্ত্বটা পাঠক সমঝাতে না পারে তাই পরবর্তীকালে তিনি একটা প্র্যাকটিক্যাল ডিমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছিলেন।

হাসান বললে, তা হবে। আমি জানি না। আমি রাজনীতির ধারে-কাছে থাকি না।

জব্বর ফোড়ন কাটে, অর্থাৎ ভাজা মাছের একটা পিঠই আপনার পরিচিত।

কুদ্‌রতের দিকে ফিরে বলে, সাক্ষী কা[illegible]ক তলব করব, স্যার?

কুদ্‌রৎ বলেন, কী দরকার সময় নষ্ট [illegible]রে? উনি নিজেই তো ফাঁসির মঞ্চটার দিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ক্রমাগত অ্যাক্‌সিলেটারে চাপ দিয়ে চলেছেন!

হাসান বলে ওঠে, গাঁয়ের লোক যদি আমার কথা শুনত, তা হলে আপনারা এ তল্লাটে এসে পৌঁছতেই পারতেন না। সব ব্রীজ আমরা উড়িয়ে দিতাম—সব নৌকা দিতাম ডুবিয়ে।

জব্বর উৎফুল্ল হয়ে নিদান হাঁকে, এনাফ্! এনাফ্! তোমার শেষ ইচ্ছা কিছু আছে?

—আছে! আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে দিন। ফাঁসিতে ঝোলাবেন না...

কুদ্‌রৎ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, মাফ্ করবেন হাজী-সা'ব, তাতে একটি গুরুতর অসুবিধা আছে। আমাদের সৈন্যবাহিনীর টিপ্ সম্বন্ধে আপনার বোধহয় কোন ধারণা নেই। সে এক বিশ্রী কেলেঙ্কারি হবে! অধিকাংশ গুলিই যাবে ফস্‌কে, দু-একটা হয়তো আপনার কনুই-এ বা ঠ্যাঙে লাগবে—শেষে

বন্দুকের কুঁদোয় ঠেঙিয়ে...না, না, সে বড় বীভৎস ব্যাপার! প্লীজ মৌলানা-সাহেব, আমার পার্সোনাল রিকোয়েস্ট— আপনি রাজি হয়ে যান! ফাঁসিই? কেমন?

আমিনা চেয়ার ছেড়ে ছুটে এল। টেবিলের প্রান্তটা চেপে ধরে বলে ওঠে, এর নাম বিচার! আপনারা সব্বাই বদ্ধ উন্মাদ!

কুদ্‌রৎ বলেন, বেগম-সাহেবা, প্লীজ! উত্তেজিত হবেন না! আপনার স্বামী একজন রিয়্যাল স্পোর্টসম্যান।

আমিনা গর্জে ওঠে, কে আমার স্বামী? ঐ লোকটা? না! ও আমার স্বামী নয়!

কথাটা সে বলেছে ইংরেজিতে। সভায় একটা গণ্ডগোল! হাসান চীৎকার করে ওঠে, এবার বিচারসভা খতম করুন, ব্রিগেডিয়ার সা'ব! আমার স্ত্রী আর সহ্য করতে পারছেন না! পাগলামি শুরু করেছেন। সব্বাইকে পাগল ভাবছেন! ওঁকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলুন...

কুদ্‌রৎ উঠে দাঁড়ালেন। বলেন, খামোশ! ব্যাপারটা আমাকে সম্‌ঝে নিতে দিন! আপনি কী বলছিলেন বেগম-সাহেবা? উনি আপনার স্বামী নন? নাকি আপনি ওঁর স্ত্রী নন? অর্থাৎ পাত্রটি তৈলাধার নয়, অথবা পাত্রাধারটি তৈল নয়? কোনটা?

আমিনা মরিয়া হয়ে বলে, দুটোই! আই মীন, কোনোটাই নয়। সোজা কথায়, আমার স্বামী মৌলানা মহীউদ্দীন হাজী পলাতক! আমি না হয় পাগল—কিন্তু গাঁ-সুদ্ধু সবাই আমার স্বামীকে চেনে, ঐ ওকেও চেনে! যে কোন লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করুন—

হাসান অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকায়।

ঘটনা নতুন দিকে মোড় নেওয়ায় জব্বর বিচলিত। হাঁক পাড়ে, হাবিলদার!

—হজৌর!

—গাঁয়ের যাকে পাও ধরে নিয়ে এস। জলদি!

হাবিলদার বিদ্যুৎগতিতে অ্যাবাউট টার্ন করে। অধীনস্থ সেপাইকে হুকুমজারী করে, সিপাহী! যো কিসিকো মিলে পাকাড়কে লাও! তুরন্ত্!

কুদ্‌রৎ যোগ করেন, শোন! শুধু দেখ, লোকটা যেন মাতাল-দাঁতাল না হয়!

হাবিলদার তৎক্ষণাৎ শাঙ্করভাষ্য দেয়, শুনিহ্! ওয়ার্না দেখ্ লিহ বহ্ মাতোয়ারা ন হো, ঔর...লেকিন 'দাঁতাল' কৌনসি চিড়িয়া বা?

কুদ্‌রৎ এদিকে ততক্ষণে হাসানকে বলছেন, বসুন মৌলানা সা'ব, আই মীন, যতক্ষণ আপনি ইকোয়েশানের আন্‌নোন 'এক্স', ততক্ষণ ঐ নামেই আপনাকে ডাকা যাক। আফটার অল—নাম কি? 'রূপ'-এর সংজ্ঞা বই তো নয়? ...আপনিও বসুন মিসেস্ অ্যানন্। ওরে কে আছিস, ওঁকে একখানা সিনেমা পত্রিকা-ফত্রিকা দে—

হাসান গর্জে ওঠে : শেম!

কুদ্‌রৎ বলেন, শেম! কাব? আপনি ব্যাপারটা লজিক্যালি চিন্তা করে দেখুন, মিস্টার মহীউদ্দীন অর সামবডি-এল্‌স্! উনি যদি আপনার স্ত্রী না হন, তাহলে ব্যাপারটা আদৌ সিরিয়াস্ নয়, আই মীন, ওঁর তরফে, ওঁর হাইপথেসিস্ অনুসারে। অথচ কনভার্সলি, উনি আপনার স্ত্রী না হওয়া সত্ত্বেও যদি আপনি ওঁর স্বামী হন, আই মীন, আপনার হাইপথেটিক্যাল প্রেমিসেস্ অনুযায়ী, তবে অবশ্য আপনি রাগ করতে পারেন। দার্শনিক বিচারটা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠ্‌ছে। ঐ কাফেররা যাকে বলে, ক্ষুরস্য ধারা—

কথার মাঝখানেই সেপাই একটি চ্যাংড়াকে ধরে এনেছে। বিচারকরা তাকে কেউ চেনেন না। ছেলেটা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

জব্বর যথারীতি জানতে চায়, তোমার নাম?

—মুৎজা!

হাসান ধমক দেয়, মুৎজা নয় রে হতভাগা। বল, মুর্তজা ওসমান আলী।

জব্বর তাকেই ধমক দেয়, আপনি সাক্ষীকে তালিম দেবেন না।

ইতিমধ্যে একটা পোর্টেবল ট্রান্সমিটার রিসিভিং সেট হাতে নিয়ে ব্রিগেডিয়ারের একান্ত-সহচর বিচারমঞ্চের কাছে ঘনিয়ে এসেছে। লোকটার কানে হেড-ফোন তখনো লাগানো। সে একগোছা কাগজ ওঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েই প্রস্থান করেছে। ব্রিগেডিয়ার সদ্যপ্রাপ্ত ডেসপ্যাচগুলি পড়তে পড়তেই তাঁর অ্যাডজুটেন্ট-এর পিছন পিছন কোথায় যেন চলে গেছেন। বোধকরি গার্ড-রুমে। ওদিকে জব্বরের সওয়াল-জবাব অনেকটা এগিয়ে গেছে। সাক্ষী স্বীকার করেছে, মতিগঞ্জের মৌলানা হাজী-সাহেবকে সে ভাল রকমই চেনে। জব্বর জানতে চেয়েছিল, তিনি কি কোর্টে আছেন? মুৎজা তাকে জানিয়েছে, তাঁই আলখাল্লা পরেন, কোট নয়। এরপর জব্বর সরাসরি প্রশ্ন করে, তুমি বন্দীকে চেন? এবার জবাবে সাক্ষী বলেছিল, কী কন? বিন্দিরে চিনি না! রাখহরি চাচার বিটি? দিব্য ডাগর হইছে অখন!

হাসান এই পর্যায়ে আবার ধমকে উঠেছিল, ইডিয়ট! ও আমার কথা জানতে চাইছে!

—জী না! বিন্দির কতা!

জব্বর ওদের বাদানুবাদ থামিয়ে প্রশ্ন করে, এঁকে চেন?

মুৎজার ভয় অনেকটা কেটেছে। সে বুঝতে পেরেছে, সে সাক্ষী মাত্র, আসামী নয়। একগাল হেসে বলে, কী কন? আঁ্যারে চিনি না? আঁইর বড়াবাই! আম্মাজানে কইত কি ছয়তানের ছাওয়াল!

—ও, তোমার বড় ভাই? ও মৌলানা মহীউদ্দীন নয়?

—ধূ-র! তা ক্যান? আলখাল্লা পরছে তাই হাজী-ছাবের পারা লাগতিছে!

এতক্ষণে সমস্যাটার সমাধান হয়েছে। সব বুঝে ফেলেছে জব্বর। সে গর্জন করে ওঠে, এই বেতমিজটাকে কোন মূর্খ গ্রেপ্তার করেছে? হাবিলদার!

হাবিলদার তৎক্ষণাৎ অধীনস্থ সেপাইকে ধমক লাগায়, য়্যে বেতমিজকো কৌনসি বুদ্ধুনে পাকড়া থা? সেপাহী?

সেপাই যথারীতি স্যালুট করে। অ্যাটেনশান অবস্থাতেই তর্জনী তুলে প্রশ্নকর্তাকেই দেখিয়ে দেয়। এতক্ষণে হাবিলদারের সব কথা মনে পড়ে যায়। সওয়া ইঞ্চি পরিমাণ জিহ্বা নির্গত করে। সেটা টেনে নিয়ে জব্বরের দিকে ফিরে বলে, মৌলানা-সাহেবের বাড়ি থেকেই ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, জনাব। লোকটা উদাম-গায়ে ঐ ওঁনার সঙ্গে বসে নির্জনে বসে চা খাচ্ছিল। ওদের যদি সাদি না হয়ে থাকে তবে হওয়া উচিত !

জব্বর গর্জে ওঠে, বাজে কথা একদম বলবে না। লোকটা মৌলানা সাহেবের ডাকে সাড়া দিল?

—জী সরকার! বিদায় নেবার সে কী ঘটা! মেরি পেয়ারী...মেরী দিল-কি-রানী!

জব্বর উঠে দাঁড়ায়। বলে, ঠিক বারোটার সময় তোমার ফাঁসি হবে!

আমিনা প্রতিবাদ করে, তা কেমন করে সম্ভব? বিচার হলো হাজী মহীউদ্দীনের আর ফাঁসি হবে হাসান আলীর? আপনার প্রসিডিংসে দেখুন—

জব্বর গর্জে ওঠে, তুই চুপ যা হারামজাদী! কটা খসম্ তোর?

কোথাও কিছু নেই, চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে পড়ে হাসান। জব্বর এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। হুমড়ি খেয়ে পড়ে টেবিলের উপর। হাসান টেবিলের উপর ওর গর্দানটা ঠেসে ধরেছে। তৎক্ষণাৎ সবাই ছুটে আসে। হাবিলদার দ্রুতগতিতে হাসানের হাতে আবার হ্যান্ডকাফ্টা পরিয়ে দেয়।

জব্বর মুখ তোলে। নাকে কাদা। তারই বুট জুতোর।

ইতিমধ্যে ব্রিগেডিয়ার ফিরে এসেছেন। বলেন, মৌলানা সা'ব, আপনার ব্যবহারে আমি মর্মাহত।

হাসান বললে, আমি তো শান্ত হয়েই ছিলাম এতক্ষণ। ঐ হারামীর বাচ্চা কেন আমার রক্ত চড়িয়ে দিল? মহিলার সম্মান রেখে শালা চলতে জানে না?

ব্রিগেডিয়ার হাত তুলে হাসানকে থামতে বলেন। জব্বরের দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, আপনি এই

ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে কোনও বেফাঁস উক্তি করেছেন?

জব্বর জবাব দেওয়ার আগেই হাত তুলে তাকেও থামতে বলেন। পকেট থেকে একটি সিল্কের সুগন্ধী রুমাল বার করে বললেন, আগে আপনার নাকটা—

জব্বরকে নাকটা মুছতে দিয়ে হাসানের দিকে ফিরে বলেন, মৌলানা সা'ব...

এবার জব্বরই বাধা দেয়। বলে, ও লোকটা মৌলানা মহীউদ্দীন নয়, স্যার! এইমাত্র প্রমাণিত হয়েছে—ও একটা জালিয়াৎ। ওর নাম হাসান আলী।

--Nonsense! হাসান আলীকে তো পরশুদিন আহ্‌মেদনগরে ফাঁসি দেওয়া হলো।

হাসান বলে, জী নেহি। তিনি আসান আলী। আমার চাচা!

কুদ্‌রৎ মর্মাহত, আই সী! আপনার চাচা। আসান আলী, নট হাসান আলী। দেন আই বেগ য়োর পার্ডন, মেজর জব্বর!

এবার হাসানের দিকে ফিরে বলেন, আপনাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা কেমন যেন 'ইয়ে' হয়ে পড়ছে। ওখানে চাচা, এখানে ভাতিজা...তোবা! তোবা! তা সে যাই হোক। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম মিস্টার আলী...আপনি আখ্‌তারুজ্জমান এক্রাম খাঁকে চেনেন?

—ঘনিষ্ঠভাবে। কেন?

—লোকটার কথার দাম আছে? বিশ্বাসযোগ্য?

--বুড়োটা কি আপনার কাছে টাকা ধার করতে চায়?

— না, না, টাকা-কড়ির ব্যাপারই নয়।

—তাহলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। টাকা কড়ির লেনদেন যেখানে নেই, সেখানে এক্রাম চাচার জবানের খেলাপ হবে না।

—থ্যাঙ্ক! বাই দ্য ওয়ে, মেজর জব্বর, ইনি যখন মৌলানা মহিউদ্দীন নন, তখন আর কেন এঁকে কষ্ট করে..

—না! তা হয় না! কোর্ট-মার্শালের রায় বেরিয়ে গেছে। ফাঁসি।

—I see ! "I'll try the whole cause and condemn you to DEATH!" তাহলে আদাব আলী সাব। We meet again before lunch break. By the way, এই মহিলাটি শেষ পর্যন্ত কী সাব্যস্ত হলেন? বেগম হাজী, না বেগম পাজী?

—সেটা আমরা জানি না।

—বোধকরি উনিও না। হেঁদুরা বলে 'আত্মানং ঋদ্ধি'। তাহলে আদাব বেগম অ্যানন!

প্রহরী বন্দীকে নিয়ে প্রস্থান করল। পুস্তুভাষী দু'জন নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর করে ডেথ-ওয়ারেন্টকে পাকা করলেন। বিচারমঞ্চ ফাঁকা হয়ে যাবার পর ব্রিগেডিয়ার আশপাশ দেখে নিয়ে বললেন, ওহে জব্বর-ভায়া! এদিকে শোন তো একবার।

মেজর জব্বর বজ্রহত! কোন সিনিয়র অফিসারকে এ জাতীয় সম্বোধন করতে সে তার সৈনিকজীবনে ইতিপূর্বে কখনো শোনেনি। অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—এই কাগজখানা পড়ে দেখ। এটা একটা চুক্তিপত্র। আহ্‌মেদনগর থেকে ঐ এক্রাম খাঁ লোকটা পাঠিয়েছে। আমাদের সই করে ফেরত দিতে হবে।

জব্বর খুশিয়াল হয়ে ওঠে। স্ট্যান্ড-ইজ হয়। বলে, কিসের চুক্তিপত্র স্যার?

—ওরা আমাদের সঙ্গে টার্মস্ ঠিক করতে একজন অফিসারকে এই মতিগঞ্জে পাঠাতে চায়। ঐ চুক্তিপত্র একটা 'সেফ-কনড্যাক্ট'—অর্থাৎ দূত অবধ্য, তাকে হাতে পেয়েও আমরা গ্রেপ্তার করব না—এইটে মেনে নেওয়া আর কি।

জব্বর নিদারুণ উৎফুল্ল। বলে, আচ্ছা! ওরা সন্ধি করতে লোক পাঠাতে চায় আহ্‌মেদনগর থেকে? এতদিনে সুর নেমেছে?

—নেমেছে, কি উঠেছে সেটা রিলেটিভ টার্ম। তবে দূত হিসাবে যে লোকটা আসছে সেই হচ্ছে গতকাল রাত্রের ধুনরি!

—ধুনরি! তার মানে?

—আহ্‌মেদনগরে যে তোমার ঐ প্লেটুনটাকে তুলোধুনো ধুনেছিল। সে কীসের টার্মস্‌ ঠিক করতে আসছে জান? আমাদের সারেন্ডারের। না, আত্মসমর্পণ করলেও ওরা আমাদের বন্দী করবে না। ছয় ঘণ্টার মধ্যে যাতে আমরা মতিগঞ্জ ছেড়ে চলে যাই তাতে ওরা আমাদের সাহায্য করবে। ওদের আর পি ও. জাব্‌লু. রাখার জায়গা নেই। অবশ্য অস্ত্রশস্ত্র আমাদের কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। সেসব হ্যাপা ওদের।

জব্বর বলে, কত বড় দুঃসাহস!

—এখন আমাদের কী কর্তব্য?

—এক নম্বর, ঐ সেফ-কনড্যাক্টখানা ছিঁড়ে ফেলা। দু'নম্বর, সদলবলে আবার ঐ আহ্‌মেদনগরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। পবিত্র পাকিস্তানের দুর্মদ সেনাবাহিনী দিয়ে আমরা আহ্‌মেদনগরকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেব! পৃথিবীর ইতিহাসে তাজা বুকের রক্ত দিয়ে আমরা লিখে যাব খুনের আখরে এক নতুন অধ্যায়।

কুদ্‌রৎ ওর ডায়ালগটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন, আপনার চেষ্টা করা উচিত ছিল—নাটক লিখলে নাম কবতে পারতেন! আসুন, অ্যাডজুটেন্টের দপ্তরে বসে সেফ-কনড্যাক্টখানা সই করে দেবেন আসুন।

জব্বর পুনবায় অ্যাটেনশান হলো। জলদগম্ভীর স্বরে বললে, ব্রিগেডিয়ার হুসেন কুদ্‌রৎ সা'ব! আপনি সেনাপতি, তবু এক্ষেত্রে আমার জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে, আপনার অর্ডার আমি এবং আমার অধীনস্থ বাহিনী খুশি-মনে মেনে নেবে না। গোটাকতক বাঙালী ভেড়ুয়ার ধমকে পেটের ভিতর লেজ গুটিয়ে পালানো আমাদেব স্বভাব নয়।

ব্রিগেডিয়ার চোখ থেকে চশমাটা খুললেন। রুমাল দিয়ে কাচ দুটো মুছতে মুছতে বললেন, মেজর ওয়ালি জব্বর! আমি আপনার বাহিনীর সেনাপতি নই। আপনার ডিসিশন আপনিই নেবেন। আমি বহিরাগত। এসেছিলাম আপনার অ্যাডভাইসব হিসাবে. .

—এক্সকিউজ মি, স্যার! আপনি কেন এসেছিলেন তা বোধহয় আপনাব স্মরণে নেই। আপনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে— ছয়খানি জাহাজের সমরাস্ত্র বিভিন্ন ডিভিশনে সুসম বণ্টনে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করতে...

—আই নো, স্যার! ফর য়োর ইনফরমেশন মেজর ওয়ালি জব্বর, স্যার : সিরাজকান্দি ঘাট থেকে ধলেশ্বরী নদী বেয়ে সেই ছয়খানি রণতরী আদৌ এখানে আসবে না। তার সমরসম্ভার বিভিন্ন ডিভিশনকে বণ্টন করার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি!

—তা হলে কে সেই কাজটা করবেন, স্যার?

—কেউই নয়। কারণ সেগুলি—আপনার ভাষায় 'গোটাকতক বাঙালী ভেড়ুয়ার আক্রমণে' বেহাত হয়ে গেছে। তিনটি ডুবে গেছে, একটিতে আগুন ধরে গেছে আর বাকি দুটি রণতরীর যাবতীয় সমরোপকরণ ওদের হস্তগত হয়েছে। বর্তমানে আপনার পূর্বদিকে এক্রাম খাঁর বাহিনী, উত্তরে বাঘা সিদ্দিকী, আর পশ্চিমে প্রতিবেশী রাজ্যের স্যাঙাতরা। একমাত্র খোলা আছে দক্ষিণ দিক। ভূগোল বইতে দেখেছি, সেদিকে সোঁদরবন—সেখানে নাকি জলে Gavialis gangeticus আর ডাঙায় Felis tigris!

মেজর জব্বর পুরো সাতচল্লিশ সেকেন্ড নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রথমটা সে বুঝে উঠতে পারেনি ব্যাপারটা। ক্রমশ বুঝল। পরিস্থিতিটা আমূল বদলে গেছে। তাব উত্তর দিকে মুক্তিবাহিনীর নায়ক বাঘা সিদ্দিকী, পশ্চিমে পিল্‌পিল্‌ করে ঢুকছে প্রতিবেশী রাজ্যের স্যাঙাৎরা, পুবদিকে ঐ বুড়ো ভাম—এক্রাম

খাঁ। কিন্তু দক্ষিণে? ঐ দু'জন জেনারেলকে তো জব্বর চেনে না। জানতে চায়, সেই মর্মে। কুদ্‌রৎ এতক্ষণে চশমাজোড়ো নাকে চড়িয়েছেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, দক্ষিণে সোঁদরবন, সেখানে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ!

জব্বর বিহ্বল হয়ে বললে, পালিয়ে যাব! ইতিহাস কী বলবে, স্যার?

—চিরটাকাল যা বলে এসেছে : নির্জলা মিথ্যা! আসুন, চুক্তিপত্রটা শেষ করে ফেলি। Come ! Let's have a strategic retreat—like that of Dunkirk! Be a sport!

ঘণ্টা-চারেক অতিক্রান্ত হয়েছে তারপর।

সূর্য এখন মাথার উপর। বাঘাডাঙার ফাঁকা মাঠ। যেখানে হাট বসার কথা ছিল। ব্যাপারিরা আসেনি। হাটুরেরাও নয়। অন্যান্য হপ্তায় সেখানে সব্‌জির বাজারটা বসে সেখানে খাটানো হয়েছে একটা ফাঁসির মঞ্চ। তার নিচে একটা কাঠের পাটাতন। বাঁশের মই। ফাঁসির দড়িটা উপরে বাঁধা আছে পুবে-হাওয়ায় দোদুল দুলছে। বিচার শুনতে গাঁয়ের মানুষ উপস্থিত হয়নি; কিন্তু ফাঁসি দেখতে অনেকেই এসেছে। মতিগঞ্জের অভিশাপ—ঐ ছয়তানের ছাওয়ালটাকে ঝুলিয়ে দেওয়ার দৃশ্যটা দেখতে! অনেক—অনেক গ্রামবাসীর রুদ্ধ আক্রোশ আজ প্রশমিত হবে। ছোঁড়াটার গুরু-লঘু জ্ঞান ছিল না—যখন যাকে ইচ্ছে খিস্তি-খেউড় করেছে। আজ তার কড়ায় গণ্ডায় শোধ হবে—এ একটি দুর্লভ দৃশ্য! কী জানি হয়তো ওই দলে আছে কিছু অবগুণ্ঠনবতী—যাদের চোখে বোরখার আড়ালে ফুটে উঠবে দু-চারটে অশ্রুমুক্তা। দর্শকদল বসেছে অর্ধচন্দ্রাকারে—মাটিতে। উবু হয়ে, কেউ বা থেবড়ে বসেছে আরাম করে। অদূরে খানদশেক লোহার ফোল্ডিং চেয়ার—ফৌজি অফিসারদের জন্যে। হাবিলদার তার সেপাহীদের সহযোগিতায় ভিড় সামলাচ্ছে। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঠেলে ঠেলে দর্শকদলের কৌতূহলকে পিছে হঠাচ্ছে।

ভিড়ের মধ্যে আমিনাকে দেখতে পেয়ে হাবিলদার খিঁচিয়ে ওঠে, আবার তুমিও এসে জুটেছ। যাও ভাগো!

আমিনা উঠে দাঁড়ায়। বলে, কেন হাবিলদার সাহেব? আমি তো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। আমার কী কসুর হলো? কী ক্ষতি করেছি তোমার?

হাবিলদার ফুঁসে ওঠে, করনি? আমার চাকরিটা যে খতম করতে বসেছিলে বাছা! লোকটা তোমার খসম নয়, অথচ কী ন্যাবস্তানি! আর সে বেটাও কী বজ্জাৎ! মেজর জব্বরের নাকটা থেৎলে দিয়েছিল আরটু হলে! ...তাতে অবশ্য প্লেটুনের সবাই খুশিই হতো...কিন্তু জনাব ইয়াহিয়া খানকে বেটা বলে কিনা...তোওবা তোওবা! যাও, হঠ! তফাৎ যাও!

আমিনা তার বোরখার অবগুণ্ঠন থেকে বার করে আনে একপাটি কানের দুল। হাবিলদারের হাতটা টেনে নিয়ে গুঁজে দেয়। বলে, এটা বরং রাখ...

হাবিলদার মুঠি খুলে দেখে চমকে ওঠে। ইতিউতি তাকিয়ে দেখে। অফিসাররা এখনো আসেনি, কিন্তু গাঁওয়ার মানুষগুলোর অনেকে ওদের লক্ষ্য করছে। হাবিলদার ফিস্‌ফিস্ করে বলে, সোনার তো? গিল্টি করা নয়।

—খোদা কসম!

—কই, ও-পাটি দুল্‌টা দেখি। তাহলেই বুঝতে পারব।

গরজ বড় বালাই। আমিনা দ্বিধা করে না। অন্য পাটি দুলটা খুলে ওকে দেয়। হাবিলদার এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সে দুটো হিপ-পকেটে ঝেড়ে দেয়। গর্জে ওঠে, কী! ঘুষের লোভ দেখানো হচ্ছে আবার! দাঁড়াও! তোমাকে কী শাস্তি দিই, দেখ! তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম। এস...ইদিকে এস! চুপটি করে বসে থাক এইখানে।

হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে একেবারে সামনের সারিতে সুবিধাজনক স্থানে আমিনাকে

বসিয়ে দেয়। একখানা ইট পেতে দিয়ে বলে পালাবার চেষ্টা করলে খুলি উড়িয়ে দেব।

ঠিক তখনি একটা কোলাহল শোনা গেল—ঐ আসছে! এসে গেছে।

অনেকে দাঁড়িয়ে উঠে দেখতে চায়। সেপাইরা জোর করে তাদের বসিয়ে দেয়।

ব্রিগেডিয়ার, জব্বর, দুই পুস্তুভাষী বিচারক এবং আরও কিছু সৈনিক আমগাছের সারি ভেদ করে এগিয়ে আসেন। পিছনে প্রহরীবেষ্টিত মৃত্যু-দণ্ডিত আসামী।

—'টে—নশান!'

প্রহরীদল পজিশন নেয়। অফিসাররা সবাই আসন গ্রহণ করেন। হাবিলদার স্বয়ং এগিয়ে এসে হাসানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তার দু'পাশে দুই রাইফেলধারী।

ব্রিগেডিয়ার ঘড়ি দেখে বললেন, পনের মিনিট সময় আছে। ইয়ে...ফাঁসির আগে কোরান-শরিফ থেকে কিছুটা পড়ে শোনানোর একটা মিলিটারি-হদিশ আছে না?

জব্বর জানায়, হ্যাঁ সেই মতো একটা নির্দেশ আছে। যদি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত আসামী মুসলমান হয়। নচেৎ নয়।

কুদ্‌রৎ বলেন, কিন্তু আমাদের প্লেটুনে তেমন লোক নেই বোধহয়। গাঁয়ের মানুষদের মধ্যে সম্ভবত একটি লোকই সে কাজটা পারত—ঐ বড়া-ইমামটা—কিন্তু সে বেপাত্তা...

জব্বর সবিনয়ে জানায়, তার ব্যবস্থাপনায় এসব ত্রুটি হয় না। ওর প্লেটুনেই আছেন—কামালুদ্দীন চৌধুরী সা'ব—সুফী পণ্ডিত। কোরান-শরিফ তাঁর পিঠুতে সর্বদাই মজুত। আহ্বান মাত্র লেফটানেন্ট কামালুদ্দীন কোরান হাতে অগ্রসর হয়ে আসে। ব্রিগেডিয়ারকে একটি ফৌজি স্যালুট করে অনুমতি ভিক্ষা করে, তাহলে পড়তে শুরু করি স্যার?

হাসান প্রতিবাদ করে, কামালভাই, তুমি এসব ধাষ্টামোর মধ্যে থেকো না। ওসব আমার বরদাস্ত হবে না।

হাসানের সম্বোধনে কুদ্‌রৎ বিস্মিত হন। তিনি জানতেন না—গতরাত্রে ওরা দু'জন 'রামি' খেলে দোস্তি পাতিয়েছে।

জব্বর বলে, ওর কথা শুনবেন না। আপনি পড়ে যান চৌধুরী সা'ব...

কামালুদ্দীন বইটা খুলে পড়তে শুরু করে : "আল্লার রসুল বলেছেন...

হাসান পাদপূরণ করে, "মুসলমান হয়ে যে মুসলমানকে জবাই করে সে হারামী কাফেরের বাচ্ছা!"

স্তম্ভিত কামালুদ্দীন সাহেবের হাত থেকে বইটা পড়ে যায়। তুলে নিয়ে সে তার ধুলো ঝেড়ে চুম্বন করে। ব্রিগেডিয়ার জব্বরকে বলেন, মেজর! ও ব্যাপারটা তো মূল অনুষ্ঠানের পরেও হতে পারে? Just a little adjustment in the programme! বিচারের আগেই যেমন নিতান্ত প্রয়োজনে ফাঁসির মঞ্চটা খাড়া করা গেছিল, just putting the cart before the horse!

জব্বর মেনে নিতে বাধ্য হয়, আপনি সেনাপতি। আপনার ইচ্ছেই হাদিস্‌।

—That's fine! কোরান পাঠ দিয়ে শুরু না করে ঐটা দিয়ে শেষ করা যাবে। তখন আর বাধা দেওয়ার কেউ থাকবে না। মিস্টার হাসান আলী, আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন, এ কাজ আমাদের করতে হচ্ছে..

বাধা দিয়ে হাসান বলে ওঠে, লুক হিয়ার ব্রিগেডিয়ার কুদ্‌রৎ! আমাকে সব কথায় রসিকতা করতে দেখে আপনি হয়তো ভাবছেন মরতে আমার খুব মজা লাগছে, নয়? মরতে আমি চাই না! কেউই চায় না। ওই যারা আমার ফাঁসি দেখতে এসেছে ওরা হয়তো চাইছে এই মজাদার দৃশ্যটা দেখতে...ঠিক কথা, আমি ওদের দলে টানতে পারিনি। আমি সেখানে ব্যর্থ! আমার মৃত্যুতে একটাই সান্ত্বনা—মরার পর আমাকে যতটা বীভৎস দেখাবে তার চেয়ে অনেক-অনেক বেশি বীভৎস দেখাচ্ছে এখন আপনাদের।

কুদ্‌রৎ কী ভেবে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মাথা থেকে টুপিটা খুললেন। বোধকরি ব্রহ্মতালুটা চুলকাবার জন্য।

হাসান আরও বলে, ইয়েস, প্রফেসর কুদ্‌রৎ। আমি জানি, কেন আপনাদের এ কাজটা করতে হচ্ছে। কিন্তু আপনি নিজে কি সেটা জানেন? আপনারা ভয় পেয়েছেন বলে! এই নির্বিরোধী নিরস্ত্র বাঙালী জাতটাকে ভয় পেয়েছেন বলে প্রতিটি গাঁয়ে একটা করে ফাঁসি দিয়ে চলেছেন। আপনি কি জানেন, আহ্‌মেদনগরে আমার চাচা শেষ মুহূর্তে কী বলেছিল? বলেছিল—পারবা না! আমাগো শ্যাষ করতি পারবা না!

আমিনা আর আত্মসম্বরণ করতে পারে না। ছুটে এসে বন্দীকে জড়িয়ে ধবে : হাসান!

—আহ্! একে কে এখানে আসতে দিল? প্লীজ প্রফেসার কুদ্‌রৎ! ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলুন! এখন কি এসব মেলোড্রামা আমার ভাল লাগছে?

কুদ্‌রৎ সাহেব এবার আর আদেশজারী করলেন না। এক পা এগিয়ে এসে আমিনার পিঠে একটা হাত বেখে বললেন, প্লীজ ম্যাডাম! লেট হিম ডাই অ্যাজ আ ডেভিলস্ ডিসাইপ্ল্।

আমিনা আত্মসম্বরণ করে। হাসানকে ছেড়ে দেয়। ধীর পায়ে ফিরে গিয়ে বসে তার নির্দিষ্ট স্থানে। দু-হাতে মুখ ঢাকে।

কুদ্‌রৎ ঘড়ি দেখে বলেন, আর পাঁচ মিনিট!

হাসান অস্থির হয়ে ওঠে, না! আপনার ঘড়ি স্লো যাচ্ছে!

ঠিক তখনি দেখা গেল ধুলোর ঝড় তুলে একটা জীপ বিদ্যুৎগতিতে হাট-তলার দিকে এগিয়ে আসছে। তার দু'দিকে পতাকা পৎপৎ করে উড়ছে। একটি মুক্তি বাহিনীর—একটি সফেদ! জীপে ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন একজন মাত্র মিলিটারি অফিসার। দেহরক্ষী পর্যন্ত সঙ্গে নেই।জীপটা মাঠের প্রান্তে এসে থামল। চালক বসেই রইল আসনে। লাফ দিয়ে নেমে পড়েন অফিসারটি।

তাঁর খাকি পোশাক। মাজায় রিভলভার। ডান হাতে একটা ফাইল। র‍্যাঙ্কে ক্যাপ্টেন। ছোট্টখাট্টো মানুষ। চোখে সান-গ্লাস। চিবুকে নূর।

হাসান হঠাৎ পুকার দিয়ে ওঠে : বল ভাইসব! স্বাধীন বাঙলাদেশ...

জনতা নির্বাক। আগন্তুক দূর থেকে শুধু বলে ওঠেন : জিন্দাবাদ!

পাকিস্তানী খান সেনার দল সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছে।

জব্বর গর্জন করে ওঠে, খর্বদার! সোলজার্স! রেডি উইথ্‌যোর আর্মস্।

সেনাদল এক-দুই-তিন' ভঙ্গিতে রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়ায়!

ততক্ষণে ছোট্টখাট্টো মানুষটি দৌড়াতে দৌড়াতে ফাঁসির মঞ্চের কাছাকাছি এসে গেছেন।

জনতা এতক্ষণে চিনতে পেরেছে তাঁকে : বড়া ইমাম-সাব! মৌলানা মহীউদ্দীন হাজী!

জনতার দিকে ফিরে এবার তিনিই পুকার দেন : বল ভাইসব! স্বাধীন বাঙলাদেশ...

ওদের কী-জানি-কী-হলো! সবাই উঠে দাঁড়ায়। অনেকেই এবার সওয়ালের জবাব দেয় : জিন্দাবাদ!

জব্বর তীক্ষ্ণতর কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে : সোলজার্স! টেক্ এইম!

জনতা স্তব্ধ। কিন্তু উত্তেজিত। কেউই বসে না ফের। সবাই স্তম্ভিত হয়ে দেখতে থাকে তাদের অতি পরিচিত সেই শান্তশিষ্ট ইমাম-সাবকে— তাঁর পরিধানে ব্রিচেস, পিঠে পিঠু, এতক্ষণে হাতে রিভলভার, মাথায় সেই নক্‌সা-করা টুপিটা বেপাত্তা—তার বদলে ফৌজি টোপি!

হাসানই এবার বলে, চুপ করে আছ কেন ভাইসব? জবাব দাও : স্বাধীন...

মৌলানা মহীউদ্দীন ওকে হাত তুলে থামতে বলেন। পাকিস্তানী সেনা নায়কদের দিকে ফিরে বলেন, আমি মতিগঞ্জের বড়া-ইমাম! মৌলানা মহীউদ্দীন হাজী!

জব্বব ব্যঙ্গ-কুর্নিশ করে : সেলাম আলাইকুম! ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন আপনি। বারোটায় আগেই! সোলজার্স! অ্যারেস্ট হিম!

দু'জন সৈনিক মৌলানার দু'পাশে এসে দাঁড়ায়।

জব্বর হুকুমজারী করে : সারেন্ডার য়োর আর্মস্!

হাজী-সাহেব হাতের রিভলভারটা কোমরের খাপে রাখতে যান। জব্বর বলে, ওখানে নয় হাজী-সাহেব, আমার হাতে দাও!

হাজী-সাহেব হেসে বলে, তোমার হাতেই দেব, মেজর জব্বর! তবে ওটা নয়, এইটে!

হাতের ফাইলটা খুলে প্রথম পাতাটি মেলে এগিয়ে ধরে বলে, আমার সেফ-কম্‌ড্যাক্ট স্যার!

কুদ্‌রৎ বলেন, আই সী! আপনিই তাহলে বিদ্রোহী-বাহিনীর অবধ্য দূত!

—জী হুজুর! এই লোকগুলোকে আমার পাশ থেকে সরে যেতে বলুন।

জব্বর বললে, তোমলোক উধার যাও!

হাবিলদার সেটা ফৌজি-কেতায় অনূদিত করে—অ্যাবাউট টার্ন! ফোর স্টেপস ফরোয়ার্ড! লেফ্‌ট্-রাইট, লেফ্‌ট্-রাইট! ক্লাস হল্ট, ওয়ান-টু!

প্রহরীরা অপসারিত হবার পর হাজী-সাহেব বলেন, ঐ স্বাধীন বাঙালী ছেলেটার হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলুন।

জব্বর কথা বলে না, ইঙ্গিত করে। হাবিলদারও নীরবে আদেশ পালন করে।

জনতা দূর থেকে কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল না— কিন্তু এবার তারা প্রত্যক্ষ দেখতে পেল দৃশ্যটা। হোক 'ছয়তানের ছাওয়াল' তবু সে তো মতিগঞ্জেরই একটা দামাল! তারা উল্লাসধ্বনি দিয়ে ওঠে। হাসান মঞ্চ থেকে এক লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বড়া-ইমামকে।

আমিনা এতক্ষণ বসেছিল দু-হাতে মুখ ঢেকে। জীপের শব্দ শুনেই সে উঠে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তী ঘটনাগুলি সে রুদ্ধশ্বাসে প্রত্যক্ষ করেছে। এখন আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ছুটে এসে চেপে ধরল হাজী-সাহেবের বাহুমূল। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলে, তুমি...তুমি তাহলে পালিয়ে যাওনি? লড়তে গেছিলে? হাসানভাইকে বাঁচাবার জন্যে...

হাসানকে ছেড়ে মৌলানা এবার আমিনার দিকে ফেরেন। দেখেন, উত্তেজনায় আমিনা তার রোরখা খুলে বেরিয়ে এসেছে। সে পর্দানসীন, গ্রামের বধূ—কিন্তু এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তে সে বুঝি আবার সেই বমনাছাত্রী-আবাসের কিশোরী হয়ে গেছে। তার দু-চোখে টলটল করছে জমজমের পানি।

হাজী-সাহেবও জনতার উপস্থিতি ভুলে গেলেন খণ্ডমুহূর্তের জন্য. ওর খোঁপায় পর পর তিনটি থাপ্পড় মেরে বলেন, এখন কী মনে হচ্ছে? অ্যাঁ? অ্যাঁ? অ্যাঁ?

আমিনা বসে পড়ে হাঁটু গেড়ে। জড়িয়ে ধরে ওঁর জানু।

হাজী-সাহেব সেই বিদায় মুহূর্তে বলা আমিনার কণ্ঠস্বর নকল করে বলেন, তোমাকে এতদিনে চিনেছি! তুমি মানুষ নও, তুমি...তুমি...

—পয়গম্বর! —হাজী-সাহেবের অসমাপ্ত বাক্যটা অস্ফুটে সম্পূর্ণ করে আমিনা।

ব্রিগেডিয়ার কুদ্‌রৎ এই মর্মস্পর্শী দৃশ্যটি দেখে মুগ্ধ। জব্বরকে বলেন, মেজর-সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি মর্মাহত?

জব্বরও তার নিরুদ্ধ আক্রোশকে বাঙ্ময় করে তোলে : আর ব্রিগেডিয়ার কুদ্‌রৎ-সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি পরাজিত!

কুদ্‌রৎ একটি বাও করেন। হাসিমুখেই বলেন, শুধু তফাৎ এই—আমি তা সত্ত্বেও খুশি! ঐ দামাল ছেলেটা বেঁচে যাওয়ায়। তুমি তা নও!

এবার হাজী-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, লেকিন মাফ কিজিয়ে মৌলনা সা'ব—শুধু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। মানে, ফিলজফিক্যালি স্পিকিং! আপনি তো হাজী মৌলভী। মসজিদের বড়া-ইমাম। আপনার এ কী সাজ?

হাজী-সাহেবের দু'পাশে ওরা দু'জন দাঁড়িয়েছে—হাসান আর আমিনা। তাদের দু'কাঁধে দুটি হাত রেখে প্রৌঢ় মানুষটি বললেন, স্যার! থোড়-বড়ি-খাড়ার জীবনে হঠাৎ ঘনিয়ে আসে চরম মুহূর্ত! অলক্ষ্য থেকে নেপথ্য নাট্যকার পুকার দিয়ে ওঠেন : বেছে নাও তোমার ভূমিকা! তখনই মানুষ চিনতে পারে

নিজেকে ! তার আগেও নয়, পরেও নয়। এই দামাল ছেলেটা ভাবত— ও বুঝি শয়তানের চেলা! কিন্তু ও মূর্খটা জানে না—শয়তান যদি থাকে তবে সেও ঐ আল্লাতালারই সৃষ্টি! তাই আহ্বান যখন এল—তখন ও মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ছুটে এল ফাঁসির মঞ্চে! হতভাগাটা এখনো জানে না—কোথায় ওর এই মৃত্যুঞ্জয়ী সাহসের উৎস...

ব্রিগেডিয়ার বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, না, না, আমি ওর কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিনি। আমি আপনার কথাটা জানতে চাইছি। আপনি কেমন করে...

—আমি? আমি আজীবন ভেবে এসেছি রাজনীতিতে কিছুতেই নিজেকে জড়াব না। ইসলাম ধর্মের প্রচারের জন্যই আমি জীবন উৎসর্গ করেছিলাম। কিন্তু ঠিকমতো ধাক্কা যখন লাগল—স্বচক্ষে দেখলাম—ওই নিরীশ্বরবাদী মানুষটা কীভাবে মৃত্যুভয় জয় করেছে, তখনই আমার আত্মদর্শন হলো। মুহূর্তে বুঝে নিলাম : পরাধীন মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম : আজাদী!

হাসান বলল, হাজী সাব, আই মীন ক্যাপ্টেন মহীউদ্দীন! আমরা তাহলে পোশাকটা কখন পালটাব?

হাজী-সাহেব জব্বরকে দেখিয়ে বললেন, স্বাধীন বাঙলাদেশের এইসব মেহ্‌মানদের সীমান্ত-তক পৌঁছে দেবার আগে যে আমার ছুটি নেই হাসানভাই। তুমি স্বেচ্ছায় আমার আলখাল্লাটা পরেছ, তস্‌বী-ছড়া তুলে নিয়েছ। দায়িত্ব তোমার। তাই আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কাজটা তোমাকেই চালিয়ে যেতে হবে।

—কাজটা?

—আমার অনুপস্থিতিকালে মস্‌জিদে রোজ অজান দেবে কে? দরগায় চিরাগ জ্বালাবে কে? তুমি ছাড়া?

কুদ্‌রতের দিকে ফিরে বললেন, আশা করি আপনারা এতদিনে বুঝেছেন, একটা জাতিকে এভাবে দাবিয়ে রাখা যায় না—তাদের গোলা-বন্দুক না থাকলেও?

কুদ্‌রৎ বললেন, বুঝলাম! স্বর্গ হইতে বিদায়! "Hurled head-long into the vast abyss!"

জব্বরের দিকে ফিরে বলেন, Now Major Beelzebub! That is from 'Paradise Lost' by William Shakespeare!

জব্বর কিছু বলল না।

কুদ্‌রৎ হাজী-সাহেবকে আহ্বান করেন, আসুন, অ্যাডজুটেণ্ট অফিসে বসে ইভ্যাকুয়েশানের ব্যাবস্থাটা পাকা করে ফেলি। না হলে এতগুলি জওয়ান খামোকা আপনার র‍্যাশানে ভাগ বসাবে।

কুদ্‌রতের সঙ্গে সঙ্গে জব্বর মৌলানা এবং অন্যান্য অফিসারেরা মাঠ ছেড়ে ছাউনির দিকে চলতে থাকেন। হাবিলদার শশব্যস্তে এগিয়ে এসে জব্বরকে বললে, স্যার আমাদের কী অর্ডার দিয়ে যাচ্ছেন?

জব্বর ঘুরে দাঁড়ায়। খিঁচিয়ে ওঠে, কিসের অর্ডার? তোমরা...মানে চলে যাও!

—কোথায় যাব স্যার? ব্যারাকে?

জব্বর তার মর্মান্তিক আক্রোশ কিছুটা ঝেড়ে ফেলে, না! জাহান্নমে।

ইতিমধ্যে জনতার অনেকেই গুটিগুটি মাঠ ছেড়ে যেতে শুরু করেছে। হাবিলদার অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে বুঝে নেবার চেষ্টা করল অর্ডারের মর্মার্থ। তারপর তার অধীনস্থ সেপাইদের অর্ডার করল : সোলজার্স! অ্যাটেনশান! লেফট্...রাইট...লেফট! দূর ঘোড়ার আণ্ডা! —এখন তো সবই ডিস্ অর্ডার! ...যাও বদমাস্ লোগ্...ভাগো!

ওর একান্ত-আজ্ঞাবহ সৈনিকটি প্রতিপ্রশ্ন করে, কাঁহা যানা হ্যঁয় জনাব? ব্যারাকপ্যে?

হাবিলদার জব্বরের অনুকরণ করে, নেহী জনাব? জাহান্নমপ্যে!

আমিনা ইতিউতি তাকিয়ে দেখে মাঠ ফাঁকা। সে ঘনিয়ে আসে হাসানের কাছে. তার কলিজা ঘেঁষে দাঁড়ায়। হাসান বলে, কী ব্যাপার?

—শোন, ইয়ে হয়েছে—মানে, ওকে যেন ওসব কথা কিছু বল না!

—কী সব কথা? কাকে বলব না?

আমিনা বিব্রত হয়ে বলে, আহা-হা! বোঝ না যেন?

হাসান উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে। বলে, ও হো হো! এতক্ষণে বুঝেছি। আরে, না, না! পাগল! আমি মৌলভী মানুষ! আমার কাছে হাঁদি-পেঁচি-খাঁদি-আমিনা সব সমান! কাফেররা বলে, 'পরদারেসু মাতৃবৎ!' সবাই আমার আম্মাজান!

তসবী-ছড়া আমিনার মাথায় ঠেকিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে।

কোথাও কিছু নেই ফেল্না ছুটে এসে হাসানকে জড়িয়ে ধরে ফেল্নার পিঠে একটা রাইফেল। তার গায়ে আঁটোসাটো কুর্তা! বলে হাসানভাই!

হাসান চম্‌কে ওঠে, আরে কে ও? খেল্না! তোকে যে আর চেনাই যায় না! কিন্তু তোর এ কী সাজ রে?

ক্যাপ্টেন মহীউদ্দীন হঠাৎ ফিরে এসেছেন। বলেন, আয় খেল্না, তুই আমার সঙ্গে আয়।

হাসান প্রতিবাদ করে, তার মানে? ওকে কি তুমি ঘরের বার করতে চাইছ হাজী-সাহেব?

—উপায় কী? দীক্ষাটা তো তুমিই দিয়েছিলে। খেল্না কি কেউ নিজে সাজে? যে খেলে সেই তো তাকে সাজায়। আপাতত ও পুতুলটা আমার।

খেলনা বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে যায় ক্যাপ্টেন মহীউদ্দীনের সঙ্গে। যাবার আগে বলে যায়, ফির মিলুঙ্গি হাসানভাই! খান-শালাদের দরিয়া পার কইর্‌যা দে আসি।

হাসান বললে, যাও! কিন্তু একী বিশ্রী ভাষা হচ্ছে তোমার দিনকে-দিন!

বাঘাডাঙার মাঠে যারা সমবেত হয়েছিল তাদের কিছু লোক বাড়ি ফেরেনি। তাদের জনা-দশেক ঘনিয়ে আসে। একজন বুড়ো মতন লোক বলে, আপ্‌নে তাইলে আমাগো নতুন মৌলভী হলেন, হাছানভাই?

হাসান নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে। তার গায়ে এখনো সেই আলখাল্লা। তার ডান হাতে এখনো সেই তস্‌বী-ছড়া। বললে, পাকেচক্রে তাই তো হয়ে পড়লাম মনে হচ্ছে রহমান-চাচা।

—এখন আমরায় কী করুম?

—সবাইকে ডেকে নিয়ে মস্‌জিদে এস। ক্যাপ্টেন মহীউদ্দীন আর মুক্তি সেনাদের শুভ কামনায় সেখানে মোনাজাত হবে।

ক্যাপ্টেন মহীউদ্দীন তখনো শ্রুতিসীমার বাইরে যাননি। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, না! ওর কথায় তোমরা কান দিও না। আগে দেশের আজাদী, তারপর ব্যক্তিগত ধর্মাচরণ। তোমরা প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন কর সবার আগে।

আমিনা বললে, আবার তাহলে তোমারা দুজন দু'দিকে? বিপক্ষ শিবিরে?

হাসান আর হাজী-সাহেব দু'জনেই হেসে ফেলে।

ক্যাপ্টেন মহীউদ্দীন জনতাকে সম্বোধন করে বলনে, সবার আগে বল ভাইসব : স্বাধীন সুনার বাঙলা...

জনতা এবার পুকার দিয়ে ওঠে : জিন্দাবাদ!

তবু খুশি হতে পারেন না ক্যাপ্টেন মহীউদ্দীন। বলেন, উঁহু-হুঁ! হেইডা তো আমাগো বাষা হইল না! পালা আমাগো শ্যাষ হইছে... অখন বাকি আছে টুক গাইন। —মেহেরবানি কইর্‌যা হগলকে খাড়াইতে হইব। ন্যান! ধরেন আঁাইয়ের লগে, 'আমার সুনার বাঙলা, আঁইরা তুমায় বালবাসি...'

লৌকিক না অলৌকিক
(নব্বই-এর দশক)

কয়েক বছর আগেকার কথা। সেবার বিশেষ আমন্ত্রণে ভাগলপুর যেতে হয়েছিল একটা সাহিত্যসভায় যোগ দিতে। সভায় প্রত্যাশিতভাবেই আমাকে একটি বক্তৃতা দিতে হল। শরৎচন্দ্র থেকে বনফুল— ভাগলপুরের সাহিত্যসভায় সব কিছুই প্রাসঙ্গিক। দীর্ঘ সময় বক্তৃতা দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এলাম। অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম কর্ণধার ডক্টর বিনয় মাহতো এগিয়ে এসে বলল, আপনি আবার তাড়াহুড়ো করে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন কেন, দাদা? ওখানেই বসুন!

আমি বলি, একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি—

—টয়লেটে যাবেন?

আমি আবার বলি, না রে বাবা। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমি পালিয়ে যাচ্ছি না- —এখনি আসব। একটু অপেক্ষা কর...

শেষের দিকে আমার কণ্ঠস্বরে বোধহয় একটু ধমকের সুর এসে গিয়েছিল। আসলে সেটা উত্তেজনায়। ডক্টর মাহাতো সেটা বুঝতে পারল না। একটু বোধহয় আহত হল। অনেকেই ঐ সময় আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। সম্ভবত আমার বক্তৃতার বিষয়ে। কিন্তু আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। দশম সারিব শেষপ্রান্তে-বসা সেই বিশেষ শ্রোতাটির দিকে এগিয়ে যাই। যাকে মঞ্চ থেকে বারে বারে লক্ষ্য করছিলাম আর চোখাচোখি হতেই যে মিটিমিটি হাসছিল। সত্যি কথা বলতে কি, সেই বিশেষ শ্রোতাটির জন্য আমি বেশ বাগিয়ে বক্তৃতাটা দিতে পারিনি। উল্টোপাল্টা চিন্তায় আর স্মৃতিতে আমার বক্তব্য তথা ভাষা মাঝেমাঝে কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। চিনতে আমার ভুল হয়নি—যদিও সময়ের ব্যবধানটা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর। আমারই বয়সী। উর্ধ্বাঙ্গে গেরুয়া রঙের একটা পাঞ্জাবি, তার উপর জহর-কোটি। মাথায় ব্যাকব্রাশ বিরল কেশে রূপালী আভাস, চোখে একটা মোটা চশমা। হাতে চুরুট, তাতে আগুন দেওয়া নেই কিন্তু।

ভিড় ঠেলে দশম সারির কাছাকাছি এসে দেখি সেই চিহ্নিত আসনটা ফাঁকা। শ্রোতা কখন উঠে গেছে; এদিক-ওদিক তাকাতেই নজরে পড়ল গেটের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চুরুট ধরাচ্ছে। আমি পিছন থেকে ডাকলুম : কমল?

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন। সেই মিটিমিটি হাসির আভাসমাত্র নেই। একটু যেন বিস্মিত। বললেন, আমাকে ডাকছেন?

কী বলব বুঝে উঠতে পারছি না। কমল নয় তাহলে?

ভদ্রলোক বললেন, আসুন। চুরুট চলবে তো?

মাতা নেড়ে বলি, না, ধন্যবাদ!

—সে কী? চুরুট খান না? সিগ্রেট তো খেতেন এতকাল?

পিছন ফিরে চলতে শুরু করেছিলাম। থমকে থেমে বলি, কী করে জানলেন?

আবার সেই মিটমিট হাসি। ভদ্রলোক বললেন, আমার কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে। লোক দেখলেই তার অতীতের কথা বলে দিতে পারি।

বিরক্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে জবাব দেবার সময় : বাঙ্কাম! হয়তো আত্মকথামূলক কোন রচনায় সিগ্রেট খাওয়ার কথা লিখেছি, আপনি তা পড়েছেন, আর আজ...

ভদ্রলোক ঝুঁকে পড়ে বলেন, আপনার লেখা আপনার নিজের মনে থাকা উচিত। বলুন, কোন্ বইতে লিখেছেন—জীবনে প্রথম সিগ্রেট টেনেছিলেন কলেজ-স্কোয়ারে, বিদ্যাসাগর-মূর্তির ঠিক পিছন

দিকে বসে। সঙ্গে ছিল আরও দুজন ইয়ার দোস্ত। তাদের মধ্যে একজন আচমকা বলেছিল, আাই! এখানে সিগ্রেট টানাটা ঠিক হচ্ছে না। বিদ্যাসাগর মশাই যদি হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেন? আপনি হাসতে গিয়ে কাশির ধমকে বে-এক্তিয়ার! বলুন, একথা কোথাও লিখেছেন?

আমি খপ্ করে ওর হাতটা চেপে ধরে বলি, তুই কমল! ঠিকই চিনেছি—তুই 'আপনি-আজ্ঞে' করে গুলিয়ে দিচ্ছিলি।

ও বললে, আয় বাপ্! কলকাতা থেকে আমদানি করা সাহিত্যিক। সভার মাননীয় সভাপতি—চেনার আগেই 'তুই-তোকারি' করতে পারি?

—তুই তো ঢাকায় ছিলি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভাগলপুরে এলি কী করে?

—কিছুটা প্লেনে, কিছুটা ট্রেনে। হোটেল থেকে এ সাহিত্যসভায় সাইকেল রিক্‌শায়। সোজা হিসাব

ধমকে উঠি, ন্যাকামি করিস্ না। ভাগলপুর এসেছিস্ কী উপলক্ষে ?

—তোর মনে নেই? নিতার বাপের বাড়ি ছিল ভাগলপুরে?

নিতা—দীপান্বিতা ওর স্ত্রী। কমলের অসাম্প্রদায়িক বিয়েতে আমারও কিছু হাত-যশ ছিল। মনে পড়ে গেল সব কথা। হ্যাঁ, দীপান্বিতা ভাগলপুরের মেয়েই ছিল বটে।

ইতিমধ্যে কর্মকর্তাদের চার-পাঁচজন আমাদের ঘিরে ফেলেছেন। অনুষ্ঠানসূচির পরবর্তী আইটেমটি নাকি থমকে থেমে আছে সভাপতি-মশাই বেমক্কা হাওয়া হয়ে যাওয়ায়।

কমল বললে, ঠিক আছে, তুই যা। বক্তিমে-টক্তিমে মিটে গেলে দেখা হবে। তখন কথা হবে।

— কিন্তু তোর পাত্তা পাব কোথায়?

—আমি উঠেছি হোটেল 'মমতাজ'-এ। আমিই তোকে খুঁজে নেব। বিকালটা ফ্রি রাখিস্

বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম সভামঞ্চে।

পরবর্তী বক্তা ততক্ষণে বোধহয় আধুনিক কবিতা অথবা কথাসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন একটি বর্ণ শুনিনি। মানে শব্দগুলি কানে ঢুকছে ঠিকই, অর্থগ্রহণ হয়নি। আমার মনে তখন নানান চিন্তা ..অতীতের স্মৃতিচারণ...কলেজ জীবনের কথা...স্কুলের কথা...

কমল যদি তার শ্বশুরবাড়িতেই এসে থাকে তাহলে হোটেল মমতাজে উঠবে কেন? চল্লিশ বছর আগে যে মতপার্থক্যটা ছিল, সেটাকে কি আজও জিইয়ে রাখা হয়েছে ? তাই যদি হবে, তবে বাঙলাদেশ থেকে ও হতভাগা এলই বা কিসের টানে? একা এসেছে, না সস্ত্রীক?

কমল আমার স্কুলের সহপাঠী। কলকাতায় কলেজস্ট্রিট পাড়ায় আমরা একই ক্লাসে. একই সেকশানে পড়তাম। কমল ওর নাম নয়। পিতৃদত্ত নাম কামালুদ্দীন চৌধুরী'। ধর্মে মুসলমান। ক্লাসে ছিল তেত্রিশজন হিন্দু আর সাতজন মুসলমান ছাত্র। কামালুদ্দীন এক আজব ব্যতিক্রম। বাকি ছয়জনই 'ভার্নাকুলার' হিসাবে নিয়েছিল 'উর্দু' আর দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে 'পার্শিয়ান।' দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ কামালুদ্দীন নিল আমাদের সঙ্গে বাঙলা আর দ্বিতীয় ভাষা সংস্কৃত। সেদিনই ওর নাম থেকে ঐ 'উদ্দীন' অংশটা খোয়া যায়। ওর নাম হয়ে গেল 'কামাল'! তখনোও সে কমল হয়নি। হয়ে গেল কামাল চৌধুরী।

তারপর বিশেষ পারিবারিক কারণে আমি কলকাতা ছেড়ে আসানসোলে চলে যাই। আসানসোল ই. আই. আর. স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই উনিশ-শ' চল্লিশে। পরে ভর্তি হই সেন্ট জেভিয়ার্সে আই. এস্‌সি. ক্লাসে। সেখানেও কামাল হাজির। তবে সে আর্টস্ স্টুডেন্ট।

আমাদের সরস্বতী পূজায় কামাল এসে মণ্ডপ সাজাতো। ঢাকির হাত থেকে ঢাকটা কেড়ে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঢাক বাজাতো! মহরমের তাজিয়া নিয়ে যখন বার হত তখন ঢাকের বদলে ও বাজাতো তাশা। আমরা—ওর হেঁদু-দোস্ত-এর দল, ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে হাসান-হোসেনের মৃত্যুতে বুক চাপড়ে শোক প্রকাশ করেছি।

গোল বাধল কামাল যখন প্রেমে পড়ল। পাড়াতুতো একটি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে। একা কামাল পড়লে হয়তো আমরা তাকে টেনে তুলতাম, কিন্তু নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে দীপান্বিতাও পড়ল ঘাড় গুঁজড়ে। দু বাড়িতেই প্রবল আপত্তি। সেটা প্রাক-স্বধীনতা যুগের কথা। বৃহত্তর বঙ্গে তখন লীগ মন্ত্রিত্ব।

কামাল দীপান্বিতাকে নিয়ে ইলোপ করল।

দীপান্বিতার বাবা থানায় গেলেন, ডায়েরি করতে। নারীহরণের মামলা। থানা এফ. আই. আর নিলই না। দারোগা বললেন, আপনার কন্যাটি হিসাব মতো প্রাপ্তবয়স্কা। সে স্বয়ম্বরা হয়েছে। বাড়ি যান, আত্মীয়স্বজনকে মিষ্টিমুখ করান গে। বিনা 'পণে' একটি মেয়ে তো দিব্যি পার করলেন মশাই, কেন হাঙ্গামা-হুজ্জোৎ করছেন?

সেদিন থেকে কামাল হয়ে গেল 'কমল'।

মাহাতো আমার আস্তিন ধরে টানায় স্মৃতিচারণ বন্ধ হল। ডক্টর মাহাতো বলল, আপনি সভাপতি। আপনিই তো ঘোষণা করবেন। নেক্সট আইটেম : রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবে শ্রীমতী...

প্রথম অধিবেশন ভাঙল বেলা বারোটায়। বারোটা থেকে দুটো—দু ঘণ্টার মধ্যাহ্ন-বিরতি। সভামণ্ডপটা যে স্কুলের প্রাঙ্গণে সেই স্কুলের ক্লাসঘরে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সাড়ম্বর আয়োজন। হাইবেঞ্চিতে কলাপাতা, মাটির খুরি। সদস্যারা, যাঁরা কুপন নিয়েছেন, তাঁরা পাশাপাশি বসে যাচ্ছেন। যাঁদের বাড়ি কাছে-পিঠে তাঁরা এই দু ঘণ্টার মধ্যে পিত্তিরক্ষা করতে ছুটলেন—তাঁরা কুপন আদৌ কেনেননি। স্থানীয় সদস্যারা, বরং বলা উচিত তাঁদের বেটার-হাফের দল, আঁচল সামলে পরিবেশন করতে এলেন।

এদিকে-ওদিক অনেক খুঁজলাম—কমলের দেখা পেলাম না। ও বোধহয় হোটেলে ফিরে গেছে। অতএব পংক্তি-ভোজনে বসা গেল। আহারান্তে ডক্টর মাহাতোকে বললাম, হ্যাঁ ভাই, হোটেল 'মমতাজ'টা কতদূর?

—প্রায় মাইলখানেক। কেন?

—ওখানে আমার এক বন্ধু উঠেছে। ফোন করা যাবে?

—কেন যাবে না? আসুন আমার সঙ্গে। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

স্কুলবাড়ির—মানে যেখানে সাহিত্য-সভাটা হচ্ছে—পাশেই একটি ডাক্তারখানা। টেলিফোন ছিল সেখানে। যোগাযোগ হল। কমল ঘরেই ছিল। মধ্যাহ্ন আহার সমাপ্ত হয়েছে তার। বললে, ক্লাস কাটতে পারবি? সহসভাপতিকে বিকালের সেশনটায় 'প্রক্সি' দিতে বলে?

টেলিফোনের কথা মুখে হাত চাপা দিয়ে মাহাতোকে বলি, কমল আমার স্কুলের বন্ধু— পঞ্চাশ বছর পরে দেখা হল। বিকেল বেলার অধিবেশনটায় যদি আমি অনুপস্থিত থাকি—

বিনয় মাহাতো পণ্ডিত ব্যক্তি। বুঝমানও। আমার অনুজপ্রতিম। এককথায় সমঝে নিল। বলল, ঠিক আছে দাদা, কিন্তু সন্ধ্যায় স্থানীয় ছেলেমেয়েরা গান গাইবে, আবৃত্তি করবে, ছোট মেয়েরা নাচবে। তাছাড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণীও আছে, সেটা আপনাকে দিতে হবে। তাই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার মধ্যে চলে এলেই হবে। আপনার বন্ধুকেও নিয়ে আসবেন।

মাহাতোকে বলি, বন্ধুর কী প্রোগ্রাম আছে জানি না—তবে আমি সাড়ে ছয়টার আগে নিশ্চিত ফিরে আসব।

টেলিফোনে কমলকেও সেইমতো জানিয়ে দিলাম। ডক্টর মাহাতো একজন পরিচিত রিক্‌শাওয়ালাকে নির্দেশ দিল আমাকে হোটেল 'মমতাজ'-এ নিয়ে যেতে। আর এ-কথাও পই-পই করে বুঝিয়ে দিল, ঠিক সন্ধ্যা ছয়টায় যেন সে আবার সেই হোটেলে গিয়ে হানা দেয়। আসামীকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে। রিকশাওয়ালার হাতে একটা অগ্রিম নোটও গুঁজে দিল দেখলাম।

*　　　*　　　*

কমল বললে, তুই অলৌকিকতায় বিশ্বাস করিস না, নারে নরেন?

—প্রশ্নটা এমন 'নেগেটিভ'-ধর্মী হল কেন আগে তাই বোঝা। তুই যেন ধরেই নিয়েছিস যে, আমি অলৌকিকতায় বিশ্বাস করি না।

—তাই ধরে নিয়েছি। প্রথম কথা : তোর 'পয়োমুখম্' বইটা পড়ে সেটাই পাঠকের ধারণা হয়। দ্বিতীয় কথা : সকালে যখন বললাম, আমার কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তুই একেবারে প্রতিবর্তী প্রেরণায় তৎক্ষণাৎ ধমকে উঠ্‌লি : 'বাঙ্কাম!'

কথা হচ্ছিল হোটেল মমতাজে, কমলের ঘরে। ও আধশোয়া হয়ে চুরুট ধরিয়ে বসেছে খাটে, আমি একটা সোফায় ভুঁড়ির খাঁজে একটা বালিশ টেনে নিয়ে। আমি বললাম, 'অলৌকিকত্ব' নিয়ে যারা ব্যবসা করে—বিশ্বাসী-মানুষের মস্তকে পনস বিদীর্ণ করে কাঁঠাল কায়, তাদের বিরুদ্ধে আমি একপায়ে-খাড়া। তাবিজ, কবজ, রত্নধারণ, হাত দেখা, কোষ্ঠিবিচার, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, কিরো'জন-নাম্বার, সব, স—ব কিছুর বিরুদ্ধেই আমার সোচ্চার প্রতিবাদ। সবই বাঙ্কাম! কিন্তু তাই বলে 'অলৌকিকতা'-য় বিশ্বাস করব না কেন?

—তাহলে তোর মতে 'অলৌকিক' কী? তার অর্থ কী?

—অভিধানে যে অর্থ নির্দেশ করা আছে তাই। চলন্তিকার মতে 'অলৌকিক' মানে 'লোকাতীত, যাহা মর্ত্যে দুর্লভ। যাহা ইহলোকের নহে।' লোকাতীত কথাটা ধোঁয়াটে; মর্ত্যে দুর্লভ তো অনেক কিছুই। ক্র্যাকাটোয়ার উদ্‌গীরণ থেকে শ্যাম দেশের যমজভাই—যাদের পিঠে-পিঠে জোড়া ছিল, এই সব কিছুই তো অত্যন্ত দুর্লভ। ইহলোক মানে কী? —মানুষের জ্ঞানের সীমানার বাইরে? যা পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়? সেক্ষেত্রে ইলেকট্রন থেকে কোয়াসার সব কিছুই তো অলৌকিক!

কমল ধমকে ওঠে, না, নরেন। তুই অহেতুক সহজ জিনিসটাকে গুলিয়ে দিচ্ছিস। 'ইহলোক' মানে 'মেটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড'। জুরাসিক যুগে মানুষ ছিল না, কিন্তু 'ইহলোক' ছিল। 'অলৌকিক' মানে বিজ্ঞান যার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। ইলেকট্রন, বা কোয়াসার পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও বুদ্ধিগ্রাহ্য। বিজ্ঞান তার হদিস্ জেনেছে। ব্যাখ্যা করতে পারছে।

—তাহলে মাধ্যাকর্ষণ?

—কী মাধ্যাকর্ষণ?

—গ্র্যাভিটেশন! কেন সূর্য পৃথিবীকে টান্‌ছে! অতি দূরস্থিত প্লুটোকে টানছে? কী দিয়ে টানছে? বিজ্ঞান জানে না। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের ব্যবহারিক সূত্রটুকুই শুধু আবিষ্কার করেছিলেন, তার উৎসের সন্ধান পাননি। মাধ্যাকর্ষণ নিশ্চয়ই 'লোকাতীত'। বিজ্ঞান যার ব্যাখ্যা জানে না। ফলে সূর্য যে পৃথিবীকে মহাকাশে ছুটে যেতে দিচ্ছে না, এটা অভিধান মতে একটা 'অলৌকিক' ঘটনা। এর কোন লৌকিক ব্যাখ্যা নেই! কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ তুললি কেন, কমল? আমরা পঞ্চাশ বছর পরে কি মিলিত হয়েছি 'বেল্‌স্ থিয়োরেম্' নিয়ে আলোচনা করতে?

ও বললে, বলছি। কিন্তু তার আগে সংক্ষেপে বল দেখি : 'বেল্‌স্ থিওরেম'টা কী?

—তুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করতিস্ না?

—না, বাঙলার। হঠাৎ সে কথা কেন?

—'বেল্‌স্ থিয়োরেম'টার জন্ম-পদার্থ-বিজ্ঞানে। কিন্তু সেটা এখন দর্শনের এক্তিয়ারে। গ্যারী জুকভ বলছেন, "Bell's theorem is a mathematical proof. What it proves is that if the statistical predictions of quantum theory are correct, then some of our commonsense ideas about the world are profoundly mistaken...This is quite a conclusion, because the statistical predictions of quantum mechanics are always correct." ['বেল'-এর (অধ্যাপক J. S. Bell) থিয়োরেম (1964) বিশুদ্ধ অঙ্কের হিসাবে প্রমাণিত। এই থিয়োরেম প্রমাণ করেছে যে, কোয়ান্টাম থিয়োরির পরিসাংখ্যিক পূর্বাভাস যদি সত্য হয়, তাহলে এই প্রপঞ্চময় দুনিয় সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ ধারণা তার অনেকটাই প্রভূতভাবে ভ্রান্ত...এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত

হয়ে যাচ্ছে, কারণ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পরিসাংখ্যিক পূর্বাভাসগুলি অভ্রান্ত সত্য।।

কমল খুব মন দিয়ে শুনল। তারপর বলল, শাদামাটা ভাষায় বেল-সাহেবের থিয়োরেমটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারিস, নরেন? তোর 'নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা' পড়ে আইনস্টাইনের ফোর্থ ডাইমেনশনটার ব্যাপার স্যাপার কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম। যদিও আমি বিজ্ঞানের অ আ-ক খও জানি না।

আমি বললাম, ঠিক আছে, শোন বলি ধর তুই আর একটা বিরাট মাঠের মাঝখানে পিঠোপিঠি দাড়ালাম। আমরা দুজনে স্থির করেছি যে, তুই যদি ডান হাত ঘোরাতে থাকিস তাহলে আমি বাঁ হাত ঘোরাবো। ঠিক যে-মুহূর্তে তুই হাত বদল করে বাঁ-হাত ঘোরাতে শুরু করবি সেই মুহূর্তেই আমিও বাঁ হাত বদলে ডান-হাত ঘোরাতে শুরু করব। কেমন তো? এখন আমরা পিঠো পিঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম—তুই পুব দিকে চলতে শুরু করলি ডান-হাত ঘোরাতে ঘোরাতে, আমি তার উল্টো দিকে পশ্চিমমুখো চলেছি, বাঁ-হাত ঘোরাতে ঘোরাতে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ তুই চিৎকার করে উঠলি 'হাত বদলালাম।' সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফেরা আমিও বা-হাত বদলে ডান হাত ঘোরাতে শুরু করলাম। এখন বল, এটা কি সম্ভব? একই মুহূর্তে দুজনের হাত বদলানো?

—হ্যাঁ, খুবই সম্ভব। কেন নয়?

—না, সম্ভব নয়। তোর চিৎকার শব্দ-তরঙ্গের মাধ্যমে আমার কানে পৌঁছাতে কিছুটা সময় নেবেই। শব্দ-তরঙ্গের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় সাতাশ মাইল। ফলে সামান্য কিছুটা সময়ের পার্থক্য অনিবার্য। যে যা হোক, এখন ধর যদি তুই পুবমুখো চলতে চলতে চীনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে যাস আর আমি পৃথিবীর বিপরীত প্রান্তে—একশ আশি ডিগ্রি ফারাকে পৌঁছে যাই, তাহলে? তুই আমাকে কী করে খবর দিবি? ঠিক কখন হাত বদলালি?

কমল বলল, কেন? এস টি ডি টেলিফোনে।

—কারেক্ট। টেলিফোনের শব্দতরঙ্গ আসলে বিদ্যুৎতরঙ্গ। ইলেকট্রো ম্যাগনেটিভ ওয়েভ। তার গতিবেগ আলোর গতির সঙ্গে সমান। সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। ফলে এবারও তোর নির্দেশ পেতে (ধরে নিচ্ছি টেলিফোন কানেকশান পেতে কোন সময়ই লাগেনি) আমার সামান্য কিছুটা দেরি হবে। হবে তো?

কমল বলল, অঙ্কের হিসাবে হবে। বাস্তবে হবে না। কারণ আলোক তরঙ্গ বা বেতার তরঙ্গ এত দ্রুতবেগে যায় যে, প্রতি সেকেন্ডে সে পৃথিবীর নিরক্ষরেখা বরাবর প্রায় সাড়ে সাতবার পাক মারতে পারে।

আমি বললাম, ঠিক কথা। তাহলে তোর নির্দেশটা পেতে আমার দেরি হবে এক সেকেন্ডের অন্তত চৌদ্দভাগের একভাগ। অঙ্কের হিসাবে। মানছিস্ তো?

কমল, স্বীকার করল, না মানার কী আছে?

—এবার শোন, 1964 খৃষ্টাব্দে সুইটজারল্যান্ডে বসে 'বেল' যে আবিষ্কারটা করলেন তার কথা উনি দুটি উপপরমাণু কণিকা (sub-atomic particles) নিয়ে গবেষণা করছিলেন। 'উপপরমাণু' জিনিসটা কী তোকে বোঝানো মুশকিল। 'অ্যাটম' বা 'পরমাণু'-কে তুই চিনিস। এককালে তা অবিভাজ্য বলে মনে করা হত। ক্রমে তারও নানারকম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হদিস বিজ্ঞান আবিষ্কার করল—ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন প্রভৃতি। ধরা যাক, তেমনি দুটি ইলেকট্রন নিয়ে উনি পরীক্ষা করছিলেন, যার একটি ঘড়ির গতিপথে (clockwise) পাক, খায়, একটি বিপরীতমুখে পাক খায় (anti-clockwise)। যেন বামাবর্ত্ম আর দক্ষিণাবর্ত্ম শঙ্খের পাক খাওয়ার ছন্দ। আর তারা প্রতিজ্ঞা করেছে একজন যে-দিকে পাক খাবে অন্যজন ঠিক তার উল্টোমুখে পাক খাবে। এ যে মুহূর্তে মুখ ঘোরাবে, ও ঠিক সেই মুহূর্তেই মুখ ঘোরাবে। যেমন তুই আমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম। বেল-সাহেব তাঁর পরীক্ষায় প্রমাণ করলেন যে, যখন ওদের দূরত্ব এত বেশি যে, আলোক বা বেতার তরঙ্গ একটি উপপরমাণু থেকে অপরটিতে

পৌঁছাতে তিন-চার পাঁচ সেকেন্ড সময় নেয়, তখনো তারা হুবহু একই খন্ডমুহূর্তে একে অপরের বিপরীত ঘূর্ণন-ছন্দে নিজেকে বদলে নিতে পারছে! প্রশ্ন হচ্ছে : কেমন করে? আইনস্টাইনের নিদান অনুযায়ী আলো বা বেতার তরঙ্গের অর্থাৎ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের চেয়ে অধিকতর গতিতে ইহলোকে কোন কিছুই যেতে পারে না তাহলে ঐ উপপরমাণু দুটি—যাদের দূরত্ব দশ লাইট-সেকেন্ড (অর্থাৎ বেতার তরঙ্গ যে দূরত্ব পাড়ি দিতে দশ-সেকেন্ড সময় নেয় = 10 × 1,86,000 মাইল = প্রায় সাড়ে আঠারো লক্ষ মাইল) তারা কেমন করে একে-অন্যের ঘূর্ণনছন্দ দশ-সেকেন্ড পরে নয়, ঠিক একই খন্ডমুহূর্তে পরিবর্তন করছে?

কমল জানতে চাইল, এর উত্তরটা কী?

—বিজ্ঞান জানে না। বেল-সাহেবের ওই পরীক্ষা তিন দশকের পুরানো। এই ত্রিশ বছরে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেছেন। কারও মতে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতিটি পরমাণু, প্রতিটি বস্তু একই সূত্রে গ্রথিত। কী আশ্চর্যের কথা, কমল—ঠিক এই কথাটাই পৌরাণিক যুগে নাকি বলেছিলেন ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক, মহাপন্ডিতা গার্গীর প্রশ্নের জবাবে। মহারাজ জনকের সভায় শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি কোনজন তা নির্ধারণ করতে গার্গী যাজ্ঞবল্ককে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এই যে ভূলোক, দ্যুলোক এবং পাতালরাজ্য এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে না কেন? কোন শক্তি এদের ধরে রেখেছে?' যাজ্ঞবল্ক বলেছিলেন, "বিশ্বপ্রপঞ্চের সব কিছুই একটি মাত্র সূত্রাত্মায় গ্রথিত। তিনিই হচ্ছেন : ব্রহ্ম। কিন্তু হে গার্গী! এটাই আপনার শেষ প্রশ্ন হউক। এর পর অতিপ্রশ্ন করলে, আপনার মস্তক পাতন হবে!"

কমল বললে, এ কাহিনীটা শুনেছি। কিন্তু এ তো একদলের মত। দ্বিতীয় দল বৈজ্ঞানিকেরা কী ব্যাখ্যা দিতে চাইছেন?

আমি বলি, দ্বিতীয় দল নোবেল-লরিয়েট বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের ধারণা—যা এই বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁরা দুনিয়াকে জানাচ্ছেন : তার সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের মূল সূত্রের খুব একটা পার্থক্য নেই—তা যেন আদি শঙ্করাচার্য অথবা বিবেকানন্দের বক্তব্যের খুব কাছাকাছি! বিশ্বের সেরা নবীন ফিজিসিস্টরা বলছেন, হয়তো এই বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতিটি অণু-পরমাণু, উপপরমাণু একই চৈতন্যময় সত্তার খন্ডাংশমাত্র! একজন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করলেন : আলোক তরঙ্গভঙ্গ মাত্র। তার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। নিশ্ছিদ্র প্রমাণ! মানতেই হচ্ছে! অপরজন প্রমাণ করলেন, না, আলোক ফোটনের সমাহারমাত্র, যে ফোটনের অস্তিত্ব আছে। ভর আছে। তা মাপা যায়। সেটাও নিশ্ছিদ্র প্রমাণ! কারও মতকে খন্ডন করা যাচ্ছে না। অথচ আমরা জানি, দুটোই সত্য হতে পারে না। এর উপর প্রফেসর আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন যে, আলোক ফোটন যখন একটি বিশেষ ছন্দে দ্বিছিদ্র-বিশিষ্ট পথে চলে তখন তার ব্যবহার এমন বিচিত্র যে, দুটি অভ্যুপগমের (হাইপথেসিস) অন্তত একটিকে মেনে নিতেই হবে। এক : ফোটনের চৈতন্য আছে। দুই : ফোটন কেমন করে এমন ব্যবহার করছে তার হেতু বিজ্ঞান দানে না! তা অলৌকিক!

কমল বলল, শুনেছি শ্রীলঙ্কার ডক্টর কভুরের পথরেখা ধরে কলকাতাতেও একটা যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠছে?

আমি বলি, উঠছিল! প্রাথমিক পর্যায়ে তারা খুবই ভাল কাজ করছিল। গ্রামে গঞ্জে সংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, ঝাড়-ফুঁক মন্ত্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করছিল। কিন্তু দুভার্গবশত সে আন্দোলনও এখন গুরুবাদী পথে চলতে শুরু করেছে। সাধারণ কর্মীরা আর তাদের নিজেদের বিবেক বা অধুনাতন বিজ্ঞানের নির্দেশে পথ চলতে ভুলে গেছে— গুরুদেবের শ্রীমুক-নিঃসৃত বাণীতেই তারা অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করতে শুরু করেছে। কিন্তু সে সব কথা থাক। তুই আসল কথাটা বারে বারে এড়িয়ে যাচ্ছিস। হঠাৎ এ প্রসঙ্গ তুললি কেন, তাই বল?

—কারণ এবার ভাগলপুরে এসে এমন একটা ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি, বুদ্ধিতে যার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। মানে লৌকিক ব্যাখ্যা। না আমি, না নিতা।

—বেশ তো, বল, শুনি তোর অভিজ্ঞতা, ভাল কথা। নিতা, আই মীন দীপান্বিতা, কোথায়?

—বলছি, সব কথাই খুলে বলছি। শোন। শুনে তোর ব্যাখ্যা দে—এটা লৌকিক না অলৌকিক।

আমাদের যৌবনকালে দীপান্বিতা ছিল পাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। হয়তো সেজন্যই কামালকে ওঁরা ক্ষমা করতে পারেননি। দীপান্বিতার মুখের উপর বাপের বাড়ির দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছিল। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা—উনিস পঁয়তাল্লিশ সাল। তারপরেই আমাদের যৌবনকালে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটে গেল পরপর কিছু ক্রান্তিকারী ঘটনা—'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'—'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'—দাঙ্গা—স্বাধীনতা এবং বঙ্গ-বিভাগ। কে কোথায় ছিটকে পড়লাম আমরা! অনেকদিন পরে খবর পাই, কামাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এম. এ. পাস করেছিল—আমার ধারণা ছিল দর্শনে, এখন জানলাম, না, বাঙলায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা লেকচারারের চাকরি পেয়ে ঢাকায় চলে যায় সস্ত্রীক। পরে ওখান থেকেই পি. এইচ. ডি. করে। দীপান্বিতা সেই সে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ঢাকায় চলে যায় তারপর আর ভারতে ফিরে আসার সুযোগ পায়নি। ইতিমধ্যে ওর বাবা এবং মা মারা গেছেন। খুড়তুতো ছোট বোন শিবানীর বিয়েতে নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছিল—আসা হয়নি। ইতিমধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান হয়েছে বাংলাদেশ। সে সময়ে দু-দেশের মধ্যে যাতায়াত কিছুটা সহজ হয়েছিল, তবু ওর আসা হয়নি। ওদেরও একটিমাত্র সন্তান—অনিরুদ্ধ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে এম. ডি. করতে লন্ডনে যায়। আর ফেরেনি। একটি বিদেশিনীকে বিবাহ করেছে। সেও আজ প্রায় দশ বছর। 'ফেরেনি' মানে পাকাপাকিভাবে। দু-বছর অন্তর ঢাকায় আসে সস্ত্রীক। বাপির জন্য, মামির জন্য হাজার কিসিমের বিদেশী জিনিস নিয়ে আসে।

অনিরুদ্ধের বিবাহ হয়েছে প্রায় দশ বছর। কিন্তু সন্তানাদি হয়নি।

দীপান্বিতা বৌমার কাছে জিজ্ঞেস্ করে জেনেছে, তার হেতু নিতান্ত জৈবিক—ওদের দুজনের কারও অনিচ্ছাজনিত কারণে নয়—অনেক রকম চিকিৎসা করিয়েছে। ফল হয়নি।

পুরনো কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে কমল বলে দীপান্বিতার জন্মও যে এক 'অলৌকিক-কান্ড'—আই মীন 'মিস্টিরিয়াস্' কান্ড—তা তুই জানিস?

আমাকে অজ্ঞতা প্রকাশ করতে হল। ওর বাবা ছিলেন পাড়ার নামকরা ডাক্তার। দীপান্বিতা আমাদের পাড়ার একটি সুন্দরী মেয়ে—ডাক্তারবাবুর মেয়ে—সবাই চিনতাম; কিন্তু তার জন্ম-ইতিহাস জানব কেমন করে?

কমল বললে, তুই তো জানিস আমার শ্বশুরমশাইও ছিলেন ডাক্তার; কিন্তু বিবাহের পর প্রথম পনের বছর তাঁরও কোন সন্তানাদি হয়নি। একই হেতুতে। নিতার বাবাও চেষ্টার ত্রুটি করেননি। দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজের নামকরা গাইনিদের পরামর্শ নিয়েছেন, চিকিৎসা করিয়েছেন। ফল হয়নি। তারপর একদিন ওঁর সম্পর্কে এক কাকা ওঁকে পরামর্শ দেন একটি বিশেষ কালী-মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতে। আলোচনাটা হচ্ছিল এই ভাগলপুর শহরেই, ওঁদের পৈত্রিক আবাসে। শুনলেন, মন্দিরটি মুঙ্গের শহরের মাইল পাঁচেক দূরে--বিশালাক্ষীর মন্দির। ডাক্তারবাবুর খুব কিছু ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিতার মায়ের প্রবল ইচ্ছার চাপে উনি সেই মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে এলেন। তারপর...কী বলব? লৌকিক অথবা অলৌকিক যাই হোক— বছরখানেকের মধ্যেই নিতার মায়ের গর্ভে শুভাগমন ঘটল নিতার।

আমি জানতে চাইলাম, ডাক্তারবাবু সস্ত্রীক মন্দিরে যাবার আগে কি গাইনি ডাক্তারের দেওয়া ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন?

কামাল হাসতে হাসতে বললে, আজ্ঞে না, তর্কচঞ্চু! সম্ভবত নয়। তবে সে-সব অনেককাল আগেকার কথা। আমি জানি না। মানে নিতাও জানে না। মোটকথা, আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ নিয়ে ও-কথা বলতে পারব না।

—নিতা এখন কোথায়? ওদের পৈত্রিক বাড়িতে?

—বলছি। আগে গল্পটা শেষ করি।

—কর!

মাসকয়েক আগে শিবানী তিওয়ারী—মানে দীপান্বিতার খুড়তুতো ছোটবোন—জানালো যে, তার ছোট ছেলের বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। আবদার করে এয়ারলেটারে লিখেছিল, দিদি, আমার দুই মেয়ের বিয়েতেই তুই আসতে পারিসনি। আমিও অবশ্য অনিরুদ্ধের বিয়েতে ঢাকা যেতে পারিনি। তা সে সব পুরনো কথা থাক। এবার এই ছোট্টুর বিয়েতে তোরা দুজন আসতে পারিস না? কতদিন, কত্তো-দিন তোকে দেখি না, দিদি!

কামাল আপত্তি করছিল। বলেছিল, দেখ নিতা, তোমার বোনের বিয়ে হয়েছে বিহারী পরিবারে—ওঁরা ত্রিবেদী-ব্রাহ্মণ। প্রচণ্ড সম্ভাবনা যে, তাঁরা কট্টরপন্থী! বিয়েবাড়িতে মুসলমান রিস্তেদার হাজির করে কেন অহেতুক তাঁদের বিব্রত করবে?

দীপান্বিতা কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলে, শোন বলি। আমরা কোন খবর দিয়ে যাব না। সোজা গিয়ে উঠব ভাগলপুরের কোনও হোটেলে। মীরাকে মনে আছে?না, তুমি বোধহয় তাকে দেখনি। ও ভাগলপুরে থাকে, মাঝে মধ্যে চিঠি দেয়। ও চিঠিতে লিখেছে—ঠিক একই সময়ে ভাগলপুরে একটা সাহিত্যসভা হচ্ছে। ওরা কলকাতা থেকে নরেনদাকে সভাপতি করে নিয়ে যাচ্ছে। নরেনদা তোমার সহপাঠী—স্কুলে এবং কলেজে! তাই তুমি সস্ত্রীক ভাগলপুরে এসেছ। তারপর আমরা দুজন ঠিকানা খুঁজে ওদের বাড়িতে যাব। জাস্ট দেখা করতে। প্রেজেন্টেশান দিতে। বিয়ের আগের দিন। ওরা যদি আগ্রহ দেখায়, খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে তবে যাব। খাব। সেসব কথা ওরা যদি না তোলে, তবে খোশগল্প করে হোটেলে ফিরে আসব।

কামাল জানতে চেয়েছিল, তোমার আসল মতলবখানা কী বলত?

দীপান্বিতা সেটা অকপটে স্বীকার করে, তুমি আমাকে একবার মুঙ্গের নিয়ে যাবে? ভাগলপুর থেকে কাছেই। আমিও একটা পুজো দিয়ে দেখতাম বিশালাক্ষী মাকে!

কামাল অট্টহাস্য করে উঠেছিল, কী পাগলের মতো বকছ নিতা! তোমার বাবা-মা ছিলেন হেঁদু। কট্টর বামুন! কিন্তু তুমি মোছলমানের জরু! যার সন্তান-কামনায় পুজো দিতে চাইছ সে শুধু মোছলমানের জরু নয়, জন্মসূত্রে খেষ্টান!

দীপান্বিতা বলল, সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না।

—না, নিতা, আমাকেও ভাবতে হবে। আমি রাজি আছি। পাসপোর্ট-ভিসা করতে দিচ্ছি। ভাগলপুর নিয়ে যাব তোমাকে। নরেনের সঙ্গে পঞ্চাশ বছর পরে দেখা হবে, সেটাও আমার কম প্রাপ্তি নয়। তাছাড়া শ্বশুরবাড়ির দেশটা এরপর আর দেখার সুযোগই হয়তো হবে না। আমারও সত্তর চলছে। কিন্তু একটা শর্ত আছে, বল মেনে নেবে?

—কী শর্ত?

—তুমি মন্দির পুরোহিতকে সব কথা খুলে বলবে। 'দীপান্বিতা চৌধুরী' নাম শুনে তিনি যেন ভুল না বোঝেন। ধরে নেন তুমি হিন্দু।

দীপান্বিতা রাজি হয়ে গিয়েছিল।

ওরা আজ দিনসাতেক হল ভাগলপুরে এসেছে। মমতাজ হোটেলে উঠেছিল দুজনে। সাইকেল-রিকশা নিয়ে শিবানীর শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছেই বুঝল পরিস্থিতিটা। ওরা যেন ভূত দেখল। বস্তুত ওরা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি ও-পার বাঙলা থেকে কামালুদ্দীন চৌধুরী-সাহেব সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এভাবে বেমক্কা চলে আসবেন। যা হোক, চক্ষুলজ্জা বাঁচিয়ে দু-পক্ষই লৌকিকতা করেছে। শিবানী জনান্তিকে দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে ঝরঝরিয়ে কেঁদেছে। তারপর গঙ্গাস্নান করে ঘুরে ঢুকেছে কি না, ইতিহাস সে-প্রসঙ্গে নীরব। বস্তুত কামালের গল্পটা— 'অলৌকিক অথবা লৌকিক'গপ্পোটা শিবানীর ছেলে ছটুর বিবাহ সংক্রান্ত নয়—ঐ কালীমন্দির ঘিরে।

ভাগলপুর থেকে মুঙ্গের একবেলার পথ। প্যাসঞ্জার ট্রেনে। কিন্তু যাত্রীরা রেলের আইন-কানুন কিছু

মানে টানে না। ওদের ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কাটাটা নেহাৎ মুর্খামি হয়েছে। বিনা টিকিটের যাত্রীর ভিড়ে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ ছিল না ওদের দুজনের।

মুঙ্গেরে একদিন থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। উঠল হোটেলে। হোটেল ম্যানেজারই গাড়ির ব্যবস্থা করে দিল। বিশালাক্ষীর মন্দির শহরের বাইরে, গঙ্গার ধারে। তবে মটোর যাতায়াতের উপযুক্ত কাঁচা রাস্তা আছে। হোটেলে ও নাম সই করেছিল 'কে. চৌধুরী', ফলে জাতির প্রশ্ন ওঠেনি। খবর নিয়ে জানতে পারল বিশালাক্ষীর মন্দিবটি প্রায় দু শ' বছরের পুরনো। আদিবাসী যাযাবর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিতা দেবীমূর্তি। সে-যুগে মায়ের নাম ছিল : বিষ-লক্ষ্মী। যাযাবর সম্প্রদায় সাপের খেলা দেখাতো—সাপুড়ে ছিল তারা। ক্রমে সেই আদিবাসীদের নির্মূল করে যাদব সম্প্রদায় মন্দিরটার দখল নেয়। তারও পরে—প্রায় সত্তর-আশি বছর আগে—এক ব্রাহ্মণ জমিদার মন্দিরটি নতুন করে গড়ে দেন। নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে বিশ বিঘে লাখেরাজ নিষ্কর ভূমি দান করেন মন্দির পুরোহিতকে। সেদিন থেকে মা এসেছেন ব্রাহ্মণ সমাজের কব্জায়। তাঁর নামেও পরিবর্তন হল। 'বিষ-লক্ষ্মী' হলেন 'বিশালাক্ষী'। এককালে যাত্রী সমাগমে মন্দির গমগম করত। ইদানীং বড় একটা কেউ ও দিকে যায় না—মা গঙ্গাও যে মন্দিরকে ছেড়ে বহু দূরে সরে গেছেন ক্রমে।

দীপান্বিতা পুরোহিতকে একটা একশ টাকার নোট প্রণামী দিয়ে প্রণাম করল। অকপটে সব কথা স্বীকার করল। সে নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ সন্তান—ভগলপুরে বাড়ি; কিন্তু বিয়ে করেছে একজন মুসলমানকে। যার পুত্রকামনায় সুদূর ঢাকা থেকে ছুটে এসেছে সে ওর পুত্রবধূ—জন্মসূত্রে প্রটেস্টন্ট : খ্রিষ্টান।

পুরোহিত বোধকরি তাঁর জীবনে একবারও একশ টাকার নোট প্রণামী পাননি। বিশুদ্ধ হিন্দিতে বললেন, ভক্তিই হচ্ছে সাচ্চা চীজ মাঈ! তুই মন্দিরে ঢুকিস্ না। তোর নাম-গোত্র বল। আমি এখনি পুজো দিয়ে প্রসাদী নিয়ে আসছি।

দীপান্বিতা বললে, বাবা। আমার নাম দীপান্বিতা চৌধুরী, কিন্তু গোত্র...

পুরোহিত বললেন, বাঃ! বাঃ! দীপান্বিতা ! এ তো মা বিশালাক্ষীর আর এক নাম! তোর পিতাজীর গোত্রটাই বল না হয়।

দীপান্বিতা বলল : ভরদ্বাজ!

—বহুৎ খুব। ঔর তেরা বহুমাঈকী ক্যা নাম?

—ক্যাথলিন চৌধুরী!

—বাঃ! বহুৎ খুব। ক্যাথিলিন! বহ্ভি তো বিশালাক্ষী মাঈকী কি ঔর এক নাম।

তা জানা ছিল না দীপান্বিতার।

মোটকথা নির্বিবাদে পুজোপর্ব মিটল।

হোটেল-ম্যানেজার পরামর্শ দিলেন, ট্রেনে কেন ফিরবেন ভাগলপুরে? এখান থেকে ডিলুক্স-বাস আছে। সাড়ে সাত ঘণ্টার মধ্যে আরামসে পৌঁছে যাবেন ভাগলপুরে। ইঁহা সে সুবে সাত বাজে ছোড়তি, ঔর তিন বাজে ভাগলপুর। বিচমে ঘণ্টাভরকে লিয়ে সুলতানগঞ্জমে রুখেগি, খানা খানেকে বারেমে।

কামাল জানতে চেয়েছিল, সীট রিসার্ভ করানো যাবে তো?

—বিলকুল!

হোটেল ম্যানেজার লোক পাঠিয়ে পরদিন সকালের সুপার ডিলুক্স বাসের দু-খানি টিকিট খরিদ করিয়ে দিল : সব্সে উমদা সীট! ড্রাইভারের ঠিক পিছনে, ঠিক ডানদিকে। সীট নম্বর এক আর দুই!

সকাল সাতটায় বাস ধরে ওরা রওনা দিল ভাগলপুরমুখো। সুলতানগঞ্জ পর্যন্ত এল নির্বিঘ্নে। এখানে বাস একঘণ্টা দাঁড়াবে। সকলে সামনের হোটেলে মধ্যাহ্ন আহার সারবে। বাসের কন্ডাকটার বললে, সামানকো বারেমে বে-ফিকর রহিয়ে সাব। যাইয়ে, আরামসে খানা খা-কে আইয়ে। লেকিন য়্যাদ রাখিয়েগা, একবাজে বাস ফিন্ ছুটেগি।

আহারের চেয়ে বেশি প্রয়োজন একবার টয়লেটে যাওয়া। যাহোক, আহারাদি সেরে মুখে- চোখে জল

দিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই দুজনে ফিরে এসে বসল নিজের-নিজের সীটে। দীপান্বিতা বসেছে জানলার ধারে। একে-একে যাত্রীরা ফিরে আসছে। আসন গ্রহণ করছে। প্রায় পৌনে একটার সময় একজন তক্‌মা-আঁটা পুলিশ এসে কমলকে বললে, আপ দোনো মেহেরবানি করকে সাতারা-আঠারো সীটমে চলা যাইয়ে।

কামাল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কেঁউ?

—বড়াসাব ভাগলপুর যায়েঙ্গে!

—বড়াসাব? কৌনসে বড়াসাহ্‌ব?

সেপাইটা বুঝিয়ে দিল, সুলতানগঞ্জ পুলিশ-স্টেশনের বড় দারোগা এই বাস-এ ভাগলপুর যাচ্ছেন। সঙ্গে একজন দোস্তও আছেন। উনি যখনই বাস-জার্নি করেন তখন এক নম্বর সীটে বসেন। কামাল জানতে চাইল, ওঁর টিকিটের নম্বর কত? —সেপাইটা হেসেই বাঁচে না। পুলিশের দারোগা আবার বাসের টিকিট কাটে নাকি কোনদিন? কামাল স্রেফ জানিয়ে দিল— তোমার বড়সাহেব যদি বি. টিকিটের যাত্রী হন তাহলে তাঁকেই বল পিছনের সীটে গিয়ে বসতে। আমি সীট ছাড়ব না।

সেপাইটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বিহাররাজ্যের চৌহদ্দির মধ্যে এ জাতীয় কথা কেউ বলতে পারে তা ওর বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ক্রমশ উষ্ণবাক্য বিনিময়। প্রায় হাতাহাতি হবার অবস্থা যখন তখন বাস ছাড়তে আর পাঁচ-মিনিট, ড্রাইভার এসে বসল তার আসনে। জানতে চাইল, ক্যা বাত?

সেপাই তাকে বুঝিয়ে বলার অবকাশ পেল না তার আগেই দারোগাবাবার আবির্ভাব ঘটল বাসের অভ্যন্তরে। তার সঙ্গে একজন ষন্ডামার্কা লোক। কামাল পরে জেনেছিল—সে লোকটা মুঙ্গের অঞ্চলের একজন নামকরা অ্যান্টিস্যোশাল। দু-তিনটে ডাকাতি এবং একটি নরহত্যার মামলা ঝুলছে তার মাথায়, যদিও সদাশয় হাইকোর্টের দয়ায় সে জামিনে খালাস আছে।

সেপাইটা দারোগাবাবাকে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা।

দারোগা স্বয়ং কেসটা টেক্‌-আপ্‌ করলেন। বিশুদ্ধ ভাগলপুরী দেহাতী ঠেট্‌-হিন্দিতে বললেন. আপনাদের দুজনকে এই সেপাইটা বারে বারে বল্‌ছে সতের-আঠারো সীটে গিয়ে বসতে। আপনি শুনছেন না কেন?

কামাল বললে, তার একটি মাত্র হেতু। আমি অগ্রিম টাকা দিয়ে সীট নম্বর ওয়ান অ্যান্ড টু রিজার্ভ করেছি।

দারোগা বললেন, কই, দেখি আপনার টিকিট?

কামাল তৎক্ষণাৎ টিকিট দুটো বার করে দারোগাকে দেখালো। লোকটা টিকিটের নম্বর দুটো তাকিয়েও দেখল না। হাতে নিয়ে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে বললে, এখন? এখন তো মানবেন যে, আপনি বিনা-টিকিটের যাত্রী? যান, পিছনের ঐ দুটো সীটে গিয়ে বসুন! না হলে...

—না হলে?

—অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।

কামালও রুখে ওঠে, করুন! দেখি আপনার হিম্মৎ। তবে একটা কথা আপনাকে এখনি জানিয়ে রাখি, দারোগা-সাহেব। আমার নাম কামালুদ্দীন চৌধুরী—আজিজুল হক-সাহেবের নাম শুনেছেন? আপনাদের ক্যাবিনেটে এডুকেশনং মিনিস্টার? তিনি আমার চাচেরা ভাই। রিস্তেদার। আপনার হিম্মৎ থাকে তো পরান আমার হাতে হাতকড়া। এক বাস লোক সাক্ষী রইল। দেখি আপনার হিম্মৎ। আপনিও দেখবেন, ডিমোশান না হলেও একমাসের মধ্যে এ স্টেসান থেকে আপনাকে বদলি করাতে পারি কি না!

দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সে বাড়িয়ে দিল দারোগার দিকে।

আজিজুল হক-সাহেবের নামটা কামাল সেদিনই খবরের কাগজে দেখেছে। বিহারের এডুকেশন

মিনিস্টার।

দারোগা ওর দিকে পুরো দশ-সেকেন্ড জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। কামালও বাঘের বাচ্চা। সেও তাকিয়ে রইল দারোগার দিকে। কারও চোখে পলক পড়ল না।

তারপর দারোগা কামালকে কিছু বলল না। ড্রাইভারকে বলল, আমি ঐ চায়ের দোকানে গিয়ে বসছি। আমার অর্ডার ছাড়া বাস ছাড়লে তোমার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। পকেট থেকে নোটবই বর করে গাড়ির নম্বরটা টুকে নিয়ে নেমে যেতে গেল সে। ড্রাইভার জোড়হাতে জানতে চাইল, মেরা ক্যা কসুর, হুজৌর?

—তোমার ডিফারেনশিয়াল বক্সে গড়বড়ি আছে। টাইরড-এর নাটগুলো টাইট দেওয়া নেই। আমি থানায় খবর পাঠাচ্ছি। মোটর-ভেহিক্‌ল্‌স্ ইন্সপেক্টার এসে দেখুক। সে ছাড় দিলে বাস ছাড়বে।

দারোগা নেমে গেল বাস থেকে। গিয়ে বসল চায়ের দোকানে। দারোগার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাসশুদ্ধ লোক ঘনিয়ে এল। কামালের হাতে-পায়ে ধরতে। এ অঞ্চলের রেওয়াজ, দারোগাবাবার জন্য পয়লা নম্বর সীট অলিখিতভাবে রিজার্ভ। কত লোকের কত জরুরি কাজ। সব ভেস্তে যাচ্ছে ওদের দুজনের জেদাজেদিতে। কামাল বলল, আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। দারোগা যদি বিনা টিকিটে যেতে চায় তবে তাকে ঐ সতের নম্বর সীটে বসে যেতে হবে।

বাসের ড্রাইভার বললে, কিন্তু আপনার কাছে তো এখন এক-দুই নম্বর টিকিট নেই, স্যার। আভি তো কোই টিকস্ ভি নহি!

—আছে! পাটনায় চলে যাও এখন ক্যাবিনেট সেশন চলছে। এডুকেশন মিনিস্টারের জেব-এ আমার দুখানা টিকিটই রাখা আছে! গিয়ে খোঁজ নাও। আমার নাম কামালুদ্দীন চৌধুরী—এই দেখ আমার পাসপোর্ট। তাঁর নাম আজিজুল হক। আমি তাঁর রিস্তেদার। তাঁর বাড়িতেই আমি উঠেছি পাটনায়। তিনি এডুকেশন মিনিস্টার। আমি ঐ দারোগাকে কানে ধরে ওঠবোস করাবো! তোমরা দেখে নিও!

এরপর আর কেউ কোন কথা বলতে সাহস পেল না। অনেকেই নেমে গেল বাস থেকে। হয় বাইরের হাওয়া খেতে অথবা আর কোন বাস ভাগলপুর যাচ্ছে কি না জানতে। ড্রাইভারও নেমে গেল চায়ের দোকানে। করজোড়ে দারোগাবাবাকে সে কী নিবেদন করল বোঝা গেল না। কান ধরে ওঠবোস করানোর কথা সে নিশ্চয় বলেনি; কিন্তু এটুকু হয়তো বুঝিয়ে বলতে পেরেছে যে, এই কামালুদ্দীন সাব হক-সাহেবের রিস্তেদার। পাটনায় মিনিস্টারের সরকারি কোয়ার্টার্সেই উঠেছেন। ওঁর পকেটে পাসপোর্ট আছে। কেওকেটা ব্যক্তি। কিন্তু ব্যাপারটা এখন প্রেস্টিজের লড়াই-এ পরিণত হয়েছে। দারোগা এখন অন্য রাস্তা ধরেছে। সে এখন বলছে, বাসটাকে রুখেছে অন্য কারণে। ওর যান্ত্রিক গন্ডগোল আছে। ডিফারেনশিয়াল বক্সে, আর টাই-রডে। সে এ বাসে আদৌ যাবে না। থানা থেকে জিপ আনবার আদেশ দিয়েছে। কিন্তু মোটার ভেহিক্‌ল্‌স্ ইন্সপেক্টারের একটা ইন্সপেকশান জরুরি। এতগুলো ইনসানের জান নিয়ে কথা...

দীপান্বিতা এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। কামালের মনে হল সে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে ওর কানে-কানে বললে : বর্তে দেনা। O.K. ! বর্তে চাইছে যখন নিচে থেকে।

কামাল চমকে ওঠে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে দীপান্বিতা সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কামাল জিগ্যেস করতে গেল, 'কী বললে? তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি'—কিন্তু সে কথা বলার আগেই দীপান্বিতা ওকে প্রশ্ন করে : হঠাৎ তুই-তোকারি শুরু করলে যে! আর কী বললে বলত ? বুঝতেই পারলাম না আমি।

কামাল সবিস্ময়ে স্ত্রীকে বললে, আমি বললাম? তোমাকে ? কী বললাম?

—তাই তো জানতে চাইছি। মনে হল তুমি বললে, "বসতে দেনা, O.K বসতে চাইছে যখন নিচে দেখে।"

দুরন্ত বিস্ময়ে কামাল বলে, ঠিক শুনেছ? 'বসতে' বলেছি আমি?

—না! আমার মনে হল, তুমি বললে : ' বর্তে। কিন্তু তার তো কোন মানে হয় না। তাই ভাবলাম..

কামাল বাধা দিয়ে বলল, না। আমি ও কথাটা বলিনি।

—তবে কে বলেছে?

—জানি না। আন্দাজ করছি যাত্রীদের মধ্যে কেউ একজন 'ভেন্ট্রিলোকুইস্ট' আছে।

—তার মানে?

—ও এক রকমের ম্যাজিক। দূর থেকে তারা এমনভাবে কথা বলে যাতে মনে হয় পাশের লোক বলছে।

দীপান্বিতা জবাব দেবার সময় পায় না। তার আগেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে বললেন, বাবুজি! গোস্তাকি মাফ্ করবেন। আমার নাম হরদয়াল মিশ্র। আমার নাতি একটা স্কুটার অ্যাক্সিডেন্ট করে ভাগলপুর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ভোর রাতে টেলিফোন পেয়েই ছুটেছি। আমার স্ত্রীও...

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধাকে দেখিয়ে দিলেন। বৃদ্ধা পিছনের সীটে বসেছিলেন। উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দু-চোখে দুটি জলের ধারা। হাত দুটি জোড় করা।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল কামাল। বললে, আপনাদের দেরি করিয়ে দিয়েছি বলে মাফি চাইছি। এস নিতা— আমরা ঐ পিছনের সীট দুটোয় গিয়ে বসি।

তিন-চার নম্বরের যাত্রী দুজন বললেন, না, না, অত পিছনে যাবেন কেন? তকলিফ হবে আপনাদের। আমরা দুজন সতের-আঠারয় গিয়ে বসব। আপনারা ঠিক পরের এই দুটো সীট...

কামাল বাধা দিয়ে বললে, বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া। কিন্তু, কী জানেন? ওই ঘুষখোর দারোগার ঠিক পিছনেই আমি বসতে পারব না। ওর গা দিয়ে ঘুষের বদ-বু বার হচ্ছে!

মুখ লুকিয়ে সবাই হাসল। কামাল সস্ত্রীক সরে এল সতের-আটারয়! দারোগাবাবা স্বচক্ষে দেখলেন। তবু গাত্রোত্থান করলেন না। ড্রাইভার-কন্ডাকটার বোধকরি কামালের হয়ে মাফি মাঙল। তারপর উনি ওঁর অ্যান্টিস্যোশাল সহকারী দোস্তকে সঙ্গে নিয়ে এসে বাসে উঠলেন। সীট নং এক-দুইয়ে।

বাসটা ছাড়ল!

আমি বললাম, এই তোর কিস্‌সা? এর মধ্যে অলৌকিকত্ব কোথায়? তুই ঠিকই ধরেছিলি। বাসে নিশ্চয় কোন 'ভেন্ট্রিলোকুইস্ট' ছিল।

কমল ঘড়ি দেখে বলল, পৌনে চারটে বাজল। নে ওঠ! আর দেরি করা চলবে না।

—কেন? আমার তো সাড়ে ছয়টায় সাহিত্যসভায় ফিরে যাবার কথা।

—না, তোর নয়। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চারটেয়।

—কার সঙ্গে? কোথায়?

—সদর হাসপাতালে। বাঃ মনে নেই, মিশিরজীর সেই নাতিটি স্কুটার অ্যাক্সিডেন্ট করে হাসপাতালে পড়ে আছে।

—তার সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক?

—-Love thy neighbour' এর সম্পর্ক। ওঠ্ ওঠ্। ঠিক চারটে থেকে ভিজিটিং আওয়ার্স।

অগত্যা পাগলটার সঙ্গে রিকসা চেপে এসে হাজির হলাম ভাগলপুরের সদর হাসপাতালে। দুর্ভাগ্য আমাদের—সেই স্কুটার দুর্ঘটনার রোগীটির ছুটি হয়ে গেছে। তার বেড-টা খালি। নতুন রোগী এখনো আসেনি।

আমি জানতে চাই, এখন কী করবি?

—দোতলায় যাব। নিতা এখানেই দোতলার একটা কেবিনে আছে।

—নিতা? দীপান্বিতা! কেন? কী হয়েছে তার?

—অহেতুক তর্ক করছিস কেন, তর্কচঞ্চু? আয় আমার সঙ্গে সঙ্গে। চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে।

দ্বিতলে কেবিনের হাফ্ রিভলভিঙ্ দরজার নিচ দিয়ে দেকা যাচ্ছিল ঘরে আরও লোক রয়েছেন। দরজা ঠেলে ঢুকতেই একটি প্রৌঢ়া উঠে দাঁড়ালেন। কামালকে হিন্দিতে বললেন, আসুন জামাইবাবু। আন্দাজে বুঝলাম, তিনিই শিবানী। সঙ্গে বোধহয় তাঁর স্বামী তিওয়ারীজি। দীপান্বিতা শুয়ে আছে। বাঁ-পায়ে প্লাস্টার করা। ঠ্যাংটা দড়ি দিয়ে টাঙানো। ওকে শেষ যখন দেখেছিলান তখন ও অষ্টাদশী। এখন আটষট্টি। না চিনিয়ে দিলে পথেঘাটে দেখলে নিশ্চয় চিনতেই পারতাম না। কমল বললে, দেখ, কাকে ধরে এনেছি!

দীপান্বিতা হাত দুটি জোড় করে বললে সেই একই কথা। পথেঘাটে দেখলে তোমাকে চিনতেই পারতাম না, নরেনদা! এ কী চেহারা হয়েছে গো তোমার! এক্কেবারে বুড়ো!

আমি বলি, বটে! আর তুমি! তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, পাড়ার ছেলেদের রাতের ঘুম-কাড়া। চকিত হরিণীপ্রেক্ষণা...

কমল বলল, থাক থাক! ঐখানেই থাম্! পরের লাইনটা অনুচ্চারিতই থাক...

আমি বলি, পড়ে গিয়ে পা ভাঙলে কী করে?

দীপান্বিতা বলে, ওমা পড়ে যাব কোন দুঃখে! আমি কি তোমার মতো বুড়ো! তোমার বন্ধু বলেনি? আমরা দুজন যে যমের দ্বার থেকে ফিরে এলাম!

আমি কমলের দিকে ফিরতেই ও বললে, হ্যাঁ, সিরিয়াস্ বাস-অ্যাক্সিডেন্ট। সুলতানগঞ্জ থেকে ভাগলপুর আসার পথে। কাগজে পড়িসনি? আমার গায়ে আঁচড়টি লাগেনি, কিন্তু চারজনের অবস্থা খুব সিরিয়াস!

—কী হয়েছিল?

—তুই বিশ্বাস করবি না, নরেন, কিন্তু থানা-ইন-চার্জ বানিয়ে বানিয়ে যে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে গাড়িটা রুখে দিয়েছিল, ঘটনাটা বাস্তবে তাই। বাসের টাইরডের নাট-বল্টুগুলো আল্‌গা হয়ে গেছিল। কী আশ্চর্য কাকতালীয় মর্মান্তিক প্রেডিক্‌শান। তাই নয়?

আমি বলি, তারপর?

বাসটা ভাগলপুর শহর থেকে তখনো মাইলদশেক দূরে। গতিবেগ ঘণ্টায় পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। হঠাৎ স্টিয়ারিঙ ঘোরাতে গিয়েই ড্রাইভার টের পায় টাইরড কেটে গেছে। গাড়ি তার নিয়ন্ত্রণে নেই। মাতালের মত সারা রাস্তা জুড়ে টালমাটাল ছুটছে। ড্রাইভার অবস্থা বুঝে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। কন্ডাকটারও তাই। গাড়িটা গিয়ে যখন পথপার্শ্বের প্রকান্ড রেইনট্রি গাছে প্রচন্ড ধাক্কা মেরে উল্টে যায় তখন বাসের বত্রিশজন যাত্রীই এ ওর ঘাড়ে। জনা পনের ফার্স্ট-এড নিয়ে বাড়ি যায়। সাত-আটজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। বাকিরা আমারই মতো অনাহত। একজন একেবারে মরণাপন্ন। বাঁচার আশা খুবই কম। দীপান্বিতা আগ বাড়িয়ে বললে, লোকটা জামিনে খালাশ ছিল। দু-নম্বর সীটে বসেছিল। একটা পাক্কা অ্যান্টিস্যোশাল।

আমি ঝুঁকে পড়ে বলি, আর এক নম্বর সীটের যাত্রীটি?

দীপান্বিতা বললে, স্যাড কেস! লোকটা লোকাল থানার দারোগা। তার মৃতদেহকে সনাক্ত করাই কঠিন হয়ে গেছিল। গাছের ধাক্কাটা ডিরেক্টলি ওরই ওপর পড়ে। একেবারে থেঁৎলে গেছিল!

আমি কমলের দিকে ফিরতেই ও বলে, অলৌকিক নয় ভাই! বিশ্বাস কর : পুরোপুরি লৌকিক! এমনটা তো হয়েই থাকে। ইট্‌স্ জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট।

দীপান্বিতা তার স্বামীকে বলে, শুনছ? একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। শুয়ে শুয়ে ঐ কথাটাই ভাবছিলাম তো? হঠাৎ সল্যুশান পেয়ে গেছি।

কমল জানতে চায়, কোন কথাটার?

—ঐ অজ্ঞাত ভেন্ট্রিলোকুইস্টের উচ্চারিত বাক্যটার পাদপূরণ হয়ে গেছে। তুমি-আমি দুজনেই ভুল শুনেছিলাম—মানে ঠিকই শুনেছিলাম, ভুল বুঝেছিলাম। শব্দটা 'বর্তে' নয় 'বসতে'ও নয়, 'মরতে' 'দেনা' নয় 'দে না', আর 'O.K.' নয় 'ওকে'। ভেন্ট্রিলোকুইস্ট যা বলেছিলেন তা, "মরতে দে না ওকে! মরতে চাইছে যখন নিজে থেকে।"

শিবানী এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এবার ধমক দিয়ে ওঠে, এই জন্যেই তোদের ম্লেচ্ছ বলে। ম্যাজিক হতে যাবে কোন দুঃখে? এ তো মা বিশালাক্ষীর দৈববাণী!

কামাল জানতে চায়, বিশালাক্ষী না বিষলক্ষ্মী? তারপর আমার দিকে ফিরে বলে, তুই কি বলিস, সাহিত্যিক? 'ভেন্ট্রিলোকুইস্‌ম্' না 'ডিভাইন জাস্টিস?' আই মীন, লৌকিক না অলৌকিক?

‘‘সন্তান মোর মার’’

(আশির দশক)

।। এক ।।

১৯৪৯ সাল। আষাঢ় মাস। ভাগলপুরের গঙ্গা এখনো কূল ছাপায়নি। বর্ষা সবে নেমেছে। বঙ্গোপসাগরের বার্ষিক আশীর্বাদ মৌসুমী মেঘের বাহন হয়ে এসে পৌঁছেছে গাঙ্গেয় উপত্যকায়। ভাগলপুরেও। দু-হাজার বছর আগে যখন ভাগলপুরের নাম ছিল চম্পানগরী, তখনো যেমন আকাশ কালো করে ছুটে আসত মেঘের দল, আজও তাই আসে।

আজ জুম্মাবার। শেষ দুটো পিরিয়ড অফ। তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজ থেকে বেলা তিনটে নাগাদ রওনা হলেন প্রফেসর জামাল উদ্দীন চৌধুরী-সাহেব। এক হাতে ঝোলা ব্যাগ অপর হাতে ছাতা। এখন অবশ্য বৃষ্টিটা ধরেছে। পথেঘাটে ছোপ ছোপ জল।

প্রফেসর চৌধুরী অবশ্য বাস্তবে 'প্রফেসর' নন, এতদিনে রিডার। তবে পাড়া-বেপাড়ার সবাই ওঁকে ডাকে ঐ 'প্রফেসর' নামে। পনের বছর আছেন ওই কলেজে। বহুদিনের প্রাচীন কলেজ। শতবার্ষিকী হয়ে গেছে দু বছর আগে। বর্তমানে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কোয়েডুকেশন কলেজ। ওঁর বয়স যে চল্লিশের বেড়া ডিঙিয়েছে তা হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না। মুখে চাপ দাড়ি, অথচ গোঁফটা কামানো। মাথার চুল কাঁধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাবরি ধরনের। পাক ধরেনি এখনো। কুচকুচে কালো। সেই কালো চুলের সঙ্গে মানানসই তালশিরের সফেদ টুপি। কলেজে উনি ইংরেজি পড়ান। এই কলেজেরই ছাত্র; এই ভাগলপুর থেকেই ইংরেজিতে এম. এ. করেছেন। ওঁর হাতব্যাগে একটি বই — পাবলিক লাইব্রেরির। ইচ্ছে, বাড়ি ফেরার পথে বইটি বদল করে নতুন একখানা ইংরেজি উপন্যাস নিয়ে যাবেন। শনি-রবি ছুটি। অকৃতদার একা মানুষ। বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। সময় কাটে না।

কলেজ থেকে বার হয়ে ছাতাটা খুললেন। বৃষ্টি নেই। কিন্তু রোদের তেজ আছে। রাস্তাটা পার হয়ে উত্তরমুখো বাস স্টপেজে এসে দাঁড়ালেন।

সেখানে আগে থেকেই দুটি ছাত্রী লেডিজ ছাতা মাথায় বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওদের বাঁ-হাতে বই। ডানহাত তুলে কপালে ছুঁইয়ে বললে, আদাব, স্যার!

'নমস্তে, সার' শুনতে অভ্যস্ত চৌধুরী-সাহেব একটু চমকে উঠলেন।

প্রতিনমস্কার করে বললেন, আদাব। তোমরা দুজন তো ফোর্থ ইয়ারের। নয়?

কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ইদানীং এত বেড়ে গেছে যে, প্রত্যেকের নাম আর আগেকার জমানার মতো স্মরণে রাখতে পারেন না।

নিকটবর্তিনী বললে, আমার নাম জহুরা। এ ফতিমা। আমরা দুজনেই ফোর্থ ইয়ারের, তবে ইংলিশ অনার্স নয়।

চৌধুরীসাব হেসে বললেন, সেটা না বললেও চলবে। অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেককেই নামে চিনি। তা তোমাদের তো কোনদিন এই রুটের বাসে যেতে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

জহুরা বললে, না স্যার, আমরা একটু অন্য দিকে থাকি। আজ আমাদের এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে জেনারেল হাসপাতালে যাচ্ছি — ভিজিটিঙ আওয়ার্স চারটে থেকে সাড়ে ছয়টা। ওর সঙ্গে দেখা করে যে যার বাড়ি যাব।

কলেজে কোএডুকেশন। চৌধুরী মেয়েটিকে প্রশ্ন করলেন, ফোর্থ ইয়ারে পাস-অনার্স মিলিয়ে এখন কতজন ছাত্রী পড়ে?

জহুরা তার বান্ধবীর দিকে তাকায়। সে নিরুত্তর শ্রাগ করে। জহুরা বলল, ঠিক সংখ্যাটা বলতে পারব না, স্যার। তবে মনে হয়, জনাকুড়ি।

— তার মধ্যে কতজন মুসলমান?

এবার উত্তর দিতে জহুরাকে কোন অসুবিধা ভোগ করতে হল না। বললে, এই আমরা দুজনই।

চৌধুরী-সাহেব ঝুঁকে পড়ে বাস রাস্তার শেষ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কোনও বাস আসছে না। বিপরীত পথের দক্ষিণমুখী একটি সাত নম্বরের বাস রাস্তার ও প্রান্তে এসে দাঁড়ালো। যাত্রী নামল না কেউ। উঠল কিছু। বাসটা ছাড়ল।

চৌধুরী বললেন, তোমরা কি জান. সারা ভারতে সব জাতের নারিদের মধ্যে সাক্ষরতার অনুপাত প্রায় চল্লিশ শতাংশ? সে হিসাব মুসলমান নারীদের সাক্ষরতার অনুপাত কত হবে আন্দাজ করতে পার?

দুজনেই নেতিবাচক মাতা নাড়ল। চৌধুরী বললেন, এগারো শতাংশ। অথচ ভাগলপুরের এই আমাদের কলেজে দেখা যাচ্ছে মুসলিম ছাত্রীর অনুপাত সে হিসাবেও কম।

ফতিমা বলে, শুধু একটা ইয়ার ধরে হিসাবটা করা কিন্তু ঠিক স্টাটিসটিকাল বাস্তবানুগ হচ্ছে না স্যার।

— করেক্ট! কিন্তু আমি গোটা কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিয়ে এই স্যাটিসক্সটিক্সটা আগেই করে দেখেছি। সর্বভারতীয় সাক্ষর মহিলার ক্ষেত্রে মুসলমান সাক্ষর মহিলার শতাংশ যেক্ষেত্রে আটাশ, — চল্লিশে এগারো, শুধু ভাগলপুর জেলায় তা আটত্রিশে ষোলো। আর আমাদের কলেজে সব ইয়ার মিলিয়ে ছাত্রী সংখ্যার মাত্র তের শতাংস মুসলমান। ছয় শতাংশ খ্রীস্টান, আর বাদ বাকি একাশি শতাংশ হিন্দু! তার মানে গোটা ভারতের তুলনায়, গোটা জেলার তুলনায় ভাগলপুর শহরে মুসলমান পরিবারেরা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তত উৎসাহী নয়। হিসাব তাই বলছে না?

ওরা কোন জবাব দিল না। উৎসাহ দেখালো না এ বিষয়ে নিয়ে আলোচনাটা চালিয়ে যেতে। এদিকে বাসের কোনও পাত্তা নেই। চৌধুরী বললেন, এক কাজ করা যাক। একটা অটো নিয়ে, চল আমরা তিনজনেই জেনারাল হস্‌পিটালে চলে যাই। ওখান থেকে আমি পায়ে হেঁটে লাইব্রেরিতে চলে যাব সেখানেই যাচ্ছি আমি। লাইব্রেরিটা হাসপাতাল থেকে মিনিট দশেকের পায়ে-হাঁটা দূরত্বে।

ছাত্রী দুজন রাজি হল। চৌধুরী একটা অটো রিক্‌শাকে ডাকলেন। কিছুটা দরাদরি করে তিনজনে উঠে বসলেন। জহুরা বসল মাঝখানে। অটো রিক্‌শাটা ছাড়ল। কথোপথন চালিয়ে যেতে চৌধুরী প্রশ্ন করেন, তোমাদের বান্ধবীর কী হয়েছে? আই মিন, অসুখটা কী জাতীয়?

জহুরা জবাব দিল না। ফতিমার দিকে আবার তাকালো। সে ও-পাশ থেকে বলল, ঠিক জানি না, স্যার। শুনেছি পয়েজনিং কেস!

— পয়েজনিং! কেউ ওকে বিষ খাইয়েছে? বধূহত্যা?

—না, স্যার! ও...মানে, ঠিক জানি না...শুনেছি, সুইসাইড করতে চেয়েছিল।

এর পর প্রতিবর্তী প্রেরণায় যে প্রশ্নটা ওঠার কথা প্রফেসর চৌধুরী সেটা উচ্চারণ করলেন না। জানতে চাইলেন না — কোন্ অসহ্য হেতুতে একটি তরুণী এই রূপরসশব্দ-গন্ধস্পর্শময় পৃথিবীর সব আকর্ষণ হারিয়ে 'বামির হাতে দীপশিখাটির' মতো একেবারে নিঃশেষে মুছে যেতে চেয়েছিল।

জহুরা এবার নিজে থেকেই বলে, আপনি হয়তো ওকে চিনবেন, স্যার। বছরতিনেক আগে আমাদের সঙ্গে পড়ত। ফার্স্ট-ইয়ারেই বিয়ে হয়ে যায়। কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে সংসার করতে যায়।

—কী নাম বল তো?

— স্মৃতিলেখা দ্বিবেদী!

—ইয়েস! আই রিমেম্‌বার। স্মৃতিলেখা। বেশ ফর্সা, মিডিয়াম হাইট, বোধহয় বাবুপুর থেকে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করত।

জহুরা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, তবে তো স্যারের সব কিছুই মনে আছে। মানে ওর গায়ের রঙটা পর্যন্ত।

শ্যামাঙ্গী জহুরা, এ কথার কোন অভিমান ছিল কি না ভ্রূক্ষেপই করলেন না অধ্যাপকমশাই। জবাবে বললেন, হ্যাঁ, সব কিছুই মনে আছে, কারণ ওর দাদাও ছিল আমার ছাত্র। বিশ্বনাথ তোমাদের চেয়ে দু বছরের সিনিয়ার। একসঙ্গে ভাইবোনে বাবুপুর থেকে বাসে করে কলেজে আসত। তা স্মৃতিলেখা হঠাৎ...

মাঝপথেই থেমে যান। অটোরিক্‌শাটা এসে হাসপাতালের গেটের বাইরে দাঁড়াল। চৌধুরী ওদের পয়সা মেটাতে দিলেন না। ওরা দুজন জানত স্মৃতিলেখার কেবিন নম্বর। ফলে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই ওঁরা এসে পৌঁছলেন ফিমেল ওয়ার্ডের দ্বিতলে।

দুর্ভাগ্য ওঁদের। কেবিনের সামনে একটা বোর্ড ঝোলানো আছে : 'নো ভিজিটার্স অ্যালাওড'!

ছাত্রী দুজন বললে, বৃথাই দৌড়াদৌড়ি হল। সোমবারে আবার এসে খোঁজ নেব বরং। চৌধুরী বললেন, তোমরা তাহলে যাও। এখানে আমার একটি ছাত্র ডাক্তার হিসাবে চাকরি করে। এলাম যখন তখন দেখে যাই, সে আছে কি না।

এবার ওঁর ভাগ্য ভাল। ডক্টর কুমার ঘরেই ছিলেন। ভিজিটার্স স্লিপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর কুমার একেবারে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন, আসুন স্যার! আপনি আবার স্লিপ দিয়েছেন কেন? সোজা নক্‌ করে ঘরে ঢুকতেন।

চৌধুরী বলেন, তাই কি পারি? তুমি যে তখন কোনও রোগিণীকে পরীক্ষা করছ না তা বাইরে থেকে কী করে বুঝব?

—যা হোক। কী খাবেন বলুন, চা-কফি না ঠাণ্ডা? তার আগে বলুন, হাসপাতালে এসেছিলেন কেন? কোন আত্মীয়-টাত্মীয় কি অসুস্থ হয়ে অ্যাডমিটেড হয়েছেন?

—হ্যাঁ। তবে আত্মীয় নয়, ছাত্রী : স্মৃতিলেখা দ্বিবেদী। অবশ্য বিয়ের পর এখন নিশ্চয়ই দ্বিবেদী উপাধি নয় ওর।

— পয়েজনিং কেস? অ্যাটেম্পটেড্ সুইসাইড?

—সেই রকমই তো শুনেছি। ঠিক জানি না।

—কেসটা ঠিকই শুনেছেন। নামটা ভুল!

—তার মানে?

—মেয়েটি প্রচুর পরিমাণে স্লিপিং পিল খেয়ে আত্মহত্যা করতেই চেয়েছিল। তবে ওর নাম স্মৃতিলেখা নয়—শুধু 'দ্বিবেদী' উপাধিটাই বদলায়নি—বিয়ের পর ওর গোটা নামটাই পালটে গেছিল, স্যার। হাসপাতালে যে রোগীটি এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে তার নাম : জুলেখা আহ্‌মেদ!

—আই সি! তার মানে ও একটি মুসলমান ছেলেকে সাদি করেছিল।

—তাই করেছিল। আর সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতেই পরশু দিন সুইসাইড করতে চেয়েছিল!

প্রফেসর চৌধুরী নীরব রইলেন। ডক্টর কুমার নিজে থেকেই বললে, আয়াম সরি স্যার। যদি আপনার মনে আঘাত দিয়ে থাকি! কিন্তু আমি যা বলেছি তা নির্জলা সত্য! মেয়েটি জীবনে একটিই ভুল করেছে : একটি মুসলমান ছেলেকে ভালবাসা।

চট করে উঠে দাঁড়ালেন অধ্যাপক চৌধুরী। বললেন, তুমি ব্যস্ত মানুষ। বেশিক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না।

—না, স্যার। বসুন! আপনি আমার উপর রাগ করেছেন। কিন্তু পুরো-কেস-হিস্ট্রিটা শুনলে আর আমার উপর রাগ করতে পারবেন না।

—তুমি কি এখন আমাকে ওর পুরো কেস হিস্ট্রিটা শোনাতে চাও?

—না, স্যার। আমি নই। তবে ঐ মেয়েটির দাদা এসে বসে আছে কাল থেকে—সারাদিন খায়নি-দায়নি, বাড়িও যায়নি। তার বোন বাঁচল কি মরল তা সে না জেনে যাবে না। রাত্রিতে ও বাড়ি ফেরেনি। সেও বোধহয় আপনার ছাত্র। তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। সেই আপনাকে কেসটা বলবে। আমি বরং আবার ক্ষমা চেয়ে নিই—যদি আমার কথায় আঘাত পেয়ে থাকেন।

ডক্টর কুমারের আর্দালি ভিজিটার্স ওয়েটিং রুম থেকে ডেকে নিয়ে এল বিশ্বনাথ দ্বিবেদীকে। চুল উস্কো-খুস্কো। গায়ে ময়লা হাফশার্ট। বোতামগুলো লাগানো নয়। পরনে জিন্‌স্-এর প্যান্ট, পায়ে চপ্পল। একদিনেই বেচারি বাজে-পোড়া তালগাছের মতো হয়ে গেছে। অধ্যাপক চৌধুরীকে সে চিনতে পারল ভালই। দু হাত তুলে নমস্কার করে বললে, আপনি স্যার, জুলেখাকে দেখতে এসেছেন? খবর পেলেন কার কাছে?

জামালুদ্দীন সে-কথার জবাব দিলেন না। ওর একটি বাহুমূল দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে ডক্টর কুমারকে বললেন, ঠিক আছে। আজ চলি। কাল বিকালে এসে জেনে যাব জুলেখা কেমন আছে।

ওর বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করে বললেন, আয় বিশ্বনাথ।

বাইরে এসে বললেন, ডাক্তার কুমার বলল, তুই কাল থেকে এখানে পড়ে আছিস্। বাড়ি যাসনি। কেন?

—বাড়িতে এখন কেউ নেই, স্যার। সদরে তালা দিয়ে আমার বউ বাপের বাড়ি চলে গেছে বাচ্চাটাকে নিয়ে।

—আই সি! আজ খেয়েছিস কী?

—খেতে ইচ্ছে করছে না স্যার, কয়েক কাপ চা খেয়েছি শুধু।

—বুঝেছি। আয় আমার সঙ্গে।

ওকে নিয়ে রাস্তায় নামলেন। কাঁধে ব্যাগ, এক হাতে ছাতা, অপর হাতে দৃঢ়ভাবে তখনো ধরা আছে ছাত্রের বাহুমূল। রাস্তার কলে তখনো জল ছিল। বললেন, মুখ-হাত ভাল করে ধুয়ে নে।

ঝোলা ব্যাগ থেকে ওঁর তোয়ালেটা বার করে দিলেন । চিরুনিটাও

সামনেই একটা মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার। ছাত্রকে নিয়ে এসে বসালেন। বৃদ্ধ দোকানির কাছে গিয়ে নিম্নস্বরে জানতে চাইলেন, আমি বসে খেলে আপত্তি হবে কি?

দোকানি—তারও মাথায় ছোট ছোট চুল, পিছনে টিকি, চোখ তুলে দেখল। বললে, না, না আপত্তি কিসের? তবে আপনারা ঐ কেবিনে গিয়ে বসুন।

জামালউদ্দীন দেখলেন। পর্দা-ঝোলানো একটি কেবিনের ব্যবস্থাও আছে। তার উপর একটি নোটিস বোর্ডে লেখা : জেনানা।

উনি বলতে গেলেন ওঁর সঙ্গে কোনও মহিলা নেই; কিন্তু দোকানি ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, বিশিষ্ট মেহ্‌মানদের জন্য ঐ কেবিনটি সংরক্ষিত। জেনানা সঙ্গে থাক-না-থাক।

চৌধুরী-সাহেব হাসলেন। বুঝলেন ব্যাপারটা। মাথায় অর্কফলার বিজয় বৈজয়ন্তী সত্ত্বেও লোকটা মুসলমান খদ্দেরকে ফেরাতে চায় না—মুসলমানপ্রীতিতে নয়—ব্যবসায়িক হেতুতে। তাই কেবিনের মাথায় যদিও লেখা আছে 'মহিলা', তবু ঘরটা অন্য প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হয়। যেমন চৌধুরী-সাহেবের মতো মৌলবাদী সাজ-পোশাকে যারা পথে-ঘাটে ঘোরা-ফেরা করেন। যাঁদের দেখলেই বোঝা যায়, 'নেড়ে'! তালশিরের টুপিতে, দাড়িতে!

বিশ্বনাথকে নিয়ে উনি মহিলা কেবিনে গিয়ে বসলেন। দোকানের ছোকরা চাকর ফ্যানটা খুলে দিল, টেনে দিল পর্দাটা। দোকানের বৃহত্তর অংশে যেসব হিন্দু মেহ্‌মান বসেছেন তাঁদের চোখের আড়ালে পড়লেন ওঁরা দুজন।

চৌধুরী ছয়খানা করে হিঙের কচুরি, আলুর দম আর জিলাপির অর্ডার দিলেন।

বিশ্বনাথ বললে, অ্যাত কে খাবে?

উনি সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, জুলেখার খসম্ কোথায়?

—লেখার কোনও স্বামী নেই, স্যার!

—মারা গেছে? লেখা কি বিধবা?

—না, না, মারা যাবে কেন? রসিদ লেখাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে।

—রসিদ? ওর স্বামীর নাম রসিদ? কী করত সে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। রসিদ আহমেদ্। রাজপুরে ওদের আদিবাড়ি। ও এই ভাগলপুরেই একটা গ্যারেজে কাজ করত। ওর বাবার মটোরগাড়ি সারানোর রিপেয়ারিং গ্যারেজ আছে। ও নিজে মটোর মেকানিক। অটোমোবাইল এঞ্জিন রিপেয়ারিঙের কাজ জানত। ভাল ফুটবলও খেলতো—সেন্টার হাফে। কী করে ওদের প্রেম মহব্বৎ হয়েছিল জানি না। লেখা তো আমার সঙ্গেই বাবুপুর থেকে বাসে করে আসত। কিন্তু একসঙ্গে ফিরত না। ও একটা কোচিং ক্লাসে পড়ত। আসলে সেটা মিছে কথা। ও কলেজ পালিয়ে রসিদের সঙ্গে ম্যাটিনি শো দেখত। ব্যাপারটা জানা জানি হয়ে যাওয়ায় বাবা একদিন লেখাকে ধরে বেধড়ক পিটল। ব্যস্! পরদিনই সে হাওয়া! থানা কেস নিলই না। থানা অফিসার ছিলেন মুসলমান। তাঁর যুক্তি লেখা প্রাপ্তবয়স্কা।

ইতিমধ্যে খাবার এসে গেছে। চৌধুরী-সাহেব রাতের খাবার ঐ দোকানেই সেরে নিলেন। বাড়িতে অবশ্য হাতে গড়া রুটি আর তরকারি বানানো আছে। নষ্ট হবে না। সেটা দিয়ে কাল নাস্তা সারা যাবে। উনি জানতে চাইলেন, ওরা সাদি করেছে, কতদিন আগে?

—বছর দুই।

—তারপর? রসিদ ওকে তালাক দিল কেন?

—সেটা স্যার, ঠিক জানি না আমি। লেখা খুব বড় জাতের কোন অন্যায় করেছিল নিশ্চয়।

—তারপর? সেই দুঃখেই কি ও বিষ খেয়েছে?

—সেটা তো আছেই। তাছাড়াও ওর ভোগান্তি তো বড় কম হয়নি। দোরে দোরে ভিখারির মতো ঘুরেছে। কেউ ঠাঁই দেয়নি।

সব কথা বিশ্বনাথ জানে না। কারণ বাড়ির সঙ্গে —বাবা, মা, দাদা-বৌদির সঙ্গে ওর নিজেরও সদ্ভাব নেই। ওর অপরাধ—ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সে প্রেমে পড়ে কলেজের এক সহপাঠিনীকে বিবাহ করেছে। মেয়েটি অব্রাহ্মণ, জাতে উগ্রক্ষত্রিয়। ফলে বাবুপুরের পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে ও চলে এসেছে, অগতির গতি ভাগলপুর শহরে। এখানে একটা প্রেস-এ প্রুফ রিডার। ওর স্ত্রী অবশ্য স্কুলটিচারির একটা কাজ পেয়েছে। বিশ্বনাথ স্পষ্ট করে বলেনি, তবে চৌধুরী-সাহেব আন্দাজ করে নিলেন—যেহেতু গৃহিণীর উপার্জন কর্তার চেয়ে বেশি, তাই ঘরওয়ালীর ইচ্ছানুযায়ীই বিশ্বনাথকে দুনিয়াদারি করতে হয়। ওদের একটি সন্তান হয়েছে। কয়েক মাস বয়স। ওর স্ত্রী এখনো মেটার্নিটি লিভে!

চৌধুরী জানতে চাইলেন, তো সদর দরজায় চাবি দিয়ে তোর বউ কোথায় গেছে? এত রাগই বা হল কেন তার?

—লেখা ভাল হয়ে উঠলে তাকে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় দেব বলেছিলাম বলে। গেছে বাপের বাড়ি।

মর্মাহত হলেন চৌধুরী-সাহেব। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন, অনেক নির্যাতনও সয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর মতাদর্শ অত্যন্ত উদার। তাই এ খবরে ওঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আহারান্তে বললেন, তুই আমার বাড়িতে চল। জানিসই তো আমি একা থাকি! সে-কথা জানা ছিল না বিশ্বনাথের। তবু বলল, আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো? —কিসের অসুবিধা? আমি একা মানুষ। আমার একটা নেয়ারের খাট আছে। বাড়তি মশারিও আছে। তুই বাইরের ঘরে শুবি। রাতের খাবার তো মোটামুটি হয়েই গেল কাল সকালে দুজনে নাস্তাপানি সেরে আবার হাসপাতালে এসে খবর নেব—জুলেখার অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি না।

বিশ্বনাথ রাজি হয়ে গেল। বলল, কাল রাতে দু-চোখের পাত এক করতে পারিনি, স্যার। হাসপাতালের ওই ওয়েটিং 'হলে' কী মশা! এক একটা চড়াইপাখির মতো!

হাসলেন চৌধুরী-সাহেব ওর উপমাটা শুনে।

।। দুই।।

জামালুদ্দীন চৌধুরীর আবাসস্থল শহরের একান্তে। গঙ্গার ধারে। জায়গাটার নাম 'বড়িবিবিমহল্লা'। কোন্ নবাব, বা আমীর-ওমরাহের বড়বিবির স্মৃতিবিজড়িত তার হদিস পাওয়া যায় না। কিন্তু ওই মহল্লাটা মুসলমান-অধ্যুষিত। বিশ-পঁচিশটি দ্বিতল ও ত্রিতলবাড়ি. এক এক মোকামে তিন-চারটি পরিবার। মহল্লার একটিকে গঙ্গা, বাকি তিনদিকে হিন্দু পাড়া। জামালসাহেব থাকেন স্থানীয় এক হেকিমের দ্বিতল মোকামের একতলায়। দুখানি ঘর নিয়ে। একতলায় অবশ্য তিনটি কামরা—তৃতীয়টি হেকিম সাহেবের দাওয়াখানা।

জামালুদ্দীন হেকিম-সাহেবের ভাড়াটিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মাসিক কত ভাড়া দেন সেটা হিসাব করতে হলে একটা জটিল অঙ্কের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করতে হবে। প্রথম কথা, হেকিম-সাহেব থাকেন দ্বিতলে—স্ত্রী-পুত্রবধূ-নাতি এবং এক স্বামীত্যক্তা কন্যাকে নিয়ে। পুত্রটি পাটনায় চাকুরিরত—মাঝে মাঝে সপ্তাহান্ত কাটিয়ে যায়। অধ্যাপক মশায়ের নাস্তা এবং রাতের আহার্য উপর থেকে নিয়ে আসে হেকিম সাহেবের সাত বছরের নাতি আবদুল—যে নাকি আবার চৌধুরী-সাহেবের ছাত্র। স্কুলে পড়ে—কিন্তু সকালে বা সন্ধ্যায় তাকে পড়তে আসতে হয় অধ্যাপক মশায়ের কাছে। ফলে জামালসাহেব ঠিক ভাড়াটিয়া নন, বলা যায় পেয়িং গেস্ট। আবার ওদিক থেকে তিনি 'আতালিখ' অর্থাৎ রেসিডেনশিয়াল প্রাইভেট টিউটার।

জামাল-সাহেবের আদি বাড়ি চান্দেরী গ্রামে। ভাগলপুর শহর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে। ভাগলপুর থেকে সুলতানগঞ্জ বা মুঙ্গের যাবার পাকা সড়কের ধারে পাশাপাশি তিনটি চাষীপ্রধান বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বাবুপুর, চান্দেরী আর রাজপুর। বাবুপুর হিন্দুপ্রধান গ্রাম—অবশ্য গ্রামের একান্তে আট-দশ ঘর মুসলমানের বাস। অধিকাংশই মজুরচাষী—'হেঁদু' জোতদারের খেতে দৈনিক হারে মজুরি খাটে। চান্দেরী গ্রামটিতে মুসলমান অধিবাসীর অনুপাত কিছু বেশি। শতকরা পঁচিশ ঘর মুসলমান। এদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কারণ এরা অধিকাংশই জোলা বা তাঁতি। নিজস্ব তাঁত খুব অল্প লোকেরই আছে। সুতার যোগান দেয় রাজপুর গ্রামের মহাজনেরা। তৈরি মাল নিয়েও যায় তারা—হাটবাজারে বেচতে। রাজপুর পুরোপুরি মুসলমান গ্রাম। হিন্দু একঘরও নেই। এভাবে মেরুকরণ হয়েছে স্বাধীনতার ঠিক পূর্বযুগে। 1945-এর ভাগলপুর দাঙ্গার পর। অবশ্য তারপর এই দীর্ঘ চারদশক এ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর হয়নি। ওরা শান্তিতেই বাস করে পাশাপাশি গ্রামে।

জামালুদ্দীনের বাপজান চান্দেরী গাঁয়ের নামকরা লোক : পীরসাহেব। 'পীর' ঠিক নন, তিনি হচ্ছেন প্রাক-স্বাধীনতা যুগের মহা শক্তিধর 'সাঁইপীরের' খাদিম অর্থাৎ সেবক। সাঁইপীরের আজ্ঞাবহ এক জোড়া জিন ছিল; তাদের মাধ্যমে তিনি অনেক বুজুর্গের মোজেজা দেখিয়ে গেছেন. অর্থাৎ দিব্যশক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ। জামালের আব্বাজান তাঁরই খাদিম. দাবি করতেন, পীরবাবা তাঁকে উত্তরাধিকার

সূত্রে ঐ জিনজোড়া উপহার দিয়ে গেছেন। সেই সুবাদে আব্বাজান মাথায় রেখেছিলেন পিঙ্গল জটা, পরনে গেরুয়া লুঙ্গি। মুসলমান সমাজের অনেকেই তাঁর ফুঁ-পাড়া পানি, কবচ-মাদুলি নিয়ে যেতেন। সেটাই তাঁর উপার্জন। আব্বাজান সন্ন্যাসী ছিলেন না তা বলে। জামালুদ্দীনের আম্মাজানের বেহেস্ত গমনের আগেই—যখন তিনি শয্যাশায়ী, উত্থানশক্তিরহিতা, তখনই তিনি জামালের বিমাতাকে নিকা করে ঘরে এনেছিলেন। তখন জামালের বয়স আট।

জামাল তাঁর বাপকে শ্রদ্ধা করতে পারেননি কোনদিনই। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে হত তাঁর রোগজীর্ণা জননী উপেক্ষিতা। বাপের ঐ সব ঝাড়ফুঁক, জলপড়া আর মাদুলি কবচেও তাঁর আস্থা ছিল না। জননীর পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে মাকে মাটি দিয়েই সংসার ত্যাগ করেছিলেন জামাল। তখন তাঁর বয়স দশ।

প্রথমে এক ট্রাক-ড্রাইভারের সাগরেদি। পেটচুক্তি—বিনা মাহিনায়, তাঁকে নানান কাজ করতে হত। গাড়ি ধোয়া থেকে ড্রাইভার-সাহেবের দেহে তৈলমর্দন। কয়েক মাসের মধ্যেই সে কাজ ছেড়ে চলে আসেন ভাগলপুরে। একটি মুসলমান হোটেলে ছোকরা চাকরের কাজ করতে। সেখান থেকে চলে আসেন এক উকিল বাবুর মোকামে। অ্যাডভোকেট জলিল সাহেবের বাড়ির চাকর হিসাবে।

এখানেই তাঁর ভাগ্য ফিরে যায়। অ্যাডভোকেট-সাব ওঁর বুদ্ধিসুদ্ধি দেখে চাকরের পদ থেকে উন্নীত করলেন সংবাদবহের পদে—মেসেঞ্জার পিয়ন। অচিরেই উকিলবাবুর নজর হল ঐ নিরক্ষর ছেলেটা নিজের চেষ্টায় হিন্দিটা শিখে ফেলেছে—সে সাক্ষর! জলিলুদ্দীন গুণীর কদর করতে জানতেন, নিঃসন্তান ভদ্রলোক ওঁকে ভালও বেসে ফেলেছিলেন। কোথাও কিছু নেই একদিন ধেড়ে বয়সে জামালকে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। বললেন, তুই লেখা-পড়া শেখ। তোকে আমি উকিল বানিয়ে ছাড়ব।

উকিল অবশ্য হতে পারেননি জামাল-সাহেব—চেষ্টাও করেননি। উনি যেবছর এম. এ. পাস করেন সেবছর বেহেস্তে চলে যান জলিলুদ্দীন অ্যাটর্নি-সাব।

উকিলবাবুর বিষয় সম্পত্তি অবশ্য কিছুই পাননি তিনি। সে-সব দখল করেছে তাঁর রিস্তেদারেরা, আইন মোতাবেক। কিন্তু জামালুদ্দীন তাঁর পালকপিতাকে আজও সমান শ্রদ্ধা করেন। তাঁর প্রয়াণ-তিথিতে আজও জামালসাহেব একদিনের জন্য ছুটি নেন। সমস্ত দিন উপবাস করেন। সূর্যোদয়ের আগে ভাগলপুরের জামা-মসজিদে পৌঁছে যান ফজরের নামাজে যোগ দিতে। ফিরে আসেন সন্ধ্যার নামাজের পর। দিনটি বিকিয়ে দেন মৌনভাবে ঈশ্বর চিন্তায়—'ইতেকাফ' করে—ঐ প্রয়াত আত্মার শান্তিকামনায়, শ্রদ্ধাবিনম্র হৃদয়ে।

*　　　　*　　　　*

বিশ্বনাথকে নিয়ে এলেন বড়িবিবি মহল্লায় নিজের মোকামে। বললেন, বিশু, তুই বাইরের ঘরে নেয়ারের খাটটা পেতে নে। মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়। তোকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

বিশ্বনাথ বলে, স্যার, লেখার কী হবে? ওর তো কোথাও ঠাঁই হবে না!

জামালসাহেব বললেন! আল্লাহ্‌তালার দুনিয়াটা কি এতই ছোট? রসিদ ওকে 'তালাক' দিয়েছে বলে ওর জীবনটাই কিছু বরবাদ হয়ে যায়নি। ওকে বোঝাতে হবে, মনে সাহস ফিরিয়ে আনতে হবে। বাঁচবার সদিচ্ছটা ওর মনে জাগ্রত করতে হবে। তুই কার কাছে খবর পেলি?

বিশ্বনাথ যা এলোমেলোভাবে বললে তা থেকে এটুকু বোঝা গেল যে, রসিদ যখন জুলেখাকে 'তালাক' দেয় তখন ওরা ছিল রাজপুর। গ্রামের বাড়িতে। কী একটা উৎসবের ছুটিতে ওরা সবাই গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছিল! সেখানেই—যেটুকু শুনেছে বিশ্বনাথ—জুলেখা কী একটা জঘন্য অপরাধ করে ফেলে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। পুত্রবধূকে তো দৈহিক শাসন করা যায় না—তাই রসিদের বাবা, আলিজান, পাঁচ মেহমানের সামনে রসিদের গালেই বসিয়ে দেয় এক বিরাশি-সিক্কার থাপ্পড়।

বলে, হেঁদু মেয়ে সাদি করাব সখ মিটেছে? যা—দূর হয়ে যা তোরা দুটোই! ...রসিদের সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ে জুলেখার উপর। সে এক উঠোনভর্তি মেহ্‌মানের সামনে তিন তিনবার 'তালাক' উচ্চারণ করে তার স্ত্রীকে বর্জন করে।

—তারপর? এক উঠোনভর্তি মানুষ তারপর কিছু করল না?

—কী করবে? রসিদ ওকে তালাক দেবার পর তো সে আর আলিজান সাহেবের পুত্রবধূ নয়। পরিবারের দৃষ্টিতে সে এক 'বেগানা' মেয়ে। তাই ওরা তাকে বাবুপুর গ্রামে পৌঁছে দিয়ে আসে ...বাকিটা কাল বলব, স্যার! আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। গতকাল দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

—ঠিক আছে। তুই শুয়ে পড়।

লাইব্রেরি থেকে বইটা বদলে আনা হয়নি। এত সন্ধ্যা রাতে ওঁর শোওয়ার অভ্যাস নেই। বিশ্বনাথ শুয়ে পড়ার পর উনি বাইরের বারান্দায় একটা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার পেতে বসলেন। এই বারান্দা থেকে গঙ্গা দেখা যায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তবু বেশ কিছু নৌকা ভাসছে মাঝগঙ্গায়। অধিকাংশই মাছমারাদের নৌকা। অনেকে সারারাত নদীতেই থাকবে, পরদিন ভাগলপুর বাজারে টাটকা মাছের জোগান দিতে।

জামালসাহেব বিশ্বনাথের অসমাপ্ত কাহিনীর শেষাংশটা কল্পনায় সম্পূর্ণ করতে থাকেন।

চোখের উপর দেখতে পান : অবগুণ্ঠিতা একটি নতমুখী বালিকাবধূর পিত্রালয় প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য। 'বালিকাবধূ' অবশ্য ঠিক বলা যায় না ওকে। স্মৃতিলেখা জহরা-ফতিমার সহপাঠিনী—তার বয়স আঠারো-বিশ হবেই। তবু মাত্র দু-বছর হল বিয়ে হয়েছে তার। বিবাহিত জীবনের হিসাবে সে দুই বছরের বালিকা—দাম্পত্যজীবনে হাঁটি হাঁটি পা-পা শিখতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে। রাজপুর গ্রামের আট-দশজন নিশ্চয় ওকে বাসে করে নিয়ে এসেছিলেন বাপের বাড়ি, বাবুপুরে। মাইলতিনেকের দূরত্ব। বাসে অনেকেই হয়তো কৌতূহলী হয়েছিল—একটি স্ত্রীলোক-চোরকে কি সবাই থানায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে? ...তারপর? বাবুপুর স্টপেজে পৌঁছে হয়তো স্মৃতিলেখাই অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে নিম্নকণ্ঠে বলেছিল, আর আপনাদের আসতে হবে না। আমি নিজের বাড়ি চিনে যেতে পারব! ...কিন্তু বাসে করে এতদূর যারা এসেছে তারা কি রাজি হয়েছিল? তামাশাটা না দেখে ফিরে যেতে? 'তামাশা' বইকি! হেঁদু গাঁয়ের বামুনের মেয়ে! প্রেম-মহব্বতের খেল দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালালো! বাপ গেলো থানায়—খেদিয়ে দিল বড় দারোগা। সেই বিদ্যেধরী আজ 'তালাক' পেয়ে গাঁয়ে ফিরে এসেছেন। বামুনবাড়িতে তাঁর অভ্যর্থনাটা কী জাতের হল সেই তামাশা না দেখে কি ওরা ফিরতে পারে?

তারপর কি মেয়েটি ফিরে আসে ভাগলপুরে? ছোড়দার কাছে? বিশ্বনাথ দ্বিবেদীর আশ্রয় ভিক্ষা করতে? বিশ্বনাথের স্ত্রী কি ননদকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল? না কি দোরগোড়া থেকেই হাঁকিয়ে দিয়েছিল?

এভাবে একটি স্নেহাস্পদা ছাত্রীর লাঞ্ছনার কাল্পনিক দৃশ্য মনে মনে আঁকতেও খারপ লাগল। উনি উঠে চলে গেলেন গঙ্গার ধারে।

* * *

পরদিন সকালে উঠেই বিশ্বনাথ তাড়াহুড়ো করে হাসপাতালে চলে গেল। নাস্তাপানি না সেরেই। চৌধুরী-সাহেব পীড়াপীড়ি করলেন না। বিশ্বনাথের আপত্তির হেতুটা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। উগ্রক্ষত্রিয় বংশের এক সহপাঠিনীকে বিবাহ করেছে বলেই সে যে তার 'বামনাই-মৌলবাদের' সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছে তার প্রমাণ এখনো পাননি। কাল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে এক টেবিলে খাওয়া অথবা সহোদর ভগ্নীকে বাড়িতে ঠাঁই দিতে চাওয়ার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও।

কিছু পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ বাকি ছিল। সারাটা দিন তাতেই কেটে গেল। আজকের দিনটাও

বর্ষণমুখর। বর্ষা ক্রমে জাঁকিয়ে নামছে। বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা ধরল—বিদায়ী সূর্য একবার মুখ দেখালেন পশ্চিমাকাশে। ঘড়ি দেখলেন চৌধুরী-সাহেব। চারটে বাজে। ছাতাটা নিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন। হাসপাতালের দিকে।

প্রথমেই গেলেন ডক্টর কুমারের কাছে। শুনলেন, রোগিণীর জ্ঞান ফিরেছে। বিপদের আশঙ্কাও আর কিছু নেই। তবে দুর্বল খুব। আরও দু-চারদিন হাসপাতালে রাখা হবে। কোন নতুন উপসর্গ না হলে বুধবার সকালে ওকে বাড়ি যেতে দেওয়া যেতে পারে।

চৌধুরী জানতে চাইলেন, ওকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল কে? ভর্তিই বা করালো কে? তার চেয়ে বড় কথা, জেনারেল ওয়ার্ডে না রেখে ওকে তোমরা দেখছি ফিমেল ওয়ার্ডের কেবিনে রেখেছ। খরচটা কে দিচ্ছে?

ডক্টর কুমার বললেন, তা তো জানি না, স্যার! আমার জানার কথাও নয় অবশ্য। আমার কোন কৌতূহলও হয়নি।

—কিন্তু আমার হয়েছে, কুমার। তুমি কি খবরটা আমাকে জানাতে পার?

—শিওর!

এমার্জেন্সিতে ফোন করলেন। তারা বলতে পারল না। রিসেপশনেও নয়। কুমার বললেন, একটু বসুন, স্যার। আমি জেনে এসে আপনাকে জানাচ্ছি। চা-য়ের কথা বলি?

—না, থাক। চা আমি দিনে দুবারই খাই।

—আমার উপর রাগ করে বলছেন না তো?

—না। রাগ করব কেন? ও বুঝেছি! সেই তোমার কালকের কথায়? না। কুমার। সে জন্য আমি রাগ করিনি। যাও, জেনে এস। আমি অপেক্ষা করছি।

ডক্টর কুমার মিনিটদশেকের মধ্যেই ফিরে এলেন। বললেন, এমার্জেন্সির রেকর্ড অনুযায়ী ওকে অজ্ঞান অবস্থায় সাইকেল রিকশা করে পৌঁছে দিয়ে যায় পাড়ার লোক। একজন নাম-ঠিকানা-বয়স ইত্যাদি জানায়। কেবিনভাড়াও সে অগ্রিম দিয়ে গেছে সাতদিনের।

—কী নাম লোকটার?

—রসিদ আহ্‌মেদ।

—আই সি! কে হয় সে জুলেখার?

—না, সম্পর্ক কিছু নেই। প্রতিবেশী বোধহয়।

—তাহলে খুব উদার প্রতিবেশী বলতে হবে! অতগুলো টাকা! লোকটা আর আসেনি খোঁজ নিতে? তার প্রতিবেশিনী বাঁচল কি মরল জানতে?

ডক্টর কুমার মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, লোকটার উপাধি আহ্‌মেদ! তার মানে কি রোগিণীর প্রাক্তন স্বামী?

চৌধুরী-সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমার তাই মনে হয়। যাকে ভালবেসে বিয়ে করা জুলেখার জীবনের সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি বলে মনে কর তুমি! মনে হয় সেই ছেলেটিই।

ডক্টর কুমার কোন জবাব দিলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চৌধুরী জানতে চাইলেন, 'নো ভিজিটার্স' বোর্ডটা কি এখনো টাঙানো আছে ওর ঘরে? না হলে একটু দেখা করে যেতাম।

—না, স্যার। আজ পেশেন্ট ভালই আছে। যান, দেখা করে আসুন। তবে ওকে বেশি কথাবার্তা বলতে দেবেন না। ওর শরীর এখনো দুর্বল! আপনি নিজেই বেশি কথাবার্তা বলবেন।

—থ্যাঙ্কস, ডক্টর।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন দ্বিতল। চিহ্নিত কেবিনের সামনে থমকে দাঁড়ালেন। মনে হল ঘরের ভিতর একজন দর্শনার্থী ইতিপূর্বেই প্রবেশ করেছে। নিশ্চয় বিশ্বনাথ। উনি ইতস্তত করছিলেন। হঠাৎ

কানে গেল রোরুদ্যমানা একটি স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর "কেন? কেন? কেন? এভাবে বাঁচিয়ে তুললেন আমায়? কে বলেছিল দয়া দেখাতে? আমি তো সুযোগ পেলেই আবার বিষ খাব। অনর্থক এভাবে টাকা নষ্ট করতে কে বলেছিল আপনাকে?"

চৌধুরী-সাহেব নিজেকে সংশোধন করলেন। সম্ভবত বিশ্বনাথ নয়, ঘরের ভিতর যে আছে, তার নাম 'রসিদ আহমেদ'। তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল না কিন্তু। বরং পরক্ষণেই চমকে উঠলেন জুলেখার তীব্র তিরস্কারে : ছিঃ! আমাকে ছুঁয়ো না তুমি! তুমি না মুসলমান? জান না? 'তালাক' দেবার পর তুমি আমার কাছে পরপুরুষ!

চৌধুরী-সাহেব মনস্থির করলেন। উনি সুইং ডোর ঠেলে ভিতরে যেতে চাইলেন। এ জাতীয় উত্তেজনা রোগিণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক। কিন্তু তার পূর্বেই তাঁকে ঠেলে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন একজন সিনিয়ার নার্স। সম্ভবত জুলেখার উচ্চকণ্ঠ শুনেই তিনি ছুটে এসেছেন। তিনিও পুরুষটিকে ভর্ৎসনা করলেন, আপনার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? বলে গেলাম না যে, ওঁকে উত্তেজিত করবেন না? যান, বাইরে যান। আমি ওঁকে ঘুমের ইন্‌জেকশান দেব।

পরমুহূর্তেই নতমস্তকে কেবিন থেকে বার হয়ে এল বছর ত্রিশের একজন স্বাস্থ্যবান নওজোয়ান। বিশ্বনাথ বলেছিল ও ভাল ফুটবল খেলত। এখন নিশ্চয়ই খেলে না। কিন্তু শরীরে একবিন্দু মেদ জমেনি। ছয় ফুটের মতো লম্বা পরনে প্যান্ট আর বুশশার্ট।

কেবিন থেকে বের হতেই চৌধুরী বললেন, প্লিজ, মিস্টার রসিদ আহ্‌মেদ! আপনার সঙ্গে দু-একটা খুব জরুরী কথা ছিল।

রসিদ ওঁকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, এক্সকিউজ মি, স্যার। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বলে তো মনে পড়ছে না?

—না নেই। আমার নাম ডক্টর জামালুদ্দীন চৌধুরী। আমি তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক। স্মৃতিলেখা, আইমিন জুলেখা, আমার ছাত্রী ছিল। ওর দাদা বিশ্বনাথ দ্বিবেদীও আমার প্রাক্তন ছাত্র।

—ও বুঝেছি! আদাব। আপনি কি জুলেখার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

—তাই এসেছিলাম। কিন্তু নার্স ওকে এখন ঘুমের ইন্‌জেকশান দিচ্ছেন—ওকে এখন ডিস্টার্ব করব না। আপনি যদি কাইন্ডলি...

—আমার সঙ্গে আপনার কী প্রয়োজন?

—সেটা ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত স্থান কি এই হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ড?

—অলরাইট। আসুন। আমরা নিচে যাই।

নেমে এলেন দুজনে। হাসপাতালের সামনে লোকজনের ভিড়। ভিজিটিং-আওয়ার্স চলছে। মানুষজন আসছে-যাচ্ছে। মেওয়াওয়ালা, ডাবওয়ালা এমন কি ফুচকা বাটাটাপুরির অস্থায়ী দোকান। এখানে কথাবার্তা হতে পারে না। সামনের মিষ্টান্ন ভাণ্ডারেও যেতে চাইলেন না আজ। রাস্তাটা পার হয়ে একটা পার্কে ঢুকলেন। বৃষ্টিতে কিছু কিছু জল জমেছে। তবে বিদায়ী সূর্যের শেষ আশীর্বাদে পার্কের বেঞ্চিগুলো আর ভিজে নেই। ঘটনাচক্রে একটি খালি পাওয়া গেল। দুজন গিয়ে বসলেন। রসিদ আহ্‌মেদ বললে, এবার বলুন? কী জানতে চাইছিলেন?

—যে কোন কারণেই হোক আপনি আপনার ভূতপূর্বা স্ত্রীকে 'তালাক' দিয়ে দিয়েছেন। শরিয়তী কানুনে জুলেখা এখন আপনার কাছে একজন নিঃসম্পর্কিতা 'মহিলা'। আপনি জানেন, মাত্র দুবছর আগে যে মেয়েটি মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছে সেই মেয়েটির ওই কথাটা কী পরিমাণে মর্মান্তিক সত্য! ওর চোখে আপনি পরপুরুষ। আমার মনে হচ্ছে, নির্জন কেবিনে আপনি ওর হাত ধরেছিলেন...

—আপনি কি সেজন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করছেন?

—করলেও সেটা অন্যায় হত না। একজন মুসলমান হিসাবে, একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য দেখা যে, কোন ভারতীয় নারীর দেহ তার অনিচ্ছায় কোন পরপুরুষ যাতে স্পর্শ না করে। কিন্তু সে প্রশ্ন আমি তুলছি না। আমি একথাও জানতে চাইছি না—জুলেখার কোন্ অপরাধে আপনি তাকে এতবড় মর্মান্তিক শাস্তি দিলেন—একথা জেনেও যে, সেই কট্টর হেঁদুর হতভাগিনী মেয়েটার এ দুনিয়ায় আর কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই নেই।

—তবে কী জানতে চাইছেন আপনি?

—ঠিক যে কথা পাঁচমিনিট আগে জানতে চেয়েছিল জুলেখা! কেন ওকে হাসপাতালে নিয়ে এলেন? কেন কেবিন ভাড়া অগ্রিম জমা দিলেন? কেন ওকে শান্তিতে মরতে দিলেন না?

রসিদ রুখে ওঠে, ও মরলেই কি আপনি খুশি হতেন?

—আমি হতাম কি না সেটা প্রশ্ন নয়, মিস্টার আহ্‌মেদ। জুলেখা হত। তার সব জ্বালা-যন্ত্রণা নিমেষে জুড়িয়ে যেত। একজন স্পোর্টসম্যানের জীবনসঙ্গিনী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল যে মেয়েটি, তাকে বাকি জীবন ফুটপাতের ধারে বসে ভিক্ষা চাইতে হত না এটা কি কম বড় প্রাপ্তি?

রসিদ মাথা নিচু করে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আপনি আন্দাজ করতে পারেন, ও কতবড় অপরাধ করেছিল?

—না, পারি না। সে কথা আমি শুনতেও চাই না। নিশ্চয় খুবই গুরুতর অপরাধ। শুনেছি, সে জন্য পাঁচ মেহ্‌মানের সম্মুখে আপনার আব্বাজান আপনার গায়ে হাত তুলেছিলেন। এবং আপনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে স্ত্রীকে 'তালাক' দিয়েছিলেন। তার অপরাধটা কী, আমি জানতে চাই না, আমার কোন কৌতূহল নেই। দ্যাটস্ এ ক্লোজড চ্যাপটার! সে অন্যায় করেছে, আপনি শাস্তি দিয়েছেন। ব্যস!

—তাহলে কী আপনার জিজ্ঞাস্য?

—আগেই তা বলেছি। জুলেখার উত্থাপিত প্রশ্নটার জবাব আপনি তাকে দিয়ে আসেননি। সেটা আমাকে বলুন। ও একটু সুস্থ হলে ওকে আমি জানিয়ে দেব। এজন্যই আপনাকে এই একান্তে ডেকে এনেছি।

রসিদ উঠে দাঁড়ায়। বলে, তার দরকার হবে না, প্রফেসর-সাহেব! সেটা সুযোগমতো আমিই জুলেখাকে জানিয়ে দেব।

চৌধুরীও উঠে দাঁড়ান। জোরের সঙ্গে বলেন, না! নো! অ্যান্ এম্‌ফ্যাটিক : নো! আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, মিস্টার রসিদ আহ্‌মেদ! আপনি আমার ছাত্রীর সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনদিন দেখা করতে আসবেন না। একান্তে কোনও কথা বলার চেষ্টা করবেন না। সেটা শরিয়তি কানুন বিরুদ্ধ। আমি আপনাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি। আমি ভাগলপুর জামা-মসজিদের বড়া-ইমাম মৌলানা হাজী নাসিরুদ্দীন আফান্দির কাছে আপনার নামে ফরিয়াদ আনব। শরিয়তি কানুনে আপনার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করব!

—আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

—নিশ্চয় নয়। আপনি মস্ত অ্যাথলেট। অসীম আপনার দৈহিক ক্ষমতা! ভয় দেখাব কেন? তবে টি. ভি. সিরিয়ালের সেই ঢিসম্‌ঢিসম্ মারপিট নয়—জামা মসজিদের বড়া ইমামের শরিয়াতি 'নসিহত'-কে যদি ভয় করেন তাহলে—আবার আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি : আপনার প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের কোন চেষ্টা করবেন না। আপনি যদি চান, কলেজে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। কেবিনভাড়া আপনি যা দিয়েছেন তা আমি ইন্‌স্টল্‌মেন্টে শোধ করে দেব। আমার আর্থিক সঙ্গতি অল্প। অনেক দান-খয়রাত করতে হয় আমাকে। তাই একলপ্তে এতগুলো টাকা দিয়ে দিতে পারব না।

নতমস্তকে রসিদ অনেকক্ষণ কী ভাবল। তারপর বলল, আগামী সপ্তাহে ওকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেবে। ওকে কীভাবে রিহ্যাবিলিটেট করা যায় তা কি আপনি ভেবেছেন, প্রফেসর চৌধুরী?

—দ্যাটস্ নান্ অব্ য়োর বিজনেস!

।। তিন।।

সাতদিন পরের কথা। এ সাতদিনে ভাগলপুরের গঙ্গা দিয়ে অনেক জল সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। আবার গাঙ্গেয় উপত্যকার ছোটখাটো নদীপথে বর্ষার জলধারা এসে জমেছে গঙ্গায়। মা গঙ্গা ভাদ্রে প্রতিবছর কূলছাপিয়ে শহরে ঢুকে পড়েন। দু পাশের গ্রাম বন্যার জলে ভাসতে থাকে। আশ্বিনের সেই অভিশাপ অন্তর্হিত হয়ে গেলে দেখা যায় ধানের জমিতে মা গঙ্গার পরিমাটির আশীর্বাদ। এ খেলা চলেছে স্মরণাতীত কাল ধরে।

বিশ্বনাথের স্ত্রী রত্না ফিরে এসেছে বাপের বাড়ি থেকে। ফলে বিশ্বনাথ দ্বিবেদী আর অনিকেত নয়। ননদের ঝামেলা ওকে সইতে হবে না এ কথা জানতে পারার পর রত্না তার মরদকে মাফ করে দিয়েছে। একরাত হাসপাতালে দু-রাত জামাল-স্যারের বাড়িতে বাস করে সে চলে গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরমশাই একটু ধমকের সুরেই বলেছিলেন, বাবাজীবন, তোমার নষ্টা ভগ্নী যে পাপ কাজ করেছে তার জন্য তুমি কেন নিজের জাত খোয়াতে বসেছিলে, বল তো? যে মেয়ে কুলত্যাগিনী তার তো ওই রকম পরিনাম হবেই! রত্না তো বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছে—ঘরে তারা দিয়ে সোজা আমার কাছে চলে এসেছে।

বিশ্বনাথ 'রাম-গঙ্গা' কিছুই বলেনি। মেয়ে-বউকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছে। দরজার সামনে পড়ে আছে তিনদিনের খবরের কাগজ আর পলিথিন ব্যাগে টকে-যাওয়া দুধ। মেঝেতে ধুলোর আস্তরণ। সারাটা দিন গেল সাফ করতে। সুযোগমতো রত্না জানতে চাইল—শেষ পর্যন্ত লেখা গেল কোথায়? নাকখৎ দিয়ে শ্বশুরবাড়িতেই তো?

বিশ্বনাথ বললে, না। মুসলমান মেয়েদের দুর্ভাগ্য তাদের হেঁদু বহিনদের চাইতে কিছু বেশি। আমাদের ঝগড়া হয়, মিটমাটও হয়—ওদের একবার তালাক হয়ে গেলে আর ফেরার পথ থাকে না। ওর 'শ্বশুরবাড়ি' বলে এখন কিছু নেইই। ও সেখানে যাবে কী করে?

—তাহলে? বাবুপুর থেকে তো ঝাঁটালাথি খেয়ে ফিরে এসেছে। তাহলে লেখা গেল কোথায়? হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর?

বিশ্বনাথ গম্ভীর হয়ে বললে, ওই হাসপাতালের সামনেই ফুটপাতে বসে গেছে।

—ফুটপাতে বসে গেছে? সেখানে বসে কী করছে?

—নষ্টা, কুলত্যাগিনী মেয়েরা অন্তিমে যা করে—ভিক্ষে!

রত্না পুরো দশ সেকেন্ড তার স্বামীর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারল না—ও সত্য বলছে না বানিয়ে। একটু নরম সুরে বললে, অমন করে বলছ কেন? মোছলমানকে বিয়ে করেছে, জাত দিয়েছে—'নষ্টা' সে হতে যাবে কেন?

—কথাটা তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বল। বিশেষণটা তিনিই প্রয়োগ করেছিলেন প্রথম। আমি গুরুজনের কথা 'রিপিট' করছি শুধু।

রত্না বুদ্ধিমতী। বুঝে নিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে এ নিয়ে আর বেশি ঘাঁটাঘাটি করা ঠিক নয়। ননদিনী হতচ্ছাড়ির শেষ গতিটা কী হল তা দুদিন পরেই জানা যাবে। বিশ্বনাথ নিজে থেকেই বলবে। আপাতত ও প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়াই সুবুদ্ধির পরিচায়ক। তিন দিন বিরহের পর ঐ মর্মান্তিক বিষয় নিয়ে আর আলোচনা করা ঠিক নয়। সে গা ধুতে গেল।

*　　　*　　　*

জুলেখা চিনতে পেরেছিল দর্শনমাত্র। আদাব জানিয়ে বলেছিল, ছোড়দা ও বেলা বলে গেছিল সে বৌদিকে আনতে যাবে। বিকালে আসবে না। আরও বলেছিল, আপনি আসবেন আজ, আমার সঙ্গে

দেখা করতে।

—জহুরা বা ফতিমা আর আসেনি?

—হ্যাঁ, ওরাও এসেছিল কাল। অনেক গল্প করল কলেজের।

জামাল-সাহেব বলেন, তোমার ছোড়দা বুঝি আজ তোমার ভাবীকে আনতে গেছে? বেচারির খুব ভোগান্তি গেল কদিন, সদর দরজার চাবি না থাকায়। এক-পোশাকে—না স্নান, না মুখ ধোওয়া—

জুলেখা আজ পিঠে বালিশ দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসেছে। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, হ্যাঁ ছোড়দা বলছিল ওর পকেটে পয়সাও তেমন ছিল না। আপনার বাড়িতে আশ্রয় না পেলে ওকে খুবই আতান্তরিতে পড়তে হত...

—কেন? সোজা শ্বশুরবাড়িতে চলে গেলেই পারত। ওর স্ত্রী তো আর ওকে 'তালাক' দিয়ে যায়নি!

জুলেখা জবাব দিল না।

চৌধুরী-সাহেব একটু অপেক্ষা করে বললেন, মিস্টার আহ্‌মেদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কিছু কথাও হয়েছে।

জুলেখা চমকে ওঠে। অবাক হয়ে তাকায়। জানতে চায়, কবে? কোথায়?

—ও যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তুমি ওকে একটা প্রশ্ন করেছিলে : কেন সে তোমাকে বাঁচলো। ও জবাব দেবার সুযোগ পায়নি। মেট্রন এসে ওকে ঘর থেকে বার করে দেন...

—আপনি কেমন করে জানলেন?

—আমি তখন দরজার বাইরেই অপেক্ষা করছিলাম। মিস্টার আহমেদ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমাকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেবার পর তুমি কোথায় যাবে!

জুলেখা বালিশঢাকাটা নিয়ে নাড়াচড়া করতে করতে বললে, আপনি তাকে কী বললেন, স্যার?

—আমি বলেছিলাম, 'দ্যাটস্ নান্ অব য়োর বিজনেস্।' ঠিক বলিনি?

জুলেখা সে প্রশ্নের জবাব দিল না।

একটু অপেক্ষা করে বললেন, তুমি কিছু বলছ না যে, জুলেখা? আমি ঠিক বলিনি?

—হ্যাঁ, তা তো বলেছেন। কিন্তু প্রশ্নটার পুরোপুরি জবাব তো ওটা হল না। তার কোন অধিকার নেই ও বিষয়ে প্রশ্ন করার। কিন্তু আমার কাছে যে সেই চিন্তাটাই...

বাধা দিয়ে জামাল-সাহেব বললেন, শোন লেখা! আমি নিজে বিয়ে-সাদি করিনি। তাই যখনই দেখি কোথাও দাম্পত্যকলহ চরমে উঠেছে তখন একটাকে ধরে নিয়ে আমার বাড়ি আটক করি। রত্না-বিশ্বনাথের দাম্পত্যকলহ মিটেছে। এখন আমি এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে। ...না, না তুমি অমন করে আমার দিকে তাকিও না, জুলেখা। আমি তোমাকে কিন্তু অযাচিত দান-খয়রাত করছি না। আমি দুনিয়ায় একা— এক্কেবারে একা। বাবা-মা-ভাই-বোন—কেউ নেই আমার। এক কাপ চা খাওয়ার ইচ্ছে হলে আমাকে উঠে গিয়ে বানাতে হয়। তুমি আমার সংসারে গিয়ে থাকবে? ছোটবোনের অধিকারে? আমাকে রেঁধে খাওয়াবে, আমার ঘরদোর সাফা রাখবে, আমার ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে আসবে। সব, স—ব কাজ তোমাকে দিয়ে করাব আমি। তোমাকে আমি দয়া দেখাচ্ছি না। তুমিই আমাকে দয়া করছ—কারণ মা-মাসি-বৌদি-ছোটবোন—বড় হয়ে আমি কখনো কোন স্ত্রীলোকের ভালবাসা পাইনি। তুমি আমার সেই অপূর্ণতা পূর্ণ করে দেবে? আসবে লেখা? আমার নুন্নিমুন্নি বোন হয়ে।

জুলেখা স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল। ওর চোখ দুটো জলে ভরে এল। ওর মনে হল, কী আন্তরিক ওঁর কণ্ঠস্বর! অস্ফুটে বললে, সারাটা জীবন?

—নিশ্চয় নয়। তোর কী বয়েস? আমার কাছে পড়তে আসে অনেক ছেলে, তাদের কেউ তোকে পছন্দ করলে, তাদের কাউকে তুই পছন্দ করলে, আমি চেষ্টা করে দেখব। একজন অন্যায় ভাবে তোকে তালাক দিয়েছে বলেই তোর জীবনটা কিছু বরবাদ হয়ে যায়নি।

নতনেত্রে জুলেখা বললে, না, স্যার! ও আমাকে অন্যায়ভাবে তালাক দেয়নি। আমার অপরাধটাও

ছিল ক্ষমার অযোগ্য। আপনার কাছে স্বীকার করব। আপনি আলিম, আপনি নূর মহম্মদের খাদিম মনে করুন এ আমার তওবা। খ্রীস্টানদের কনফেশনের মতো।

জামালুদ্দীন বলেন, কী প্রয়োজন? আমি সেই বেদনাদায়ক কাহিনীটা শুনতে চাইনে। আমি না শুনেই মেনে নিচ্ছি অপরাধটা ছিল অত্যন্ত গুরুতর। নইলে তোর শ্বশুর, আলিজান সাহেব, পাঁচ মেহেমানের সামনে উপযুক্ত পুত্রকে চাপটাঘাত করতেন না; আর রসিদও আত্মজ্ঞান হারিয়ে তোকে তালাক দিত না।

জুলেখা নতনেত্রে বললে, প্রয়োজনটা আপনার নয়, স্যার। প্রয়োজনটা আমার। আপনি নিষ্ঠাবান মুসলমান—রোজা-নামাজ করেন—আল্লাহ্‌তালার মুবারকীতে সামান্য ট্রাক ড্রাইভার থেকে কলেজের অধ্যাপক হয়েছেন। আপনিই তো দেবেন আমাকে পথের নির্দেশ। বুঝিয়ে বলবেন—কী আমার অপরাধ, কেন এটা অপরাধ। শাস্তি আমাকে দেওয়া হয়েছে—নির্বাসন দণ্ড ; তার পরিবর্তে আমি মৃত্যুদণ্ড বেছে নিয়েছিলাম; কিন্তু এই বিচারে আত্মপক্ষসমর্থনে আমার কিছু বলার আছে কি না কেউ তা কোনদিন জানতে চাইবে না? আপনিও না?

জামাল বলেন, বেশ বল্‌। কী বলতে চাইছিলি?

*　　　　　*　　　　　*

আলিজানের মটোর রিপেয়ারিং গ্যারেজটা মশল্লাচকের শেষ প্রান্তে, বড়রাস্তার ধারে। নানান জাতের গাড়ির মেরামতির কাজ হয়। রঙ হয়, আপ্‌হোলসট্রির কাজ হয়, এমনকি ইঞ্জিন রিবোরিঙের কাজও হয়। সে কাজটায় রসিদ আহমেদ আলিম। নিখুঁতভাবে সিলিন্ডারের মাপ রিঙের মাপের সঙ্গে মিলে যায়। স্টার্ট দিলে মনে হয় নতুন গাড়ি। একটু শব্দ নেই, একটু ঝাঁকি নেই। আলিজানের গ্যারেজের সুনাম এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সুলতানগঞ্জ, মুঙ্গের অথবা পাটনা থেকেও লোকে এঞ্জিন খুলে এখানে রিবোরিঙ করতে পাঠাতো!

বাপ-বেটা ভাগলপুরেই থাকত। জুলেখা থাকত গ্রামের বাড়িতে। রসিদের দাদা রহমৎ সেখানে সংসারের কর্তা। ওদের কিছু জমি ছিল। ভাগে চাষ করাতো। রসিদ প্রতি শনিবার রাত্রে গ্রামে আসত, সোমবার ভোরে ভাগলপুরে ফিরে যেত। রহমতের দুই বিবি, তিন-চারটি সন্তান। জুলেখাই তাদের দেখ্‌ভাল করত। পাক্‌ঘরের দায়িত্বটা তার ছিল না। তবে রহমতের এক জোড়া মোষ আর একজোড়া বলদের দেখভাল করতে হত জুলেখাকে। রহমতের দ্বিতীয়া বিবি সাইদার ছোট বাচ্ছাটা মায়ের বুকের দুধ খাওয়া ছেড়ে দেবার পর রহমৎ একটি এঁড়ে বাছুর সহ দুধেলা গাই কিনে এনেছিল পাঁচশ টাকায়। বুধবারে গাইটার জন্ম হয়েছিল বলে তার নাম 'বুধি'। বাছুরটাও নাকি জন্মেছে বুধবারে। তাই জুলেখা তার নাম দিয়েছিল 'বুদবুদ'। বুধির বাচ্ছা বুধে জন্মেছে বলে। কুমারী জীবনেও দ্বিবেদী-বাড়িতে তাকে গো-মাতার সেবাযত্ন করতে হয়েছে। গরু-মোষকে সে ভয় পায় না। কিশোরী বয়সে—মায় কলেজে ভর্তি হয়েও—ও ঘুম ভেঙে উঠে পড়ত ভুক্কো তারা ডোবার আগে। গো-মাতার সেবা সমাপ্ত করে—গো-দোহন করে, সবাইকে জাব্‌না মেখে দিয়ে তবে যেত স্নান করতে। দুটো নাকে-মুখে গুঁজে ছুটতো নয়টা আটান্নোর ভাগলপুর-মুখো বাস ধরতে।

ফলে শ্বশুরবাড়িতে এসে গো-সেবায় অসুবিধা হয়নি তার। প্রথম প্রথম মোষ-জোড়াকে একটু ভয় পেত। ক্রমে তাও সহে গেল। গোয়ালের সব জন্তুই নতুন মানুষটার পোষ মানল। সবচেয়ে বেশি বুদবুদ। ওর বোধহয় নতুন শিং ওঠার জন্য মাথা চুলকাতো। জুলেখার নিতম্বদেশটি ঢুঁ মারার প্রশস্ত স্থান মনে করত সে। থাপ্পড়ও খেত সেজন্য।

তারপর বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। জুলেখা জানতে পারল। রহমৎ সবৎস গাভীটিকে ক্রয় করেছিল আগমী উৎসব দিনের কথা স্মরণে রেখে। বুধির দুধও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। আগে যেখানে দিনে সাত-আট সের দুধ দিত, এখন সেখানে দু-বেলায় দেড় সের হয়-কি-না-হয়। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে চান্দ্র

মাসের হিসাবে পড়ছে জউল-হিজ্জহ মাসের দশম দিন—যে দিনটিকে বলা হয় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব : ঈদ-উল্-অব্বহা। এই দিনে আমন্ত্রিত হন নিকট আত্মীয়েরা, রিস্তেদারেরা, ধনাঢ্য ব্যক্তির মোকামে। সংলগ্ন কোন চিহ্নিত উন্মুক্ত প্রান্তরে—তার একটি বিশেষ অভিধা আছে—'ঈদগাহ্'—সেখানে ধার্মিক মুসলমানেরা সমবেত হন। প্রার্থনার সূত্রপাত হিসাবে ইমাম দুটি রাকাহ্ বা শ্লোক আবৃত্তি করেন এবং প্রার্থনান্তে খুৎবা বা ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে ইমাম ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের সঙ্গে কুরবানির তাৎপর্যটা বুঝিয়ে দেন। খুৎবা সমাপ্ত হলে সমবেত সবাই ঈদ্গাহ থেকে আমন্ত্রণকর্তা ধনবান ব্যক্তির গৃহে সমবেত হন। পরিবারের কর্তা তারপর একটি ভেড়া অথবা গরু, কিংবা ছাগল বা, উট বলি দেন। পশুটিকে মক্কার দিকে মুখ করে বলিদান করা হয়। শরিয়তি রীতিতে হালাল করা পশুটির মাংস তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। একভাগ প্রদান করা হয় আমন্ত্রিত মেহ্মানদের। এক-তৃতীয়াংশ রবাহূত দরিদ্রদের, বাকি এক-তৃতীয়াংশ গৃহস্বামীর।

উৎসবের আগের সপ্তাহে জুলেখা নিতান্ত ঘটনাচক্রে জানতে পারল আগামী সপ্তাহে উৎযাপিত হবে 'বকরহ্ ঈদ'বা 'কুরবান ঈদ'। আর কুরবানি করা হবে ঐ বুদবুদকে!

এটা সহ্য করতে পারল না প্রাক্তন স্মৃতিলেখা দ্বিবেদী। সে গোপনে তার স্বামীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করল বুদবুদের পরিবর্তে একটি বড় পাঁঠা কিনে আনতে। তার হাতে ধরল, পায়ে ধরল। রসিদ রাজি হল না। রসিদের যুক্তি অকাট্য : পাঁঠার মৃত্যুযন্ত্রণা কি বাছুরের চাইতে কম?

জুলেখা বোঝাতে চেয়েছিল, না! কিন্তু আমার যদি কোন সন্তান থাকত তবে তার মৃত্যুযন্ত্রণা অন্তত আমার চোখে বিশ্বের আর যে কোন শিশুমৃত্যুর চেয়ে বেশি শোকাবহ! 'বুদবুদ'কে আমি যে অ্যাতটুকু বয়স থেকে...

রসিদ বলেছিল, মুসলমান ধর্মে যখন দীক্ষা নিয়েছ, মুসলিমের জরু হয়েছ, তখন ওসব হেঁদু সেন্টিমেন্ট তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। একথা আমার সামনে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ কর না। তাতে গুনাহ্ হয়।

সোমবার সকালে আলিজান আর রসিদ ভাগলপুরমুখো রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে জুলেখা বুধি আর বুদবুদকে দড়ি খুলে নিয়ে ঈদগাহ্ মাঠের ওপ্রান্তে চলে যায়। ঈদগাহ্ মাঠটাই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সীমানা। ওদিকে হিন্দু পল্লী। মহেশ্বরপ্রসাদ তেওয়ারি গ্রামের একজন ধনবান মাতব্বর। তাঁর কন্যাটি জুলেখার সঙ্গে একসঙ্গে ভাগলপুর কলেজে এককালে পড়তে যেত—এক বাসেই যেত—তাই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। বকরহ-ঈদের ছুটিতে সে বাড়িতেই ছিল। জুলেখা সব কথা খুলে বলে। গোহত্যা বন্ধ করতে মহেশ্বরপ্রসাদ এককথায় নগদ হাজার টাকা দিয়ে জুলেখার কাছ থেকে বুধি আর বুদ্বুদকে কিনে নেন। পাকা রসিদও সংগ্রহ করে রাখেন।

উৎসবের আগের দিন রসিদ আর আলিজান পাঁচ রিস্তেদার সহ এসে উপস্থিত হল গ্রামে। পরদিন বকরহ্-ঈদ। এতক্ষণ সব জেনেবুঝেও রহমৎ কিছু বলেনি। যার গরু সে অপেক্ষা করছিল যার জরু তার আগমনের

বাকি ঘটনা জামাল, সাহেবের জানা।

জুলেখা বলল, বলুন স্যার, আমি কি কিছু অন্যায় করেছি?

জামাল বললেন, এই হাসপাতালে বসে এ আলোচনার শেষ হবে না। আমি বরং তোমার রিলিজ-এর এন্তাজাম করতে যাই। আজই তোমাকে নিয়ে যাব আমার বাড়িতে। সেখানে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে এ নিয়ে আলোচনা করবার।

।। চার ।।

আজ দুদিন হল জুলেখা এসেছে বড়িবেগম মহল্লায়। হেকিম-সাহেবকে জামালুদ্দীন সব কথাই খুলে বলেছেন। হেকিম-সাহেব একটু গোঁড়া-—ধর্মবিষয়ে। তিনি শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। অর্থাৎ ইমামদের দৈবী চরিত্রে বিশ্বাসী এবং পয়গম্বরের শিক্ষার ব্যাখ্যাতা হিসাবে ইমামদের অভিমতকে প্রামাণ্য মনে করেন। এ সব ব্যাপারে 'ইজ্‌তিহাদ' বা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির কার্যকারিতায় অবিশ্বাসী।

'তালাক' প্রথার যৌক্তিকতা তিনি মেনে থাকেন। 'শাহবানু' মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়টাকে তিনি অন্তর থেকে মানতে পারেননি। লোকসভা সেটা খারিজ করে দেওয়ায় তিনি খুশি।

হেকিম-সাহেবের মতে তালাক হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের ব্যাপার। বাইরের লোকের এ-বিষয়ে কোন বক্তব্য থাকতে পারে না। মুসলমান পুরুষের এ শরিয়তি অধিকার চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে!

জামাল-সাহেব এ নিয়ে তর্ক করেননি। বলেছেন, সে যাই হোক! মেয়েটির কোন মাথা-গোঁজার আশ্রয় নেই দেখে ওকে আপনার বাড়িতে নিয়ে এসেছি। আপনি যদি দয়া করে আবদুলকে আমার নিচের ঘরে শোবার অনুমতি দেন, তাহলে আমি বাইরের ঘরে খাটিয়া পেতে শুতে পারি। আর জুলেখা যখন এখানেই থাকছে তখন একটা স্টোভ আর কিছু বাসনপত্র কিনে নিয়ে আসতে পারি। ঐ বারান্দার কোণটায় আপনার যদি আপত্তি না থাকে—একটা পোর্টেবল গ্যাসের উনানে আমাদের দুজনের রান্নাবান্না...

হেকিম-সাহেব বলেছিলেন, তাতে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। বাড়িতে আমরা এতগুলি প্রাণী। একটি মানুষ বেড়েছে বলে আমাদের পৃথগন্ন হাতে হবে কেন? জুলেখা আমার বড় কন্যার চেয়ে বয়সে ছোট। সে আমার কন্যাপ্রতিম—কন্যাই। সে আমার সংসারে দোতলায় থাকবে। এজন্য আপনাকে খাটিয়া পেতে বাইরের ঘরে শুতে হবে কেন?

জামাল নিম্নস্বরে বলেছিলেন, তাহলে ওর খাওয়া-থাকা বাবদ...

—কেন? ও কি পটের বিবি? সংসারের পাঁচটা কাজ ও করবে না? আমার আর একটি বেটি থাকলে তাকে যা কাজকর্ম করতে হত তাই ও করবে। আপনি বরং একটা কাজ করুন জামান-সাহেব ইন্‌স্টলমেন্টে একটা সিঙ্গার মেশিনের পা-কল কিনে ফেলুন। আমার মেয়ে সারিনা খুব ভাল সেলাই ফোঁড়াই জানে। আমার একজন বন্ধু কলিমুদ্দীন মোস্তাফার একটা দর্জির দোকান আছে; উনি নিজে খুব ভাল দর্জি। ওঁর স্ত্রী আমার মরিজ— বাতের ক্রনিক পেশেন্ট। জুলেখাকে সারিনা সেলাইয়ের কাজ শিখিয়ে দেবে। অবসর মতো দুজনে মেশিন চালাবে। আপনি তো জানেনই, সারিনার খসম ওকে নেয় না—তালাকও দেয়নি অবশ্য। যাহোক, দুজনেই তাহলে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। কলিমুদ্দীন কাজ জোগাবে, মজুরি মেটাবে!

জামাল-সাহেব বলেছিলেন, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব।

'বকরহ্ ঈদ' বা কুরবান-ঈদের তাৎপর্যটুকু জামাল-সাহেব একদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন জুলেখাকে, কোন এক বর্ষণক্লান্ত রবিবারের অপরাহ্ণে। সারিনা, তার আব্বা ও মাও উপস্থিত ছিলেন সেই অপরাহ্ণের আসরে। জামাল এতদিনে হেকিম-সাহেবের ঘরের লোক হয়ে গেছেন। তাঁর সম্মুখে বে পর্দা উপস্থিতিতে কারও সঙ্কোচ হয় না। জামালুদ্দীন গোটা বড়বিবি মহল্লায় একজন বহু-সম্মানিত ব্যক্তি। সবাই জানে তিনি জিতেন্দ্রিয় এবং সাচ্চা মুসলমান। অধ্যাপক-মশাই বলেছিলেন :

ঈদ-ই-জুহা বাস্তবে ইসলামের বৃহত্তম উৎসব : ঈদ্-উল-কবীর। এই উৎসব জুউল-হিজ্জহ চান্দ্রমাসের দশম দিনে অনুষ্ঠেয়। একসময় এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে মক্কায় তীর্থযাত্রার সম্পর্ক ছিল। এই উৎসব পালনান্তে আরব ধার্মিকেরা মক্কাভিমুখে যাত্রা করতেন। বর্তমানে অবশ্য এটি মুসলিম ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করার এবং বলিদান উৎসবের দিন হিসাবে গণনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানের বিধি

কোরানের সূরহ্ দ্বাবিংশতি থেকে অষ্টত্রিংশতিতে বিধৃত। কথিত আছে, হিজরার কয়েক মাস পরে মদিনায় অবস্থানকালে শেষ নবী হজরৎ মহম্মদ লক্ষ্য করেছিলেন যে, ইহুদিরা তাদের সপ্তম মাসের দশম দিনটি প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপবাসের দিবস হিসাবে পালন করে। এই দিনটি মোশিকর্তৃক অর্থাৎ 'মোজেস্' কর্তৃক ইহুদিদের উদ্ধারের স্মারক হিসাবে স্মরণ করা হয়। এই সময় ইহুদিদের সঙ্গে মহম্মদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাদের সিনাগগেও তিনি মাঝে মাঝে যেতেন। তিনি তাঁর অনুচরদের নির্দেশ দিলেন ইহুদিদের ঐ ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি গ্রহণ করতে। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহুদিরা তাঁর প্রবর্তিত সত্যধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করলে তিনি পৃথকভাবে ঈদ-উল অজ্‌হার প্রবর্তন করেন। এই অনুষ্ঠানে বলিদান উৎসবটি প্রতীকী—ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসের ব্যঞ্জনা এই কুরবানি উৎসবে বিধৃত।

বাইবেলের পুরাতনবিধির সৃষ্টিখণ্ডে কথিত আছে মহাধার্মিক আব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতি তাঁর একান্ত নিষ্ঠা প্রমাণিত করতে, তাঁর প্রীতি উৎপাদন মানসে নিজের পুত্র আইজাক্‌কে বলি দিতে উদ্যত হন। ঘটনাস্থল বাইবেল মতে মোরিহ্ জনপদ। ঈশ্বর আব্রহামের ঐকান্তিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রের পরিবর্তে একটি পশুকে প্রেরণ করেন। ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী আব্রাহাম হচ্ছেন ইব্রাহিম। তাঁর ইস্‌হাক নামে এক পুত্র ছিল বটে, তবে যাকে তিনি বলি দিতে উদ্যত হন সেই পুত্রটির নাম ইস্‌মাইল। বলিদান স্থানটিও মোরিহ্ নয়, মক্কার নিকটবর্তী মীনা পর্বত।

ঐতিহ্য-উপকথায় আরও বলা হয়েছে, ইব্রাহিম বলিদানের জন্য কয়েকবার ছুরিকাঘাত করেন বটে কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। তখন তাঁর ক্রোড়স্থিত ইস্‌মাইল তাঁর আব্বাকে বলেন, "আপনি আমার দিকে দৃক্‌পাত করে আমাকে হত্যা করতে চাইছেন বলে স্নেহবশত বারে বারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছেন, বাপজান। আপনি দুই চক্ষু আবরিত করে আমাকে ছুরিকাবিদ্ধ করার উদ্যোগ করুন। তাহলেই আপনার ছুরিকা আমার পঞ্জর বিদ্ধ করবে।" এই কথায়, পুত্রের ঈশ্বরপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে ইব্রাহিম দুই চক্ষু রুদ্ধ করে পুনরায় পুত্রকে বলিদানের উদ্যোগ করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই গ্যাব্রিয়েল ইস্‌মাইলের পরিবর্তে একটি পশুকে ইব্রাহিমের ক্রোড়ে স্থাপন করলেন। ইব্রাহিম সে কথা না জেনে 'বিস্‌মিল্লাহি-আল্লাহ্ আকবর' পুকার দিয়ে ক্রোড়স্থিত জীবটিকে ছুরিকাবিদ্ধ করলেন। পরমুহূর্তেই চোখ খুলে দেখলেন তাঁর পুত্র অক্ষত— কুরবানি হয়েছে পশুটি।

হেকিম-সাহেব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্!

জুলেখা জানতে চায়, একটা কথা! ইব্রাহিম পুত্রভ্রমে যে পশুটিকে কুরবানি করেছিলেন সেটি কী জন্তু ছিল? ছাগল, গরু না উট?

হেকিম-সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই কাফেরের মতো প্রশ্নটা করেছিস্, জুলেখা! জীবটা কী ছিল সেটা এখানে প্রশ্ন নয়। মূল বক্তব্য ইব্রাহিমের ঐকান্তিকতা! ইসমাইলের আত্মোৎসর্গের সদিচ্ছা। আল্লাহ্-র প্রতি নিষ্ঠা!

জুলেখা বলে, সেটাতে তো আমি কোন সন্দেহ প্রকাশ করছি না। আমি বড়ভাইয়ের কাছে জানতে চাইছে কোরানে জীবটার কী নাম লেখা আছে।

জামালুদ্দীন বললেন, কোরান ধ্রুপদী আরবীতে রচিত। সে ভাষা আমি জানি না। ফলে, মূল কোরান আমি পড়িনি, জুলেখা। হজরত মহম্মদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের মতে, কোরানের বাণীকে যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন নেই, কারণ সেগুলি স্বয়ংসিদ্ধ।

জুলেখা বাধা দিয়ে বলে, আপনি আমার প্রশ্নটার সরাসরি জবাব দিন স্যার, জন্তুটা কী ছিল? কোরানে কী লেখা আছে?

—সেই কথাই তো বলছি, জুলেখা। যুক্তির সাহায্যে উটকে বাদ দিতে হয় কারণ কোন একজন মানুষ তার কোলের উপর একটা জ্যান্ত উটকে তুলতে পারে না। যুক্তির নিরিখে ওটা ছিল হয় দুম্বা অথবা ভেড়া, ছাগল, বা বাছুর। ঠিক কী ছিল তা জানি না। অনুবাদে আমি যা পড়েছি তা . 'পশু'!

হেকিম-সাহেব বললেন, পশুটা ছিল বাছুর। ভেড়া, ছাগল, বা দুম্বা নয়।

জুলেখা বললে, আপনি কী করে জানলেন?

— আমাকে মৌলানা সৈয়দ আবুল কাশেম আল জবরীয়া সাব বলেছিলেন। তিনি আর্বী-ফার্সি দুটি ভাষাতেই ছিলেন আলিম। এবাদতিতে তিনি ছিলেন সর্বজনমান্য!

জুলেখা জানতে চায়, সেই মৌলানা-সাহেব আপনাকে কি বলেছিলেন, মূল ধ্রুপদী আরবী ভাষাতে যে কোরানের সংস্করণ পাওয়া যায় তাতে লেখা আছে যে, পশুটা বাছুর?

—না, তা অবশ্য বলেননি।

জুলেখা এদিকে ফিরে জামালকে প্রশ্ন করে, আপনার কী বিশ্বাস, স্যার?

জামাল-সাহেব বললেন, কোরানের ঐ বাইশ থেকে আটত্রিশ নম্বর সূরাহ্—যেখানে বকরহ্-ঈদের ঐ ঘটনার উল্লেখ আছে সেখানে পশুটার নাম লেখা আছে কি না আমি জানি না। আমার ধারণা সেটা ছিল : ভেড়া। মক্কা অঞ্চলে মেষপালক ছিল প্রচুর— গবাদিপশু অল্প। তাছাড়া আমার ধারণা— ভারতবর্ষ অধিকার করার পর থেকে বেশ কিছু অত্যাচারী বাদশাহ্ বা আমীর-ওমরাহ্ বিজিত প্রজাদের উৎপীড়ন করার মধ্যেই আমোদ পেতেন। যারা ধর্মত্যাগ করে সদ্ধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হল না তাদের। তারাই 'জিজিয়া' কর প্রবর্তন করেছিল বা বিজাতীয়দের কাছ থেকে ঐভাবে অর্থ সংগ্রহ করত। তারাই পশুটাকে ছাগল-ভেড়া-দুম্বা থেকে গরুতে রূপান্তরিত করেছিল—একজাতের ধর্ষকামী মনোভাব থেকে। যেহেতু কাফেরদের চোখে গরু হচ্ছে গো-মাতা।

হেকিম-সাহেব প্রতিবাদ করেন, এটা সত্য নয়। কাফেরদের যুক্তি।

জুলেখা বলে ওঠে, যুক্তিটা যারই হোক, এ-কথা তো মানবেন যে, বকরহ্-ঈদ এ পশুটা গরুর পরিবর্তে পাঁঠা বা ভেড়া হলে কোরান-অবমাননার গুনাহ্ হয় না। যেহেতু কোরানে বলা হয়েছে—'পশু'। 'গরু' এ কথা লেখা নেই। সেটা মেনে নিলে হয়তো হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বটা মেটাবার একটা ধাপ অতিক্রম করা যায়। যায় না?

*　　　*　　　*

ইংরাজি অনার্সের কোন কোন ছাত্র— হিন্দু এবং মুসলমান—চিরকালই ছুটির দিনে জামাল-সাহেবের কাছে ইংরেজি সাহিত্য আলোচনার জন্য আসত। তাদের মধ্যে দু-একজন জুলেখার প্রতি উৎসাহ দেখালো। হেকিমসাহেব পর্দাপ্রথা মানলেও, জামালুদ্দীন সেটা আদৌ মানতেন না। উনি ছিলেন 'সুফী' মতে বিশ্বাসী—অর্থাৎ সুতাকাল্লাসীন বা লুকামা-পন্থীদের মতো শাস্ত্রীয় নির্দেশকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলে মনে করতেন না—বিশেষ যেসব নির্দেশ সরাসরি কোরান বা হাদিসের নয়—মৌলভিদের নিজ নিজ ইন্টারপ্রিটেশান। তাঁর কাছে হজরত মহম্মদের আধ্যাত্মিক আবেগ এবং প্রত্যক্ষানুভূতির মূল্য ছিল অনেক বেশি। ফলে, তাঁর ছাত্রদের চা পরিবেশন করতে জুলেখা প্রায়ই বেপর্দা হয়ে বৈঠকখানায় আসত। জামাল-সাহেব ছাত্রদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতেন। কখনো কখনো বলতেন, বস না জুলেখা, আমরা কিট্স-এর 'এন্ডিমিয়ান' পড়ছি। শুনলে লাভ বৈ তোর ক্ষতি হবে না।

দু একজন ওর প্রতি যে না ঝুঁকেছিল এমন নয়, কিন্তু জুলেখা কিছুতেই এগিয়ে এল না। উৎসাহিত হল না। সে সেলাই শিখে স্বনির্ভর হতে চায়।

তারপর একদিন। হেকিম-সাহেব ওঁকে জনান্তিকে ডেকে বললেন, প্রফেসর সাব, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি যখন কলেজে থাকেন, আবদুল স্কুলে, আমি মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করি তখন জুলেখার সঙ্গে একজন পুরুষ গোপনে সাক্ষাৎ করতে আসে। সে 'কল-বেল' বাজায় না, বা দরজার কড়া নাড়ে না। আমার বেটি বলেছে। লোকটা নির্দিষ্ট সময়ে ঐ গাছতলায় এসে দাঁড়ায়। জুলেখা সদর খুলে দেয়। ছেলেটি কখনো একঘণ্টা, কখনো দু'ঘণ্টা কাটিয়ে চলে যায়।

জামাল-সাহেব বললেন, সম্ভবত বিশ্বনাথ। মানে জুলেকার দাদা।

—না, প্রফেসর-সব, বিশ্বনাথ দ্যুবেকে আমি চিনি। সে দু-একবার আমার ডাক্তারখানায় এসেছে। নিজের পরিচয় দিয়েছে। আমি ভিতরে খবর পাঠিয়েছি। জুলেখা এসে তার সঙ্গে কথা বলেছে। এ ছেলেটি আরও দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ! এ অন্য একজন।

অধ্যাপকমশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে, আমি জুলেখাকে জিজ্ঞাসা করে জানব। যথাকর্তব্য করব। আপনাকেও জানাব। এটা তো ভাল কথা নয়। ওকে 'নসিহত' করতে হবে। ভর্ৎসনা।

প্রশ্নমাত্র জুলেখা স্বীকার করল . হ্যাঁ, রসিদই। তবে বিশ্বাস করুন, স্যার—ও কোনদিন আর আমাকে ছোঁয়নি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে তার সব সম্পর্ক যখন চুকে গেছে তখন সে আমার বাড়িতে আসে কেন? আর লুকিয়েই বা আসে কেন?

—ও আপনাকে কিছু বলতে চায়। খুব জরুরী কথা। সাহস পাচ্ছিল না। আমি বলেছি, ভয়ের কিছু নেই। আপনার সঙ্গে কলেজে দেখা করতে বলেছি। কাল জুম্মাবার, আমি জানি আপনার ছুটি বেলা তিনটেয়। ওকে বলেছি, কলেজের গেট-এ অপেক্ষা করতে।

।। পাঁচ ।।

জুম্মবার কলেজ ছুটির পর উনি বেরিয়ে এসে দেখলেন, গেটের কাছে রসিদ দাঁড়িয়ে আছে। নত হয়ে সে আদাব জানালো। জামাল-সাহেব বললেন, জুলেখা বলছিল তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও?

'তুমি' সম্বোধনে কোনও সঙ্কোচ হল না এবার। বয়সে রসিদ ওঁর চেয়ে দশবছরের ছোট। রসিদ বলল, হ্যাঁ স্যার, আপনি যদি অনুগ্রহ করে শোনেন। আর আমাকে সাহায্য করেন।

—কী বিষয়ে সাহায্য?

—স্যার, এভাবে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে আমরা যদি অগ্রসর হতে থাকি তাহলে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা আছে। আসুন আমরা কোথাও গিয়ে বসি। আমার সমস্যাটা আপনাকে খুলে বলি। আপনি যদি আমাকে এই জটিলতা থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করেন তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব...না, না স্যার, বাধা দেবেন না...আমি জানি আপনার প্রশ্নটা কী। তাই দুটো কথা প্রথমেই বলে রাখি। প্রথম কথা : আমি অনুতপ্ত। রাগের মাথায় অত্যন্ত অসংযমী হয়ে আমি এ অভিশাপ নিজেই সৃষ্টি করেছি। সেজন্য আমি জুলেখার কাছে ক্ষমাও চেয়েছি—হাত-ধরে ক্ষমা চাইতে পারিনি, যেহেতু আমার স্পর্শকে সে গুনাহ্ বলে মনে করে। দ্বিতীয় কথা : আমি আপনাকে যা বল্‌ব তা জুলেখা জানে। বস্তুত তার পরামর্শ মতোই আমি আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি, স্যার!

—বেশ চল, এসব আলোচনা কোন রেস্তরাঁ বা হোটেলে ভালভাবে করা যাবে না। কলেজে কতকগুলি ছোট ঘর আছে—গ্রুপ-ডিস্‌কাশানের জন্য। তার একটাতে গিয়ে আমরা বসি।

—আপনার অশেষ মেহেরবানি, স্যার!

রসিদ যে প্রস্তাব দিল তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন জামাল-সহেব।

কিন্তু প্রস্তাবটা পেশ করার আগে সে সমস্যাটা বিস্তারিত জানিয়েছে। জুলেখাকে 'তালাক' দিয়ে সে মর্মান্তিক অনুতপ্ত! কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে এই কাজটা করে বসেছে। পাঁচ মেহ্‌মানের সম্মুখে আব্বাজানের থাপ্পড় খেয়ে সে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

পরে জেনেছে, এজন্য জুলেখাকে চূড়ান্ত অবমাননা সইতে হয়েছে। গ্রামের কয়েকজন—সঙ্গে ছিলেন ওর দাদা রহমৎ—জুলেখাকে তার বাপের ভিটেতে পৌঁছে দিয়ে আসে। কিন্তু বাপের বাড়ির লোকেরা ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। তাঁদেরও দোষ দেওয়া যায় না। তাহলে হয়তো গ্রাম-পঞ্চায়েত

ওঁদের একঘরে করত, অর্থাৎ জাতিচ্যুত। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, শেষ বাসটাও চলে গেছে। ফলে একটা রাত জুলেখাকে বাধ্য হয়ে কাটাতে হয়েছে পিতৃগৃহে—গৃহে নয়; গোয়ালঘরে। ওর মা মাটির সরায়, মাটির গেলাসে ওর রাতের খাবারটা পৌঁছে দিয়েছিল চোখের জলে ভাসতে ভাসতে। একটা বাক্যবিনিময়ও করতে পারেনি গৃহপ্রত্যাগতা কন্যার সঙ্গে—কারণ সমাজের তরফে পাহারাদার খাড়া দাঁড়িয়েছিল, যাতে ব্রাহ্মণের জাত কোনক্রমেই না খোয়া যায়।

জুলেখার ছোট বোন স্বাতীলেখা কিছু ভিজে খড় জ্বালিয়ে দিয়ে গেল গোয়ালের কাছে পিঠে—যাতে ধোঁয়া হয়। মশার কামড় কম সইতে হয়।

জুলেখা একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিল। তার দ্বিতীয় পোশাক ছিল না যে, বদল করবে। নাকছাবিটা বাদে সারা দেহে এক রতি সোনা ছিল না।

পরদিন ভোর রাতে স্বাতীলেখা গোয়ালঘরে দিদির তত্ত্বতালাশ নিতে এসে দেখেছিল—একরাশ দগ্ধ ভস্মের মাঝখানে খড়ের বিছানা শূন্য। অপরাধী মেয়েটা বাপের বাড়ি থেকে শেষ বিদায় নেবার আগে সেই গোয়ালঘরে যদি দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলে থাকে তাহলে তাও শুকিয়ে গেছে। পড়ে আছে মাটির সরায় অভুক্ত খাদ্য।

আশ্চর্য! গোয়ালে যে গরুটি সারারাত ওর সঙ্গ দিয়েছে—কৈশোরকাল থেকে যার সেবা করে এসেছে জুলেখা—তার জন্য জাব্‌না মেখে রেখে যেতে ভোলেনি কিন্তু।

পরদিন অভুক্ত, অস্নাত বিতাড়িতা মেয়েটি একবস্ত্রে এসে উঠেছিল তার ছোড়দার বাড়িতে। ভোরবেলাকার প্রথম বাসে। ভাগলপুরে। ভাগ্যক্রমে বাড়ি ছাড়ার আগে আঁচলের খুঁটে গোটা দুই দশটাকার নোট বেঁধে রওনা হয়েছিল। বুধি আর বুদ্‌বুদ্‌কে বিক্রয় করে যে হাজার টাকা পেয়েছিল তা থেকেই। বাকি ন শো আশিটাকা রেখে এসেছে ওর শোবার ঘরে আলমারিতে।

ছোড়দার বাড়ির চৌকাঠ অতিক্রম করতে পারেনি।

দোরগোড়া থেকেই ফিরে আসে। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে মশল্লাচকে। যেখানে ওর শ্বশুরমশায়ের মটোর মেরামতির কারখানা। কয়েকজন মজদুর—হিন্দু এবং মুসলমান—ওকে 'ভাবিজী' ডাকে। তাদের সাহায্য নিতেই এসেছিল। দুর্ভাগ্যবশত গ্যারেজ তালাবন্ধ। ঈদ-এর ছুটি।

জুলেখা পর পর চারটি ডাক্তারখানা থেকে অল্প অল্প পরিমাণে ঘুমের ওষুধ 'কাম্পোজ' কিনে নেয়। বিনা প্রেস্‌ক্রিপশানে কোনও ডিস্‌পেনসারিই ওকে একপাতা বেচতে রাজি হয়নি। তারপর রাস্তার কলের জলের সঙ্গে বড়িগুলো গলাধঃকরণ করে পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

অধ্যাপমশাই প্রশ্ন করেন, এত বিস্তারিত খবর তুমি পেলে কী করে?

—জুলেখাই বলেছে।

—তুমি হাসপাতালে ওর সঙ্গে দেখা করতে কেন এসেছিলে?

রসিদ চট-জলদি জবাব দেয়, নাকছাবিটা ফেরত দিতে।

—নাকছাবি! মানে?

রসিদ বুঝিয়ে বলে ব্যাপারটা। গরু-বাছুরের দাম বাবদ জুলেখার বিক্রয়লব্ধ প্রায় হাজার টাকা সে ধরিয়ে দেয় ওর দাদা রহমতের হাতে। বলে, একজোড়া পাঁঠা কিনে নিয়ে এসে ধর্মীয় কারনামা সেরে ফেল। আমি চললাম...

রহমত ওর হাত চেপে ধরে বলেছিল, নালায়েকের মতো বাতচিৎ করিস্ না রসু! জুলেখা আর তোর জরু নয়। সে কোথায় গেল তা তোকে দেখতে হবে না।

দাদার হাত ছাড়িয়ে সে চলে এসেছিল বাবুপুর গ্রামে। ওর শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে পাড়ার ছেলেদের হাতে বেশ দু-চার ঘা খেতে হয়। তবে খবর পায় জুলেখা সেখানে নেই। চলে আসে ভাগলপুরে। প্রথমে বিশ্বনাথের বাড়ি, তারপর গ্যারেজ। রিপেয়ারিং গ্যারেজ সুনসান্। তবে দারোয়ান আছে। সে দরজা খুলে ছোটহুজুরকে ঢুকতে দেয়। রাতের জন্য একটা খাটিয়া পেতে দেয়। মশারি

খাটিয়ে দেয়। পরদিন সকালেই সে খবর পায় সামনের পার্কে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করে মরে পড়ে আছে। ও ছুটে যায়। জুলেখা বেঁচে আছে কি না বুঝতে পারে না। যা হোক, প্রতিবেশীদের সাহায্যে সে ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। এমার্জেন্সি জানায় মেয়েটি জীবিতা। তাকে ভর্তি করে নেওয়া হয়। রসিদই নামধাম লেখায়। নিজের পরিচয় দেয় না, বলে রিস্তেদার। তার নামধাম লিখে নিয়ে দু-একজন সাক্ষী রেখে এমার্জেন্সির ছোকরা ডাক্তার জুলেখার নাকছাবিটা খুলে তার হাতে দেয়।

এবার অধ্যাপকমশাই জানতে চান, তুমি কি অনুতপ্ত? মানে, তুমি কি মনে কর, জুলেখাকে তালাক দেওয়া তোমার অন্যায় হয়েছে?

—হ্যাঁ, স্যার। তাই মনে করি আমি। প্রচণ্ড রাগের মাথায় দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে ওকে আমি তালাক দিয়ে বসেছি।

—বুঝলাম। কিন্তু তুমি কি জান যে, জুলেখা তার কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত নয়?

—হ্যাঁ, স্যার, তাও জানি। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি একজন ধার্মিক মুসলমান মৌলানার সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁর মতে 'বকরহ্-ঈদ'-এ যে গো-শাবককেই কুরবানি করতে হবে এমন কোনও শাস্ত্রীয় নির্দেশ নেই। উনি একথাও বলেন যে, অনেক মৌলবাদী ধর্মীয় নেতার মতে কুরবানির পশুটি গরু না হলে চলবে না। তিনি সে মত মানেন না। তাছাড়া তিনি বললেন, "তুই তো জানতিস তোর বউ হিঁদু ঘরের মেয়ে। তোব মহব্বতে দিওয়ানা হয়ে সে সব কিছু ছেড়ে তোর ঘর করতে এসেছে। আর পরিবর্তে তুই তোর জিদ্দিবাজিটা ছাড়তে পারলি না? ওর কয়েক হাজার বছরের জিন-বাহিত সংস্কারটাকে অস্বীকার করলি?" আমি, স্যার, ওঁর কথা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছি। যতদিন বেঁচে থাকব আমি গো-হত্যা করব না, গো-মাংস ভক্ষণ করব না। জুলেখা মাংস খায়। কিন্তু গো-মাংস খেতে পারে না। ও যা খায়, আমিও এবার থেকে তাই খাব।

জামাল-সাহেব বললেন, তোমার এই সিদ্ধান্তটা বড় দেরি করে নেওয়া হচ্ছে না, রসিদভাই?

—সেটা স্যার, নির্ভর করছে, আপনার সিদ্ধান্তের উপর। অর্থাৎ আপনি আমাদের দুজনকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে স্বীকৃত কি না—তার উপর!

—তার মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?

রসিদ এইবার তার প্রস্তাবটা পেশ করে :

শরিয়তি কানুনে কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে 'তালাক' দেবাব পর সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায় বটে: কিন্তু একটি বিকল্প ব্যবস্থা আছে তাদের পুনর্বিবাহের। যদি ঐ তালাকপ্রাপ্তা রমণীকে কোনও দ্বিতীয় পুরুষ নিকা করে তিন মাস শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করে তারপর 'তালাক' দেয়। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে জুলেখাকে একজন দ্বিতীয় পুরুষ নিকা করবে—তার যদি ইতিপূর্বেই বিবাহ করা চার বিবি জীবিতা না থাকে। তারপর তারা দুজন তিনমাস স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করবে। প্রতি রাত্রেই সে দুজনকে এক শয্যায় শয়ন করতে হবে সে রকম কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এই বিবাহকালের মধ্যে জুলেখাকে তিনবার ঋতুমতী হতে হবে। সে প্রয়োজনে তিন চান্দ্রমাসের সময়কাল বর্ধিতও হতে পারে। তারপর জুলেখার দ্বিতীয় স্বামী জুলেখাকে 'তালাক' দিলে জুলেখা মুক্তি পাবে। তখন সে আবার তার প্রথম স্বামীকে বিবাহ করতে পারে।

জামাল-সাহেবকে এত কথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজনই হল না, তিনি এসব আইন-কানুন সম্বন্ধে অবহিত। বললেন, এজন্য কিছু লুচ্চা-জাতের কারবারী পাওয়া যায়, যারা কিছু অর্থের বিনিময়ে তালাকপ্রাপ্তাকে তিনমাসের জন্য শয্যাসঙ্গিনী করতে রাজি হয়ে যায়। সাময়িক একটি শয্যাসঙ্গিনীও জুটল, কিছু উপার্জনও হল। তুমি কি সেই ব্যবস্থা করছ রসিদ?

—ন্যা, স্যার! জুলেখা তাতে রাজি নয়। তার বক্তব্য : তার খসম্ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে তাকে 'তালাক' দিয়েছে—এতে তার কী অপরাধ? সে কেন তার স্বামীর হঠকারিতার জন্য তিনমাস বেশ্যাবৃত্তি

করবে?

জামাল-সাহেব প্রতিবাদ করেন, বেশ্যাবৃত্রি কেন বলছ রসিদ? সে তো রীতিমতো সর্বসমক্ষে ওকে 'নিকা' করবে!

রসিদ বললে, সে যুক্তিটা, স্যার, আপনি-আমি মানছি, কিন্তু জুলেখার কয়েক হাজার বছরের জিনবাহিত কাফের-খুন মানতে রাজি নয়। ওর দৃষ্টিভঙ্গিতে 'নিকা' করুক বা না-করুক অর্থের বিনিময়ে তিন চান্দ্রমাসের জন্য যে খদ্দের ওর নারীদেহটা উপভোগের ধর্মীয় অনুমতি পাচ্ছে তার সঙ্গে রেড লাইট এলাকার কোনও খদ্দেরের বিন্দুমাত্র প্রভেদ নেই।

—তাহলে?

—এ-ছাড়া আরও একটা মুশকিল আছে, স্যার। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়েও তিনমাস পরে পুরুষটি 'তালাক' দিতে রাজি হয় না। ব্ল্যাকমেলিং শুরু করে। শরিয়তি কানুনের মাধ্যমেও তাকে বাধ্য করা যায় না, আদালতের মাধ্যমেও নয়। লোকটা যদি জুলেখাকে তিনমাস পরে 'তালাক' দিতে রাজি না হয় তাহলে তাকে খুন করা ছাড়া জুলেখাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা যাবে না। তাই নয়?

—বুঝলাম। তাহলে তোমরা কী চাইছ?

—আপনি স্যার, আমাদের দুজনকে মুক্তি দিন। আপনি নিজেই জুলেখাকে নিকা করুন—তিন মাসের জন্যে!

অধ্যাপক মশাই নিজের অজান্তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, এ-সব কী বলছ রসিদভাই? আমি যে জুলেখাকে নিজের বহিনের মতে দেখি—

—জানি। আমি ছাড়া এ কথা জুলেখাও জানে। তাই সে রাজি হয়েছে। পুরো তিন-তিনটে মাস আপনার শয্যায় শয়ন করতে। আমরা দুজনেই বিশ্বাস করি : আপনি সরিফ, আপনি শীরীন! ইব্‌তিজাল আর খিয়ানৎ আপনার কাছে হারাম! আমরা দুজনেই বিশ্বাস করি তিনমাস পরে আপনি জুলেখাকে খিলাৎ দেবেন আমার মত বেঅকুফ, নাদান নফরকে! মাত্র তিনমাসের জন্য আপনি ওকে আপনার কলিজা ঘেঁষে শয়নের অনুমতি দিন, স্যার! জুলেখা সরমে একথা বলতে পারছিল না বলেই আমাকে আপনার দ্বারে ভিক্ষা চাইতে আসতে হল। বেরোদানে ইসলাম! আপনার মুবারকী আমরা দুজন জিন্দেগীভর বিস্মৃত হব না, স্যার!

।। ছয় ।।

পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলি লিপিবদ্ধ করার পূর্বে একটা ব্যক্তিগত 'কৈফিয়ত' দেবার প্রয়োজন বোধ করছি। সেটা হচ্ছে এই যে, এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করার মূল অনুপ্রেরণা যে ভদ্রলোকের কাছ থেকে পেয়েছি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। তিনি আমাকে ভাগলপুর দাঙ্গার কথা বিস্তারিত বলেন এবং অনুরোধ করেন, "এ নিয়ে লিখুন মিস্টার সান্যাল। আপনার ঐ গোয়েন্দা কাহিনী অথবা দুশো বছর আগে যে, মহিলা নারীমুক্তির প্রথম উদ্‌গাতা হিসাবে কীর্তি রেখে গেছেন তাঁর কথা পরে লিখলেও চলবে। একদল রাজনীতি-ব্যবসায়ী ধর্মান্ধতাকে মূলধন করে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। এখন যদি আপনারা, শিল্পী-সাহিত্যিকরা, রুখে না দাঁড়ান তবে ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। আপনি লিখুন ভাগলপুর দাঙ্গার কথা—সেখানে সাম্প্রদায়িক বিভেদবুদ্ধিকে চূর্ণ করে কী ভাবে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল—লিখুন, অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বর্বতার কথা, গুজরাটের সেই অনবদ্য কাহিনীটি।"

আমি ডক্টর খইরনারের উপদেশ মেনে নিয়েছিলাম। তাই লিখতে বসেছি সেইসব মানুষের কথা যাঁরা সাম্প্রদায়িক বিভেদবুদ্ধির উপরে উঠে ভারতবর্ষের প্রাণসত্তাকে পুনর্জীবিত করতে চেয়েছিলেন।

১৯৮৯ সালে, মহরমের মাসে, বিহারের ভাগলপুর শহরে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয় তাতে প্রায় আড়াই

হাজার মানুষ প্রাণ দেন। এর প্রায় পঁচানব্বই শতাংশই মুসলমান। সরকাব একটি তদন্ত কমিশন বসান। সাম্প্রতি তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে; 11.3.95 তারিখের আনন্দবাজারে এই নিয়ে সম্পাদকীয় ছিল: **লজ্জাকর ভাগলপুর উপাখ্যান**। বলা হয়েছে;

জনহীন শূন্য কুটিরের ভিতর তরোয়ালের কোপে ছিন্নভিন্ন তোষক, বালিশ—শূন্যগর্ভ বাক্স-পেটরা।

আক্রমণকারীরা বিধর্মীদের হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। শূন্যগৃহে অগ্নিসংযোগ করে গেছিল। কয়েকশত বছরের পুরাতন মস্‌জিদ ধ্বংস করে সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে হনুমানজী অথবা দূর্গা মাঈর মন্দির। আমাদের সবচেয়ে যেটা বিস্মিত করল তা এই যে, ঘটনার এতদিন পরেও মৌলবাদী হিন্দু দাঙ্গাবাজদের মনে এতটুকু অনুশোচনা জাগেনি। অনেকেই অনায়াসে বললে, "মুসলমানেরা তো সব ব্লাডি বাস্টার্ড! যা করা হয়েছে তাই ছিল ওদের প্রাপ্য। সুযোগ পেলে যা করেছি, তা আবার করব!"

ওদিকে দাঙ্গার সেই ভয়াবহ হাহাকার থেকে যেসব মুসলমান রক্ষা পেয়েছে তারা এখন একটি মাত্র স্বপ্ন দেখে : প্রতিশোধ! কড়ায়-গণ্ডায়। অনেকে একই কথা আমাদের বলল : "বাবুমশাইরা! আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন? আমাদের উপকার করতে? একটিমাত্র পথ আছে! বড় কর্তাদের কাছে তদ্বির তদারক করে আমাদের জন্য কিছু গান-লাইসেন্স বার করে দেন। ব্যস্‌! বাদবাকি কাজ আমাদের!"

গোটা এলাকায় ছোট ছোট 'ঘেট্টো' গড়ে উঠেছে। অস্থায়ী ছাপড়া। এখানে ওখানে। উইঢিপির মতো। যেসব গ্রাম হিন্দুপ্রধান সেখান থেকে মুসলমানেরা সপরিবারে সরে এসেছে মুসলিম-অধ্যুষিত গ্রামে এবং ভাইসি-ভার্সা! এই জাতীয় সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের শেষ পরিণতি যে কী, তা সুধীজন মাত্রেই অনুমান করবেন!

কলকাতায় ফিরে এসে আমরা নিজেদের মধ্যে গভীরভাবে আলোচনা করলাম। কীভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত? অভিজ্ঞ সমাজসেবী দাদারা বললেন, "সর্বপ্রথম শান্তি-পদযাত্রার আয়োজন কর। সাম্প্রদায়িক শান্তি-সমাবেশ আর মিলাদ-সরিফ!" কিন্তু আমাদের মনে হল তাতে কিছু লাভ হবে না। ভাগলপুর দাঙ্গার মাত্র ছয়মাস পূর্বে বাবা আমতে ঐ ভাগলপুর শহরেই 'ভারত জোড়ো' পদযাত্রা তো করে গেছেন। ভারত তো দূরের কথা—ভাগলপুরই তাতে জোড়া লাগেনি! তাহলে?

আমরা জানতাম : ঐসব প্রতীকী শুভেচ্ছা, মৌখিক উপদেশ বা সহানুভূতি নিরর্থক। সমস্যাটা ওদের, সমাধান ওদেরই করতে হবে। আমরা বড়জোর অনুঘটকের ভূমিকা নিতে পারি। পজেটিভ ক্যাটালিস্ট। প্রথম কাজ হচ্ছে জীবনে-জীবন যোগ করা। স্থির হল, অন্তত ছয়মাসকাল ধরে প্রতি মাসে আমাদের এক-একটি ছোট দল ওখানে যাবে। গ্রামে গ্রামে ঘুরবে। ওখানে বাস করবে। ওদের জীবনের ভাগিদার হতে হবে। এভাবেই শুরু হল কাজ।

প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি গ্রাম আমরা বেছে নিয়েছিলাম : বাবুপুর, চান্দেরী আর রাজপুর। তিনটিই ভাগলপুরের কাছাকাছি গ্রাম। বাবুপুর হিন্দুপ্রধান গ্রাম। সেখানে কোন প্রাণহানি হয়নি, কিন্তু বর্তমানে গ্রামে একটিও মুসলমান নেই। ওদের বাড়িগুলো হয় অগ্নিদগ্ধ অথবা তার সদর দরজা হাট করে খোলা। জনমানবশূন্য। চান্দেরী ঐ ত্রয়ীর সবচেয়ে দুর্ভাগা গ্রাম। সেখানে হিসাবমতো পঁয়ষট্টি জন মুসলমান নিহত হয়েছিল একরাত্রে। যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ নর ও নারী। মৃতদেহগুলি ফেলে দেওয়া হয়েছিল সংলগ্ন ঝিলে। যারা প্রাণে বেঁচেছিল তারা আশ্রয় নিয়েছিল রাজপুরে। সেটি মুসলমানপ্রধান গ্রাম।

প্রথম প্রথম আমরা এই তিনটি গ্রামে বারে বারে যেতাম। আমাদের মনে হল, যদি বাবুপুরের বাস্তুচ্যুত দশ-পনের ঘর মুসলমান পরিবারকে তাদের ফেলে-আসা ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলেই মস্ত বড় একটা কাজ হবে। কিন্তু প্রাথমিক বাধা হল বাবুপুরেরই হিন্দু মোড়লেরা। তারা ক্রমাগত বলতে থাকে— মুসলমানেরা সর্বদাই মারমুখী! সরকার ওদের সুয়োরানীর ছেলে বলে মনে করে। ওদের উচিত শিক্ষা হয়েছে। ওদের গাঁয়ে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না!

আমরা নিজেদের চিন্তাভাবনা ওদের উপর আরোপ করতে চাইতাম না। তাহলে আমাদের কাজ ব্যাহত হবে। আমরা বরং সক্রেটিসের মতো নানান প্রশ্ন তুলে ওদের কাছে উত্তর শুনতে চাইতাম। আর উত্তর দিতে গিয়ে ওরা নিজেদের ভুলগুলো বুঝতে পারত। আমরা জানতে চাইতাম—তোমাদের

এই রাজপুর গাঁয়ের ঐ দশ-পনের ঘর মুসলমানকে সরকার কী কী বাড়তি সুবিধা দিয়েছে যা তোমরা পাওনি? ঐ দশ-পনের ঘর মুসলমানের মধ্যে কজন ছিল সরকারি চাকুরে? মানে গাঁয়ের চৌকিদার, সরকারি পিওন বা ডাক-হরকরা? অথবা গাঁয়ের স্কুলে, পোস্টাপিসে কিংবা সমবায় প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত ? ওরা আম্‌তা আম্‌তা করত। স্বীকার করত ওই বিতাড়িতদের অবস্থা ছিল হিন্দুদের তুলনায় আরও খারাপ। অশিক্ষিত অবজ্ঞাত প্রায় সবাই মজুরচাষী! পড়িলিখি ইনসান নয়। এবং শেষ পর্যন্ত বলত, ওরা নিজেদের গাঁয়ের মুসলমান বাসিন্দাকে কোন বাড়তি সুবিধা পেতে দেখেনি বটে, তবে অমুক-দাদা বলেছেন, সরকার ওদের সুয়োরানীর ছেলেদের মতো নেকনজরে দেখেন।

সেই অমুক-দাদা বহিরাগত কোন রাজনৈতিক দলের নেতা! বলা বাহুল্য কোন দলের। ক্রমে এ-কথা ওরাও নিজমুখে স্বীকার করল : "মনিরুদ্দি, বসির, কামাল—ওরা মানুষ খারাপ ছিল না! ওদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। অধিকাংশ দিনই একবেলা খেত। অথবা উপবাস। তবে অমুকদা কিন্তু বললেন..." মুসলমানদের জমায়েতেও আমরা বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতাম না। প্রথম প্রথম আমরা নিশ্চুপ শুনে যেতাম ওদের নির্যাতনের কথা, আত্মীয়-বিয়োগের দুঃখের কথা। ক্রমে, ধীরে ধীরে আমাদের যুক্তিগুলো ওরা নিজেরাই শুনতে চাইল। আমরা ওদের মুখ দিয়েই বলাবার চেষ্টা করলাম যে, দু-দশটা বন্দুকের লাইসেন্স যোগাড় করে দিলেই সমস্যাটা মিটবে না! হেঁদুরাও তা জোগাড় করবে। ফলে গতবার ছিল টাঙি, রাম-দা, তলোয়ার—আগামী বার হবে বন্দুকের লড়াই! ওরা স্বীকার করল : জী! হক কথা! এটা কোন সমাধান নয়।